যুগনায়ক বিবেকানন্দ

(প্রথম খণ্ড)

প্রস্তুতি

স্বামী গম্ভীরানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রাগ্‌বাণী

স্বামীজীর জীবন ও বাণী লইয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন, জীবনী-গ্রন্থও বিরচিত হইয়াছে অনেক। বিশেষতঃ সম্প্রতি (১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার শতবর্ষ-জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে এই জাতীয় সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশনের ফলে তাঁহার মহিমা জনসমাজে বহুধা বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব সহজেই মনে প্রশ্ন জাগিবে—বর্তমান উদ্যমের সার্থকতা কি?

সার্থকতা যে কি, তাহা লেখক নিজেও হয়তো সম্যক বিদিত নহেন; ইহা পাঠকসাধারণকেই স্থির করিতে হইবে। বর্তমান লেখক স্বামীজীর দেবদুর্লভ পূতচরিত্রের অনুধ্যানপূর্বক স্বীয় জীবনকে ধন্য করার উদ্দেশ্য লইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। অবশ্য এই মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত অন্যান্য অভিপ্রায়ও যে বিজড়িত ছিল না, এমন কথা বলা চলে না।

স্বামীজীর দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পরে মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে **Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples** নামে একখানি প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থ চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়; উহা অধুনা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে একখণ্ডে মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহার পরে প্রামাণিক সম্পূর্ণ জীবনী-গ্রন্থ হিসাবে প্রমথনাথ বসু কর্তৃক বিরচিত ও উদ্বোধন কার্যালয় হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি সমধিক আদরণীয়। এই দ্বিতীয় রচনাতে কিছু কিছু নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইলেও ইহার প্রধান উপজীব্য পূর্বোক্ত ইংরেজী জীবনী। অতঃপর যেসব গ্রন্থে স্বামীজীর সম্পূর্ণ জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিতে এই দুইখানি গ্রন্থেরই উপাদানরাশি স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয়ের নিকট আমরাও বহুলাংশে ঋণী এবং বর্তমান পুস্তকে এই দুইখানি যথাক্রমে 'ইংরেজী জীবনী' ও 'বাঙ্গলা জীবনী' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

স্বামীজীর জীবনী-লেখককে আরও দুইখানি প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য অবশ্যই লইতে হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' -এর মধ্যে স্বামীজীর জীবনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে; আমাদিগকে উহাদের সাহায্য লইতে হইয়াছে ও স্থানে স্থানে উহাদের বাক্যাবলী 'লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'কথামৃত' নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'

এবং ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' ও 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে'—এই তিনখানি পুস্তকেও বহু অমূল্য রত্ন সংরক্ষিত আছে; আমরা ইঁহাদেরও নিকট ঋণী।

শতবর্ষ-জয়ন্তীর পূর্ব পর্যন্ত লিখিত জীবনীগুলির বিষয়বস্তু এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে ও পরে আরও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, অথবা পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকাদিতে যাহা বিচ্ছিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সংগ্রহ-গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হওয়ায় জীবনীলেখকদের কার্য লঘুতর হইয়াছে। এই গ্রন্থাদির মধ্যে দুইখানি সমধিক মূল্যবান—Swami Vivekananda in America : New Discoveries, by Marie Louis Burke ও Reminiscences of Swami Vivekananda, by His Eastern and Western Admirers. বর্তমান পুস্তকে এই গ্রন্থদ্বয় 'নিউ ডিস্‌কভারিজ্‌' ও 'রেমিনিসেন্সেস্‌' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে এই তিনখানির নাম করা উচিত : Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter by Benisankar Sarma ; Vivekananda : Patriot Saint by Bhupendra Nath Datta এবং উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।' অধিকন্তু স্বামীজীর অপ্রকাশিত অনেক পত্র অধুনা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়া তাঁহার জীবনের বহু ক্ষেত্র আলোকোদ্ভাসিত করিয়াছে। স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের জীবনী, পত্রাবলী ও মৌখিক (অধুনা মুদ্রিত) আলোচনাদি হইতেও অনেক কিছু জানা যায়। স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পুস্তকগুলিও অনেকস্থলে সহায়ক। এইভাবে বিবেকানন্দজীবনের যে নূতন তথ্যাবলী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও সুবিন্যস্তরূপে উপস্থাপিত করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আরও একটি দিক হইতে স্বামীজীর জীবনের নবীনতর আলোচনা অনিবার্য বলিয়া বোধ হয়। তথ্যের অপ্রাচুর্যবশতঃ পূর্বে যেসব ঘটনার বিবরণ অসম্পূর্ণ ছিল কিংবা অনুমানাবলম্বনে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, নূতন আলোক-সম্পাতে উহাদের প্রকৃত স্থান, কাল ও পারম্পর্য স্পষ্টতররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা স্বামীজীর খাণ্ডোয়া গমন, কন্যাকুমারী দর্শন, চিকাগো মহাসভায় পূর্বে বক্তৃতাদি-প্রদান ইত্যাদির উল্লেখ করিতে পারি। এইরূপ আরও কিছু কিছু বিবরণাদিকে ঢালিয়া সাজাইবার আবশ্যক ঘটিয়াছে।

ঘটনাবলীর পূর্ণতর রূপ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় এবং নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মূল্যায়ন বিষয়েও আমাদের মতপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু প্রাক্‌স্বাধীনতাযুগে স্বামীজীকে ভারতবাসীরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, স্বাধীনতোত্তরকালে তাহা বদলাইয়া গিয়াছে; এখন আমরা তাঁহার জীবন ও বাণীর মধ্যে অন্যরূপ অর্থ ও সার্থকতার সন্ধান পাইতেছি। আবার বিদেশী ও বিদেশিনীদের রচিত গ্রন্থাবলী পাঠের ফলে আর কিছু না হউক দুইটি বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়াছে; প্রথমতঃ স্বামীজীর জীবন অন্ততঃ বিদেশে অধ্যাত্ম চিন্তা ও অধ্যাত্ম প্রচেষ্টায় সর্বদা ব্যাপৃত ছিল; অন্যান্য যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহা ঐ চিন্তা বা প্রচেষ্টার পরিপুরক বা উহারই শাখাপ্রশাখাদি। দ্বিতীয়তঃ স্বামীজী শুধু ভারতের নহেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের নায়ক। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থে আমরা স্বামীজীর ভাবরাশির স্বরূপনির্ণয় অপেক্ষা ঘটনাবলীর সন্নিবেশের প্রতিই অধিক দৃষ্টি দিয়াছি; তবু ভাবকে বাদ দিয়া নিছক ঘটনার মূল্য অতি অল্প বলিয়া ভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয় নাই। স্থানে স্থানে ভাবেরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাবলীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, যদিও অধিকাংশ স্থলে ঘটনাপরম্পরাই ভাবের স্বরূপ আপনা হইতে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। তথাপি বলিতে হইবে, ভাবের অতিবিস্তার বর্তমান গ্রন্থের কর্তব্য নহে।

রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনাদির সৌকর্যার্থ এই পুস্তকখানিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইল—প্রস্তুতি, প্রচার ও প্রবর্তন। অবশ্য এই তিনটি বিভাগ পরস্পর-নিরপেক্ষ নহে। এ কথা সত্য নহে যে, আমেরিকায় প্রচারকার্য আরম্ভের পূর্বে স্বামীজী কোনরূপ প্রচার করেন নাই কিংবা আমেরিকায় গমনের পূর্বেই তাঁহার প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অথবা ইহাও বলা যায় না যে, শেষজীবনে ভারতে বা ভারতেতর দেশে বিবিধ পরিকল্পনার রূপায়ণের বা স্বীয় সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রবর্তনের পূর্বে তিনি কখনও ঐ জাতীয় প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হন নাই, কিংবা শেষের দিনগুলিতে কোন প্রকার প্রচারে নিরত থাকেন নাই। মোট কথা এই যে, এই জাতীয় পরস্পর-নিরপেক্ষ বিভাগ অসম্ভব হইলেও তাঁহার জীবনের আদি, মধ্য ও অন্ত—এই তিন অংশে এই তিনটি ভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, ইহা অনস্বীকার্য।

পরিশেষে আমরা এই কঠিন ও সুদীর্ঘ কার্যে যাঁহাদের সহায়তা পাইয়াছি,

তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত অপর যে সকল গ্রন্থ হইতে উপাদানাদি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলির গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি—

বেলুড় মঠ
গুরু পূর্ণিমা
১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

নিবেদক
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শত শত বৎসর পরাধীন থাকার পরের কথা। বিজিত জাতিসুলভ অনেক দোষই ভারতীয় জীবনের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়াছিল; তবু ভারতীয় সংস্কৃতি স্বীয় সুকৃতিবলে এবং ভগবানের আশীর্বাদে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই—উহা শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, যদিও উহার প্রসার ও গাম্ভীর্য ক্রমেই সঙ্কুচিত ও বিধ্বস্ত হইয়া এক বিকট পরিস্থিতি আনয়ন করিতে-ছিল। পর পর বহু শক্তিশালী বিদেশীয় ভাবরাশির প্রতিঘাতে ভারত-জীবন তখন সন্ত্রস্ত। এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া সে আত্মরক্ষার্থ অনেক অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয় উপায় অবলম্বনেও বাধ্য হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বহির্দেশ হইতে ভারতের উপর অনেক কিছু আরোপিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের নিজস্ব ধর্মের কোন ভেদসূচক নাম না থাকিলেও বিধর্মীরা যখন ভারতে আগমনের পরও তাহাদের চিরাচরিত প্রথানুসারে স্বীয় পৃথক সত্তার সংরক্ষণে এবং উহাকে অধিকতর মর্যাদাদানে উন্মুখ হইল, তখন বেদসম্ভূত সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মকে তাহারা বলিল হিন্দুধর্ম। ইহার ফলে যে ভারতবাসীরা এ যাবৎ ধর্মকে ধর্ম বলিয়াই জানিত, তাহারা এখন হইতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি অবলম্বনে আপনাদিগকে হিন্দু ও অপরদিগকে বিবিধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইল। ধর্মাবলম্বনে যে ভারতবাসী শান্তির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে আজ ধর্মকে বিবাদ-বিচ্ছেদের অন্যতম হেতুরূপে দেখিতে শিখিল। ধর্মান্ধতা আধ্যাত্মিকতার আসন কাড়িয়া লইল। আবার বৌদ্ধধর্মের অবসানকালে উহার মধ্যে যে সকল অবনতির কারণ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা হিন্দুধর্মেও অনেকটা অনুসঞ্চারিত হইল। বৌদ্ধদের নেতিবাদ ও নির্বিচারে সন্ন্যাসগ্রহণ-প্রথা ভারতীয় সমাজকে কর্মবিমুখ ও দুর্বল করিল। বৌদ্ধধর্মের দ্রুতপ্রসারের ফলে ভারতের বহির্ভূত যে সকল অনুন্নত দেশবাসী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভারতের সহিত অধিকতর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে প্রবৃত্ত হইল, তাহারা স্ব-স্ব ভাবধারার দ্বারা ভারতকেও গৌণভাবে প্রভাবিত করিল। এইসব কুপ্রথার নিবারণ-কল্পে হিন্দু-সমাজ আপনাকে বিবিধ নিগড়ে বন্ধন করিতে লাগিল—বিদেশগমন প্রায় নিষিদ্ধ হইল এবং হিন্দু রাজশক্তির অভাব পূরণার্থ পুরোহিতকুল সমাজপালন-ব্যবস্থা

স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন। মুসলমানদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা দৃঢ়তর আকারে সমাজের স্কন্ধে আরোপিত হইল। আর মুসলমানদের অনুকরণে নারীদের অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজও স্বীকার করিয়া লইল। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, সমাজ স্বাভাবিক সবল পন্থাবলম্বনে আত্মবিকাশের অবকাশ না পাইয়া বিকরাল বামাচারাদি গোপন অনুষ্ঠানের আশ্রয় লইল—ধর্মের নামে এক অন্তর্ঘাতী অনাচার ভারতীয় সমাজে আসন পাতিল। বিদেশীরা ভারতীয়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা আপন ঐশ্বর্যবৃদ্ধি ও ভোগব্যবস্থায় অধিকতর মনোনিবেশ করায় দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইল এবং রোগ, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বস্তুতঃ ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ভারত তখন বিব্রত ও পথহারা—বুঝি বা ভারতীয়দের ভারতীয়ত্ব চিরতরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এই বিপদের শেষভাগে আবার আসিল পাশ্চাত্য জাতিসমূহ—বিশেষতঃ ইংরেজগণ। তাহাদের ধর্ম, হাবভাব, চলন-বলন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তাহাদের বাণিজ্য ও সংস্কৃতিপ্রসারের রীতিও অন্যরূপ। মুসলমানদের ন্যায় অস্ত্রমাত্র সহায়ে রাজ্যবৃদ্ধি, অর্থলুণ্ঠন বা ধর্মান্তরিতকরণ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। বাণিজ্যব্যপদেশে ধনলুণ্ঠনই তাহাদের প্রধান প্রয়োজন এবং এই কার্যে সহায়তালাভের জন্য পরদেশবাসীদের মধ্যে স্বকীয় কৃষ্টির প্রচার করিয়া, প্রাচ্যবাসীর হৃদয়ে প্রতীচ্য-সদৃশ আভিজাত্যলাভের লালসা জাগাইয়া এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাসীকে প্রতীচ্যের নিকট হেয়তা স্বীকার করাইয়া শুধু বাহ্যজগতে নহে, অন্তর্জগতেও চিরদিনের মতো আধিপত্য স্থাপন করিয়া সে যুগের ইংরেজগণ ভারতকে অনন্তকাল ধরিয়া শাসন করিবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল। ইউরোপীয়ানদের আগমনের পূর্বে যে সব বিদেশী ভারতে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল, সভ্যতার ক্ষেত্রে তাহারা ভারত অপেক্ষা অগ্রাধিকারের দাবি রাখিত না। দৈহিক শক্তি ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার ফলেই তাহারা স্বাধিকার স্থাপন করিত এবং কয়েক পুরুষ পরে ভারতের সমাজে তাহাদের অস্তিত্ব প্রায় হারাইয়া ফেলিত। মুসলমানদের সম্বন্ধে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক এতখানি সত্য না হইলেও অর্থ, রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বহুলাংশে সত্য—তাহারাও শেষ পর্যন্ত ভারতকেই স্বদেশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয়দের দৃষ্টিতে প্রধানতঃ শাসক ও শোষকরূপেই আবির্ভূত হইল। ইংরেজদের

সাংস্কৃতিক অভিযানের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ভারতবাসীরা স্ব স্ব গৃহে ভাষা ও আকৃতিগত পৃথক সত্তা বজায় রাখিলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং ইংরেজপ্রভুদের সহিত আদান-প্রদান-কালে সর্বতোভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ করিবে এবং উহারই আনুগত্য স্বীকার করিবে।

ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিলেন, তাহা ইংরেজদেরই প্রয়োজন-সাধনের অনুকূলরূপে রচিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিক ও পরবর্তী কালে ইংরেজ শাসকবর্গের কার্যে সহায়তার জন্য এই শ্রেণীর মসীজীবী সৃজনই ছিল তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নবীন শিক্ষাপ্রাপ্ত নূতন সমাজ যাহাতে ইংরেজের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়, সেদিকেও ইংরেজদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। এই সুপরিকল্পিত কার্যধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র ও ধর্ম-প্রচারের মাধ্যমে পরিষ্কার ভাষায় ভারতবাসীকে বলা হইত, ভারতবর্ষের নিজস্ব এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহাকে আধুনিক জগতে বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক; বরং ভারতকে প্রগতিশীল হইতে হইলে সব কিছুই বিদেশ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে -বেশ, ভূষা, খাদ্য, আদব-কায়দা, ব্যক্তিগত ধর্ম ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য কৃষ্টির মান অতি উচ্চ। পাশ্চাত্য সভ্যতা উন্নততর বলিয়াই পাশ্চাত্য রাষ্ট্র প্রভাবশালী ও বিজয়মণ্ডিত হইয়াছে; অতএব উচ্চাকাঙ্ক্ষী অপর জাতিকেও স্বীয় উন্নতির জন্য ঐ সভ্যতাকেই নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রমাণ করিলেন যে, অতীতকালে ভারতে যে সব চিন্তারাজি প্রকাশ পাইয়াছিল, কিংবা শিল্পবিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে যে সব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ অন্য সভ্যতার আনুকূল্যে সম্ভব হইয়াছিল—মৌলিকতা ভারতের নহে—গ্রীসের, মিশরের বা আরবের। ভারতের যাহা নিজস্ব বস্তু, তুলনার দৃষ্টিতে তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। ভারতের বেদান্ত স্বপ্নবিলাসীর অলীক বৃথা চিন্তা মাত্র; ভারতের বেদ চাষীর সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই নহে; ভারতের ধর্ম এক নিম্নতর সভ্যতার পরিবেশে উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট; উন্নততর সভ্যতামধ্যে উহার আসন অটল থাকিতে পারে না। বিদ্যালয় হইতে এবং অন্যান্য প্রচারের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এই প্রকারের যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে বলিয়াছেন নেতি-মূলক শিক্ষা, আর বলিয়াছেন, এই শিক্ষাবলম্বনে কোন স্বাধীন জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না, আত্মস্থ হইয়া দৃঢ়পদক্ষেপে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু স্বামীজীর

আগমনের পূর্বে এই সহজ সত্যটি ভারতীয় মনে উদিত হয় নাই। বরং এই সকল মুখরোচক কথা, ঐশ্বর্যের চাকচিক্য, বিলাস-বৈভবের আকর্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের অদম্য শক্তির সম্মুখে ভারতপ্রতিভা একান্ত ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় সমাজ স্বীয় প্রাচীন কৃষ্টির পটভূমিতে সময়োপযোগী নব নব সবল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে "পরানুকরণ, পরানুবাদ, দাসসুলভ দুর্বলতার" আশ্রয় লইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ তখন ইংরেজের ন্যায় পানভোজন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত। প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য-ভক্ষণ ও মদ্যপান তখন সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইংরেজের তীব্র সমালোচনায় বিক্ষুব্ধ নবীন সম্প্রদায় তখন হিন্দুসমাজকে ঢালিয়া সাজিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারত-সংস্কৃতির তরী তখন কর্ণধারহীন হইয়া পাশ্চাত্য বায়ুপ্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের বায়ু কতরকম বিরুদ্ধ সমালোচনা, জড়বাদ ও নাস্তিকতার দ্বারাই না বিষাক্ত হইয়াছিল! একদিকে খৃষ্টান মিশনারীরা হিন্দুধর্মের নিন্দায় শতমুখ এবং ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরিত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প; আর অপরদিকে ধর্মবিমুখ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীয় সাফল্যে গর্বিত হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধা, গুরুপরম্পরা, ঐতিহ্য, রীতিনীতি প্রভৃতিকে নস্যাৎ করিতে কৃতনিশ্চয়। এই পাশ্চাত্য ধর্ম ও বিজ্ঞানের যুগপৎ আক্রমণের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকা বড় সহজ ছিল-না। তথাপি ভারতের মতো একটা সুপ্রাচীন দেশ—যে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত গৌরব বক্ষে ধারণ করিয়া এবং অতীতের নির্দিষ্ট পথে চলিয়া শত শত বাধাবিপত্তি অতিক্রমপূর্বক যুগোপযোগী অভিনব সাধনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে, অপরকে শিখাইয়াছে, এবং চিরকাল আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সে এত সহজে ধ্বংস হইতে পারে না—ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাহা হইতে দিতে পারেন না; কেন না, তাহা হইলে জগৎ হইতে এমন এক বস্তু চিরবিলুপ্ত হইয়া যাইবে, যাহা অপূরণীয়।

অতএব নৈরাশ্যপূর্ণ বিপর্যয়ের মুখেও প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইল এবং জাতীয় আত্মরক্ষাশক্তি ক্রমেই মস্তকোত্তলনে উদ্যত হইল। অবশ্য প্রথমেই উহা স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; বরং উহা পাশ্চাত্য ভাবরাশির সহিত আপস করিয়া চলার পথই বাছিয়া লইয়াছিল, এবং এই প্রকার একটা আংশিক বিজিত-সুলভ মনোবৃত্তি লইয়া তদানীন্তন সভ্যসমাজে অতি উচ্চ না হইলেও নিজের মতো একটু সম্মানের স্থান করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

আত্মরক্ষার পথে যাঁহারা চলিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী ও পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নিরাকার একেশ্বরের উপাসনার্থ 'আত্মীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই পরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে একটি 'ইউনিটেরিয়ান্ এ্যাসোসিয়্যাসন' (একেশ্বরবাদ-সমিতি) এবং তাহারও পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত হয়। অতঃপর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বে নগরে 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ঐ বৎসরই মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সূত্রপাত করেন। শেষোক্ত সোসাইটি প্রথমে নিউ ইয়র্কে স্থাপিত হইয়া ভারতীয় প্রয়োজনানুসারে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে ভারতে প্রসারিত হয়। এই তিনটি ধর্মান্দোলনই প্রধানতঃ সমাজ ও ধর্মের সংস্কারকে স্বীয় সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার অন্যতম মূল উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং ভগবৎ-প্রেরণার স্থলে বিচারসহ ও বুদ্ধিপ্রসূত সাধনাবলীকে প্রাধান্য দেন।[১]

ব্রাহ্মসমাজ ছিলেন ধর্মক্ষেত্রে একেশ্বরবাদী, মূর্তিপূজাবিরোধী, গুরুবাদে অবিশ্বাসী, ও অবতারবাদ-বিদ্বেষী। সমাজক্ষেত্রে তাঁহারা নারীশিক্ষার প্রসার, স্ত্রীস্বাধীনতা ও জাতিভেদপ্রথানিরোধের প্রতি ঝুঁকিয়াছিলেন। তাঁহারা বাল্য-বিবাহপ্রথাও উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন; কেশবচন্দ্র স্বীয় দুহিতার বিবাহকালে উহা অমান্য করায় তাহার প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' উদ্ভব হয় ও অতঃপর কেশবের নেতৃত্বাধীনে 'নববিধান' সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা রামমোহন রায় বহুবিষয়ে নবীন ভারতের পথপ্রদর্শক হইলেও আমাদের বিশ্বাস, তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে সামূহিকভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; হিন্দুধর্মকেও তিনি সামগ্রিকভাবে সম্মান প্রদান করেন নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃতকে প্রাধান্য না দিয়া ইংরেজীকেই উচ্চাসন দিয়াছিলেন। সমাজ-ব্যবস্থায় তিনি সংস্কারের পথে চলিতে চাহিয়াছিলেন, যদিও ঐ জাতীয় চিন্তাপ্রণালী তাঁহার সময়ে তেমন প্রাধান্য লাভ না করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১। 'I have already pointed out that in Debendranath's case, and still more that of his successors, reason had a tendency to be confused with religious inspiration'—Romain Rolland's *Life of Ramakrishna*, Page—112.

অবশ্য সতীদাহপ্রথা নিবারণে ও সমুদ্রযাত্রা প্রবর্তনে তাঁহার যথেষ্ট অবদান ছিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে রামমোহনের এই জাতীয় চেষ্টা ধর্মবিরোধী মনে হইলেও রাজা তদানীন্তন ভারতে একটা উদারতাপূর্ণ গতিশীল মনোভাব অনুসংক্রামিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং কথঞ্চিৎ কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই নবীন নেতৃত্ব মানিয়া লইলেও, বিরাট হিন্দুসমাজ ইহাতে সাড়া দেয় নাই। রাজার চিন্তারাজ্যে কেমন যেন একটা বিদেশীয়সুলভ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতির আত্মশ্রদ্ধায় আঘাত করিল এবং জাতি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিল না। রামমোহন মুসলমান ও খৃষ্টানদের মতো প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং তাহাদেরই ভাষায় নিন্দাও করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পৌত্তলিক সমাজে নৈতিকতার অবনতি ঘটে, অবৈধ সম্বন্ধের পথ উন্মুক্ত হয়, এবং আত্মহত্যা, নারীহত্যা, নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির উদ্ভব হয়; পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় না, সেখানে মূর্খতাই প্রশ্রয় পায়।[২] কাজেই বৈদান্তিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করিলেও রাজা উপনিষদ্ অবলম্বনে শুধু সগুণ নিরাকারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, নির্গুণ নিরাকারের কিংবা সগুণ সাকারের উপাসনা তাঁহার সুমার্জিত ধর্মমতে স্থান পাইল না।[৩] ইংরেজদেরই ন্যায় রামমোহন স্বীকার করিলেন, জাগতিক অভ্যুদয় লাভের জন্য হিন্দুদিগকে স্বীয় ধর্ম সংশোধিত করিতে হইবে। ফলতঃ রাজনৈতিক জীবনে সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং সামাজিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের ইচ্ছা রামমোহনের ধর্ম-

২। "Idol-worship, the source of prejudice and superstition and of the total destruction of moral principles as countenancing criminal intercourse, suicide, female murder and human sacrifice"

—মুণ্ডকোপনিষদের ভূমিকা।

"Idolatrous nations have checked or rather destroyed every mark of reason and darkened any beam of understanding."

—কেনোপনিষদের ভূমিকা।

৩। "The Theism of Roy claims to rest on two poles—The 'absolute' Vedanta and the Encyclopaedic thought of the eighteenth century—on the formless God and Reason. It was not easy to define and it was still less easy to realise after he had gone".

—Rolland's *Life of Ramakrishna*, p. 105.

সংস্কারের অনেকটা প্রেরণা জাগাইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।[৪] তিনি চাহিয়াছিলেন একটা বুদ্ধিপরিপুষ্ট সার্বভৌম ধর্মাবলম্বনে ভারতীয় সমাজকে সুসংবদ্ধ ও সতেজ করিয়া তুলিতে। গোষ্ঠীর নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়া তিনি ভারতবাসীকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রদানেরও স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; অন্ততঃ ব্যক্তিগত জীবনে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার করিয়া স্বদেশকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসমৃদ্ধ ও এশিয়াখণ্ডের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত দেখিতেও চাহিয়াছিলেন।[৫]

রাজা রামমোহনের মধ্যে যে সকল ভাবরাশি কখনও ক্ষীণধারায় এবং কখনও প্রবলাকারে প্রবাহিত ছিল, উহাই ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজকে অবলম্বন করিয়া প্রকটতর মূর্তি ধারণ করিল। রাজা আপনাকে অহিন্দু বলেন নাই; আদি ব্রাহ্ম সমাজও সনাতন ভাবধারার সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেন নাই—দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ভারতীয় ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ক্রমে উগ্র পন্থা অবলম্বন-পূর্বক হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিবাহ ও আহার-বিহারে জাতিভেদ অস্বীকার করিল। নববিধান বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়া, বিশেষতঃ যীশুখৃষ্টকে প্রাধান্য দিয়া এক নব ধর্মমতের রচনায় প্রবৃত্ত হইল।[৬] যৌবনে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) দেবেন্দ্রনাথেরই শিষ্যস্থানীয় ও সহকারী ছিলেন। পরন্তু শিষ্যের মনে এইসব নবীন ভাবের আলোড়ন দেবেন্দ্রনাথ

৪। "It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort".
—মিঃ ডিগ্‌বীকে লিখিত রামমোহনের পত্রাংশ।

৫। "He went so far as to wish his people to adopt English as their universal language, to make India Western socially and then to achieve independence and enlighten the rest of Asia...Far from desiring the expulsion of England from India, he wished her to be established there in such a way that her blood, her gold, and her thought would inter-mingle with the Indian, and not as a blood-sucking ghoul leaving her exhausted".—*Life of Ramakrishna*, p. 107.

৬। Christ had touched him (Keshav) and it was to be his mission in life to introduce him into the Brahmo Samaj, and into the heart of a group of the best minds in India. When he died, the *Indian Christian Herald* said of him, "*The Christians looked upon him as God's messenger, sent to awake India to the spirit of Christ. Thanks to him, hatred of Christ died out*"—*Ibid*—p. 115.

লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পরিশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। তখন কেশব প্রকাশ্যভাবে যীশুখৃষ্টের প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় কেশব অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহাপুরুষের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে লাগিলেন, এমনকি বিভিন্ন ধর্মমতের বিশিষ্ট বাণী উদ্ধৃত করিয়া সমাজের উপাসনাকালে ব্যবহার করিতে থাকিলেন। ক্রমে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিসাধনার কীর্তনাদি অঙ্গবিশেষও স্বীকার করিলেন।[৭] তদ্ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশাধিকার পাইলেন। এমনকি, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া প্রচার করিলেন যে, হিন্দুদের দেবদেবীর রূপ অস্বীকার্য হইলেও প্রত্যেক দেবদেবী এক একটি ভাবের প্রতীক—ইহা অস্বীকার করা চলে না। এইরূপে সকল ধর্মের সহিত একটা বৌদ্ধিক, বাচনিক ও আনুষ্ঠানিক সামঞ্জস্য অবলম্বনে তিনি এক সার্বভৌম ধর্মের প্রবর্তনে প্রয়াসী হইলেও সর্বতোভাবে কোন ধর্মকেই গ্রহণ করিলেন না। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সে সার্বভৌম ধর্মেও স্থান পাইল না, দেবদেবী সে নবধর্মমন্দিরের বহির্ভাগেই পড়িয়া রহিলেন, সাকারের পূজা এবং যাগযজ্ঞাদিও স্বীকৃতি লাভ করিল না।

৭। বেলঘরিয়ায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়—ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র কোন কোন স্থল দর্শনে এই বিষয়ে সন্দেহ জাগে—মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে অন্ততঃ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দেখিয়া থাকিবেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিচ্ছেদের পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কেশবচন্দ্র 'ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপন করেন এবং ১৫ই নভেম্বর 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'-এর নামকরণ হয়। ইহার পরে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে বসেন নাই। অথচ 'কথামৃতে' আছে, 'কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি ব্রাহ্মসমাজে' (২।১৯।২), "জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম কেশব সেন বেদিতে বসে ধ্যান করছে" (৩।১৪।৩)। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কেশবচন্দ্র বৈষ্ণবদের মতো কীর্তনাদি আরম্ভ করেন (কেশবের জীবনী ১৮৭-৮৮ পৃঃ)। 'কথামৃতে' আছে, "কেশবকে বললাম, 'তোমরা হরিনাম করো'···তখন ওরা খোলকরতাল নিয়ে হরিনাম করলে।" (৫।১৫।৪)। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরের সহিত দেবেন্দ্রভবনে যান (মথুরের দেহত্যাগের তারিখ ১৪।৭।৭১)। 'কথামৃত'-কারের মতে কেশব পূর্ব হইতেই খোল লইয়া কীর্তন আরম্ভ করিয়া থাকিলেও হরিনাম-কীর্তন আরম্ভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পর। আদি সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে দেখেন, এই কথা কেশবজননীর আত্মকথায় ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় স্বীকৃত হইয়াছে—"সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" ১২৪ ও ১২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও অপর ব্রাহ্মদের দৃষ্টিতে তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলেন না—বাল্যবিবাহের বিরোধী হইয়াও তিনি অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে কোচবিহারের রাজপুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাঁহার বহু প্রধান অনুগামীও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। অতঃপর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'নববিধান সমাজ' রূপ-পরিগ্রহ করিল।

বলা বাহুল্য এই সকল পরিবর্তন, পরিবর্জনাদি বিষয়ে হিন্দুসমাজও সচেতন ছিল এবং তখনকার সাময়িক সাহিত্য সংস্কারপন্থী ও সংস্কার-বিরোধীদের বাদবিবাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এবং যুক্তি যাহারই প্রবলতর হউক না কেন, হিন্দুসমাজের জনসাধারণ এই নবীন বার্তায় সায় দেয় নাই, যদিও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেকে প্রগতির প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ফলতঃ খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ-প্রচেষ্টা ব্রাহ্মপ্রভাবে কিঞ্চিৎ প্রতিহত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রায় আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই; সুবিশাল হিন্দুসমাজ এই নবীন কার্যধারায় পরিচালিত হয় নাই। ব্রাহ্মপ্রভাব উচ্চশিক্ষিতদের স্তরবিশেষেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবের দেহত্যাগকালে তিনটি ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৬,৪০০।

কেশবচন্দ্রেরই সমকালে ব্রাহ্মসমাজের পাশ্চাত্যানুকরণের প্রতিপক্ষরূপে হিন্দুসমাজেরই এক ব্যক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩)। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে তিনি যে 'আর্যসমাজ' প্রবর্তিত করেন, তাহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, এবং উহা সেই যুগের মনোভাবেরই প্রতিফলন বলিয়া অনুমিত হয়। দয়ানন্দ ছিলেন গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরোধী, জাতিভেদের উচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মূর্তিপূজাবিদ্বেষী ও একেশ্বরবাদী। ব্রাহ্মসমাজ প্রথম দিকে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছিল, দয়ানন্দ উপনিষদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া বেদের সংহিতা অবলম্বনে প্রাচীন যজ্ঞাদির অনুকল্প-রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ব্রাহ্মদেরই ন্যায় এই সমাজও অনেকাংশে সনাতনধর্ম-বিরোধী হইলেও দয়ানন্দের সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি, বিরোধদমনের প্রবল স্পৃহা, নিজ-মতে ঐকান্তিক সরল বিশ্বাস, জাতীয়তাবোধ ও বীর্যবত্তাপে প্রচারাভিযানের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষে এই সমাজের প্রভাব দ্রুত বিস্তারিত হইল এবং খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ বিশেষ প্রতিহত হইল। কিন্তু বিরাট

হিন্দুসমাজ এই চিন্তাধারায়ও সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হইল না। অধিকন্তু নূতন নাম ও কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ যেমন এক সঙ্কীর্ণ নবীন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল, আর্যসমাজের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। উভয় সমাজের সভ্যদের মনে এবং তটস্থ দ্রষ্টাদের অন্তরে সন্দেহ থাকিয়াই গেল—এই সম্প্রদায়দ্বয় হিন্দুনামধেয় কি না। ব্রাহ্মদিগের অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল ম্যারেজ স্বীকৃতির ফলে ও আর্যদের জাতিভেদ উচ্ছেদের ফলে এই বিচ্ছেদ আরও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। অতএব পাশ্চাত্যের আগমনসম্ভূত তদানীন্তন পরিস্থিতির সহিত হিন্দুহিসাবে সামূহিকভাবে বুঝাপড়ার সমস্যা ও তাহার সমাধান পূর্বেরই ন্যায় অমীমাংসিত এবং অনারব্ধ বা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ধর্মের সাহায্য না লইয়া আইন অবলম্বনে সমাজসংস্কারের পথে চলিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি এই উদ্দেশ্যে স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য লইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টার সহিত প্রত্যক্ষতঃ ঈশ্বরবিশ্বাস, আত্মার স্বরূপ, প্রতিমাপূজা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নের সম্বন্ধ ছিল না। আবার হৃদয়বত্তার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও তাঁহার বিধবাবিবাহাদি সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন হিন্দুসমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশকেই আলোড়িত বা পরিবর্তিত করিয়াছিল। সসীম উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এই সকল ক্রিয়াকলাপের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অল্পসময় মধ্যেই নিস্তব্ধ হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। আইন কি বলে, তাহার প্রতি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হিন্দু-সমাজ আপন চিরাভ্যস্ত পথেই চলিতে থাকিল।

এইকালে কোন কোন হিন্দু প্রচারকও হিন্দুধর্মের সংরক্ষণে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্মের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া হিন্দুগণের মনে স্বধর্মে আস্থার উদ্রেকে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। পরন্তু এই সর্বপ্রকার উদ্যমই বুদ্ধি ও প্রচারের স্তরে সীমিত ছিল—অপরের হৃদয়ে স্বধর্মাবলম্বনে অধ্যাত্মপথে যাত্রার উদ্দীপনা জাগাইবার উপযুক্ত অনুভূতি উহাতে ছিল না। আবার এই সকল চিন্তার মধ্যে ভারতেতর দেশ স্থান পায় নাই বলিলেই চলে। এই সকল দৃষ্টিভঙ্গির কোনটিই বিশ্বের সকল ধর্মকে কেন, শুধু ভারতীয় ধর্মগুলিকেও উদার সামূহিক দৃষ্টিতে দেখিয়া সব কয়টিকে সমভাবে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া বিশ্বময় যথার্থ সৌভ্রাত্র স্থাপনে যত্নপর হয় নাই।

এমন সময়ে হিন্দুর ভগবান হিন্দুসমাজের ও শাস্ত্রের মধ্য হইতেই যথার্থ

শক্তিলাভের, অগ্রগতির এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দুর নবজাগরণের পন্থা নির্ধারণের সূত্র আবিষ্কার করিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অল্প বয়সেই দক্ষিণেশ্বরের ৺কালী-মন্দিরে সাধনায় রত হইলেন এবং সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রমাণ করিলেন, হিন্দুরা পৌত্তলিক নহে, তাহারা মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর উপাসনা করে; ধর্ম কথার কথা নহে, প্রত্যুত অনুভূতির সামগ্রী এবং সে অনুভূতি সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানবীয় ব্যবস্থা-নিরপেক্ষ; ভগবান-লাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং সকল ধর্মমতই তল্লাভের বিবিধ পথমাত্র; সংসারে থাকিয়াও ধর্মলাভ সম্ভবপর, তথাপি ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণেরও প্রয়োজন আছে; সকল ধর্মেই ধার্মিক ব্যক্তি পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন বাঞ্ছনীয়; মানুষকে পাপী বলা অন্যায়, কারণ আত্মা নিষ্পাপ ও এক, অতএব কাহাকেও ভর্ৎসনা বা নিরুৎসাহ না করিয়া সকলকে ধর্মপথে উৎসাহিত করাই উচিত; সরলতা ও বুদ্ধিবিবেচনা সহকারে ভক্তিমার্গের অনুসরণ করা এবং নির্লিপ্তভাবে সংসারের কর্তব্য পালন করাই এই যুগোপযোগী সহজ ধর্মমার্গ, এ যুগের মানুষ অন্নগত-প্রাণ, অতএব তাহাদের পক্ষে প্রাচীন যুগের কঠিন তপশ্চর্যা বা যজ্ঞাদি বিধির অনুসরণ করা অসম্ভব; অদ্বৈতজ্ঞান ধর্মসাধনের শেষ কথা এবং এক ব্রহ্মই জীব জগৎ ও অপর যাহা কিছু সব হইয়াছেন—বিভিন্ন দৃষ্টি অনুযায়ী তিনি মানবীয় ভাষায় বিভিন্ন নাম ধারণ করেন মাত্র। দক্ষিণেশ্বরের পরমপুরুষ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এই সকল বাণীই প্রচার করিতেছিলেন এবং স্বীয় জীবনে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সারল্য, ঈশ্বরানুরাগ, সদসদ্‌বিবেক ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মানব-মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছিলেন। হিন্দুসমাজের সে এক অতি গৌরবময় সৌভাগ্যের দিন। হিন্দু আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বাঁচিবার আশা ও অভ্যুদয়লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে শিখিতে লাগিল। এমন সময়ে সেই মহাপুরুষের আকর্ষণে তাঁহারই ভাবী বার্তাবহরূপে বাঙ্গলার যুবকসমাজ দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইল।

ভক্তের সহিত ভগবদালাপনের জন্য উৎকণ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ হর্ম্যশীর্ষ হইতে আহ্বান জানাইতেন ভাবী ভক্তদের প্রতি—যাহাতে তাঁহারা অচিরে দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হন। সে আহ্বানে নবযুগের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্রাহ্ম ভক্তগণ প্রথমে দলবদ্ধভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন; কিন্তু তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরের পরমপুরুষের

পূর্ণ পরিচয় লইতে পারেন নাই ; তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধ ও প্রয়োজনাদি ইহার পরিপন্থী ছিল। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনিয়াছিলেন একজন ভগবদ্বেত্তা সাধুরূপে—জগতের অপরাপর ভগবদ্ভক্তদেরই অন্যতম বলিয়া। তথাপি একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে অনেক ব্রাহ্মভক্তের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই হউক আর যে কোন কারণে হউক, নেতৃস্থানীয় অনেক ব্রাহ্মভক্ত সমাজ-সংস্কার ও প্রচার মাত্র অবলম্বনে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ; তাঁহাদের অনেকেরই, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির মন অনুভূতিমূলক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং এই কারণেই তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতে মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া নবজাগ্রত সনাতন ধর্ম নবীনপন্থী ব্রাহ্মসমাজের উপর এক প্রগাঢ় প্রভাববিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল।

ইহাই কিন্তু নবযুগের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই অতঃপর আসিলেন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তবৃন্দ। ইঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া চিনিলেও তাঁহার জীবন ও বাণীর নবযুগোপযোগী কোন নূতন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রাচীন ধারা, ভাষা ও প্রতীকাদি অবলম্বনে তাঁহাকে বুঝিতে যাইয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হইলেন। অতএব প্রয়োজন হইল ইয়ং বেঙ্গলের—বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকবৃন্দের, যাঁহাদের দেহে ছিল বল, মনে ছিল অদম্য উৎসাহ, আর যাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিক পথ ভিন্ন অন্য পথে না চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যায় নাই, সত্যের জন্য যাঁহারা উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত দ্বার। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বাগ্রণী ছিলেন আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ (তৎকালে শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত)। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আত্মরক্ষা করা নহে, প্রত্যুত আত্মজ্ঞান, আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মসমাধি লাভ করা এবং অপরকেও ঐ কার্যে সাহায্য করা।

বংশ পরিচয়

প্রবাদ আছে যে, নরেন্দ্রনাথ যে দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের আদি বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত কাল্না সাবডিভিসনের 'দত্ত ডেরিয়াটোনা' বা 'ডেরেটোনা' নামক গ্রামে। মোগল সম্রাটদের সময় হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহারা ঐ গ্রামে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। সম্ভবতঃ ইহারাই গ্রামের জমিদার ছিলেন। অতঃপর ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে রামনিধি দত্ত মহাশয় তাঁহার পুত্র রামজীবন এবং পৌত্র রামসুন্দর দত্তের সহিত কলিকাতায় আসিয়া গড-গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করেন। পরে যখন কেল্লা প্রস্তুত হয়, তখন দত্তপরিবার গোবিন্দপুর ছাড়িয়া এখনকার উত্তর কলিকাতার শিমুলিয়া বা শিমলা অঞ্চলে চলিয়া আসেন এবং বর্তমান মধুরায়ের গলিতে নূতন বাটী নির্মাণ করেন। রামনিধি ও রামজীবন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামসুন্দর জনৈক জমিদারের দেওয়ান ছিলেন।

রামসুন্দরের পাঁচজন পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রামমোহন দত্ত সুপ্রীম কোর্টের জনৈক ইংরেজ এটর্নির আফিসে ম্যানেজিং ক্লার্কের কাজ করিতেন এবং ঐ ব্যপদেশে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করেন। বাড়ীখানি প্রাচীন রীতিতে অনেক জমি জুড়িয়া বেশ বড়-লোকের উপযুক্ত রূপেই নির্মিত হইয়াছিল। বাড়ীর ভিতরে দেড় বিঘা জমি ছিল এবং আশে-পাশে অনেক জমিতে রেওয়ত ছিল। দক্ষিণমুখে নেপাল-শালের প্রস্তুত সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার দিয়া ভিতরে ঢুকিলে দেখা যাইত এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পুর্বে পশ্চিমমুখী পাঁচফুকুরী—অর্থাৎ ঘসা গোল ইঁটের থামের উপর পাঁচটি খিলানযুক্ত, ঠাকুর-দালান। ঠাকুর-দালানের দোতলায় দক্ষিণ দিকে বড় বড় হল ঘর। উহাদের উত্তর দিকের ঘরটিকে 'বড় বৈঠকখানা ঘর' আর দক্ষিণ দিকের ঘরটিকে 'ঠাকুর ঘর' বলা হইত। নীচের দক্ষিণ দিকের ঘরের নাম ছিল 'বোধন ঘর'। তাহার পর বাহিরের উঠানের পশ্চিমে চকমিলানো দালান ও গোয়াল-ঘর। অন্দরমহলের দুই দিকে দুইটি প্রাঙ্গণ এবং পশ্চাদ্ভাগে কানাচ বা অন্দরমহলের মহিলাদের ব্যবহারের জন্য পুকুর ছিল। এই বাড়ীর বাহিরে ২নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে চারি কাঠা জমির উপর রামমোহন দত্তের

অশ্বশালা অবস্থিত ছিল। বৈঠকখানা ঘরে তৎকালীন প্রথানুসারে দেওয়াল-গিরি, বেল-লণ্ঠন ও হাঁড়ির-লণ্ঠন সাজানো ছিল। তাছাড়া নানা প্রকারের চিত্র দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করিত।

রামমোহন প্রভৃত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে এই নূতন ভবনে বাস করিতেন। হাওড়ায় শালকিয়া অঞ্চলে তাঁহার দুইটি উদ্যানবাটী ছিল, খিদিরপুরেও কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল। নূতন বাটী নির্মিত হইলে রামমোহনের আহ্বানে তাঁহার তিন ভ্রাতা সেখানে চলিয়া আসিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় ভ্রাতা পৃথক বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। অবশেষে বিশ্বনাথ দত্তের বিবাহের পর পুরাতন বাটীটি সকলের সম্মতিক্রমে বিক্রয় করা হয়। রামমোহনের দুই পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল দুর্গাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদের পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উত্তর কলিকাতা নিবাসী দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা শ্যামাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্যামাসুন্দরী একাধারে সুন্দরী ও বিদুষী ছিলেন। তিনি 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু ছাপাইবার পুর্বেই উহা হারাইয়া যায়। তাঁহার দুইটি সন্তান ছিল। প্রথম কন্যা-সন্তানটি সাত বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করে; দ্বিতীয় সন্তানের নাম বিশ্বনাথ দত্ত। বিশ্বনাথ সম্ভবতঃ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বনাথের ছয়-সাত মাস বয়সে অন্নপ্রাশনের সময় দুর্গাপ্রসাদ বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা অবলম্বনপুর্বক চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করেন। অতএব বিশ্বনাথের লালন-পালনের ভার তাঁহার খুল্লতাত কালীপ্রসাদকে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হয়। দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা দত্ত পরিবারে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। গৃহত্যাগের পর সম্ভবতঃ গঙ্গাসাগর দর্শনের পথে তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া এক পরিচিত ব্যক্তির বাটীতে উঠেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার ভ্রাতা কালীপ্রসাদ তাঁহাকে পালকিতে বসাইয়া দ্বারবানে পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বগৃহে লইয়া আসিয়া ঠাকুরদালানের দক্ষিণ দিকের বোধন-ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ[১] অন্ন-জল ত্যাগ করিয়া তিন

১। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে ইঁহার প্রকৃত নাম দুর্গাপ্রসাদ—দুর্গাচরণ নহে, কেননা, ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্পত্তি বণ্টনের মকদ্দমায় দুর্গাপ্রসাদ নামই ব্যবহৃত হয়; গঙ্গাসাগর দর্শন

দিন সেই ঘরে থাকিয়া শুধু জপ করিতে থাকিলে সকলে ভীত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

কয়েক বৎসর পরে বাড়ীর সকলে নৌকা করিয়া ৺কাশীধাম দর্শনে যান, কারণ তখনও রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। এই দলে শ্যামাসুন্দরী এবং অল্পবয়স্ক বালক বিশ্বনাথও ছিলেন। পথে অকস্মাৎ ক্রীড়ারত বালক বিশ্বনাথ নৌকা হইতে পড়িয়া গেলে শ্যামাসুন্দরী নিজে সাঁতার না জানিলেও সন্তানকে রক্ষা করিবার জননীসুলভ আগ্রহে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং দৃঢ়মুষ্টিতে বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া সন্তানসহ স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইতে থাকেন। নৌকায় কবিরাজ উমাপদ গুপ্ত মহাশয়ও ছিলেন। তিনি ঐ কালে দত্তবাড়ীতে থাকিতেন। কবিরাজ মহাশয় আশু বিপদ দেখিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এবং শ্যামাসুন্দরীর ভাসমান কেশ দেখিয়া উহা ধারণপূর্বক উভয়কে টানিয়া নৌকায় তুলিলেন। অতঃপর সকলের বিশেষ যত্নে মাতাপুত্রের সংজ্ঞালাভ হইল। শ্যামাসুন্দরী পুত্রকে এরূপ সবলে ধারণ করিয়াছিলেন যে, বিশ্বনাথের হস্তে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল এবং ঐ চিহ্ন দীর্ঘকাল ছিল।[২]

নৌকা অতঃপর ধীর গতিতে কাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল এবং ৺বিশ্বনাথের সুবর্ণপুরী ক্রমেই নিকটতর হইতে লাগিল। সকলের মনই তখন বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ। পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছিয়া তাঁহারা যথারীতি ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে ৺শিব দর্শন ও পূজাদি করিলেন এবং ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরাদি অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানে গিয়া দেবদেবীর দর্শনলাভে ধন্য হইলেন। একদিন দুর্গাপ্রসাদের এক ভগিনী এবং বংশের এক অল্পবয়স্কা বিধবা আত্মীয়া পদব্রজে ৺বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতেছিলেন; তখন একে সামান্য বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তা পিচ্ছিল হইয়াছে,

মানসে দুর্গাপ্রসাদ প্রায়ই কলিকাতায় আসিয়া শিমলা ষ্ট্রীটে স্বীয় ব্রাহ্মণ-ভিক্ষাপুত্রের গৃহে থাকিতেন এবং সেই সময় বিশ্বনাথও সেখানে যাইতেন। শেষবারে আত্মীয়দের পরামর্শে শ্যামাসুন্দরী সেখানে গিয়া স্বামীর পদসেবা আরম্ভ করিলে দুর্গাপ্রসাদ বলিয়া উঠেন "চণ্ডালী স্পর্শ করেছে"। অতঃপর আর তিনি কলিকাতায় আসেন নাই (*Swami Vivekananda*, pp 91-92)। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে দুর্গাচরণ কলিকাতায় আসেন মাত্র একবার (৫।৭৮)।

২। ইংরেজী জীবনীর মতে বিশ্বনাথ পড়িয়া গিয়াছিলেন (পৃঃ ৫)। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে কে একজন চীৎকার করিয়া উঠে যে, নৌকা ডুবিয়া যাইতেছে; তখন শ্যামাসুন্দরী পুত্রকে লইয়া জলে ঝাঁপ দেন (পৃঃ ৯৩)। মহেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন' অনুসারে নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায় ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল (পৃঃ ৫)। ইংরেজী জীবনীর মতই সমীচীন মনে হয়।

তাহাতে আবার অন্তঃপুরচারিণীরা শুধু পায়ে পাথরের রাস্তায় চলিতে অনভ্যস্তা। অকস্মাৎ অল্পবয়স্কা রমণীটি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। পিছনে জনকয়েক সন্ন্যাসী আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, "মায়ী গির গয়ী" (মা পড়ে গেছেন) এবং তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—দুর্গাপ্রসাদ! তিনি সন্ন্যাসবেশে ভূষিত এবং অপ্রত্যাশিত স্থানে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেও, তাঁহার ভগিনী তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও মুখাকৃতি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে ও, দুর্গাপ্রসাদ?" সন্ন্যাসী অমনি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উৎপত্তি হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "এখানেও তোরা বিরক্ত করতে এসেছিস?" এবং দ্রুতপদে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।[৩] ইহার পরে সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদকে আর কেহ দেখেন নাই; তবে এক সময়ে দত্ত পরিবারে সংবাদ পৌঁছিয়াছিল যে, দুর্গাপ্রসাদ কাশীধামে মঠধারী (বা মঠাধীশ) হইয়াছেন। বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপার্জনক্ষম হইয়া কাশীতে পিতার অন্বেষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন সন্ধান পান নাই।

দুর্গাপ্রসাদের সন্ন্যাস গ্রহণের পর কালীপ্রসাদ দত্ত পরিবারের কর্তা হইলেন। কালীপ্রসাদের নিজস্ব আয় কিছুই ছিল না; অতএব যৌথ পরিবারের ব্যয় নির্বাহার্থ সঞ্চিত অর্থই ব্যয়িত হইতে লাগিল। আর এ পরিবারটিও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না; অনেক আত্মীয়ই সেখানে প্রতিপালিত হইতেন। যথা, রামমোহনের এক কন্যা ও তাঁহার সন্তান-সন্ততি চারি পুরুষ পর্যন্ত ঐ পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এইরূপে দত্তবংশ ক্রমেই দরিদ্র হইতে লাগিল। আবার কালীপ্রসাদের স্বার্থপরতাও হয়তো বিশ্বনাথের স্ত্রীপুত্রাদির দুঃখের কারণ হইয়াছিল। তাই স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সখেদে লিখিয়াছেন, "দুর্গাপ্রসাদ সংসারের দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য এবং নিজ আত্মার বন্ধন ছেদনের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন; কিন্তু নিজ স্ত্রী পুত্রকে বুভুক্ষু নেকড়ে বাঘদের হাতে ফেলিয়া গেলেন; আর সেই বাঘেরা এবং তাহাদের

৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে এই ঘটনাটিরও বিবরণ তিন প্রকার। ইংরেজী জীবনীর মতে দুর্গাপ্রসাদের পত্নীই পড়িয়া গিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবুর মতে ভূপতিতা মহিলা শ্যামাসুন্দরী নহেন, জ্ঞাতির এক বিধবা নারী। তবে ভূপেন্দ্রবাবু ইংরেজী জীবনীর মতও সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নাই। মহেন্দ্রবাবুর মতে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে প্রস্তর উত্তপ্ত ছিল: ভূপেন্দ্রবাবুর মতে বৃষ্টি পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছিল।

বাচ্চারা তাঁহার বংশধরদিগকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিতে বাস করিতে দেয় নাই" (পৃঃ ৪)। ভূপেনবাবু দুর্গাপ্রসাদের গৃহত্যাগের পরবর্তী আয়হীন ব্যয় এবং বিশ্বনাথ দত্তের দেহত্যাগের পরকালের আর্থিক দুরবস্থার কথা মিলাইয়া ফেলিয়া পাঠকের ভ্রমোৎপাদন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ; কারণ দুর্গাপ্রসাদের সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহার পত্নী ও পুত্র বিব্রত হইলেও অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করেন নাই, ইহা তীর্থযাত্রা প্রভৃতি হইতে অনুমিত হয়। পরেও যে আর্থিক বিপদ ঘটিয়াছিল তজ্জন্য পিতামহের সন্ন্যাসকে দায়ী না করিয়া যৌথপরিবারপ্রথাকে দায়ী করিলে যুক্তিযুক্ত হইত। সে যাহাই হউক, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, পিতৃস্নেহে বঞ্চিত বিশ্বনাথ খুল্লতাতের নিকট সমুচিত আদরযত্ন পান নাই। আবার বিশ্বনাথের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর তখন শ্যামাসুন্দরী দেহত্যাগ করেন। বিশ্বনাথ তখন অনাথ, এবং অনাথেরই ন্যায় ব্যবহার পাইতে থাকিলেন। তথাপি বিশ্বনাথ এমনই উদারমনা ছিলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্তির পরও তিনি আজীবন খুল্লতাতকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, যদিও তিনি জানিতেন যে খুল্লতাত তাঁহাকে পদে পদে ঠকাইতেছেন।

ষোল বৎসর বয়সে বিশ্বনাথ শিমুলিয়ার নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ভুবনেশ্বরীর বয়স তখন দশ বৎসর। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন ; সুতরাং চারিকাঠা জমি সহ পৈতৃক গৃহের অধিকারিণী তিনিই হইলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার পুত্রেরা উহার স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ের[৪] (পরবর্তী কালের ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর) শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে ব্যবসায় আরম্ভ করেন ; কিন্তু উহাতে বিফলকাম হইয়া টেম্পল্ নামক জনৈক ইংরেজ এটর্নির আফিসে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করেন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ ধরের সহিত একযোগে 'ধর ও দত্ত' নামে আফিস খুলিয়া এটর্নির কার্যে অবতীর্ণ হন। ইহার কিছু কাল পরে তিনি স্বাধীন ভাবেই কার্য চালাইতে থাকেন।

বিশ্বনাথ ইংরেজী, বাংলা, পারস্য-ভাষা, আরব-ভাষা, উর্দু ও হিন্দীতে

৪। বিশ্বনাথ যখন ঐ বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, তখন শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চন্দ্র সেখানে শিক্ষকতা করিতেন। ইঁহারই দ্বিতীয় পুত্র যথাকালে সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্বক স্বামী অভেদানন্দ নামে পরিচিত হন।

সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। জ্যোতিষেও তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন। তবে ইতিহাসে ছিল তাঁহার সমধিক আগ্রহ। তিনি 'সুলোচনা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; উহা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রশংসালাভ করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'শিষ্টাচার-পদ্ধতি' নামক একখানি পুস্তক বাংলা ও হিন্দী ভাষায় লিখিয়া অপরের দ্বারা ছাপাইয়াছিলেন। শেষোক্ত পুস্তকে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি দক্ষিণ ভারত ব্যতীত এই দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন, জনসমাজে এমন সব সামাজিক কুসংস্কার আছে, যাহার ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুর ফলে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয় নাই (ভূপেন্দ্র দত্ত, ৯৯ পৃঃ)।

তখন এক যুগসন্ধিক্ষণ। হিন্দু ও মুসলমান কৃষ্টির সংমিশ্রণে ভারতে যে নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা তখনও অপ্রতিহত গতিতে বিদ্যমান। আবার ইউরোপীয় সভ্যতার সম্মিলনও ঐ যুগেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত সমাজ তখন এই ত্রিবিধ প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বিশ্বনাথের জীবনেও ইহার অন্যথা হয় নাই। ফলতঃ হিন্দু-মুস্লিম সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি এই উভয়ের প্রতিই তাঁহার আনুগত্য দেখা যাইত। অনেক ইউরোপীয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার, আদব-কায়দায় তিনি প্রাচীন হিন্দু-মুস্লিম যৌথ পরিবারের রীতি অনুসরণ করিতেন। আবার দৈনন্দিন জীবনের কোন কোন বিষয়ে তিনি তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজেরই অনুযায়ী ইংরেজদের অনুসরণ করিতেন। কিন্তু ধর্মাচারের ক্ষেত্রে তিনি কখনও চিরন্তন ধারার পরিবর্তন করেন নাই। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট দক্ষিণা পাইতেন, পীররাও স্বীয় প্রাপ্যে বঞ্চিত হইতেন না। তিনি কখনও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে মাতিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। তবে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত বালবিধবাদের পুনর্বিবাহবিধির সমর্থন করিতেন। দত্ত-বাড়ীর সন্নিকটেই ঐরূপ দুইটি বিবাহ লইয়া সমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইলে বিশ্বনাথ ও তাঁহার পত্নী পুনর্বিবাহেরই অনুমোদন করেন। ফল কথা এই—আচার-বিচারে বিশ্বনাথবাবু অপর দশজন হিন্দু ভদ্রলোকেরই মতো হইলেও তাঁহার উচ্চশিক্ষাসম্ভূত উদার দৃষ্টি তাঁহাকে কূপমণ্ডূকত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং তিনি সকল ধর্মেরই সার্বভৌম মর্মকথার সহিত

পরিচিত হইতে চাহিতেন। এই হিসাবেই তিনি মনোযোগ সহকারে বাইবেল ও দেওয়ান-ই-হাফিজ প্রভৃতি গ্রন্থ নিজে পাঠ করিতেন এবং একসময়ে তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রনাথকেও পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতও তিনি পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুস্তকালয়ের যে সামান্য অংশ রক্ষা পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে 'বরার্ট' উপাধিধারী জনৈক গ্রন্থকারের অনূদিত একখানি 'ভাগবত'ও পাওয়া গিয়াছিল।[৫]

বিশ্বনাথ উদার হইলেও নির্বিচারে কোন মতবাদের পশ্চাতে ছুটিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কথিত আছে, একসময়ে ব্রাহ্মভাবে ভাবিত নরেন্দ্রনাথ নিরামিষাহার আরম্ভ করেন। একদিন আহারের সময় তিনি কোন একটি তরকারি খাইতে এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, উহার সহিত মাছের স্পর্শ ঘটিয়াছে। তাঁহার ভগিনী স্বর্ণময়ী পরিবেশন করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতেছে শুনিয়া উঠানে স্নানের জায়গা হইতে বিশ্বনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওর চৌদ্দ পুরুষ গেড়িগুগ্‌লি খেয়ে এল, আর এখন ও সেজেছে ব্রহ্মদত্যি, মাছ খাবে না।" ইহা হইতেই তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি ধারণার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য এই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেও তিনি পুত্রের ওই বিষয়ে স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। এমনও উল্লেখ আছে যে, ব্রাহ্মনেতা শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কখন কখনও দত্তবাড়ীতে আসিতেন এবং সেখানে সাদরে গৃহীত হইতেন।

'লীলাপ্রসঙ্গ'-কারের মতে (৫ম খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ) বিশ্বনাথ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার ফলে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি আপন পিতা দুর্গাপ্রসাদের ন্যায় অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারেন নাই। "পারস্য কবি হাফেজের কবিতা এবং বাইবেল-নিবদ্ধ ঈশার বাণীসমূহ তাঁহার নিকটে আধ্যাত্মিক ভাবের চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতাবশতঃ গীতাপ্রমুখ হিন্দু শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে না পারাতেই যে তাঁহাকে আধ্যাত্মিক রসোপভোগের জন্য ঐ সকল

৫। ইহা ভূপেন্দ্রবাবুর মত। মহেন্দ্রবাবুর মতে তিনি উপেন্দ্রচন্দ্র দত্তের প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রাহক ছিলেন এবং উহা যেমন যেমন খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইত, অমনি কিনিয়া পড়িতেন।

গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে না। আমরা শুনিয়াছি নরেন্দ্রকে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া তিনি তাহাকে একখানি বাইবেল উপহার দিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, 'ধর্মকর্ম যদি কিছু থাকে তাহা কেবলমাত্র ইহারই ভিতরে আছে।' কিন্তু এইসকল ধর্মগ্রন্থ পড়িলেও 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে বিশ্বনাথ ঐ সকলের রসাস্বাদ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার অধ্যাত্মজীবনে উহাদের ছাপ পড়ে নাই। বস্তুতঃ তিনি তদানীন্তন পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় কৃতবিদ্য সমাজেরই ন্যায় স্বয়ং সুখভোগ করা এবং অপরকে সুখে রাখার কার্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন। পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদ ও ইহলোক-সর্বস্বতা তখন শিক্ষিতসমাজে যে ধর্মবিষয়ক সংশয় ও অনেক ক্ষেত্রে নাস্তিকতা আনয়ন করিয়াছিল, তাহা হইতে ঐ সমাজের বিশেষ কেহই সম্পূর্ণ অব্যাহতি পান নাই।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (পৃঃ ৯৮-১০১) এই মত স্বীকার করেন না এবং ইহার বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ অনুমান প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার ছিল না, কারণ বুদ্ধিবিকাশের পর পিতৃসান্নিধ্য হইতে যে চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মে, উহা তিনি পান নাই। ভূপেন বাবুর মতে বিশ্বনাথ যেহেতু প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন, অতএব সংস্কৃত অবশ্যই পড়িয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি পণ্ডিত কালীচরণ ভট্টাচার্যের গোয়াবাগানের টোলে সংস্কৃত পড়েন ; কালীচরণ ও তাঁহার ভ্রাতা কিছুদিন দত্তগৃহে বাস করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ জ্যোতিষও পড়িয়াছিলেন এবং জন্মকুণ্ডলী রচনা করিতে জানিতেন। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকাবলী মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাওয়াও উল্লেখযোগ্য। ভূপেন্দ্র বাবুর মতানুযায়ী আরও কিছু তথ্য আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই সকল যুক্তি অনুসারে ভূপেন বাবু স্বীকার করেন না যে, তাঁহার পিতা সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য হাফেজের গ্রন্থ ও বাইবেলের প্রতি পিতার অনুরাগের কথা তিনি অস্বীকার করেন না। তবে উহার তাৎপর্য তিনি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এদিকে ইহাও যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না যে, পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ না জানিয়া বা না ভাবিয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বামীজী ও তাঁহার পিতামাতার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন ; তাঁহাদের প্রতি বৃথা আক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। ফলতঃ এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আরও তথ্যের সন্ধান করা আবশ্যক।

এটর্নিরূপে বিশ্বনাথবাবু প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ; সুতরাং এই খ্যাতির সঙ্গে তাঁহার কার্যক্ষেত্রের প্রসারও উত্তর ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কার্যব্যপদেশে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ, লাহোর, দিল্লী, রাজপুতানা, বিলাশপুর, রায়পুর প্রভৃতি বহু অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। তখন মোগল সরাই পর্যন্ত ট্রেন ছিল, তারপর টাঙ্গা ও অন্যান্য যানবাহনে দূর দূর স্থানে যাইতে হইত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোরে ঘটে-পটে ৺দুর্গাপূজা করাইয়া বহুলোককে প্রসাদদানে আপ্যায়িত করাইয়াছিলেন। এই এটর্নির কার্যে তিনি একদিকে যেমন প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেন, ব্যয়ও করিতেন তদ্রূপ। তিনি অনেক দাসদাসী পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এবং আহারাদিতে প্রচুর পারিপাট্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ছোট ছেলেদের ভাল খাওয়াইতে হয়, নতুবা মগজ খোলে না। আর ছেলেদের জন্য বেশী রাখিয়া যাওয়াও অনাবশ্যক ; তাহাদের লেখাপড়া শিখাইলে এবং জীবনের উচ্চ মানের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে তাহারা যথাকালে নিজেদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। অন্যথা অধিক টাকা রাখিয়া গেলে তাহারা মূর্খ হইয়া সব উড়াইয়া দিবে। এই জীবন-দর্শনের পশ্চাতে হয়তো দত্ত মহাশয়ের নিজ উপার্জনক্ষম জীবন ও যৌথ পরিবারের অকর্মন্যদের জীবনের অভিজ্ঞতা বিদ্যমান ছিল। কারণ বিত্তশালী রামমোহন দত্তের পুত্র কালীপ্রসাদকে তিনি উপার্জনহীন অর্থব্যয়ে নিরত দেখিয়াছিলেন, আর নিজ পৌরুষবলে তিনি স্বয়ং অনাথ অবস্থা হইতে বিত্তশালী হইতে পারিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ বাবু মুক্তহস্ত দাতা ছিলেন। কাহারও কষ্ট দেখিলে তিনি ব্যথিত হইয়া অকাতরে সাহায্য করিতেন। দূরসম্পর্কের অনেক ছাত্র তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহারই ব্যয়ে অধ্যয়নাদি করিত। ইহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রতিবেশী যে কেহ আপদ-বিপদে দত্তগৃহে আসিলে কিছু না কিছু সাহায্য পাইত। এই জন্য পাড়ার লোক তাঁহাকে দাতা বিশ্বনাথ বলিয়া ডাকিত। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "গরীব-দুঃখীকে দান করা তাঁহার যেন একটা ব্যামোর মতো ছিল।" তিনি বলিতেন, "আমার ছেলেদের জন্য ভাবতে হবে না। তারা নিজেরা করে নেবে, কিন্তু এদের সেরূপ শক্তি নেই, এই জন্যে এই গরীব লোকদের দেওয়া আবশ্যক।" তাঁহার নির্বিচার দান ও নেশাখোর প্রভৃতির দ্বারা এ দানের

অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ একবার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে বিশ্বনাথ বাবু বলিয়াছিলেন, "জীবনটা যে কত দুঃখের তা তুই এখন কি বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি, তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তার লাভের জন্য যারা নেশাভাঙ্গ করে, তাদের পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখবি।" আমরা দেখিব পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। বিশ্বনাথ যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, কখনও হৃদয়ের মহত্ত্ব হারান নাই। তবে লোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার সহৃদয় ও মধুর হইলেও তিনি কখনও স্বীয় গাম্ভীর্য হারাইতেন না। বিপরীত উক্তি শুনিয়াও যুক্তিযুক্ত উত্তরই দিতেন। পুত্রের সহিত পূর্বোক্ত বাক্যালাপই ইহার প্রমাণ; আর ঐ ঘটনা হইতে ইহাও প্রতীত হয় যে, বিশ্বনাথবাবু পুত্রের স্বাধীন চিন্তা ও উক্তিতে বিরক্ত হইতেন না—শুধু উপযুক্ত উত্তর দিয়াই নীরব হইতেন। আর একটি ঘটনা হইতেও ইহা প্রমাণ হয়। সম্ভবতঃ পিতার অমিতব্যয়িতা দর্শনে নরেন্দ্রনাথ একদিন বলিয়া উঠেন, "আপনি আর আমার জন্য কী করেছেন?" ধীরমতি বিশ্বনাথ অমনি উত্তর দেন, "যা আরসিতে নিজের চেহারাটা একবার দেখ গে, তাহলেই বুঝবি।"

রন্ধনে বিশ্বনাথ বেশ পটু ছিলেন। নিজে নানা প্রকার জিনিস রাঁধিতেন এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইয়া আনন্দ পাইতেন। পিতার এই প্রবৃত্তিই হয়তো নরেন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন।

সঙ্গীতে বিশ্বনাথের প্রচুর অনুরাগ ছিল। এককালে ওস্তাদ রাখিয়া তিনি সঙ্গীত চর্চা করিয়াছিলেন। রায়পুরে অবস্থানকালে তিনি গুণগুণ করিয়া গান গাইতেন। দুর্গাপ্রসাদও মিষ্টকণ্ঠ ছিলেন।[৬] আর নরেন্দ্র-জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর কণ্ঠও সুমধুর ছিল, কৃষ্ণযাত্রার গান তিনি আপনমনে বেশ গাইতেন এবং ভিখারী গায়ক বাড়ীতে আসিলে তাহার নিকট শুনিয়া তাহার গানগুলি শিখিয়া লইতেন। বংশের সঙ্গীতস্পৃহাই হয়তো নরেন্দ্রকে সুগায়কে পরিণত করিয়াছিল।

ছেলেদের শাসন-সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বাবুর একটা নিজস্ব পন্থা ছিল। মারধর

৬। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন', মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ৫৪ পৃঃ।

প্রতি শনি ও রবিবারে বিশ্বনাথ-গৃহে সঙ্গীতের মজলিস বসিত এবং তিনি অতিথিদিগকে পোলাও-ভোজে আপ্যায়িত করিতেন—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-রচিত Swami Vivekananda, ১০৫ পৃঃ।

না করিয়া তিনি ছেলেদের আত্মসম্মানবোধ ও শালীনতাবুদ্ধি জাগাইবার চেষ্টা করিতেন। একবার বালক নরেন্দ্র রাগিয়া গিয়া মাতার প্রতি দুই একটি রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বাবা পুত্রকে ঐজন্য ভর্ৎসনা না করিয়া যে ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র সমবয়স্কদের সহিত আলাপাদি করিতেন, ঐ ঘরের দরজার উপরে লিখিয়া রাখিলেন, "নরেনবাবু আজ তার মাকে এইসব বলেছেন"—ঐ স্থলে নরেন্দ্রের উচ্চারিত শব্দগুলিও বসাইয়া দিলেন, যাহাতে বন্ধুরা সহজেই পড়িতে পারে। নরেন্দ্র ইহাতে লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ বন্ধ করেন।

সংসারে কিরূপ চলা উচিত এই বিষয়ে নবেন্দ্র পিতার উপদেশ চাহিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "কখনও কোন বিষয়ে অবাক হবি না।" সম্ভবতঃ এই কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া নরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে রাজপ্রাসাদে ও ভিখারীর পর্ণকুটীরে সমান মনোভাব লইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিতেন।

যৌথপরিবারের সকলের মধ্যে বিশ্বনাথই ছিলেন সর্বাধিক উপার্জনক্ষম; কিন্তু তথাপি সর্ববিষয়ে পরিবারের কর্তা কালীপ্রসাদের অনুগত ছিলেন। অবশ্য কালীপ্রসাদের পুত্র 'তারকনাথও ।রে আইন পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উক্ত ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু তখনও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমনই ছিল যে, বিশ্বনাথের ইচ্ছা থাকিলেও নিজ পুত্রকন্যার জন্য তিনি পৃথক সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। মধ্যে মধ্যে তিনি যে ঐরূপ চেষ্টা করেন নাই, তাহাও নহে; কিন্তু খুল্লতাত সন্ধান পাইলেই যৌথপরিবারের কর্তার প্রভুত্ববলে বা অন্য প্রকার কৌশলে উহা হস্তগত করিয়া লইতেন। এক সময়ে অর্থাভাব বশতঃ কালীপ্রসাদ ভুবনেশ্বরী দেবীর অলঙ্কার বন্ধক দিয়া অর্থসংগ্রহ করেন এবং পরে উহার বিনিময়ে ভুবনেশ্বরীকে কিছু ভূসম্পত্তি লিখিয়া দেন। কিন্তু সম্পত্তি দখল লইতে গিয়া দেখা যায়, উহার দলিলাদিতে বহু ত্রুটি রহিয়াছে—সম্পত্তি পাওয়া অসম্ভব। আবার দয়াদাক্ষিণ্যে দত্ত পরিবারের কেহই বোধ হয় পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এককালে বিশ্বনাথ-বাবু ভুবনেশ্বরীর নামে জনৈক মুসলমানের সম্পত্তি সংগ্রহ করেন। একদিন মুসলমান প্রজারা আসিয়া বলিল, তাহারা নিতান্ত গরীব, খাজানা দিতে পারিবে না। পূর্বে তাহাদের অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু তখন তাহারা অসহায়। বিশ্বনাথ-বাবু বলিলেন, সম্পত্তি তাঁহার নহে, তাঁহার পত্নীর। অতএব প্রজারা ভুবনেশ্বরীর নিকট গেল, আর তিনিও অমনি দলিলে লিখিয়া দিলেন, "খাজানা মকুব।"

আবার এমনও হইয়াছে যে, কালীপ্রসাদ ভুবনেশ্বরীর নামীয় কোন ভূসম্পত্তি দখলের জন্য হয়তো কড়া কথা শুনাইয়া বলিলেন, "কেন ছাড়বে না ? এটা কি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি ?" ভুবনেশ্বরীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তিনি অমনি সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া দিলেন।

এই সকল কারণে বিশ্বনাথের পরিবারের আর্থিক ভবিষ্যৎ ক্রমেই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে বিশ্বনাথের দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পুর্বে যখন যৌথপরিবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হইল, তখন বিশ্বনাথের অর্জিত সম্পত্তি নিজেদেরই হস্তে রাখিবার জন্য কৌশল করিয়া অপর অংশীদাররা বিশ্বনাথের পৃথক অন্নের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর তিনি স্ত্রী-পুত্রসহ অস্থায়িভাবে ৭ নং ভৈরব বিশ্বাস লেনের এক ভাড়াবাড়িতে গিয়া উঠিলেন। ভূপেন্দ্রবাবুর মতে নরেন্দ্রনাথ এখানে থাকিয়াই বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন (পৃঃ ১০৭)।[৭]

পতির অনুরূপা ভুবনেশ্বরী দেবীর সুকণ্ঠ ও বদান্যতার কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি। তিনি যেমন ছিলেন সুন্দরী, তেমনি তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে একটা আভিজাত্যের পরিচয় ফুটিয়া উঠিত। আবার তিনি ছিলেন বিশেষ বুদ্ধিমতী, কার্যকুশলা ও দেবভক্তি-পরায়ণা। সংসারের যাবতীয় কর্ম সুচারুরূপে নির্বাহ করিয়াও তিনি পাঠাভ্যাস, সূচীকর্ম, ও প্রতিবেশীদের সুখদুঃখশ্রবণ করিবার যথেষ্ট সময় পাইতেন। রামায়ণ ও মহাভারত তাঁহার বেশ জানা ছিল এবং শিক্ষিত স্বামী ও পুত্রদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বিবিধ জ্ঞানের গণ্ডিও সুপ্রসারিত হইয়াছিল—আলাপ করিলেই মনে হইত, তিনি সুশিক্ষিতা। তাঁহার ধারণা ও স্মৃতিশক্তিও খুব প্রখর ছিল। তিনি মিতভাষিণী, গম্ভীর-প্রকৃতি, আলাপে অতিশয় মিষ্টস্বভাবা, তেজস্বিনী ও রাজরাণী সদৃশা গরীয়সী ছিলেন। প্রতিবেশিনীরা সর্বদাই তাঁহার সাহায্যের প্রত্যাশা রাখিতেন এবং দত্তগৃহের দ্বারে আগত গরীব দুঃখী কখনও রিক্তহস্তে ফিরিত না—এমনি ছিল ভুবনেশ্বরী দেবীর করুণামাখা হৃদয়।

সন্তানকে সুশিক্ষিত করার আগ্রহও তাঁহার ছিল প্রচুর ; তাঁহারই ক্রোড়ে

৭। মতান্তরে নরেন্দ্রনাথ মাতামহীর গৃহে পাঠাভ্যাস করিতেন (ইংরেজী জীবনী ও লীলাপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। আমরা পরে এই মতই মানিয়া লইয়াছি।

বসিয়া বালক নরেন্দ্র বংশগৌরব পিতামহাদির কথা, ভারতের মহাপুরুষবৃন্দ ও দেবদেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বিদ্যারম্ভ মায়েরই নিকট এবং মায়েরই নিকট তিনি শিখিয়াছিলেন—সংসারের শত আবর্তে পড়িয়াও নৈতিক মান কিরূপে উচ্চে তুলিয়া রাখিতে হয় ও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে জীবনের সর্বোত্তম অবলম্বন জানিয়া কিরূপে কায়মনোবাক্যে উহারই আশ্রয় লইতে হয়। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে ভুবনেশ্বরী দেবীর দৃষ্টিভঙ্গী কি প্রকার উন্নত ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ প্রতীতি জন্মিবে। বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক একদিন নরেন্দ্রের ভূগোলের পাঠে ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া অযথা তাঁহাকে শাস্তি দেন। প্রতিবাদ কল্পে নরেন্দ্র যদিও বারংবার বলিতে থাকেন, "আমার ভুল হয়নি, আমি ঠিকই বলেছি", তথাপি শিক্ষকের উহাতে ক্রোধ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ছাত্রকে সপাসপ্ বেত্রাঘাত করেন। জর্জরিতদেহ নরেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিয়া সাশ্রুলোচনে মাতার নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিলে স্নেহময়ী ভুবনেশ্বরী সন্তানের বেদনায় আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, "বাছা, তোমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে এতে কি আসে যায়? ফল যাই হোক না কেন, সর্বদা যা সত্য বলে মনে করবে, তাই করে যাবে। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে, কিন্তু তবু সত্য কখনও ছাড়বে না।" বলা আবশ্যক যে, শিক্ষক পরে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ক্রটিও স্বীকার করিয়াছিলেন।

জননী আরও শিক্ষা দিতেন, "আজীবন পবিত্র থাকিও, নিজের মর্যাদা রক্ষা করিও, এবং কখনও অপরের মর্যাদা লঙ্ঘন করিও না। খুব শান্ত হইবে, কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে।"

নরেন্দ্রনাথ স্বীয় জননীকে আজীবন প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং তাঁহার উপদেশ স্মরণ রাখিতেন। তিনি বলিতেন, "যে মাকে সত্য সত্য পূজা করিতে না পারে, সে কখনও বড় হইতে পারে না।" আর বহুবার তিনি সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন, "আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মার নিকট ঋণী।" তাঁহার চিত্ত কতখানি মাতৃভক্তিপরায়ণ ছিল, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা পরে পাইব এবং দেখিয়া অবাক হইব যে, সংসার-বিরাগী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হৃদয়ও কত কোমল ছিল।

নরেন্দ্রনাথ শৈশবে তাঁহার ঝি-মা, অর্থাৎ মাতামহীর মা এবং মাতামহীর নিকটও অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "ঝিমা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি ভাগবতের, পুরাণের ও বৈষ্ণবদিগের নানা প্রকার কথা ও গল্প জানিতেন। তিনি প্রথম রাত্রে কখনও গল্প বলিতেন এবং শেষ রাত্রি হইলে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেন ও সকলকে কৃষ্ণকথা বলাইতেন। আমাদিগের মাতামহীও ভাগবতের অনেক কথা জানিতেন। তিঁনিও সব ভাগবতের কথা বলিতেন।" 'ঝি-মার' পিতা, অর্থাৎ রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতামহ কুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় প্রভৃত অর্থশালী ও "বৈষ্ণবদিগের গোসাঁই ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার অনেক বৈষ্ণব শিষ্য ছিল।······সেই জন্য কুঞ্জবিহারী বা কুঁচিল দত্তের নাম বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিশেষ পরিচিত।" ('স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী', ৩৬-৩৭ পৃঃ)। বলা বাহুল্য, এই সূত্রে স্বামীজী শৈশবেই বৈষ্ণব-ভাবের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন।

বংশ তালিকা

(পিতৃবংশ)

রামনিধি দত্ত (গড় গোবিন্দপুরের)

রামজীবন

রামসুন্দর (শিমুলিয়ার)

রামমোহন　পুত্র　পুত্র　পুত্র　পুত্র

দুর্গাপ্রসাদ　কালীপ্রসাদ　সাত কন্যা

কন্যা (সাত বৎসর বয়সে মৃত্যু)　বিশ্বনাথ

কেদারনাথ　তারকনাথ

অমৃতলাল (হাবু বাবু)　সুরেন্দ্রনাথ (তমু বাবু)　শরৎচন্দ্র　দুই কন্যা　পুত্র (শৈশবে মৃত্যু)　সাত কন্যা

(মাতৃবংশ)

কৃষ্ণ বিহারী দত্ত

গোপাল চন্দ্র ঘোষ (জামাতা)—রাইমণি দেবী (কন্যা)

নন্দলাল বসু (জামাতা)—রঘুমণি দেবী (কন্যা)

বিশ্বনাথ দত্ত (জামাতা)—ভুবনেশ্বরী দেবী (কন্যা)

নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত (পুত্র)

রামচন্দ্র দত্ত (পুত্র)

পুত্র (উভয়ের শৈশবে মৃত্যু)　কন্যা　হরমোহিনী (হারামণি) (২২ বৎসরে মৃত্যু)　স্বর্ণময়ী (৭২ বৎসরে মৃত্যু)　নরেন্দ্রনাথ　কন্যা (শৈশবে মৃত্যু)　কিরণ বালা (১৬ বৎসরে মৃত্যু)　যোগেন্দ্রবালা (২২ বৎসরে মৃত্যু)　মহেন্দ্রনাথ　ভূপেন্দ্রনাথ

উষার আলো

পুত্রলাভের জন্য মাতার গভীর আকূতির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, প্রথম পুত্রসন্তান হারাইবার পর দীর্ঘকাল পুত্রমুখ-সন্দর্শনে বঞ্চিতা ভুবনেশ্বরী দেবীর পুত্রপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা কত গভীর, কত ঐকান্তিক ছিল। স্নেহপুত্তলি ক্রোড় অলঙ্কৃত করিবে, সম্মুখে হাসিবে খেলিবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, অতীতের সহিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র স্থাপন করিয়া বংশগৌরব চিরস্থায়ী করিবে—ইহা কোন্ না জননীর অভীপ্সিত? ভুবনেশ্বরী (১৮৪১-১৯১১) ছিলেন শিমুলিয়ার রামতনু বসুর গলি নিবাসী বিখ্যাত বসুবংশের শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের একমাত্র সন্তান। বড় ঘরের কন্যা বড় ঘরেই আসিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পবয়সেই জননীর মর্যাদা লাভ করিলেও তিনি পুত্রমুখে মাতৃশব্দশ্রবণে দীর্ঘকাল বঞ্চিতা ছিলেন। তাঁহার প্রথম সন্তান একটি পুত্র এবং দ্বিতীয় সন্তান একটি কন্যা শৈশবেই জননীকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া বিদায় গ্রহণ করে। তাঁহার পরবর্তী তিনটি সন্তানই ছিল কন্যা—হরমোহিনী বা হারামণি, স্বর্ণময়ী, ও শৈশবে গতাসু আর একটি। সুতরাং পুত্রসন্তানলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। হিন্দুনারী সমস্ত অভাব-অভিযোগ দেবতার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করেন এবং প্রতিকারের জন্য দেবতার আশীর্বাদের প্রতীক্ষায় তপস্যায় নিরত হন। ভুবনেশ্বরী দেবীও মনপ্রাণ ঢালিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণে নিত্য আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে একান্তমনে জপ-ধ্যান, উপবাস ও বহু কৃচ্ছ্রসাধনার মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার তপঃপূত দেহের দৈবজ্যোতিতে মুগ্ধ সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—তাঁহার অভূতপূর্ব মুখশ্রী এবং দেহলাবণ্য ভগবৎকৃপারই পরিচায়ক। দেবী কিন্তু ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আর একটি উপায় অবলম্বন করিলেন। দত্ত-পরিবারের এক বর্ষীয়সী আত্মীয়া কাশীবাস করিতেন। ভুবনেশ্বরী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন, তিনি যেন প্রত্যহ ৺বীরেশ্বর-শিবমন্দিরে পূজা, ভোগ ও প্রার্থনাদির ব্যবস্থা করেন।[১] আত্মীয়া

১। মহেন্দ্র বাবুর মতে, বৃদ্ধার "সহিত বন্দোবস্ত হইল, তিনি সোমবার বীরেশ্বরের পূজা করিবেন, এবং মাতা ভুবনেশ্বরী সোমবারের ব্রত পালন করিবেন। এইরূপে এক বৎসর ব্রত পালন করিলে একটি পুত্র জন্মলাভ করে।" ('স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী', ৯ পৃঃ)।

তদনুসারে ক্ষীণষষ্টি সহায়ে শিবমন্দিরে যাইয়া অর্চনা ও বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সুব্যবস্থার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে ভুবনেশ্বরীর আশা আরও দৃঢ় হইল যে, এইবারে দেবতা প্রসন্ন হইবেন ও বরলাভের আর বিলম্ব নাই। তবু তিনি পূর্বেরই ন্যায় ভক্তি ও বিশ্বাসভরে ধ্যান-জপ, ব্রত-পূজা ও উপবাসাদিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন; মন তাঁহার কাশীতে দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণে নিমগ্ন রহিল, এবং কল্পনাবলে উহা কখন কখনও কাশীধামে উপস্থিত হইয়া ৺বীরেশ্বরের মস্তকে স্নিগ্ধ ও পবিত্র গঙ্গাবারি বর্ষণে অথবা পুষ্প ও বিল্বপত্রে সজ্জিত অর্ঘ্য অর্পণে নিযুক্ত হইল।

ক্রমে পূজায় প্রীত মহাদেব ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন—ভুবনেশ্বরী দেবী স্বীয় অভিলাষ-পূরণের এক চমৎকার পূর্বাভাস পাইলেন। সেদিন দিবসব্যাপী পূজা-প্রার্থনাদির পরে তিনি রাত্রে ক্লান্তদেহে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন; প্রকৃতি চারিদিকে নিস্তব্ধ; স্বগৃহে শব্দমাত্র নাই। অকস্মাৎ তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, জটাজুটমণ্ডিত জ্যোতির্ময় তুষারধবল মহাদেবের ধ্যানমূর্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। দেবাদিদেব সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া এক পুরুষ-শিশুর আকার ধারণ করিলেন—যেন ভুবনেশ্বরীর নিজেরই সন্তান। সেই রজতগিরিনিভ সুকোমল বপু দেখিতে দেখিতে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তখনও তিনি এক অত্যাশ্চর্য আনন্দসাগরে নিমগ্ন রহিলেন, আর মনে হইতে লাগিল—ইহা কি শুধু স্বপ্ন, অথবা উদ্বেলিত সত্যের কালাতিক্রমকারী পূর্বোচ্ছ্বাস? শিব! শিব! তুমি ভক্তের প্রার্থনা কতভাবেই না পূর্ণ করিয়া থাক। দেবীর অন্তস্তল হইতে স্বতই এক সানন্দ কৃতজ্ঞতা উৎসারিত হইল, কারণ তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাঁহার প্রতীক্ষার দিন অতীত হইয়াছে—সদ্যোদৃষ্ট স্বপ্নের একমাত্র অর্থ এই যে, তাঁহার পুত্রসন্তানলাভের সময় সমাগত। সে বিশ্বাস ব্যর্থ হয় নাই, ঐ দর্শনের কয়েক মাস পরে ভুবনেশ্বরী সত্যই পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।

সেদিন সোমবার, ১২ই জানুয়ারি, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ, পৌষ-সংক্রান্তি। তখন সবে আনন্দের আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হৃদয় লইয়া বাঙ্গলার নরনারী, কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকা শয্যাত্যাগ করিয়া ও গঙ্গাস্নান সারিয়া উৎসবময় দিনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এখনই বাঙ্গলার প্রতিগৃহ আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিবে। সেই শুভদিনের পুণ্যমুহূর্তে সূর্যোদয়ের ছয় মিনিট পূর্বে দত্তগৃহ

হাস্যোজ্জ্বল করিয়া অবতীর্ণ হইলেন নবযুগের পথপ্রদর্শক বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ।[২] উৎসবমুখর বাঙ্গলার নরনারী অবশ্য বুঝিতে পারে নাই, সেদিন তাহাদেরই দেশে এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহার পুণ্যপ্রভা তাহাদিগকে অজ্ঞাতসারে সমধিক উল্লসিত করিয়াছে, যিনি অচিরে বেদান্তভেরি-নিনাদে সমগ্র বিশ্বে সনাতন ধর্মের বিজয়বার্তা বিঘোষিত করিবেন, হিন্দুধর্মকে রক্ষাকবচাবৃত করিবেন, মৃতপ্রায় মহাভারতে মৃতসঞ্জীবনীধারা প্রবাহিত

২। স্বামীজীর সায়নমতে জন্মকুণ্ডলী

স্বামীজীর জন্মের যথার্থ সময় নির্ণয় বিষয়ে প্রমথনাথ বসু প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের শেষে কোষ্ঠীবিচার দ্রষ্টব্য। উহাতে লিপিবদ্ধ অংশের মর্মকথা এই—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের মতে স্বামীজীর জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর সহিত কোষ্ঠীর ঐক্যসম্পাদনের জন্য তাঁহার জন্মক্ষণ আরও ছয় মিনিট পরে, অর্থাৎ ধনুলগ্নে না হইয়া মকরলগ্নে হওয়া উচিত; কারণ এইরূপ মহাপুরুষের জন্ম ধনুলগ্নে হইতে পারে না। এই ছয় মিনিট সময়ের ভ্রম ঘড়ির দোষে বা অন্য কারণে ঘটিয়া থাকিবে। জন্মক্ষণ এই হিসাবে এইরূপ—"১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ, ভোর ৬টা ৪৯ মিনিট, সোমবার, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, হস্তা নক্ষত্র, কন্যা রাশি, শুভ্রবর্ণা যোগ, দেবগণ, শূদ্রবর্ণ। সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে জন্ম। মকরলগ্ন, শনির ক্ষেত্র, চন্দ্রের হোরা, শনির দ্রেক্কান, শনির তুর্যাংশ, চন্দ্রের সপ্তাংশ, শনির নবাংশ, বুধের দশাংশ, শনির দ্বাদশাংশ, শুক্রের ত্রিংশাংশ। লগ্ন শনির সিংহাসনবর্গ প্রাপ্ত এবং চন্দ্রের পারিজাতবর্গ প্রাপ্ত।" পরন্তু শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "রাজেনবাবু যে মকরলগ্ন করিবার জন্য ৬ মিনিট পরে জন্মসময় ধরিয়াছেন, তাহা না ধরিলেও (সায়ন গণনায় যাহা ধরিয়াই প্রকৃত গণনা করা উচিত) মকরলগ্নই হইবে।...ইঁহার যে পুরাতন কোষ্ঠী আছে, তাহার জন্মসময়ে ৬ নটমিনিট যোগ না করিলেও সায়নলগ্ন মকরই হইবে। এই মহাপুরুষের সায়ন-জন্মকুণ্ডলী দেওয়া আছে।"

করিবেন, শতধাবিচ্ছিন্ন মানব-সমাজে সৌভ্রাত্রসৌধ গড়িয়া তুলিবেন এবং জড়বাদগ্রস্ত নিখিল বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত করিবেন।

নবপ্রসূত শিশুর সহিত তাহার পিতামহ দুর্গাচরণের অবয়বগত সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইলেন ; সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া জনৈকা দুর্গাপ্রসাদ-সহোদরা বলিয়া উঠিলেন, "এযে ঠিক সেই দুর্গাপ্রসাদ। মায়া কাটাতে পারেনি ; তাই আবার নাতি হয়ে জন্মেছে।" তাই নামকরণের সময় কেহ কেহ বলিলেন, "নবজাতের নাম হোক দুর্গাদাস।" কিন্তু মাতা ভুবনেশ্বরী কিছুকাল নীরব স্নেহদৃষ্টিতে পুত্রের চক্ষে স্বীয় চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "নাম ? এর নাম বীরেশ্বর।" ইহাতে সকলেই প্রীত হইয়া সেদিন হইতে তাহাকে বীরেশ্বর বা সংক্ষেপে বিলে বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, উহাই হইল ৺বীরেশ্বরের প্রসাদে লব্ধ পুত্রের আদরের ডাকনাম ; কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য পোশাকী ভাল-নাম স্থির হইল নরেন্দ্রনাথ।

সুন্দর, সবল, গৌরবর্ণ, হাস্যময় শিশু মায়ের ক্রোড় সুশোভিত করিয়াছে ; নিমেষশূন্যদৃষ্টিতে ভুবনেশ্বরী দেখেন তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত, দীর্ঘ প্রার্থনার নিধি আদরের দুলালকে, আর গর্বে ভরিয়া উঠে তাঁহার বুক, চক্ষে প্রবাহিত হয় আনন্দের অশ্রু। কিন্তু এতো সাধারণ শিশু নয় ; ইহার ভিতর যে লুক্কায়িত আছে এক অদম্য বিরাট শক্তি যাহার স্ফুরণে আত্মবিস্মৃত হিন্দুসমাজে নবচেতনার পুলক জাগিবে, পথভ্রষ্ট মানবসমাজের সম্মুখে নূতন আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত হইবে, সমস্ত বিভেদ-বিচ্ছেদ বিদূরিত হইয়া জগৎ একসূত্রে গ্রথিত হইবে। বিন্দুর মধ্যে সুপ্ত এই সিন্ধুর উচ্ছ্বাস ক্ষণে ক্ষণে আপন স্বরূপ প্রকাশে উদ্যত হইয়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে বড়ই বিব্রত করিত। ইহার ফলে দেবী এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইলেন—এই চঞ্চল শিশুকে বশে রাখা যেন সাধ্যাতীত-প্রায় বোধ হইল। নরেন্দ্রনাথ তিন বৎসরে পড়িতে না পড়িতে তাঁহার বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের অভিযোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ছেলে বড়ই একরোখা ; যাহা ধরিবে তাহা করিয়া ছাড়িবে, কিছুতেই তাহাকে বশ করা যায় না। তাহার দৌরাত্ম্য ক্রমে চরমে উঠিতে লাগিল—প্রলোভন, বকুনি, ধমক, ভয় কিছুতেই কিছু হয় না। পুত্রের ক্রোধ দেখিয়া মাতা বলিতেন, "অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।" অবশেষে তিনি ছেলের ক্রোধপ্রশমনের এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার

করিলেন। কিছুতেই না পারিলে তিনি বিলের মাথায় হুড়হুড় করিয়া জল ঢালিয়া দিতেন আর জপ করিতেন "শিব শিব।" আবার ভয় দেখাইতেন, "যদি দুষ্টুমি করিস তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।" ছেলে অমনি চীৎকার বন্ধ করিয়া শান্ত হইত। অনেক কাল পরে যখন স্বামীজীর কোন কোন পাশ্চাত্ত্য শিষ্যা ভুবনেশ্বরী দেবীকে প্রশ্ন করিতেন, "আচ্ছা, স্বামীজী তাহলে ছেলেবেলায় বড় দুষ্টু ছিলেন?" মাতা তাহাতে উত্তর দিতেন, "বল কি গো? তাকে দেখবার জন্য দুটো ঝি অষ্টপ্রহর তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো।" তিনি আরও বলিতেন, "ছেলেবেলা থেকে নরেনের একটা মস্ত বড় দোষ ছিল, কোন কারণে রাগ হলে আর তার জ্ঞান থাকত না, বাড়ীর আসবাবপত্র ভেঙ্গেচুরে তচনচ করত।"

চঞ্চল শিশুর কিন্তু একটি গুণ ছিল—সকলেই ছিল তাহার আত্মীয়। যে-কেহ হাত বাড়াইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইতে চাহিত, সে বিনা দ্বিধায় তাহারই ক্রোড়ে বসিত। নরেন্দ্রনাথ চিরদিনই ছিলেন মিষ্ট ব্যবহারের বশ, কড়া কথা মোটে সহ্য করিতে পারিতেন না।

বুদ্ধিবিকাশের পর সাধুভিখারীর প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা গেল; তাঁহারা আসিলে তিনি তাঁহাদের নিকট ছুটিয়া যাইতেন, কেহ আটকাইতে পারিত না। আর তাঁহাদিগকে অদেয় কিছুই ছিল না। একদিন নূতন কাপড় পরিয়া সঙ্গীদের সহিত ক্রীড়ারত আছেন, এমন সময় দ্বারে শব্দ হইল, "নারায়ণ হরি!" অমনি নরেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। আগন্তুক বস্ত্র ভিক্ষা করিল। দ্বিধাহীন নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নূতন বস্ত্রখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু সে ক্ষুদ্র বস্ত্র তো কোমরে জড়াইতেই কুলায় না; সে উহা পাগড়ির আকারে মাথায় বাঁধিয়া বালককে আশীর্বাদ করিতে করিতে সহর্ষে বিদায় লইল। তখন দত্তগৃহে অথিসমাগম প্রায়ই হইত; অতএব অতঃপর ঐরূপ কেহ আসিলে নরেন্দ্রকে অন্যত্র বন্ধ করিয়া রাখা হইত। নরেন্দ্র ইহাতেও পরাস্ত হইতেন না; সুযোগ পাইলেই অপরের অসাক্ষাতে জানালা গলাইয়া বিবিধ দ্রব্য রাস্তায় সাধু বা ভিখারীর হস্তে অর্পণ করিতেন এবং পরিবারের সকলকে জব্দ করিয়াছেন ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয়ও তাঁহার উৎপাতে অতিষ্ঠ হইতেন। কখনও তাড়া করিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি দৌড়িয়া গিয়া আঁস্তাকুড়ে আশ্রয় লইতেন এবং

সেখানে মনের সাথে নানাভাবে ভেঙচাইতে ভেঙচাইতে মৃদুহাস্য সহকারে বলিতেন, "ধর না, ধর না!"

পোষা জন্তু-জানোয়ারের সহিত খেলিতে তিনি ভালবাসিতেন, তাঁহার খেলার সাথী ছিল বিলাতী ইঁদুর, বানর, ছাগল, কাকাতুয়া, পায়রা। তাছাড়া বাড়ীর গাভিটি ছিল তাঁহার পরম প্রিয়। তাহার গলায় মালা পরাইয়া, কপালে সিঁদুর দিয়া ও গায়ে হাত বুলাইয়া তিনি তাহার সহিত কতই না মিষ্টালাপ করিতেন!

বাড়ীর চাকরদের মধ্যে সহিসের সহিত ছিল তাঁহার সর্বাধিক হৃদ্যতা আর তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ ছিল, বড় হইলে সহিস বা কোচোয়ান হইবেন। পাগড়ি মাথায় পরিয়া, গাড়ীর সম্মুখে উচ্চাসনে বসিয়া, চাবুক ঘুরাইয়া দুরন্ত ঘোড়াকে শহরের জানা-অজানা বিভিন্ন প্রদেশে চালনা করার মধ্যে সত্যই একটা পুরুষোচিত লোভনীয় গরিমা ছিল। দত্ত-পরিবার একদিন গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ কত বিষয়ে কত প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। ইহারই মধ্যে পিতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "বিলে, তুই বড় হয়ে কি হবি বল দেখি?" নরেন্দ্রের চিন্তার প্রয়োজন ছিল না, ঝটিতি উত্তর দিলেন, "সহিস কিংবা কোচোয়ান।"

রামায়ণের কথা তিনি অনেক শুনিয়াছিলেন, এবং সীতারামের প্রতি, বিশেষতঃ সীতার প্রতি, ঐ কালে তাঁহার হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা আজীবন অটুট ছিল। একদিন বাজার হইতে সীতারামের একটি মাটির যুগলমূর্তি আনিয়া বাড়ীর চিলেঘরে স্থাপন করিলেন এবং সেই ঘরের দরজায় খিল দিয়া পাড়ার হরি-নামক এক সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালকের সহিত চক্ষু বুজিয়া ভিতরে ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে তন্ময় নরেন্দ্র স্নানকালের কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে দীর্ঘকাল বালককে দেখিতে না পাইয়া বাড়ীর সকলে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। চারিদিকে হুলস্থুল বাঁধিয়া গিয়াছে, এমন সময় একজনের মনে হইল, ছাদের উপরটা একবার দেখিলে হয় না? সেখানে গিয়া দেখেন চিলেঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলিতে দরজা খুলিল না দেখিয়া অবশেষে উহা ভাঙ্গিতে হইল। তখন বেগতিক দেখিয়া ব্রাহ্মণ বালকটি উন্মুক্ত পথে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। নরেন্দ্র কিন্তু তখনও ধীর, স্থির, মুদ্রিত-নয়ন। অবশেষে ঝাঁকুনি দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইল।

ইহার অল্পকাল পরে এক অদ্ভুত সমস্যা নরেন্দ্রের অপক্ক মনকে বিশেষ আলোড়িত করিল। আস্তাবলের সবজান্তা সহিসের নিকট বসিয়া তিনি অনেক গল্পগুজব করিতেন, তাহার মুখে অনেক সব অপূর্ব কাহিনী শুনিতেন। কোন কারণে সহিসের দাম্পত্যজীবন সুখময় হয় নাই ; তাই সে বিবাহ বিষয়ে অনেক বিরুদ্ধ কথাও বলিত। একদিন সীতারামের পূজান্তে আস্তাবলে গিয়া সহিসের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় সহিস খুব জোর দিয়াই বলিল, "বিয়ে করা বড় খারাপ।" সঙ্গে সঙ্গে সে নানা যুক্তিরও অবতারণা করিল। শুনিয়া নরেন্দ্রেরও মনে হইল, সহিসের এই অভিজ্ঞতা ও উপদেশের মধ্যে মানিয়া লইবার মতো অনেকটা সত্য আছে। তিনিও মনে মনে ভাবিলেন, বিবাহ কখনও করিবেন না, কিন্তু তাঁহার প্রিয় সীতারামের মূর্তির কি হইবে ? এতদিন তো তিনি এই অতি পবিত্র মূর্তিদ্বয়কে বালকোচিত সারল্য ও বিশ্বাসের সহিত পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনবদ্য চরিত্রকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন। এখন একটা অস্পষ্ট আদর্শগত আন্দোলন তাঁহার শিশুমনকে আলোড়িত করিল। ইহার পূর্ণ তাৎপর্য তিনি নিশ্চয়ই তখন হৃদয়ঙ্গম করেন নাই ; অন্ততঃ সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, একালে তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তবু সহিসের কথা ও যুগলমূর্তির মধ্যে একটা মীমাংসাশূন্য অসামঞ্জস্য দেখিয়া তাঁহার সমস্যাজর্জরিত হৃদয় ফাটিয়া কান্না আসিল। পুত্রের চক্ষে জল দেখিয়া মাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নরেন প্রথমে নীরব রহিলেন, তারপর ফোঁপাইতে লাগিলেন। মা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা দিতে থাকিলে নরেন অবশেষে মনের দুঃখ খুলিয়া বলিলেন। বুদ্ধিমতী মা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বিলে, ওতে আর কি হয়েছে ? তুই শিবপুজা কর।" কথাটা মনে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বীরেশ্বর ছাদে উঠিলেন এবং সীতারামের মূর্তি হাতে লইয়া ছাদের কিনারে দাঁড়াইলেন। সেটা নিশ্চয়ই তাঁহার এক দুঃখময় মুহূর্ত—সীতারামের মূর্তিকে বিদায় দিতে গিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় দুঃখোদ্বেলিত হইয়াছিল, হয়তো বা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস অজ্ঞাতসারে নির্গত হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। পরমুহূর্তে সে যুগলমূর্তি নিম্নের কঠিন রাস্তায় পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। পরদিন বাজার হইতে একটি শিবমূর্তি আনিয়া সীতারামের আসনে বসাইলেন এবং আবার মুদ্রিতনয়নে সে মূর্তির সম্মুখে ধ্যানমগ্ন হইলেন। এই বালকোচিত সমাধানে তিনি তখনকার মত শান্তি পাইলেও পরে আমরা

দেখিব, সীতারামের প্রতি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তি কখনও আসনচ্যুত হয় নাই। শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া তিনি রামায়ণের যে অপূর্ব চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনিয়াছিলেন, তাহা দাম্পত্যজীবনের দুরভিজ্ঞতায় ক্লিষ্ট সহিসের তিক্তবাণীতে অকস্মাৎ ম্লান হইলেও কোন দিনই হৃদয় হইতে মুছিয়া যাইতে পারে নাই, বরং উহা পাশ্চাত্ত্য জীবনের আদর্শের সংঘর্ষে স্পষ্টতর হইয়াছিল। বিশেষতঃ রামায়ণের হনুমান চরিত্র তাঁহাকে শৈশবকালে খুবই আকৃষ্ট করিত। রামগত-প্রাণ অদ্ভুতকর্মা মহাবীর হনুমানের আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত, এবং রামায়ণ-গানের সংবাদ পাইলেই তাহা শুনিতে যাইতেন।

একদিন তিনি এক কথক ঠাকুরের মুখে রামায়ণ-কাহিনী শুনিতেছিলেন। কথক যখন বলিলেন, হনুমান কদলীবনে থাকেন, তখন মহাবীরের দর্শনলাভে সমুৎসুক বীরেশ্বর প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "সেখানে গেলে কি তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়?" বালকের কৌতুকপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে কথক কতকটা বিদ্রূপচ্ছলে মৃদুহাস্যে বলিলেন, "হ্যাগো, গিয়েই দেখ না।" বীরেশ্বরের বাড়ীর কাছেই এক কলাগাছের ঝোপ ছিল। কথাশেষে রাত্রে বাড়ী ফিরিবার পথে বীরেশ্বর সেই ঝোপে গিয়া কদলীতলায় বসিয়া হনুমানের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন তাঁহার দর্শন মিলিল না, তখন ক্ষুণ্নমনে গৃহে ফিরিয়া সকলকে উহা নিবেদন করিলেন। বয়স্করা তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "ওরে বিলে, বোধ হয় আজ প্রভুর কাজে হনুমান অন্য কোথাও গেছেন, তাই তাঁর দেখা পাসনি।" ইহাতে তিনি কতকটা আশ্বাসিত হইলেন।

সন্ন্যাসী হইবার সাধ তাঁহার বাল্যকালেও ছিল। একদিন একখণ্ড গেরুয়া কাপড় কৌপীনের মতো আঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিরে?" বীরেশ্বর সোল্লাসে জোর গলায় বলিলেন, "আমি শিব হয়েছি।" আর ছিল তাঁহার ধ্যানপ্রবণতা। পূর্বে একটি ঘটনার কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বৃদ্ধদের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, ধ্যাননিমগ্ন মুনি-ঋষিদের জটা লম্বা হইয়া ভূমি স্পর্শ করে এবং ক্রমে বটের শিকড়ের ন্যায় বহুদূরে জমিতে ঢুকিয়া যায়। সরল শিশু বীরেশ্বর ধ্যানে বসিতেন আর মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া দেখিতেন, জটা ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে কিনা। যখন দেখিতেন তাহা হয় নাই, তখন ছুটিয়া গিয়া মাকে বলিতেন, "কই, ধ্যান তো করলাম, জটা কোথায়

হল ?" মা প্রবোধ দিতেন, "এক আধ ঘণ্টায় বা এক আধ দিনে হয় না, অনেকদিন লাগে।"

বাড়ীর সকলেই দেখেন, বীরেশ্বর এমনিভাবে কখনও একাকী, কখনও বা প্রতিবেশী বালকদের সহিত ধ্যানে বসিয়া সময়ের জ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং আপন ভাবে এমন তন্ময় হইয়া যায় যে, ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যায় না। একদিন (চিলে-ঘরে বা বাড়ীর ছাদে)[৩] ঐরূপ ধ্যান খেলা চলিতেছে, অকস্মাৎ একটি বালক দেখিল, মেঝের উপর এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ। সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বীরেশ্বর ব্যতীত সকল বালকই ঘরের বাহিরে ছুটিয়া পলাইল। বীরেশ্বর কিন্তু তখনও ধ্যানমগ্ন—বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য। সাথীরা ডাকাডাকি করিয়াও যখন সাড়া পাইল না, তখন তাড়াতাড়ি সভয়ে ছুটিয়া গিয়া বয়স্কদের ডাকিয়া আনিল। তাঁহারা আসিয়া দেখেন অতি ভয়াবহ দৃশ্য ; বালক চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছে, আর সম্মুখে বিষধর করাল ফনা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে। দেখিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল, নিঃশ্বাস পর্যন্ত থামিয়া গেল। শব্দ করিলে পাছে সাপ বালকের অনিষ্ট করে এই ভয়ে নিরুপায় সকলে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে গোখুরা আপনিই সরিয়া গেল, মুহূর্ত পরে আর তাহাকে খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। স্বল্পকাল পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া বীরেশ্বর সব শুনিলেন ; কিন্তু বলিলেন, "আমি তো কিছুই টের পাইনি।"

নরেন্দ্রের নিদ্রাও ছিল এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি অন্যান্য ছেলের ন্যায় বালিশে মাথা রাখিলেই নিদ্রাভিভূত হইতেন না। তাঁহার অভ্যাস ছিল উপুড় হইয়া শোওয়া। এই অবস্থায় নিদ্রার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেই তিনি ভ্রূমধ্যে এক অপূর্ব জ্যোতিবিন্দু দেখিতে পাইতেন। উহা পরিবর্ধিত ও নানা বর্ণে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকার ধারণ করিত এবং অকস্মাৎ ফাটিয়া গিয়া তারাবাজির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িত ও শুভ্রদীপ্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহাকে সেই আলোক-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিত। সেই সাগরে মগ্ন হইতে হইতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রতি রাত্রিতেই এইরূপ ঘটিত এবং তিনি উহা সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করিতেন ও ভাবিতেন, সকলেই ঠিক এই রীতিতেই নিদ্রা যায়। কাজেই এই অতিসাধারণ দৈনন্দিন ঘটনার কথা কাহাকেও বলার

৩। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে নরেন্দ্রনাথকে বাটীর "এক নিভৃত প্রদেশে" "অর্গলবদ্ধ" স্থানে একদিন ধ্যান করিতে দেখা গিয়াছিল (৫।৬৪)।

প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অনেক কাল পরে তিনি যখন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ধ্যান শিক্ষা করিতে যাইতেন, তখন সমবয়স্ক এক বন্ধুর কিরূপ ধ্যান হয় তাহা জানিতে উৎসুক হইয়া তিনি কথাচ্ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা ভাই, তুমি কি ঘুমাইবার আগে একটা জ্যোতি দেখ?" প্রশ্নের তাৎপর্য গ্রহণে অক্ষম বন্ধু আশ্চর্য হইয়া বলিল, "না।" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমি দেখি। এ কথাটি মনে করিয়া রাখিবে—বিছানায় শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িবে না, কতক্ষণ সতর্ক হইয়া থাকিলে তুমিও দেখিতে পাইবে।" বন্ধু ইহা কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার ভাগ্যে কি ফলাফল হইয়াছিল জানা নাই; তবে পরে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই জ্যোতি দর্শনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "যারা ধ্যানসিদ্ধ. তারাই ঐরূপ জ্যোতি দেখতে পায়।" নরেন্দ্রের নিকট ইহা ছিল আজীবন দৈনিক ঘটনা, যদিও শেষের দিকে ইহা তত ঘন ঘন বা স্পষ্ট হইত না। বহুকাল পরে তাঁহার এক গুরুভ্রাতা তাঁহাকে এই জ্যোতি দেখাইতে অনুরোধ করিলে যেই স্বামীজী গুরুভ্রাতার কপালে হাত দিলেন, অমনি গুরুভ্রাতা দেখিলেন—সমস্ত বহির্জগৎ সহসা এক জ্যোতিঃ-সমুদ্রে পরিণত হইয়া গেল। "আশ্চর্যো জ্ঞাতা, কুশলোঽস্য লব্ধা!"

জীবনপ্রারম্ভেই দেখা যাইত, সমবয়স্কদের সহিত দলবদ্ধভাবে ক্রীড়া-আমোদাদির কালে নরেন্দ্রই হইতেন এ সব অনুষ্ঠানের নেতা। বস্তুতঃ নেতৃসুলভ গুণাবলী তখন হইতেই তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়া ক্রমে সমুচিত রূপ ধারণ করিতেছিল। এক মকর-সংক্রান্তির দিনে তিনি পিতার অনুমতি লইলেন, সহপাঠীদের সহিত গঙ্গাপুজা করিতে যাইবেন। বাদ্য ও পতাকাদির ব্যবস্থা পিতৃব্যয়ে সহজেই হইয়া গেল। অবশেষে গঙ্গার মাহাত্ম্য গাহিতে গাহিতে বাদ্য ও নিশানাদি সহ সকলে একটি ছোটখাট শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন এবং গঙ্গাসলিলে পুষ্পমাল্যাদি অর্পণ করিয়া ও দীপাবলী ভাসাইয়া দিয়া দেবীর পুজা সমাপন করিলেন। কলার খোলে প্রজ্বলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসমান দীপগুলি বক্ষে লইয়া বালকদের পুজায় প্রীতা সুরধুনী যেন সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকারে প্রসন্নচিত্তে সহাস্যবদনে মন্থরগতিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা হইলেন।[৪]

৪। মহেন্দ্র বাবুর মতে "তখনকার দিনে পাঠশালায় মকর-সংক্রান্তির দিন গঙ্গাবন্দনা গাহিয়া গঙ্গার পুজা করিয়া আসার প্রথা ছিল। মকরসংক্রান্তির দিনে...বিশ্বনাথ নূতন কাপড় জামা

কখনও সমবয়স্কদের সহিত রাজা-কোটাল খেলায় তিনি রাজা সাজিতেন। দত্তবাড়ীর ঠাকুর-দালান উঠান হইতে এক-মানুষ উঁচু ছিল—ছয়টি ধাপ বা সিঁড়ি দিয়া উঠান হইতে ঠাকুর-দালানে উঠিতে হইত। নরেন্দ্র সদর্পে উহার সর্বোচ্চ সোপানে বসিয়া আর দুইজন সঙ্গীকে নীচের ধাপ দেখাইয়া বলিতেন, "তুমি হচ্ছ রাজমন্ত্রী, আর তুমি সেনাপতি, যাও ওখানে দাঁড়াও।" তাহারও নীচের সিঁড়িতে বসিত সভাসদগণ। অবশেষে রাজদরবারের কার্য আরম্ভ হইলে কর্মচারীরা ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিত, আর রাজা প্রশ্ন করিতেন, "মন্ত্রী, রাজ্যের খবর কি?" মন্ত্রী কখনও সুখবর নিবেদন করিয়া বলিত, "আজ্ঞা হাঁ, প্রজারা পরম সুখে আছে।" কখনও বা বলিত, "না মহারাজ, একজন দস্যু বড উৎপাত করছে।" অমনি রাজাদেশ বিঘোষিত হইত, "দুরাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ কর।" তৎক্ষণাৎ দশ এগার জন খেলোয়াড় বালক-দস্যুর শাস্তিবিধানে উদ্যত হইত; কিন্তু দস্যু আত্মসমর্পণ না করিয়া দ্রুতবেগে সদর দরজার দিকে ছুটিত আর রাজার সৈনিকদলও ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিত। তখন দ্বিপ্রহরে সকলে স্ব স্ব শয্যায় বা চাকররা দেউড়িতে শুইয়া আরাম উপভোগ করিতেছে। সশব্দে ধাবমান বালকদের উৎপাতে অতিষ্ঠ চাকররা তাহাদের ধরিয়া শিক্ষা দিবার জন্য পিছনে ছুটিত। কিন্তু বেগে পলায়মান বালকদের নাগাল না পাইয়া ক্লান্তদেহে স্বস্থানে ফিরিয়া শুধু মৌখিক ভর্ৎসনা করিতে থাকিত। নরেন্দ্র রাজাসনে বসিয়া এবং সব দেখিয়া শুনিয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতেন।

আরও কত রকমের খেলা ছিল। তখন কলিকাতায় সবে গ্যাসের আলো আসিয়াছে, আর সোডা-লেমনেডের দোকান বসিয়াছে। নরেন্দ্রও অমনি কলকব্জা যোগাড় করিয়া গ্যাসের ও সোডা-লেমনেডের কারখানা বসাইলেন। এমন কি সেখানে রেলগাড়িও চলিতে লাগিল। কতকগুলো পুরানো দস্তার নল, মেটে হাঁড়ি ও খড় লইয়া তিনি বাটীর উঠানে গ্যাসঘর নির্মাণ করিলেন। খড় জ্বালাইলেই ধোঁয়া হইত, আর এ নল বাহিয়া উপরে উঠিত। তখন

ইত্যাদি গুরুমহাশয়কে এবং কয়েকজন ছাত্রকে দিতেন এবং তাঁহাদের বাজনাবাদ্যসহ গঙ্গাপূজা করিয়া আসিতে অনুমতি দিতেন।... ফিরিয়া আসিলে রীতিমত মিষ্টিমুখ করাইতেন।... সকল বালক মিলিত হইয়া সুর করিয়া গাহিত—'বন্দে মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি।' ইত্যাদি" (১০ পৃঃ)।

নরেন্দ্র বিজ্ঞের মতো কোমরে হাত দিয়া গম্ভীর দৃষ্টিতে সব পর্যবেক্ষণ করিতেন আর স্বীয় আবিষ্কারের জন্য আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন। কখনও বা তৃপ্ত না হইয়া নাক সিঁটকাইয়া সঙ্গীদের বলিতেন "না, এ কিচ্ছু হয়নি, আরও আগুন দে, খুব ফুঁ লাগা—গ্যাস বড় কম বেরুচ্ছে।"

বিশ্বনাথ দত্তের একজন মুসলমান মক্কেল ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে খুব ভালবাসিতেন। নরেন্দ্রও তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'চাচা' বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন এবং পার্শ্বে বসিয়া পঞ্জাব, আফগানিস্থান প্রভৃতি দুর্গম দেশে কিরূপে উষ্ট্র ও অশ্বাদি আরোহণে যাতায়াত করিতে হয় ইত্যাদি কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। সে সব গল্পের কোন আদি-অন্ত ছিল না। নরেন্দ্রের শুনিয়া কখনও ক্লান্তিবোধও হইত না। চাচা মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রকে মিঠাই দিতেন, আর নরেন্দ্র উহা অম্লান বদনে ভক্ষণ করিতেন। অপর মক্কেলগণ এই ভ্রষ্টাচার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেন এবং নীরব মুখভঙ্গীতে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেন। বিশ্বনাথ বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়াই সব বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে তিনি সর্বদা অতি উদার-ভাবাপন্ন ছিলেন, কিছুই বলিতেন না। এই জাতিনাশের ব্যাপার লইয়া একদিন বড় মজা হইল। পিতাকে বিষয়কার্যে ব্যস্ত দেখিয়া নরেন্দ্র অন্যত্র গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে কাজ সারিয়া পিতা যখন মক্কেলদের সহিতে কথা বলিতে বলিতে সদর দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই ফাঁকে নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন এবং বিভিন্ন জাতির মক্কেলদের জন্য যে সব হুঁকা পৃথক পৃথক সাজানো ছিল, তাহার প্রত্যেকটিতে একবার মুখ দিয়া ফুড়ুক করিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের মাথায় তখন জাতিভেদ-প্রথাটা বেশ একটা সমস্যার আকারে তোলপাড় করিতেছিল। একজন অপরের হাতে খাইবে না কেন? একজন অপরের হুঁকায় তামাক খাইলে কি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে? নরেন্দ্র আজ তাই প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু কই এতগুলি হুঁকায় মুখ দিবার পরও তো পৃথিবীর কোন পরিবর্তন ঘটিল না! তিনিও তো যে নরেন্দ্র সেই নরেন্দ্রই রহিয়া গেলেন। এমন সময় বিশ্বনাথ আসিয়া পড়িলেন এবং নরেন্দ্রকে সেই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কচ্ছিস রে?" পুত্র বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, "দেখছি জাত না মানলে কি হয়।" পুত্রের অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা এবং বিকট সমস্যার আশ্চর্য সমাধানকৌশল দেখিয়া

পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, এবং "বটে রে দুষ্টু" বলিয়া পাঠগৃহে চলিয়া গেলেন।

আর একদিন ঐ মুসলমান ভদ্রলোক বৈঠকখানায় বসিয়া অপর সকলকে সম্রাট আকবরের গুণগ্রাম শুনাইতেছেন, এমন সময় অন্দরমহলে হাহাকার উঠিল—নরেন্দ্র অপর বালকদের সহিত লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে অকস্মাৎ পা পিছলাইয়া একতলার পুজাদালানের সিঁড়ি হইতে[৫] গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আসিলেন এবং অনেক চেষ্টার ফলে প্রায় একঘণ্টা পরে বালকের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পিতামাতাদি সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। চৈতন্য ফিরিলে ডাক্তার আরও পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আঘাত গুরুতর বটে; কিন্তু জীবনের কোন ভয় নেই।" সেই পতনের ফলে নরেন্দ্রের দক্ষিণ চক্ষুর উপরে কিয়দংশ কাটিয়া গিয়াছিল এবং সেই দাগ আজীবন ছিল। উত্তরকালে এই ঘটনার বিবরণ শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "যদি সেদিন ঐ রকম ওর শক্তি না কমে যেত, তাহলে ও যে পৃথিবীটা একেবারে ওলট-পালট করে ফেলত।"

আমরা নরেন্দ্রের নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার অর্থ এই নহে যে, কর্তৃত্বের মোহে তিনি সরদার সাজিতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "শিরদার তো সরদার।" বস্তুতঃ তিনি সঙ্গীদের জন্য নিজ মস্তকদানে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়াই সরদার হইতে পারিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সের সময় তিনি এক খেলার সাথীকে লইয়া চড়ক দেখিতে যান এবং চড়কতলা হইতে মাটির মহাদেবের মূর্তি কিনিয়া একসঙ্গে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, আর সঙ্গীটি একটু পিছাইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী দ্রুতবেগে পশ্চাতে আসিতেছে বুঝিয়া নরেন্দ্র পিছনে তাকাইয়া দেখেন সঙ্গীটি একেবারে ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে আর কি! রাস্তার লোক চীৎকার করিয়া উঠিল, "গেল গেল!" কিন্তু কেহই প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিল না বা করিতে পারিল না। এদিকে নরেন্দ্রনাথ বাম বগলে মহাদেবকে পুরিয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলেন এবং

৫। বাঙ্গলা জীবনীর মতে দোতলার সিঁড়ি হইতে; অন্যমতে পূজাদালানের বা বারাণ্ডার উঁচু সিঁড়ি হইতে। দ্বিতীয় মতই সমীচীন মনে হয়।

বালকটিকে সজোরে হাত ধরিয়া টানিয়া আশু বিপদ হইতে বাঁচাইলেন। মুহূর্তে এই অপূর্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল এবং উপস্থিত সকলে বালকের সাধুবাদে মুখর হইয়া উঠিলেন।[৬] নরেন্দ্র সে সবে কান না দিয়া স্বগৃহে ফিরিলেন এবং মায়ের নিকট যেভাবে দৈনন্দিন সব কথা বলিতেন তেমনি ভাবে ঐ ঘটনাও বলিলেন। মা আদ্যোপান্ত শুনিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাছা এই তো মানুষের মতো কাজ! সব সময়ই এই রকম মানুষ হবার চেষ্টা করবি।"

নরেন্দ্র একবার কুড়ি পঁচিশ জন বালককে লইয়া গড়ের মাঠে কেল্লা দেখিতে যান। তাহাদের মধ্যে একটি বালক পথিমধ্যে অসুস্থ বোধ করিল। অপর বালকেরা উহা কিছুই নয় ভাবিয়া হাসিঠাট্টা করিতে লাগিল এবং গন্তব্যপথে আগাইয়া চলিল। নরেন্দ্রনাথও আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া চলিতেছিলেন। হঠাৎ ঐ বালকের কথা মনে পড়িল এবং দেখিলেন, সে ক্রমে দল হইতে পিছাইয়া অবশেষে অবসন্নদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়াছে। তিনি অমনি ফিরিলেন ও বালকের গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন সে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত—থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। অতএব তাহাকে ধরাধরি করিয়া একখানি গাড়ীতে চাপাইলেন এবং স্বয়ং বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন।

সাত আট বৎসরের বালক নরেন্দ্র একদিন কয়েকজন সহপাঠীকে লইয়া নৌকারোহণে চাঁদপাল ঘাট হইতে মেটেবুরুজে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজিদ আলি শার পশুশালা দেখিতে যান। ফিরিবার সময় একটি বালক অসুস্থ হইয়া নৌকামধ্যে বমি করিয়া ফেলে। ইহাতে মাঝিরা বিরক্ত হইয়া ছেলেদিগকে উহা স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে আদেশ দেয়। ছেলেরা উহা অপর কাহারও দ্বারা পরিষ্কার করাইতে বলে এবং তজ্জন্য দ্বিগুণ ভাড়া দিতে প্রস্তুত হয়। মাঝিরা কিন্তু জেদ ছাড়িল না, বরং তাহাদের কথা অমান্য করার জন্য ছেলেদিগকে গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং পাড়ের কাছে আসিয়াও ভয় দেখাইল, কথা না মানিলে নৌকা ভিড়াইবে না। তখন কথা কাটাকাটি মারামারিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইল এবং ঘাটের অন্যান্য মাঝিরাও ঐ মাঝিদের সহিত যোগ দিল দেখিয়া ছেলেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। নরেন্দ্র তাহাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ

৬। বাঙ্গলা জীবনীতে অনুরূপ আর এক ঘটনাকালে নরেন্দ্রনাথ ঠিক এইভাবেই একটি বালক ও তাহার মাতাকে দুই হস্তে রক্ষা করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। (৩৪ পৃঃ)।

হইলেও নৌকা ঘুরিবার এক সুযোগে লম্বা লাফ দিয়া তীরে উঠিলেন এবং সহযাত্রীদের উদ্ধারের উপায় আবিষ্কারের জন্য ইতস্ততঃ তাকাইতে লাগিলেন। দেখিলেন পল্টনের দুই গোরা ঐ দিকে আসিতেছে। তিনি সাহস ও বিশ্বাসভরে তাহাদের নিকট গিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা নিজেদের বিপদের কথা জানাইলেন। গোরারা আকার ইঙ্গিতে অবস্থাটা বুঝিতে পারিল এবং সুদর্শন ক্ষুদ্র বালকের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া নিজ ভাষায় বলিল, "ঠিক আছে বাচ্ছা, তুমি ভেবো না।" নরেন তাহাদের হাত ধরিয়া নৌকার দিকে লইয়া চলিলেন। গোরাদের দেখিয়াই মাঝিরা ভীত হইয়া পড়িল এবং তাহাদের আদেশ পাইবামাত্র নির্বিবাদে ছেলেদের পাড়ে নামাইয়া দিল। নরেন্দ্রের ব্যবহারে সন্তুষ্ট গোরারা তাঁহাকে থিয়েটারে লইয়া যাইতে চাহিল ; কিন্তু তিনি ধন্যবাদ সহকারে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া সাথীদের সহিত স্বগৃহে ফিরিলেন।

নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ বৎসর তখন ইংলণ্ডের প্রিন্স্ অব ওয়েল্‌স্ (পরে সম্রাট সপ্তম এডয়ার্ড) ভারত পরিদর্শনে আসেন। সেই বৎসর সিরাপিস নামীয় ড্রেড্‌নট্ জাতীয় একখানি বিরাট রণতরী কলিকাতা বন্দরে আসে। নরেন্দ্রের বন্ধুরা ধরিয়া বসিল ঐ যুদ্ধজাহাজ দেখিতে হইবে। নরেন্দ্র সম্মত হইয়া সকলের সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু জাহাজ দেখিতে হইলে চৌরঙ্গীতে এক সাহেবের আফিসে গিয়া অনুমতি লইতে হইবে। এদিকে ছোট ছেলে দেখিয়া আফিসের দারোয়ান তাহাদিগকে তাচ্ছিল্য করিয়া সরাইয়া দিল—সাহেবের আফিসে যাইতে দিল না। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন্দ্র সহজে দমিবার পাত্র নহেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, সকলে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলার একখানি ঘরে যাইতেছে এবং অনুমতিপত্র সহ সেখান হইতে বাহির হইতেছে। উহাই তাহা হইলে ঐ সাহেবের ঘর ! তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন, দোতলায় যাইবার জন্য বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে একটি সরু ঘোরানো লোহার সিঁড়ি আছে। তিনি দারোয়ানের অলক্ষ্যে ঐ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন এবং প্রার্থীদের দলে ভিড়িয়া ক্রমে বড় সাহেবের ঘরে হাজির হইলেন। সাহেব মাথা নীচু করিয়া এক দিক হইতে আবেদনপত্র সহি করিতেছিলেন ; নরেন্দ্রের পালা আসিলে তিনিও আবেদনপত্রখানি সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন এবং সাহেব সহি করিয়া দিলেন। তখন স্মিতমুখে তিনি সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া

দারোয়ানকে সগর্বে দেখাইলেন—তিনিও অনুমতি পাইয়াছেন। অবাক হইয়া হিন্দুস্থানী দারোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুম ক্যায়সা উপর গয়া থা?" সকৌতুকে নরেন্দ্র বলিলেন, "হাম জাদু জানতা" এবং দারোয়ানের প্রতি কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া সাথীদের সহিত সানন্দে জাহাজ দেখিতে চলিলেন।

আরও ছেলেবেলার আর একটি ঘটনায় নরেন্দ্রের সাহস ও বিচারপ্রবণতার পরিচয় পাই। নরেন্দ্রের এক সহপাঠীর বাড়ীতে একটি চাঁপাফুলের গাছ ছিল। মাঝে মাঝে তিনি সেখানে গিয়া চাঁপা গাছের ডালে পা বাঁধাইয়া হাত ছাড়িয়া মাথা নীচু করিয়া দোল খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন ঐরূপ করার সময় বাড়ীর কর্তা এবং সহপাঠীর বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা রামরতন বসু মহাশয়[৭] নরেনের গলার আওয়াজ পাইয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং ঐটুকু ছেলে পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিতে পারে, তাছাড়া চাঁপা গাছের নরম ডাল সহজেই ভাঙ্গে বলিয়া গাছেরও ক্ষতি হইতে পারে ইত্যাদি ভাবিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাড়ীর বহিরে আসিলেন এবং নাতিস্থানীয় ছোট ছেলেকে বৃদ্ধরা যেভাবে স্নেহভরে বুঝাইয়া থাকেন তেমনিভাবে নামিয়া আসিতে বলিলেন ও ভবিষ্যতে ঐরূপ করিতে বারণ করিলেন। নরেন্দ্র নামিয়া আসিলেন ঠিক, কিন্তু বৃদ্ধ তো তাঁহার পিতামহ-স্থানীয় এবং তাঁহার সহিত খোলামনে কথা বলা চলে। আবার নরেন্দ্রের যুক্তিবাদী মন শুধু আদেশে বা ঠাকুরদাদার স্নেহবচনে তো ভুলে না। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ও গাছটায় চড়লে কি হয়?" এইরূপ ক্ষেত্রে কে যুক্তি দিতে যায়? ভয় দেখানোই বরং স্বাভাবিক। বৃদ্ধ বসু মহাশয়ও তাই বলিলেন, "ও গাছে একটা বেহ্মদত্যি আছে; তার ভয়ানক চেহারা। আর যারা ও গাছে চড়ে, তাদের ঘাড় মটকে দেয়।" ঠাকুরদাদার এমন যুক্তিতে নরেন্দ্র ভুলিলেন না—তিনি উহা ছেলে-ভুলানো কথা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন, এবং বৃদ্ধ চলিয়া গেলে আবার গাছে চড়িতে উদ্যত হইলেন ও মনে মনে ভাবিলেন, ব্রহ্মদত্যি যদিই বা আসে, উহার গায়ে থুথু ফেলিয়া উহাকে জব্দ করিবেন। সাথী কিন্তু বলিল, "না ভাই, অমন কর্ম করিসনি, তাহলে সে তোর ঘাড় মটকাবে।" ইহাতে নরেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "তুই ছোঁড়াও

৭। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দেরও ঠাকুর দাদা। ইঁহাদের বাড়ী তখন ঐ পাড়াতেই ছিল।

যেমন গাধা! একজন একটা কথা বলে গেল, আর অমনি তা বিশ্বাস করতে হবে? যদি তোর ঠাকুরদা বুড়োর ঐ বেহ্মদত্যির কথা সত্যি হত, তাহলে অনেকক্ষণ আগেই আমার ঘাড় মটকে যাওয়া উচিত ছিল।"

প্রত্যুষের উজ্জ্বল রক্তিমাভা দেখিয়া ভাবী দিবস সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত ধারণা করা চলে; শৈশবের গুণাবলী দর্শনে ভাবী মঙ্গলময় জীবনেরও একটা সুন্দর পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব। অন্ততঃ নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একথা নির্বিবাদে বলা চলে। নরেন্দ্রের ছিল সুঠাম সুন্দর দেহ, চক্ষুযুগল আয়ত ও উজ্জ্বল, বর্ণ গৌর, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাবণ্যমণ্ডিত, আর সমস্ত বদনমণ্ডলে প্রতিভার দীপ্তি—দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। মন ছিল তাঁহার শত চারুকল্পনায় পূর্ণ, হৃদয় স্নেহসিক্ত, বুদ্ধি ক্ষুরধার, সাহস অমিত, উদ্ভাবনী শক্তি অচিন্তনীয়, কার্যক্ষমতা অসীম, উৎসাহ অদম্য। আর সর্বোপরি ছিল তাঁহার ভগবদুন্মুখতা; জন্ম হইতে তিনি ধ্যানসিদ্ধ—আত্মজ্যোতিতে সদা নিমগ্ন। পূজা, প্রার্থনা, আত্মানুসন্ধিৎসাতে তাঁহার আবাল্য রুচি ও অধিকার। এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবনীর অনুধ্যান করিলে আমরা দেখিব, এই সকল কথা অতিরঞ্জিত না হইয়া বরং সত্যের তুলনায় অতি ম্লান।

প্রভাতের ইঙ্গিত

শিশুর বুদ্ধিবিকাশ পিতামাতার ক্রোড়ে বসিয়াই হয়। বিশেষতঃ নরেন্দ্রের পিতামাতার ছিল অপূর্ব উদার চিত্ত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রগতিশীল মন। অতএব এই ক্ষেত্রে এই কথা আরও সত্য। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী, হিন্দুদের দেবদেবীর কথা ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ তিনি ঐ শৈশবের আদর-ভালবাসার মাধ্যমেই আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সুকুমার মনে ঐ সকলের গভীর রেখাপাত হইয়াছিল বলিয়াই উত্তর কালে তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ঐ সকল কথা উত্থাপন করিয়া এবং আবেগভরে সুললিত ভাষায় বিবৃত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেন। রামায়ণ তাঁহার এইরূপ আয়ত্ত হইয়াছিল যে, একবার বাড়ীর নিকটে একদল রামায়ণ-গায়ক পালাবিশেষ গাহিবার সময় কয়েকটি পংক্তি ভুলিয়া গিয়া অশুদ্ধভাবে গাহিতে থাকিলে নরেন্দ্র সেই পদগুলির বিশুদ্ধ উদ্ধৃতি দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সমাদর ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লাভ করেন। তাঁহার মহাভারত পাঠ-সম্বন্ধেও একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা জানিতে পারা যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দত্তবাড়ীর তদানীন্তন কর্তা ও নরেন্দ্রনাথের খুল্লপিতামহ কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। অন্তিমকালে তাঁহার একটি শেষ বাসনা জাগিল—মৃত্যুর পূর্বে তিনি বালক-বালিকাদের কাহারও মুখে মহাভারত-পাঠ শুনিবেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ কেহই পাঠ করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা বৃদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য নরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র হস্তদ্বয়ে বৃহদাকার মহাভারত লইয়া বৃদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পরিষ্কার কণ্ঠে কয়েক পাতা পড়িয়া শুনাইলেন।[১] পরলোকের প্রতি প্রসারিত-দৃষ্টি বৃদ্ধ তাঁহার এই কুলতিলকের কার্যে উল্লসিত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন, "ভাই, কালে তুই নিশ্চয়ই মস্ত লোক হবি।" শিশু বীরেশ্বর যখন পয়ারছন্দে নাকি-সুরে পাঠ করিতেন—"অরুণে লইয়া স্কন্ধে বিনতানন্দন" ইত্যাদি, তখন শুনিতে খুবই আনন্দ হইত।

এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্বে নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠশালায় ভর্তি

১। 'স্বামী বিবেকানন্দ'— প্রমথ নাথ বসু।

মহেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, শুধু শেষ মুহূর্তের পূর্বে নহে, তারও আগে কালীপ্রসাদ বীরেশ্বরের মুখে কয়েক দিন ধরিয়া সমগ্র রামায়ণ-পাঠ শুনিয়াছিলেন। পাঠকালে ভুবনেশ্বরীও উপস্থিত থাকিতেন। ('স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন,' ১১ পৃঃ)।

হইয়াছিলেন। পাঠশালায় যাইবার আগে দত্তবংশের কুলপুরোহিত আসিয়া মাটিতে রামখড়ির আঁকর কাটিয়া নরেন্দ্রকে শিখাইলেন—এটা "ক", এটা "খ"। নরেন্দ্রও বলিলেন, এটা "ক", এটা "খ"। তারপর কোরা ধুতি পরিয়া খাঁগের কলম লইয়া পাঠশালায় গেলেন। কিন্তু বিদ্যালয় এক অপূর্ব স্থান— সেখানে অচেনা, অজানা, সামাজিক বিভিন্ন স্তরের কত ছেলেই না সমবেত হয়! তাহাদের কথাবার্তা, চলন-বলনও সব নূতন ধরনের। ইহার ফলে নরেন্দ্র দুই-চারি দিনের মধ্যেই অভিধান-বহির্ভূত এমন কতকগুলি শব্দ শিখিয়া ফেলিলেন যে, জনক-জননী তাঁহাকে আর ঐরূপ বিদ্যালয়ে রাখা সমীচীন মনে করিলেন না; বাড়ীতে নিজেদের পুজাদালানে একটি ছোট-খাটো পাঠশালা খুলিয়া সেখানে গুরুমহাশয়ের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। বাহিরের পাঠশালায় গিয়া নূতন সঙ্গী পাইয়া নরেন্দ্রের যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহার অভাবও এখানে অনেকটা পুর্ণ হইল; কারণ নূতন পাঠশালায় অনেকগুলি আত্মীয় বালকও যোগ দিল। নরেন তখন ছয় বৎসরে পড়িয়াছেন। এইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইলেও মায়ের নিকট নরেন্দ্র যে জ্ঞানার্জন করিতেছিলেন, তাহা বন্ধ হইল না; আর পুঁথিগত বিদ্যা হিসাবে বাংলা বর্ণপরিচয় এবং প্যারীচরণ সরকারের ইংরেজী ফার্ষ্টবুক তিনি মায়ের কাছে বসিয়াই আয়ত্ত করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পাঠাভ্যাসের একটা নিজস্ব রীতি ছিল। গুরু মহাশয় পার্শ্বে বসিয়া প্রতিদিনের পাঠ পড়িয়া যাইতেন। আর নরেন্দ্র চক্ষু বুজিয়া শুইয়া শুইয়া তাহা শুনিতেন। তাহাতেই দৈনিক পাঠ আয়ত্ত হইয়া যাইত। শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতা নৃসিংহ দত্ত তখন পুত্রসহ নরেন্দ্রদের বাড়ীতেই থাকিতেন। নরেন্দ্র রাত্রিতে নৃসিংহ দত্তের নিকট শয়ন করিতেন। বৃদ্ধ দত্ত মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সংস্কৃতজ্ঞান ছিল, আর তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কঠিন বিষয়গুলি বাল্যকালেই শিখাইলে ছেলেরা উহা সহজে শিখিতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি রাত্রে নরেন্দ্রকে কাছে পাওয়ার সুযোগে পিতৃ-পুরুষের নামাবলী, দেবদেবীর স্তোত্র ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্রগুলি তাঁহাকে মুখে মুখে শিখাইতেন।[২] মাতা, আত্মীয়বর্গ ও গুরুমহাশয়ের কৃপায় এইরূপে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতে নরেন্দ্রের অল্প বয়সেই যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

২। ইহা প্রমথবাবুর মত। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কারের মতে নরেন্দ্র সন্ধ্যাকালে নৃসিংহ দত্তের ক্রোড়ে বসিয়া ঐ সব অভ্যাস করিতেন। (৫ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রো-পলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের নবম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।[৩] বিদ্যালয়টি তখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে ছিল; সেখানে এখন লাহাদের বাড়ী হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ এবং অপরাপর সকলে শীঘ্রই তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু এক কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল; তিনি ইংরেজী ভাষা শিখিতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।[৪] সকলে কত বুঝাইলেন—"আজকাল ইংরেজী শিক্ষা করা দরকার। না শিখিলে চলে না"; তবু নরেন্দ্রের প্রতিজ্ঞা টলিল না। বৃদ্ধ নৃসিংহ দত্ত মহাশয়ও বুঝাইলেন, কিন্তু সফলকাম হইলেন না। এইভাবে কয়েক মাস গত হইলে নরেন্দ্র কি মনে করিয়া দত্ত মহাশয়ের কথায় সম্মত হইলেন, এবং এই নবীন ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে এমন নবোৎসাহে ঐ ভাষা শিখিতে লাগিলেন যে, সকলে দেখিয়া অবাক। ইতিহাস ও সংস্কৃতভাষাও তিনি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু অঙ্কে ছিল তাঁহার বিরাগ। তাঁহার পিতারও ভাব ঐ বিষয়ে অনুরূপ ছিল; তিনি বলিতেন, "ও তো মুদির দোকানের বিদ্যে।"

খেলাধূলার প্রতি নরেন্দ্রনাথের আশৈশব একটা স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। লেখাপড়ার জন্য তাঁহাকে খুব বেশী সময় দিতে হইত না, তাঁহার প্রতিভার পক্ষে দৈনিক দুই-এক ঘণ্টা পড়াই যথেষ্ট ছিল। বাকী সময় তিনি নূতন নূতন ক্রীড়াকৌতুক আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকিতেন এবং খেলার সাথী পাইলেই সব ভুলিয়া উহাতে মাতিয়া থাকিতেন। জলখাবারের পয়সা জমাইয়া হয় মর্বেল কিংবা নূতন ব্যাট্ বা বল কিনিতেন। ক্রিকেটে তাঁহার বেশ দক্ষতা ছিল। এই ভাবে সারা বছর কাটাইয়া পরীক্ষার দিন কয়েক পূর্ব হইতে পড়ায় অধিকতর মন দিতেন এবং সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পরও এই ক্রীড়াপ্রবৃত্তি সমভাবে বর্তমান ছিল; অধিকন্তু গৃহে মাতার নিকট তিনি যেমন চঞ্চল শিশু ছিলেন, বিদ্যালয়েও তেমনি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন।

৩। ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের গ্রন্থে (*Swami Vivekananda, P 153*) প্রকাশিত মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের বেতনের একখানি রসিদ হইতে জানা যায়, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ ক্লাশ নাইনের ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হন। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন, প্রসন্নচন্দ্র রায়।

৪। ইহা একটা সাময়িক ভাব বলিয়া মনে হয়; কারণ আমরা জানি, তিনি ইহার পূর্বেই মাতার নিকট ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষকদের মতে তিনি পড়িবার বেঞ্চে বসিতেন না বলিলেই চলে। বসা ও দাঁড়ানোর মধ্যে যত রকম ভঙ্গী কল্পনা করা চলে, তাঁহাকে সর্বদা তাহারই কোন একটিতে পাওয়া যাইত। তখন তিনি ইজের পরিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। এই অস্থিরতার পরিণতিস্বরূপ দেখা যাইত, উহার কোন না কোন অংশ রোজই ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আবার সময় পাইলেই—বিদ্যালয়ের জলযোগের ছুটি হইলেই, তিনি ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, আর সঙ্গীদের দলে ভিড়াইয়া লইতেন। যখন খেলিতেন তখন আর কোন দিকে হুঁশ থাকিত না, আর কোন চিন্তা মনে স্থান পাইত না। মার্বেল, ছুটাছুটি, হুটোপাটি, লাফানো, ঘুষোঘুষি এইসব খেলা তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় ছিল। আর এই সকলে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। পরদিন কি খেলিবেন তাহার প্রোগ্রাম আগের দিনেই ঠিক করিয়া রাখিতেন। তেমন সুযোগ ঘটিলে বিদ্যালয়কক্ষও সময় সময় ক্রীডাভূমিতে পরিণত হইয়া যাইত।

বালকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থতা করিতেন, অপর সকলে তাহা মানিয়াও লইত। দুই দলে মারামারি উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যে পড়িয়া উভয় দলকে পৃথক করিয়া দিতেন; কখনও বা এইরূপ করিতে গিয়া প্রতিপক্ষদের দুই-এক ঘা প্রহারও অকস্মাৎ অনভিপ্সীতরূপে তাঁহার দেহে আসিয়া পড়িত। আবার তিনি মুষ্টিযুদ্ধে সুশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া এইরূপ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইত না। নিজে তিনি মারামারি ভালবাসিতেন না, এবং তাই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী-দলেও ভিড়িতেন না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সাহস, নূতন উপায় আবিষ্কার, ঝুঁকি লওয়া ইত্যাদি সদ্‌গুণের জন্য ছেলেরা তাঁহাকে স্বতই সমীহ করিয়া চলিত। পরবর্তী কালে তিনি শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলুম, তা না হলে কি আর একটা কানা-কড়ি সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?"

বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট থাকায়, স্বভাবতই পাঠে তাঁহার খুব বেশী মন দিবার প্রয়োজন হইত না। তাই অবসর কাটাইবার জন্য সাথীদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিতেন; ইহাতে মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হইত। হয়তো শিক্ষক আসিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু নরেন্দ্রের গল্প তখনও শেষ হয় নাই—তিনি নিজের কোন দুষ্টামির কথা বা রামায়ণ-মহাভারতের কোন চিত্তাকর্ষক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন এবং ছেলেরা পাঠ ভুলিয়া তাহাই শুনিতেছে; এমন সময় ফিস্‌ফিস্ শব্দে বিরক্ত হইয়া শিক্ষক হঠাৎ ছেলেদিগকে পাঠের কথা

জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। উত্তর দিতে না পারিয়া সকলে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু নরেনের মন যেন ছিল দ্বিমুখো—তিনি গল্পেও মাতিতেন, আবার শিক্ষকের কথাও শুনিতেন; অথবা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষকের যে দুই-চারিটি কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তাহা হইতেই পাঠ্য বিষয়টি বুঝিয়া লইতেন। কাজেই শিক্ষক যখন পালাক্রমে নরেন্দ্রকে পাঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি অক্লেশে যথাযথ উত্তর দিলেন। শিক্ষক তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঠের সময় কে কথা কহিতেছিল। উত্তরে যখন সকলেই নরেনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল, তখন তিনি বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। অতএব তিনি নরেন ব্যতীত সকলকে শাস্তিস্বরূপ দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নরেনও দাঁড়াইলেন। শিক্ষক বলিলেন, "তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।" নরেন কিন্তু বলিলেন, "না, আমাকেও দাঁড়াতে হবে, কারণ আমিই তো কথা বলছিলাম।" তিনি দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

আর একটি ঘটনা হইতে আমরা জানিতে পারি, তিনি কিরূপ নির্ভীক ছিলেন এবং বলপূর্বক তাঁহার মত পরিবর্তন করানো কত কঠিন ছিল। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বড় ক্রোধপরায়ণ ছিলেন, এবং প্রয়োজন বোধ করিলেই ছাত্রদিগকে কঠিন দৈহিক দণ্ড দিতেন। একদিন ঐ শিক্ষক যখন একটি বালককে তাহার কিম্ভূতকিমাকার ব্যবহারের জন্য প্রহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এই অকারণ উন্মত্ততা, বিকট মুখভঙ্গী ইত্যাদি দেখিয়া নরেন্দ্র হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহার ফলে শিক্ষকের সমস্ত ক্রোধ নরেনের উপর গিয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বল্, আর কখন আমার দিকে হাসবি না।" নরেন এইরূপ বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় শিক্ষক প্রহারের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন এবং দুই হাতে কান মলিতে লাগিলেন, এমন কি কান ধরিয়া উঁচু করিয়া তাঁহাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন, ইহাতে একটি কানের চামড়া ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। তখনও নরেন ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে অসম্মত হইলেন, বরং ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, "আমার কান মলবেন না! আমাকে মারবার আপনি কে? আমার গায়ে হাত দেবেন না।" ইত্যাদি। এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে আসিয়া পড়িলেন। নরেন ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, এবং পুস্তকগুলি

হাতে তুলিয়া বলিলেন, তিনি বরাবরের মতো সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া বহু সান্ত্বনা দিলেন। পরে এই প্রকার শাস্তিবিধান সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের পর এই আদেশ প্রচারিত হইল— বিদ্যালয়ে ঐরূপ শাস্তি দেওয়া চলিবে না। এদিকে বাড়ীতে ভুবনেশ্বরী যখন ঘটনার বিবরণ শুনিলেন, তখন তিনি দুঃখ ও ক্ষোভে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, ছেলেকে তিনি আর এমন বিদ্যালয়ে যাইতে দিবেন না। নরেন্দ্রনাথের মন কিন্তু তখন শান্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি পূর্বেরই মতো ঐ বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার কান সারিতে কয়েক দিন লাগিয়াছিল।

খেলাধূলা ও লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের আরও বহুদিক এই সময়ে বিকশিত হইতে থাকে। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার একটা জন্মগত ও স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ভিখারী গায়ক দল যখন দ্বারে দাঁড়াইয়া খোল বাজাইয়া গান গাহিত, তখন তিনি সাগ্রহে তাহা শুনিতেন। পাড়ার কোথাও রামায়ণাদি গান হইলে তিনি সেখানেও উপস্থিত হইতেন। এই সময়ে তিনি রন্ধনবিদ্যাও আয়ত্ত করেন। সাথীদের লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে তিনি রন্ধনের সমস্ত সরঞ্জাম যোগাড় করিতেন। তাহাদের নিকট চাঁদাও লইতেন; কিন্তু অধিকাংশ ব্যয় নিজেকেই বহন করিতে হইত। প্রধান পাচক হইতেন তিনি, রান্নাও হইত চমৎকার; যদিও তিনি লঙ্কা ব্যবহার করিতেন একটু বেশী।

একঘেয়েমি তাঁহার অসহ্য ছিল, সুতরাং নিত্য নূতন আনন্দের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত। তবে এখানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তাঁহার জীবনে এমনই একটা প্রকৃতিগত পবিত্রতা ছিল এবং পরিবারের সুশিক্ষা এমনই উত্তম ছিল যে, তাঁহার পা কখনও বেচালে পড়িতে পারিত না, সাথীদের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় কেহ থাকিলেও সে তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইত না। যাহা হউক অনাবিল আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত থাকিয়া তিনি এক সময়ে একটি সখের থিয়েটার-দল গড়িয়া তুলেন ও স্বগৃহের পূজা-দালানে কয়েকবার অভিনয় করেন। কিন্তু একজন কাকা এই বিষয়ে আপত্তি তোলায় থিয়েটারের স্টেজের পরিবর্তে বাড়ীর প্রাঙ্গণে এক ব্যায়ামের আখড়া প্রস্তুত হয় এবং বন্ধুরা সেখানে নিয়মিত ব্যায়াম আরম্ভ করেন। সেখানে আবার এক খুড়তুতো ভাই ব্যায়াম করিতে গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিল; তাই ঐ কাকা ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি নষ্ট করিয়া দিলেন। ফলে ব্যায়ামক্ষেত্রটি বন্ধ হইয়া গেল এবং নরেন্দ্র-

নাথ অতঃপর প্রতিবেশী নবগোপাল বাবুর জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌-এর আখড়ায় যোগ দিলেন। নবগোপাল বাবু ছিলেন হিন্দুমেলার প্রবর্তক ও হিন্দুদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকামী। নরেন্দ্র উপযুক্ত স্থান পাইয়া শরীরচর্চায় মন দিলেন। আখড়াটি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর অবস্থিত ছিল। আখড়ার সভ্যরূপে নরেন্দ্রনাথ লাঠিখেলা, অসিচালনা, নৌকাচালনা, সন্তরণ, কুস্তি এবং অন্যান্য ব্যায়ামে পারদর্শিতা লাভ করেন। একবার ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে তিনি মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি রূপার প্রজাপতি পাইয়াছিলেন।[৫] লাঠিখেলায়ও তাঁহার বেশ উৎসাহ ছিল। আখড়ায় এবং আখড়ার বাহিরে কয়েকজন মুসলমান উস্তাদের সাহায্যে তিনি ঐ বিদ্যা বিশেষ আয়ত্ত করেন। তাঁহার বয়স যখন দশ বৎসর ও তিনি মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়েন, তখন এক মেলা উপলক্ষে জিম্‌ন্যাষ্টিকের খেলা দেখানো হয়। দর্শক হিসাবে নরেন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য খেলার পরে লাঠিখেলা চলিতে থাকিলে যখন উৎসাহ কমিয়া আসিয়াছে, তখন নরেন্দ্র হঠাৎ বলিলেন, খেলোয়াড়দের মধ্যে যে কেহ তাঁহার প্রতিপক্ষে দাঁড়াইতে চাহেন, তিনি তাঁহারই সহিত খেলিতে প্রস্তুত। খেলোয়াড়দের মধ্যে যিনি সর্বাধিক বলবান ছিলেন, তিনিই আগাইয়া গেলেন এবং ঘোর ঠকাঠক শব্দে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। নরেন্দ্র অপেক্ষা অপর ব্যক্তি বয়স ও শক্তিতে প্রবলতর বলিয়া ফলাফল একরূপ অবধারিতই ছিল। তথাপি বালকের কৌশল ও সাহস দর্শনে মুহুর্মুহুঃ সাধুবাদ বর্ষিত হইতে লাগিল। এদিকে নরেন্দ্র পাঁয়তারা কসিতে কসিতে হঠাৎ সুকৌশলে ও সশব্দে প্রতিপক্ষকে এমন এক প্রচণ্ড আঘাত করিলেন যে, তাঁহার হাতের লাঠি দ্বিখণ্ডিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। নরেন্দ্রের শিক্ষা সার্থক হইল। তিনি জিতিলেন এবং দর্শকবৃন্দের আনন্দের অবধি রহিল না। (প্রমথনাথ বসু, পৃঃ ১৭-১৮)।

আলস্যবিমুখ নরেন্দ্রের জীবন সর্বদাই কর্মবহুল ছিল। ব্যায়ামাদির অবসরে তিনি স্বগৃহে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখাইতেন। পিতা তাঁহাকে একটি টাট্টু ঘোড়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অশ্বচালনায় সুদক্ষ হইয়াছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া তাঁহার একটা সখ ছিল।

৫। এই প্রদর্শনীতে মখমলের উপর সুচারু সূচীকর্মের জন্য নরেন্দ্রের এক ভগিনী প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

তিনি পাড়ার সকলের আদরের পাত্র ছিলেন—সকলেরই প্রতি ছিল তাঁহার ঐকান্তিক আত্মীয়তাবোধ। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন মামা, খুড়ো, জ্যেঠা, পিসী, মাসী, মা ইত্যাদি, অথবা দাদা, দিদি, ভাই, বোন ইত্যাদি। প্রত্যেকের বিপদ আপদের সময় তিনি তাহাদের সাহায্য করিতেন। আবার অনেক সময় তাঁহার হাস্যকৌতুকে ও দুষ্টামিতে অতি গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তিরাও হাসিয়া আটখানা হইতেন। সব গৃহেই ছিল তাঁহার অবাধ প্রবেশের অধিকার এবং তাঁহার নিজের দিক হইতে কোথাও যাইতে কোন সঙ্কোচ ছিল না।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, নরেন্দ্র নিয়মিত ভাবে শরীরচর্চার জন্য নবগোপাল বাবুর আখড়ায় যাইতেন। নবগোপাল বাবুও নরেন্দ্রের উৎসাহ ও কার্যক্ষমতা দেখিয়া আখড়ার বিধিব্যবস্থার ভার তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একদিন বালকগণ সকলে মিলিয়া একটা ভারী ট্র্যাপিজ খাটাইবার আয়োজন করিতেছিল। মজা দেখিবার জন্য সেখানে একটা ছোটখাট ভিড জমিয়া গিয়াছিল। ভিড়ের মধ্যে একজন ইংরেজ নাবিকও ছিল। নরেন্দ্র ঐ নাবিককে সাহায্যের জন্য ডাকিলে সে সানন্দে অগ্রসর হইল। কিন্তু ট্র্যাপিজের খুঁটি দুইটি খাডা রাখিবার সময় দড়ি ছিঁড়িয়া উহা হঠাৎ পড়িয়া গেল এবং উহার একপদ উপরে উঠিয়া নাবিকের কপালে গুরুতর আঘাত করিল। সে অজ্ঞান হইয়া পডিয়া গেল এবং কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। একে দুর্ঘটনা, তাহাতে আবার ইংরেজ নাবিক আহত। তখনই একটা পুলিসের মামলা শুরু হইবে ভাবিয়া সকলে পালাইয়া গেল; কিন্তু নরেন এবং তাঁহার দুই একজন বন্ধু পলাইলেন না। তাঁহারা রক্ত পরিষ্কার করিয়া নিজেদের কাপড় ছিঁড়িয়া পট্টি বাঁধিলেন, নাবিকের মুখে জলসেচন ও বীজন করিয়া সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে নিকটবর্তী ট্রেনিং একাডেমি বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন, নবগোপাল বাবুকেও খবর দিলেন। সপ্তাহব্যাপী শুশ্রূষাদির পর নাবিক সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে নরেন্দ্রনাথ কিছু চাঁদা তুলিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন ও প্রীতমনে বিদায় দিলেন।

তাঁহার বয়স্যপ্রীতির বহু দৃষ্টান্ত আমরা ইতিমধ্যে পাইয়াছি। সাথীদের প্রত্যেকেই ভাবিত, নরেন তাহাকেই সর্বাধিক ভালবাসেন, তাই তাহারাও তাঁহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিত। বস্তুতঃ বাল্যজীবনের যত প্রকার গুণরাশি সমবয়স্কদের হৃদয় আকর্ষণ করে, তাহার সবগুলিই নরেন্দ্রজীবনে পূর্ণরূপে

বিরাজিত ছিল। অশ্রান্ত কর্মচঞ্চলতা, ক্রীড়ানৈপুণ্য, দুষ্টামি ইত্যাদির সঙ্গে পরিহাসাদিতেও তিনি পটু ছিলেন। ক্লাশের প্রত্যেক বালকের জন্য তিনি স্বকপোলকল্পিত বা পুরাণাদি হইতে লব্ধ উদ্ভট নামের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ঐ নামেই ডাকিতেন। তাহারাও ইহাতে একটা আত্মীয়তারই স্পর্শ পাইয়া তৃপ্ত হইত। আবার সচ্চরিত্রও তাঁহার একটা মস্ত সম্পদ ছিল। ধর্মের জন্য একটা ব্যাকুলতা তাঁহার জীবনে সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁহাকে চঞ্চল, বিদ্যাবিমুখ ইত্যাদি বলিয়া অনেকের ভ্রম হইলেও তাঁহার মেধা ও আত্মিক বিকাশের ধারা তখন আপন অব্যাহত গতিতেই প্রবাহিত হইতেছিল। আমরা পুর্বে চাঁপা গাছে দোল খাওয়ার প্রসঙ্গে যে রামরতন বসু মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাঁহারই পুত্র, অর্থাৎ নরেন্দ্রের সহপাঠীর পিতা নরেন্দ্রকে স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার মঙ্গলেচ্ছু ছিলেন। তাই একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি ছোকরা বুঝি সমস্ত দিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই রকম করে খেলে বেড়াও! কখনও পড়াশুনা কর কি?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দুইই করি—খেলি, আবার পড়িও।" উত্তরটি যে সত্য তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল ঐ জাতীয় আর একটি সন্দেহ ও সন্দেহভঞ্জনের মধ্য দিয়া। ঐ কথাবার্তার অল্প পরেই পরীক্ষা আরম্ভ হইল—কবিতা-আবৃত্তি, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি সব বিষয়েই নরেন্দ্র চটপট উত্তর দিতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষক সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেশ, বেশ! তোমাকে দেখে কে? তোমার বাবা তো লাহোরে?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বাবা লাহোরে আছেন সত্য; কিন্তু মা তো এখানে আছেন, তিনিই যা করতে হবে বলে দেন, আর আমি নিজেই পড়ি।" ভদ্রলোক প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে স্থির করিলেন, -এ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই উন্নতি করিবে। তদবধি তিনি বরাবরই নরেন্দ্রের খোঁজ-খবর রাখিতেন।

সন্ন্যাসের প্রতি তাঁহার আবাল্য অনুরক্তির কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি। নিজ শ্রেণীতে নূতন ছেলে ভর্তি হইলেই তাঁহার প্রথম প্রশ্ন ছিল, ঐ বালকের কোন আত্মীয়, বিশেষতঃ ঠাকুরদা সন্ন্যাসী হইয়াছেন কিনা। সুযোগ পাইলেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে, এ ইচ্ছা তাঁহার মনে খুবই জাগিত, আর বাল্যসুলভ আগ্রহভরে সহপাঠীদের বলিতেন, "বড় হয়ে আমি সন্ন্যাসী হব, অমুক অমুক জায়গায় যাব ও এইসব করব।" আবার হাত দেখাইয়া সগর্বে বলিতেন,

"আমি সাধু হব, এতে আর ভুল নেই ; আমার হাতে সন্ন্যাসী হবার খুব বড় একটা দাগ আছে।" সঙ্গে সঙ্গে অনেক সব রেখা দেখাইতেন—কে নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ঐ গুলি সন্ন্যাসের রেখা ! তারপর কথা চলিত, সন্ন্যাসীরা কোথায় থাকেন, কি খান, কি করেন। কল্পনাবলে নরেন্দ্রনাথ হিমালয়ের গিরিগুহা, বন-অরণ্য প্রভৃতি সন্ন্যাসোচিত বাসভূমির চিত্র সহপাঠীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। আর তাহারা অবাক হইয়া শুনিত—কৌপীনধারী জটা-জুটমণ্ডিত সন্ন্যাসীরা কিরূপে ফলমূলাহারী হইয়া গিরিকন্দরে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রীড়াচঞ্চল বালকেরও প্রতিভা স্থূলজগতের অন্তর্বর্তী সূক্ষ্মবিষয়গুলি ধরিবার জন্য লালায়িত হইল ; তাঁহার হাবভাবে ক্রমেই একটা পরিবর্তন আসিয়া পড়িল। এখন হইতে তিনি পুস্তকপাঠ, সংবাদপত্রপাঠ, সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকা প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার স্মৃতি ও বোধশক্তি প্রখর ছিল বলিয়া সভার পরে বাড়ী ফিরিয়া তিনি বন্ধুদের নিকট বক্তৃতার সারমর্ম বলিতে পারিতেন এবং সময়বিশেষে সমালোচনাও করিতেন। তাঁহার বিচারশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখিয়া সহপাঠীরা অবাক হইত এবং তর্কক্ষেত্রেও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিত। সৌন্দর্যবোধও ছিল তাঁহার অপূর্ব ও মৌলিক। একদিন এক বন্ধুকে পেশাদার গায়কের মতো গান করিতে শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "সুর ও তালই তো গানের একমাত্র বস্তু নয় ; গানের ভিতর একটা ভাবের প্রকাশ আবশ্যক। কেউ নাকিসুরে সুর ভাজছে শুনলেই বুঝি আনন্দ হয় ? গানের অন্তরে যে ভাবটা আছে তা গানের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠা দরকার, শব্দগুলি পরিষ্কার উচ্চারিত হবে। আর সুরতালের প্রতি ঠিক ঠিক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে গান শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাব না জাগাতে পারে, সেই গান গানই নয়।"

তাঁহার জীবনে তখন অনেক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিও ঘটিত। তিনি বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলা থেকেই সময়ে সময়ে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান দেখে মনে হত, ওসব আমি পূর্বে কোথাও দেখেছি ; কিন্তু তা চেষ্টা করেও কিছুতে স্মরণ আনতে পারতাম না। কোনো স্থানে বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো কোনো বিষয়ে আলোচনা করছি, তখন তাদের একজন হঠাৎ এমন একটা কথা বলেছে যা শুনেই আমার মনে হয়েছে—তাই তো, এই ঘরে এই সব লোকের সঙ্গে যে

আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং তখনও যে এই লোকটি এই কথাই বলেছিল! কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কারণ স্থির করতে পারিনি। পরে যখন পুনর্জন্মবাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম, তখন ভেবেছি, বোধ হয় এইসব ঘটনা আমার পূর্বের জন্মে ঘটেছে এবং তারই আংশিক স্মৃতি কখন কখন আমার মনে উদয় হয়। কিন্তু আরও পরে বুঝেছি, এইসব ব্যাপারের ঐরূপ মীমাংসা যুক্তি-যুক্ত নয়। এখন মনে হয়, এই জন্মে আমার যে সকল লোক বা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তা জন্মাবার পূর্বে চিত্রপরম্পরায় আমি কোনরূপে দেখতে পেয়েছিলাম, এবং জন্মাবার পরে তারই স্মৃতি সময়ে সময়ে আমার মনে উদয় হয়ে থাকে।"

পরবর্তী ঘটনা তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিচায়ক। নরেন্দ্রের পিতা কার্যোপলক্ষে উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেক স্থানেই যাইতেন। নরেন্দ্রের বয়স যখন চতুর্দশ বৎসর (১৮৭৭), অর্থাৎ যখন তিনি মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন, তখন বিশ্বনাথ বাবু মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ছিলেন। কয়েক মাস সেখানে থাকার পর তিনি পরিবারবর্গকে নিজ সকাশে লইয়া আসেন। তখন এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করিত। গোশকট ব্যতীত নাগপুর হইতে রায়পুর পর্যন্ত দীর্ঘপথ ভ্রমণের আর কোন উপায় ছিল না, এবং পথ অতিক্রম করিতে এক পক্ষেরও অধিক সময় লাগিত। তবে রাস্তার শোভা ছিল অতি মনোরম। উভয় পার্শ্বেই সবুজ ঘন বনরাজি, পত্রপুষ্পে সুশোভিত। ইতস্ততঃ বনবিহঙ্গের কাকলি ও ঝিল্লীরব। কোথাও বা বন্যজন্তু একাকী বা দলবদ্ধ হইয়া নিঃশঙ্ক বিচরণ করিতেছে। আর মাঝে মাঝে গগনস্পর্শী পর্বতচূড়া বা কলকল নিনাদে প্রবাহিতা পর্বতনির্ঝরিণী। অরণ্যভূমির শোভা দর্শন করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ শকটারোহণে ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছেন, এমন সময় গোযানসকল এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে পর্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধচিত্ত নরেন্দ্রনাথ পর্বতের দিকে চোখ রাখিয়াই চলিয়াছেন; অকস্মাৎ দেখিলেন, একদিকে পর্বতগাত্রের শিখরদেশ হইতে তলদেশ পর্যন্ত একটি বিস্তৃত বৃহৎ ফাটলের মধ্যে "মক্ষিকাকুলের যুগ-যুগান্তরের পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকারাজ্যের আদি-অনন্তের কথা ভাবিতে

ভাবিতে তাঁহার মন অনন্তের ভাবে এমন তলাইয়া গেল যে, কিছু কালের জন্য বাহ্য সংজ্ঞার একেবারে লোপ হইল।" তিনি কত কাল যে ঐভাবে পড়িয়াছিলেন, বুঝিতে পারেন নাই। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলেন, বহুদূর চলিয়া আসিয়াছেন। গোযানে তিনি একাই ছিলেন; অতএব এ কথা আর কেহ জানিতে পারে নাই। 'লীলাপ্রসঙ্গকার' লিখিয়াছেন, "প্রবল কল্পনাসহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে ইহাই বোধ হয় প্রথম।"

রায়পুরে উপযুক্ত বিদ্যালয় ছিল না; সুতরাং নরেন্দ্রনাথ পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। এই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত ছিল না। পুত্রের বুদ্ধি স্ফুরণের জন্য পিতা বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এমন কি পুত্রের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিতেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে হার মানিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। অধিকন্তু তখন বিশ্বনাথ বাবুর বাসায় অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের সমাগম হইত এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনা চলিত। নরেন্দ্রনাথ নিবিষ্টমনে তাহা শুনিতেন ও সুযোগ বুঝিয়া স্থলবিশেষে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের বিস্তার দর্শনে বয়োবৃদ্ধরাও চমৎকৃত হইতেন; অতএব কেহই তাঁহাকে বালকজ্ঞানে অবহেলা করিতেন না। ঐসব আলোচনার প্রসঙ্গে নরেন্দ্র একদিন বাঙ্গলার খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের গদ্য ও পদ্য রচনা হইতে বহু উদ্ধৃতি দিয়া পিতার জনৈক সুপণ্ডিত বন্ধুকে এমন চমৎকৃত করিয়াছিলেন যে, প্রশংসাচ্ছলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা একদিন না একদিন তোমার নাম আমরা শুনতে পাব।" বলা বাহুল্য যে, উহা শুধু স্নেহসিক্ত অত্যুক্তি ছিল না—উহা ছিল এক অতি সত্য ভবিষ্যদ্বাণী; নরেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া গিয়াছেন।

বালক নরেন্দ্র বালক হইলেও আত্মসম্মান রক্ষা করিতে জানিতেন। শুধু বয়স দেখিয়া কেহ তাঁহাকে অবহেলা করিতে চাহিলে তিনি তাহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বুদ্ধিবৃত্তিতে তিনি বস্তুতঃ যতটা বড় ছিলেন, অযথা নিজেকে তদপেক্ষা উন্নত বা অবনত মনে করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না, কিংবা অপরকে এরূপ ভাবিবার অবকাশ দিবারও প্রয়োজন বোধ করিতেন না। একবার তাঁহার এক পিতৃবন্ধু তাঁহাকে অযথা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে থাকিলে নরেন্দ্র ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য! আমার পিতাও আমাকে এত তুচ্ছ

মনে করেন না, আর ইনি কিনা তাই ভাবেন।” অতএব আহত ফণীর ন্যায় সোজা হইয়া তিনি পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন, “আপনার মতো অনেক আছেন, যাঁরা মনে করেন, ছেলে-মানুষ হলেই বুদ্ধিবিবেচনা থাকে না। এ ধারণা কিন্তু নিতান্ত ভুল।” নরেন্দ্র অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত আর বাক্যালাপ করিতেও প্রস্তুত নহেন দেখিয়া ভদ্রলোক অবশেষে ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কঠোপনিষদে বালক নচিকেতার মধ্যেও এই জাতীয় আত্মশ্রদ্ধা দেখা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, “অনেকের মধ্যে আমি প্রথম শ্রেণীর, বা অনেকের মধ্যে আমি মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হই; অধম আমি কখনই নই।”

রন্ধনবিদ্যার প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তো ছিলই; রায়পুরে সর্বদা স্বপরিবারমধ্যে থাকার সুযোগে এবং ঐ বিষয়ে পিতার সাহায্য ও অনুকরণে তিনি ঐ বিদ্যায় আরও পটুতা অর্জন করেন। রায়পুরে তিনি দাবা-খেলাও শিখিয়াছিলেন এবং ভাল ভাল খেলোয়াড়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিতেন।

দেড় বৎসর রায়পুরে থাকিয়া বিশ্বনাথ সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন নরেন্দ্রনাথের শরীর সুস্থ, সবল ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে; মনের সমধিক উৎকর্ষ হইয়াছে, বেশ আত্মশ্রদ্ধাও জাগিয়াছে, জ্ঞানেও তিনি সমবয়স্কদের তুলনায় অনেক অগ্রগামী হইয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস না করায় শিক্ষকগণ তাঁহাকে প্রথমে ঊর্ধ্বতম (প্রবেশিকা) শ্রেণীতে ভর্তি করিতে চাহিলেন না। পরিশেষে বিশেষ অনুমতির ফলে তিনি বিদ্যালয়ের ঐ শ্রেণীতেই প্রবেশ করিলেন এবং সযত্নে অধ্যয়ন করিয়া অনধীত বিষয়গুলি অল্পসময়ে ঠিক করিয়া লইলেন ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা দিলেন।[৬] যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, তিনি যে শুধু কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহাই নহে, ঐ বৎসর উক্ত বিদ্যালয় হইতে একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

৬। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (*Swami Vivekananda*, ১৫৩ পৃঃ) মতে তিনি রায়পুরে দেড় বৎসর ছিলেন। পূর্বোক্ত পুস্তকে প্রকাশিত এক বেতনের রসিদ হইতে জানা যায়, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি নরেন্দ্রনাথ দশ টাকা ভর্তি-ফি দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের জেনারেল ডিপার্টমেণ্টে ভর্তি হন। (ঐ, ১৫৪ পৃঃ)।

হইয়াছেন। এই সাফল্য অর্জন করিয়া তিনি পিতার নিকট হইতে একটি সুন্দর রূপার ঘড়ি উপহার পাইয়াছিলেন।

প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠকালে যদিও তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত, তথাপি তিনি নিছক পুস্তক-কীটে পরিণত হইতে চাহিতেন না, কিংবা মুখস্থ করা বিদ্যায় বিশ্বাস করিতেন না। অবশ্য এইজন্য তাঁহাকে পরীক্ষাকালে অসুবিধায়ও পড়িতে হইত। আবার তাঁহার আদরের বিষয়গুলি অধিক সময় পাইত, অন্যগুলি তেমন আয়ত্ত হইত না। তিনি সাহিত্য পছন্দ করিতেন, অতএব ইংরেজী ও বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইতিহাসেও তাঁহার সমধিক রুচি ছিল; তাই মনোনিবেশপূর্বক মার্শম্যান, এল্‌ফিনস্টোন্ প্রভৃতির লিখিত ভারতেতিহাস সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু গণিতের দিকে তিনি তেমন দৃষ্টি দিতেন না। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রবেশিকা পরীক্ষার মাত্র দুই-তিন দিন আগে দেখি, জ্যামিতির কিছুই শিখা হয় নাই। তখন সারা রাত জেগে পড়তে লাগলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জ্যামিতির চারখণ্ড বই শিখে ফেললাম।"

সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি বই পড়ার এক নবীন কৌশল আবিষ্কার করেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন, "এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কোন লেখকের বই পঙ্‌ক্তি ধরে না পড়েও আমি বুঝতে পারতাম। প্রতি প্যারাগ্রাফের প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তি পড়েই তাঁর ভাব ধরতে পারতাম। এই শক্তি যখন আরও বাড়ল, তখন প্যারাগ্রাফ পড়ারও প্রয়োজন হত না; প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তি পড়েই বুঝতে পারতাম। আবার যেখানে কোন বিষয় বুঝাবার জন্য লেখক চার পাঁচ বা আরও বেশী পাতা জুড়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন, সেখানে গোড়ার দিকের কয়েকটি কথা পড়েই আমি তা বুঝে নিতাম।"

কলিকাতায় তখন সাধারণ নাট্যশালার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। সেখানে একরাত্রের ঘটনায় তাঁহার সাহসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একস্থানে অভিনয় চলিতেছে, এমন সময় আদালতের এক পেয়াদা রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া এক অভিনেতাকে গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখাইল এবং আইন ও আদালতের দোহাই দিয়া তাহাকে গ্রেফতার করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিল। থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সতেজে গর্জিয়া উঠিলেন, "স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও।

যতক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাক গে। এভাবে লোককে বিরক্ত করার মানে কি?" তখনই সেই দৃপ্ত আদেশ-বাণীর সমর্থনে বহুকণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইল, "বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও; শীগ্‌গীর বেরোও।" বেগতিক দেখিয়া পেয়াদা সরিয়া দাঁড়াইল, আব যাঁহারা নরেন্দ্রকে চিনিতেন, তাঁহারা তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "বাহবা ভায়া, বাহবা! তুমি না থাকলে আজ সব পণ্ড হ'ত।"

আবাব, গল্প বলায় তিনি ছিলেন সুনিপুণ শিল্পী। বাড়ীতে ছোট ছোট ভাই-বোনবা বিছানায় শুইয়া আবদার করিত, "দাদা, গল্প বল না"। আর তিনিও অমনি চিত্তাকর্ষক সব কাহিনী বলিয়া যাইতেন। 'আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু', 'বেউম-বেউমী' (বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী), ইত্যাদি রোমাঞ্চকর বা শিক্ষাপ্রদ গল্পের অবতারণা করিয়া শ্রোতাদের মনে আনন্দেব ও কল্পনার তুফান উঠানো তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ ছিল। সহপাঠীরাও অনেক সময় এই রসভোগে তৃপ্ত হইত।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই নরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা-শক্তি স্ফুরিত হইতেছিল। একবার মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে পারিতোষিক বিতরণের জন্য যে সভা হয়, তাহারই সঙ্গে একজন প্রিয় শিক্ষককে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়-অভিনন্দন দিবারও আয়োজন হয়। ছাত্ররা তখন ধরিয়া বসিল, ছাত্রদের পক্ষ হইতে নরেন্দ্রকে বিদায়-অভিভাষণ দিতে হইবে, তাহাও আবার ইংরেজীতে। নরেন্দ্র তখন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য সাদরে পাঠ করিতেন এবং বন্ধুমহলে এইজন্য তাঁহার সুনামও ছিল। কিন্তু সে এক কথা, আর প্রকাশ্যে ভাষণ দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক কথা। বিশেষতঃ সে সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। যাহা হউক, নির্ভীক নরেন্দ্র সম্মত হইলেন ও যথাকালে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অর্ধঘণ্টা যাবৎ উক্ত শিক্ষকের স্থানান্তর গমনের ফলে ছাত্ররা কত দুঃখিত হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে বিশুদ্ধ ও সুললিত ইংরেজী ভাষায় সুচিন্তিত বক্তৃতা দিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার প্রশংসা করিলেন। বহুদিন পরে স্বামীজীর বক্তৃতাশক্তি বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে যত বাগ্মী দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম ছিলেন।" ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই; কারণ ভগবান তখন হইতেই যেন তাঁহাকে স্বহস্তে গড়িয়া তুলিতেছিলেন এবং বিবিধ সুযোগ-সুবিধায়

মধ্য দিয়া তাঁহার শক্তি-প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বিদ্যালয়ের আলোচনা-সভাদিতে তিনি সোৎসাহে যোগ দিতেন, অন্যান্য ক্ষেত্রেও গল্প-বলা, সহপাঠী-দিগকে বিভিন্ন বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া, বিচার-বিতর্কে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ইত্যাদির সাহায্যে তাঁহার ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। আবার বিধিদত্ত সুন্দর আকৃতি, মেঘমন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর আওয়াজ, সঙ্গীতসদৃশ সুমিষ্ট স্পষ্ট আবৃত্তি, সুচারু বাক্যবিন্যাস প্রভৃতিও শ্রোতাদের হৃদয় কম আকৃষ্ট করিত না।

কথিত আছে, তিনি পিতার নিকটই প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন; বিশেষতঃ সঙ্গীতামোদী বিশ্বনাথ যখন রায়পুরে ছিলেন, তখন নরেন্দ্রকে নিকটে পাইয়া অনেক প্রকার গান শিখাইয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতে "পিতার নিকট তিনি বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত-শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গীতবাদ্যেও তাঁহার অধিকার ঐকালে কম ছিল না" ('বিবেকানন্দ চরিত,' ৩৫ পৃঃ)। কার্যব্যপদেশে যখন বিশ্বনাথ পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, তখন ঠুংরী, টপ্পা, গজল ইত্যাদি শিখিয়াছিলেন এবং অবসর পাইয়া পুত্রকেও ঐ সকলে উৎসাহী ও পারদর্শী করিয়াছিলেন। পরে উস্তাদ রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতবিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করেন।[৭] সে আলোচনা আমরা পরে করিব।

৭। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠসঙ্গীত-শিক্ষক বেণী উস্তাদের নাম বিষয়ে মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইঁহার প্রকৃত নাম বেণীমাধব অধিকারী। ইনি রামায়েৎ বৈষ্ণব ছিলেন। অপর শিক্ষক ছিলেন আহম্মদ খাঁ। এই মতে বাদ্যসঙ্গীত-শিক্ষকের নাম অজ্ঞাত; কাশী ঘোষালকে পাখোয়াজের শিক্ষক বলা হইলেও ঐ কথা যুক্তিসহ নহে ('সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু', ২১-২৩ পৃষ্ঠা); আর নরেন্দ্রনাথের পদ্ধতিমত শিক্ষার কাল মাত্র তিন-চারি বৎসর—১৮৭৯ হইতে ১৮৮৩। অন্য মতে নরেন্দ্রনাথ আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

সর্বতোমুখী প্রতিভা

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'সাধারণ বিভাগে' প্রবেশলাভের পর নরেন্দ্রনাথ সেখানে নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। সেখানে যেসব ছেলে পড়িত তাহারা প্রায় সকলেই নূতন, পুরাতন সাথীদের প্রায় কেহই নাই। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনও তখন এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন। বাল্যের সদাহাস্যময় ক্রীড়াচঞ্চলতা ছাড়িয়া এখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন; এখন ক্রিয়াচাঞ্চল্য অপেক্ষা চিন্তাপূর্ণ গাম্ভীর্যের প্রয়োজন অধিক। সমস্যাবিহীন একটানা অনাবিল আনন্দের স্থলে এখন সমস্যাপূর্ণ জীবনের উত্থান-পতন ও সঙ্ঘর্ষ। এ এক নবীন আবহাওয়া, অজ্ঞাতপূর্ব ভাবধারা, অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। মহাবিদ্যালয়ে আসার পর তিনি পাঠেও অধিক মনোনিবেশ করিলেন; বিশেষতঃ সাহিত্যে এবং ইংরেজী ভাষায় রচনা, কথোপকথন, বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অধিকতর আগ্রহান্বিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তর্কশাস্ত্র এবং দর্শনের আলোচনাও চলিতে লাগিল। মহাবিদ্যালয়টি সরকারের অধীনে ছিল এবং অধ্যাপকগণের অধিকাংশ ছিলেন বিদেশী। অতএব নিয়ম ছিল যে, ছাত্রদিগকে ইউরোপীয় বেশভূষা পরিয়া অথবা ভারতীয় চাপকান ও পাজামা পরিয়া পড়িতে আসিতে হইবে। নরেন্দ্র চাপকান ও পাজামা পরিয়া এবং হাতে হাত-ঘড়ি বাঁধিয়া মহাবিদ্যালয়ে যাইতেন।

এই রীতিতে পাঠ চলিতে থাকিলে প্রথম বর্ষের শেষে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া যথানিয়মে কলেজে আসিতে পারিতেন না; কাজেই নিয়মানুযায়ী বৎসরে যতদিন উপস্থিত থাকা আবশ্যক, তাহা সম্ভব হইল না এবং যথাকালে [illegible] পরীক্ষার অনুমতিপ্রাপ্তি বিষয়ে গোল বাধার সম্ভাবনা দেখা দিল।[১] তাই তিনি বাড়ীর নিকটবর্তী জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিস চার্চ কলেজে) ভর্তি হইলেন। এখানে প্রথম বার্ষিক এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হইলেন এবং এক বৎসর পরে

১। পরীক্ষা-বিষয়ে যখন অনিশ্চয়তা চলিতেছিল, তখন নরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রস্তাব করেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রকে দূরে পাঠাইতে পিতা সম্মত হইলেন না। (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৫৩ পৃঃ)।

পরীক্ষাদান বিষয়েও কোন আপত্তি উঠিল না। এই শিক্ষায়তনে তখন ভাবী প্রথিতযশা দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও অধ্যয়ন করিতেন। ইনি উপরের শ্রেণীর ছাত্র হইলেও ছাত্রদের কোন এক দার্শনিক সভায় উভয়ের মিলন ঘটিত এবং অপরাপর সুযোগে উভয়ে দার্শনিক আলোচনা করিতেন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই নরেন্দ্রনাথ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষা পাস করেন। ইহার পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এখান হইতেই বি. এ. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের) আইন বিভাগে বি. এল. পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই, কারণ ইতিমধ্যে তাঁহার ধর্মজীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায়।

মনে রাখিতে হইবে, আমরা লৌকিক দৃষ্টি অবলম্বনে মানবীয় ভাষায় লোকোত্তর পুরুষের জীবনী লিখিতে বসিয়াছি এবং ঐ ভূমি হইতেই পরিবর্তনাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া যাইতেছি। তাহা না হইলে পরিবর্তনাদি শব্দ পরিত্যাগ করিয়া বিকাশ প্রভৃতি শব্দেরই আশ্রয় লওয়া উচিত। যে মহাপুরুষ জগতে বিরাট ধর্মান্দোলন আনয়নের জন্য জন্ম হইতেই চিহ্নিত হইয়া আছেন, বস্তুতঃ যিনি এই উদ্দেশ্যেই যুগাবতারের সহিত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার জীবনের গতি আমাদের সসীম দৃষ্টিতে যেরূপই প্রতিভাত হউক না কেন, ভগবানের ইঙ্গিতে উহা একটি সুপরিকল্পিত পথেই পরিচালিত হইতেছিল। তথাপি মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি স্বীকারের ফলে মানবমঙ্গলেরই জন্য ঐ চরিত্রে মানবীয় ভাবরাশির অতিক্ষীণ ছায়াপাত যে একেবারেই হইত না, এমন কথা কে বলিতে পারে? কিন্তু আমরা এই জীবনীতে পুনঃপুনঃ এই প্রকার সন্দেহ ও সন্দেহনিরসনের বৃথা চেষ্টা না করিয়া ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ইহলৌকিক ঘটনাবলম্বনেই সত্যের পরিচয় গ্রহণে অগ্রসর হইব, যদিও পূর্বসূরিগণের অতিলৌকিক বাণীও আমাদিগকে পথের সন্ধান দিবে।

নরেন্দ্রজীবনের গতি তখন কোন দিকে ছিল? যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তিনি স্বীয় যাত্রাপথের সুনিশ্চিত নির্দেশ পান নাই বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মনে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, যদিও ত্যাগের প্রতিই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তিনি একসময়ে পূজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কারকে বলিয়াছিলেন, "যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্যন্ত প্রতিরাত্রে শয়ন করিলেই দুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধন-জন-সম্পদ-

ঐশ্বর্যাদি লাভ হইয়াছে, সংসারে যাহাদের বড়লোক বলে তাহাদিগের শীর্ষস্থানে যেন আরূঢ় হইয়া রহিয়াছি, মনে হইত ঐরূপ হইবার শক্তি আমাতে সত্য সত্যই রহিয়াছে। আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভরপূর্বক কৌপীনধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন, এবং বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া কাল কাটাইতেছি। মনে হইত, ইচ্ছা করিলে আমি ঐভাবে ঋষিমুনিদের ন্যায় জীবনযাপনে সমর্থ। ঐরূপে দুই প্রকারে জীবন নিয়মিত করিবার ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। ভাবিতাম ঐরূপেই মানব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, আমি ঐরূপই করিব। তখন ঐপ্রকার জীবনের সুখ ভাবিতে ভাবিতে ঈশ্বরচিন্তায় মন নিমগ্ন হইত এবং ঘুমাইয়া পড়িতাম। আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যহ অনেক দিন পর্যন্ত ঐরূপ হইয়াছিল।" কথা কয়টি নরেন্দ্রনাথের জীবন অনুধ্যানের পক্ষে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সে যাহা হউক, আমরা আপাততঃ তাঁহার ভাবী জীবনের প্রস্তুতির কথাই বলিতেছি। সে প্রস্তুতি চলিতেছিল সামূহিকভাবে দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, হার্দিক, আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে। আমরা আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির কথা হইতেই আরম্ভ করি—যদিও নরেন্দ্রজীবনের বিভিন্ন দিক এরূপ পরস্পর-সংবদ্ধ ছিল যে, কোন বিশেষ দিককে অন্যগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেখা চলে না; একটির কথা বলিতে গেলে অপরটিও স্বতই আসিয়া পড়ে। অধিকন্তু পরেও আমরা দেখিতে পাইব, চরিত্রের এই সামগ্রিক দৃষ্টিই বিবেকানন্দ-দর্শনের অন্যতম প্রধান অবদান; ধর্মকে তিনি কখনও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, ভগবানকে বাদ দিয়া কখনও মানবজীবনের কথা ভাবিতে পারেন নাই।

যৌবনারম্ভে যখন ধর্মভাবের তীব্র অনুপ্রেরণা আসিল, তখন তিনি নিরামিষ ভোজন করিতেন এবং ভূমিতে, মাদুরে বা কম্বলশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতেন। নরেন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছুকাল পর হইতেই যৌথ-পরিবারে বিবাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং খুল্লতাতের পরিবারের উৎপীড়নে বিশ্বনাথ সপরিবারে ৭ নং ভৈরব বিশ্বাস লেনের এক ভাড়া-বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ উহার বহির্ভাগের দ্বিতলের একখানি গৃহে থাকিয়া পাঠাদি করিতেন। সেখানে অসুবিধা হইলে তিনি ঐ বাড়ীরই নিকটে মাতামহীর বাড়ীর একখানি ঘরে আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে থাকিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতেন। তাঁহার সদাশিব পিতা ও আত্মীয়বর্গ মনে করিতেন, বহু

ভ্রাতাভগিনীর কলনাদে মুখরিত নিজ বাটীতে অধ্যয়নের অসুবিধা হয় বলিয়াই নরেন্দ্র ঐরূপ করেন।[২]

এই সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজেও গমনাগমন আরম্ভ করেন। তখন তিনি নিরাকার সগুণ ব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ঐরূপ ধ্যানে অনেক কাল কাটাইতেন। তিনি মনে করিতেন, ঈশ্বর যখন সত্য, তখন তিনি শুধু তর্কযুক্তির অনিশ্চিত ভূমিতে আবদ্ধ না থাকিয়া সাধকহৃদয়ে অবশ্যই প্রত্যক্ষানুভূতি অবলম্বনে আবির্ভূত হইবেন, মানবের অন্তঃকরণের ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত করিবেন, এবং এই প্রকার ঈশ্বরানুভূতি ব্যতীত জীবন বিড়ম্বনামাত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যগুণে তাঁহার এই ধ্যান-প্রবণতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই মহর্ষির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। এই সাধারণ পরিচয়সূত্রে নরেন্দ্রনাথ একদিন বয়স্যদিগের সহিত মহর্ষির নিকট সমুপস্থিত হইলে তিনি যুবকদিগকে সাদরে নিকটে বসাইয়া বহু সদুপদেশ দিলেন এবং ধ্যানাভ্যাস করিতে বলিলেন। নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "তোমাতে যোগীর লক্ষণসকল প্রকাশিত আছে ; তুমি ধ্যানাভ্যাস করলে যোগশাস্ত্রনির্দিষ্ট ফলসকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করবে।" সেই অবধি নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

এখানে ব্রাহ্মসমাজের সহিত নরেন্দ্রের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। আমরা এই বিষয়ে 'যুগান্তর'-পত্রিকায় প্রকাশিত (১১ই আগস্ট, ১৯৬৩) শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্রের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত করিলাম—"নরেন্দ্রনাথ যখন প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয় তাঁর বেণী উস্তাদের কাছে। ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত শুরু করেন তিনি ১৮৭৯ সাল থেকেই। ওদিকে জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তখনকার দিনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন চলেছে পূর্ণোদ্যমে। এই পরিবারের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ভাবুক যদু ভট্টের যোগাযোগ। মহর্ষির পুত্রগণ—বিশেষভাবে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ও রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদাঙ্গের গান রচনার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতভাণ্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ।" ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই শ্রাবণ যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

২। নরেন্দ্র ও তাঁহার সহোদরগণ মাতামহীর বাড়ী উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন।

মন্দিরে অমকালভাবে রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাদেবীর সহিত ভাবী 'সঞ্জীবনী'-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তিনখানি ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে শিখাইয়া দেন এবং যথাসময়ে ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, কেদার নাথ মিত্র, অন্ধ চুনীলাল ও নরেন্দ্রনাথ গাহেন রবীন্দ্র-রচিত 'দুই হৃদয়ের নদী' (সাহানা, ঝাঁপতাল), 'জগতের পুরোহিত তুমি' (খাম্বাজ, একতালা), 'শুভদিনে এসেছ দোঁহে' (বেহাগ, তেতালা) এই তিনখানি গান ও অন্যান্য সঙ্গীত ।[৩]

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে (১৫৫ পৃঃ) নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষা হয় বেণী উস্তাদের কাছে, এবং বাঁয়া-তবলা শিক্ষা হয় কাশী ঘোষালের কাছে। কাশী ঘোষাল নাকি আদি ব্রাহ্মসমাজে পাখোয়াজ বাজাইতেন। নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধসহ একখানি সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন বড়তলার চণ্ডীচরণ বসাক। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, উক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচিত 'দুই হৃদয়ের নদী' সহ দশটি গান এবং আরও বহু ব্রাহ্মসঙ্গীত স্থান পাইয়াছে।

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন বিবেকানন্দের সহপাঠী। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেনও ছিলেন বিবেকানন্দের সতীর্থ। ঠাকুরবাড়ীতে বিবেকানন্দের মেলামেশার প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বিবেকানন্দ দীপুদাদার (দীপেন্দ্র ঠাকুরের) ক্লাশ ফ্রেণ্ড (সহপাঠী) ছিলেন। তখন দুজনেই পড়তেন কলেজে। আমাদের বাড়ীতে বিবেকানন্দ এলে দীপুদাদা "কে হে নরেন ?" বলে ছুটে এসে দেখা করতেন। এতই ছিল হৃদ্যতা ও ভালবাসা।'··· বিবেকানন্দের পঠদ্দশায় ব্রাহ্মসমাজের গান তাঁকে সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করে রাখত! দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'অনুপমমহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান', রবীন্দ্রনাথের 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ', বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'অচল ঘন গহন গুণ গাও হে তাঁহারি', রবীন্দ্রনাথের '(তাঁরে) আরতি করে চন্দ্রতপন,

৩। এই তথ্যটি রাজনারায়ণ বাবুর কন্যা লীলাদেবীর দিনলিপি হইতে প্রাপ্ত এবং কালীদাস নাগ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত ('উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৬৮)। রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগাযোগ আরম্ভ হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির পরে—যখন রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন।

দেবমানব বন্দে চরণ', প্রভৃতি গান তিনি প্রায়ই গাইতেন।" ('বিশ্ববিবেক'-এ 'সঙ্গীত সাধক স্বামী বিবেকানন্দ'—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ২৩৯ পৃঃ)।

শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর রায় লিখিয়াছেন যে, নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাত তারকনাথ দত্ত এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। ('স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী', ১৭২ পৃঃ)।

মোট কথা, এইসব বিভিন্ন উল্লেখ হইতে প্রমাণ হয় যে, ব্রাহ্মসমাজের অনেকের সহিত, বিশেষতঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সহিত নরেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। ধর্মক্ষেত্রে তিনি মহর্ষির নিকট শিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটিলেও আদিসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতার কোন প্রমাণ নাই। কেশবচন্দ্রের সহিতও তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "কেশব বাবু ব্যাণ্ড্ অব হোপ্ নামে একটি দল গঠন করিলেন।...নরেন্দ্রনাথ সেই ব্যাণ্ড্ অব্ হোপ্ বা আশার দলে নাম লিখাইয়াছিল।" ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান', ২য় সংখ্যা, ১৭ পৃঃ)। ইহা কোন কালের ঘটনা জানা নাই ; কিন্তু ইহা হইতে কেশবের নববিধান সমাজে যোগদান প্রমাণিত হয় না ; কিংবা কেহ কেহ যেমন মনে করেন যে, কেশবের প্রভাবেই নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মগণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার্য হয় না। বরং ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে আত্মীয়, সঙ্গী ও সহপাঠীদের আকর্ষণ তাঁহাকেও ব্রাহ্মদের ও ঠাকুরবাড়ীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। নলিনীকুমার ভদ্র মহোদয়ের মতে নরেন্দ্র ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই আদিসমাজে যাতায়াত করিতে থাকেন। সমাজের সহিত ঐ সময় কোনও প্রকার যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া থাকিলেও নরেন্দ্র তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য এতই ব্যস্ত যে, সে যাতায়াত তেমন ঘন ঘন ছিল না নিশ্চয়। অবনীন্দ্র ঠাকুর কিন্তু কলেজে পাঠকালে যাতায়াতের কথাই লিখিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ শা[illegible] বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। [illegible]এব রায়পুর হইতে ফিরিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষাসমাপনান্তে প্রারব্ধযৌবন নরেন্দ্রনাথের মনে যখন ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবলভাবে উত্থিত হইয়াছে, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের অপর শাখাদ্বয় অপেক্ষা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি সেখানে নিয়মিতভাবে যাইতেন, প্রার্থনাকালে সঙ্গীতের দলে যোগদান করিতেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে রেজেষ্ট্রীতে নাম লিখাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের

সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কোন প্রমাণ নাই, বরং পরবর্তী কালে তিনি এক পত্রে (২৪শে মে, ১৮৯৪) লিখিয়াছিলেন, 'চন্দ্রসেন' ও মজুমদার সরলপথে চলেন নাই ; ইঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটে নাই ; তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরক্ত ছিলেন—যদিও ইঁহারও সহিত সম্পূর্ণ মতের মিল ছিল না। 'চন্দ্রসেনের' প্রতি এই কটাক্ষের জন্য সম্ভবতঃ কোচ-বিহার-বিবাহ দায়ী ছিল। অবশ্য নরেন্দ্রনাথ এক সময়ে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল) কেশবের সমাজে যখন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রণীত 'নববৃন্দাবন' নাটক অভিনীত হয়, তখন আমন্ত্রণ পাইয়া অভেদানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন , তবু ইহাতেও নববিধানের সহিত ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয় না। কারণ গায়কের অভাব মিটাইবার জন্য সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ নববিধানের অনুরোধে ঐ যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৪] এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া অথচ কেশবও যে এই অভিনয়ে প্রধান ভূমিকায় পওহারী-বাবা রূপে নামিয়াছিলেন, তাহা চাপিয়া গিয়া পরবর্তী কালে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লেখনীমুখে এইরূপ ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়, যেন আমোদপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ হালকা মনে থিয়েটার করিয়াই বেড়াইতেন। আবার এই ইঙ্গিত করিতে যাইয়া মজুমদার মহাশয় ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ঐ একটিমাত্র অভিনয়ের কাল ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মিলন ঘটে নাই—যদিও ইহাও মিথ্যা, কেন না শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে তিনি তাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজে সুকণ্ঠ নরেন্দ্রনাথ সুপরিচিত ছিলেন বলিয়াই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহাকে নববিধানে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। যাহা হউক, এইসব অবান্তর বিষয়ের আলোচনার স্থান ইহা নহে ; আমরা নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত পরিচিত হইতেই অগ্রসর হইয়াছি, ঈর্ষাপরায়ণ নিন্দুকের স্বরূপ নিরাবরণ করিতে নহে।

নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন একটা আদর্শের টানে।

৪। নববৃন্দাবন নাটক অভিনয় সম্বন্ধে 'কথামৃত' ৪।৩।১ দ্রষ্টব্য।

"ঠাকুর সেই নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। স্বামীজী যখন সাধু সেজে স্টেজে এল, ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজীকে ঐ বেশেই নেমে আসার জন্য বলিতে লাগিলেন। স্বামীজী ইতস্ততঃ করছে দেখে কেশববাবু বললেন, 'উনি যখন বলছেন নেমে এস না ?' তারপর কাছে এলে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে স্বামীজীর হাত ধরে বললেন 'এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে।'" ('সৎকথা', ২য় ভাগ, ৫-৫ পৃঃ)।

প্রাচীন হিন্দুসমাজ যখন আচার-বিচারের বদ্ধ পচা জলে হাবু-ডুবু খাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ তখন দাঁড়াইল ভগবানলাভের একটা যুক্তিসম্মত কার্যকর পথ নির্দেশ করিতে।) আচারের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল নৈতিকতা, নিয়মিত স্বাধ্যায়, ভজন, প্রার্থনা ইত্যাদির প্রতি। পুরোহিতের মধ্যস্থতার পরিবর্তে মানুষকে উৎসাহিত করা হইল সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে ডাকিতে; আবার ব্যক্তিগত চেষ্টার পরিপুর্তিকল্পে ভদ্রসমাজের উপযুক্ত সমবেত প্রার্থনা, ভজন ও উৎসবাদিরও ব্যবস্থা হইল। শাস্ত্রের দোহাই না দিয়া যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হইল; গুরুবাদ, অবতারবাদ ইত্যাদি এ ধর্মে স্থান পাইল না। সামাজিক যেসব কুরীতির ফলে ভারতীয় সমাজ বহির্জগতে পশ্চাৎপদ, উপহাসাস্পদ বা অবহেলিত হইতেছিল, ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষতঃ সাধারণ সমাজ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। বাল্য-বিবাহ নিরোধ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, জাতি-বিভাগের উচ্ছেদ, ইত্যাদি সমাজসংস্কারের ব্যাপারে একদল লোক বেশ মাতিয়া উঠিলেন। আদর্শবাদী যুবকচিত্ত এই প্রকার সক্রিয় চেষ্টায় ও প্রগতিবাদে স্বতই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও নরেন্দ্রের মনে একটা অভাববোধ থাকিয়াই গেল। তিনি চাহিতেন আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ঈশ্বরলাভ; শুধু সমাজসংস্কার, নৈতিক উৎকর্ষ বা বৌদ্ধিক সামঞ্জস্য তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, এমন কি সমবেত প্রার্থনা, সঙ্গীত প্রভৃতিও তাঁহার প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে পারে নাই। নরেন্দ্রনাথের এই কালের আকৃতির পরিচয় পাই আমরা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের লেখনীমুখে। আমরা তাঁহার লেখার যে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতেছি, তাহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে যেমন, যৌবনেও তেমনি বিধিনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র পথেই অগ্রসর হইতেছিলেন; পারিপার্শ্বিক প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত না থাকিলেও তাঁহার গতিপথ উহা দ্বারা কখনও রুদ্ধ বা পরিবর্তিত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো একজন যুক্তিবাদী ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিও তাঁহার বৌদ্ধিক বা হার্দিক স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করিতে পারেন নাই। সত্য বটে শীল মহাশয় স্বীয় আংশিক সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয় শীল মহাশয়ের সে সাফল্য নরেন্দ্রের দৃষ্টিতে তেমন দূরপ্রসারী হইলে তিনি পরবর্তী জীবনে কখন না কখনও তাহা স্বীকার করিতেন—স্বামীজীর স্বভাবই ছিল এইরূপ যে সামান্য উপকারকে তিনি বড় করিয়া দেখিতেন এবং বাড়াইয়া বলিতেন। অথচ সত্যবাদী ও

সদাকৃতজ্ঞ স্বামীজীর 'বাণী ও রচনাতে' শীল মহাশয়ের উল্লেখমাত্র নাই। শীল মহাশয়ের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান সতীর্থদের আলাপ-আলোচনার উর্ধ্বে উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। শীল মহাশয় দর্শনগ্রন্থ ও শেলীর কাব্যের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়ার কথাও বলিয়াছেন। ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও শীল মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সব গ্রন্থ পাঠ করিয়াও স্বামীজী তাঁহার মৌলিক সমস্যার সমাধান পান নাই। যাহা হউক ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্য এই—

"১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল, তখন আমরা দুজনেই জেনারেল এসেম্‌লিজ কলেজের পণ্ডিত, দার্শনিক ও কবি উইলিয়ম হেষ্টির ছাত্র। বিবেকানন্দ আমার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় হলেও আমি তাঁর এক ক্লাশ উপরে পড়তাম। বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান্ যুবক, মুক্তস্বভাব, বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ এবং মধুকণ্ঠ গায়ক, অসাধারণ বাক্-নিপুণ, যদিও কথাগুলি অনেক সময়ই ব্যঙ্গপূর্ণ ও তিক্ত; পৃথিবীর ভণ্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীক্ষ্ণস্বর সহাস্য বাক্যে অবিরত বিদ্ধ করেন, মনে হয় অবজ্ঞার উচ্চাসনে আসীন তিনি, কিন্তু সেটা ছদ্মবেশ, তার দ্বারা আবৃত করে রাখেন কোমলতম হৃদয়কে—সব জড়িয়ে একজন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ বোহেমিয়ান (স্বাধীনচেতা ফুর্তিবাজ), অথচ বোহেমিয়ানরা যাতে বঞ্চিত সেই লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞায় সমৃদ্ধ ; ভঙ্গীতে অটল ও অভ্রান্ত, অধিকারের দাঢ্য নিয়ে কথা বলেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আছে চোখে এক অদ্ভুত শক্তি যা সম্মোহিত করে রাখে শ্রোতাদের।)

"এ সমস্তই সকলের প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যকই জানত তাঁর ভিতরের মানুষটিকে, তাঁর সংগ্রামকে—অস্থির ও বেপরোয়া অন্বেষার মধ্যে যে সত্তার ঝড়ঝঞ্ঝা অন্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত।

"তাঁর মানস-ইতিহাসের এক সঙ্কট মুহূর্তের সূচনাকাল এই সময়েই ; এই কালেই তিনি আত্মচেতনার জগতে জাগরিত হলেন, যার দ্বারা তাঁর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত হল। ব্রাহ্মসমাজের বহির্বর্তী অংশ থেকে তিনি যে বালসুলভ আস্তিকতা এবং সহজ আশাবাদ অর্জন করেছিলেন, জন স্টুয়ার্ট মিলের 'থ্রি এসেজ অন রিলিজিয়ন' তাতে বিপর্যয় এনে দিল। সৃষ্টির হেতুবাদী এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে খড়কুটোর মতো নির্ভরের অযোগ্য হয়ে উঠল,

এবং তিনি প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলময় স্বভাবের সঙ্গে সৃষ্টির এই অমঙ্গলকে তিনি কিছুতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবতে পারলেন না। এক বন্ধু তাঁকে এই কালে হিউমের সংশয়বাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়বাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর অবিশ্বাস ক্রমে স্থায়ী দার্শনিক সংশয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

"বিবেকানন্দের প্রাথমিক সতেজ আবেগ এবং সহজ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল। এক ধরনের বিশুষ্কতা ও অবসাদ এল, প্রার্থনাময় ভক্তির পুরাতন সামর্থ্য আর রইল না। স্বভাবসিদ্ধ উপহাস ও ঔদাসীন্যের দ্বারা একে আবৃত করে রাখলেও ব্যাপারটা তাঁর আত্মাকে অস্থির করে তুলল যন্ত্রণায়, কিন্তু তখনও রইল তাঁর সঙ্গীত, যা আলোড়িত করত তাঁর গভীরতাকে, যা তাঁকে অলৌকিক, অপার্থিব ও অপ্রত্যক্ষ সত্যের চেতনায় উন্নীত করত, যা অশ্রু আনত তাঁর নয়নে।

"এই সময়েই তিনি আমার কাছে এলেন; যে বন্ধু তাঁকে হিউম ও হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বন্ধুই আমাদের আলাপ ঘটিয়ে দিলেন। আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে মুখচেনা পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন তিনি নিজেকে উন্মোচন করলেন আমার কাছে—বলে গেলেন সংশয়ের, যন্ত্রণার কথা, নিত্যবস্তু সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হতে না পারায় নৈরাশ্যের কথা। বর্তমান মানসিক অবস্থার উপযোগী হতে পারে এমন আস্তিক্য দর্শনের গ্রন্থাদির কথা তিনি জানতে চাইলেন। কয়েকজন প্রামাণ্য লেখকের নাম আমি করলাম; কিন্তু ইন্‌টুইসানিস্ট্ (প্রজ্ঞাবাদী)-দের ও স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশীয় কমন্‌সেন্স্ (সাধারণ বুদ্ধি)-বাদীদের ধরাবাঁধা যুক্তি তাঁর অবিশ্বাসকেই প্রবল করে তুলল। তাছাড়া একঘেয়ে সব কিছু পড়ে যাওয়ার মতো ধৈর্য তাঁর আছে বলে মনে হল না—তাঁর স্বভাবধর্ম গ্রন্থ থেকে আহরণ করার চেয়ে অন্তর্জীবনের সহযোগ থেকে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহের পক্ষপাতী। প্রাণ থেকে প্রাণ, চিন্তা থেকে চিন্তার প্রজ্বলনই তাঁর প্রকৃতিসিদ্ধ।

"আমি বিবেকানন্দের দিকে সুগভীরভাবে আকৃষ্ট হলাম; কারণ বুঝলাম, তিনি নিষ্পত্তি করতে চান ঐকান্তিকভাবে।

"আমি তাঁকে শেলীর রচনা দিলাম। শেলীর প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্যতত্ত্বের বন্দনা, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বপ্রেমের তত্ত্ব, এবং গৌরবদীপ্ত চিরশ্রেয়ঃ মানবসমাজের ভাবদর্শন

তাঁকে নাড়া দিল—দার্শনিকদের যুক্তিতত্ত্ব যা করতে সমর্থ হয়নি। ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে আর প্রাণহীন, প্রেমহীন যন্ত্রবিশেষ রইল না; তিনি অনুভব করলেন, তার মধ্যে জাগ্রত আছে আধ্যাত্মিক ঐক্য।

"তারপর আমি তাঁকে শেলীর ধারণার অপেক্ষা উচ্চতর ঐক্যতত্ত্বের কথা বললাম—সার্বিক হেতুরূপী (ইউনিভার্সেল রিজ্‌ন) পরব্রহ্মের, অদ্বয়তত্ত্বের কথা। আমার দার্শনিক প্রত্যয় তখন একের মধ্যে তিনটি তত্ত্বকে সমন্বিত করতে চাইছে—বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, হেগেলের ডায়েলেক্‌টিক্স্‌ অব্‌ দি এ্যাব্‌সলিউট্‌ আয়ডিয়া, এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, ও স্বাধীনতার বাণীকে। আমার কাছে তখন বস্তু-পার্থক্যের নীতি ছিল অমঙ্গলের নীতির নামান্তর। সবকিছু ঐ সার্বিক-হেতুর প্রকৃতি, জীবন ও ইতিহাস এই পরচেতনার গতিশীল ক্রমবিকাশ। সকল নৈতিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক মত ও পথের যাচাই করতে হবে বিশুদ্ধ হেতুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অনুভূতি ব্যাপারটা আমার কাছে তখন শারীরিক ছাড়া আর কিছু নয়—তা শালীনতা ও শৃঙ্খলার বিপর্যয়বিশেষ। কিভাবে বস্তুর, ব্যক্তিত্বের এবং যুক্তিহীনতার প্রতিরোধ অতিক্রম করে শুদ্ধ হেতুর অভিজ্ঞতা ঘটানো যায়, তাই হলো জীবন, সমাজ, শিক্ষা ও নিয়মের বৃহৎ সমস্যা। তরুণ, অভিজ্ঞতাহীন স্বাপ্নিকের ভাবাবেগ নিয়ে আমি কল্পনানেত্রে দেখতাম, যুক্তিহীনতার বন্ধন থেকে জাতির মুক্তি আসছে এক নূতন বৈপ্লবিক সমাজের মধ্য দিয়ে—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা যাদের মূলমন্ত্র।

"সার্বিক হেতুর একচ্ছত্র অধিকার এবং নীতিবিধি হিসাবে ব্যক্তির অস্বীকৃতিরূপ ভাবরাশি শীঘ্রই বিবেকানন্দের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করল এবং তা তাঁকে সংশয়বাদ ও জড়বাদের উপর জয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিল। তারো বেশী, তা তাঁকে জীবনের মত-পথের দিগ্‌-দর্শন করিয়ে দিল। সবই হল, কিন্তু শান্তি মিলল না। সত্তার আরও গভীরে প্রবেশ করল সংঘাত, কারণ সার্বিক হেতুর ধারণা তাঁকে তাঁর শিল্পী ও বাউল স্বভাবের স্পর্শকাতরতা এবং অভীপ্সাকে দমিত করতে আহ্বান করল। তীক্ষ্ণ ও তীব্র তাঁর অনুভূতি, আবেগ-বাসনায় তিনি দুর্বার, যৌবনের স্পর্শ-চেতনায় তিনি কোমল, বন্ধুসঙ্গে তিনি সদানন্দ মুক্তপ্রাণ। এসকলকে দমন করার অর্থ নিজের স্বাভাবিক বিকাশকে রোধ করা, কার্যতঃ আত্মহত্যা করা। তাঁর সংগ্রাম শীঘ্রই নৈতিকরূপ ধারণ করল—বাসনা ও

ইন্দ্রিয়ের উপর হেতুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, যৌবনের আকাঙ্ক্ষাকে মনে হল তাঁর অপবিত্র, স্থূল ও দৈহিক। তাঁর জীবনের ঘনতম সংঘাতের এই কাল। সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য যেসব বন্ধু জুটেছিল, তাদের অনেকের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল তিক্ততম প্রকাশ্য ঘৃণা; কিন্তু মজা-মজলিশের প্রতি তাঁর আগ্রহও অপরিসীম। তাই যখন আমি কোনো কোনো সন্ধ্যায় সঙ্গীতের আসরে তাঁর সঙ্গী হতাম, তিনি আশ্বস্ত হতেন।

"তাঁর মধ্যে সমুচ্চ, ঐকান্তিক এবং পবিত্র স্বভাবকে আমি লক্ষ্য করলাম; সে স্বভাব প্রচণ্ড অনুভূতিতে স্পন্দিত ও ধ্বনিত। তিনি অবশ্যই অম্লমুখ, বিরক্ত-স্বভাব, শুচিবাদী-জাতীয় ছিলেন না, কিংবা ছিলেন না স্বভাব-বিষণ্ণ কোনো মানুষ। আমাকে বাঁচিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সঙ্গে রীতিবিগর্হিত ভাষাও ব্যবহার করতেন। প্রচলিতের ঘাড় ধরে নাড়া দেওয়ার, ভব্যরীতিকে তার সাজানো আবাসে আক্রমণ করার মধ্যে তাঁর যেন একটা বিকট আনন্দ ছিল, এবং আনন্দের জন্য যা করতেন, তা অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন অন্যদের কাছে অনেক সময়ই উদ্ভট ও বিভ্রান্তিকর মনে হত; কিন্তু সেই একই কালে তিনি সত্তার নিভৃত আলয়ে বাসনার সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত, মায়ার সূক্ষ্ম মোহজাল ছিন্ন করতে উদ্যত।

"বিবেকানন্দ বারে বারে সন্ধান করতে লাগলেন সেই শক্তিকে যা তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে, উদ্ধার করবে এই দুষ্কর সংগ্রাম থেকে। উত্তরে আমি শুধু বিশুদ্ধ হেতুবাদের কথাই বলতে পারলাম—সার্বিক হেতুর সঙ্গে একাত্মতা আনতে পারলে আসবে প্রার্থিত অপার প্রশান্তি। আমার কাছে এই কালটা প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদের (Platonic Transcendentalism) বিজয়ের যুগ। অবাধ্য দেহচেতনা ও বিদ্রোহী মনের অভিজ্ঞতা আমার ঘটেনি। কৃপাবাদ কিংবা ঈশ্বরধ্যান জাতীয় কৃত্রিম বহিরঙ্গ সাহায্যের কাছে যে স্বভাব ও মন আত্মসমর্পণ করে, তাদের বিষয়ে তখন আমার যথেষ্ট মানসিক সহিষ্ণুতা ছিল না। হেতুবাদের সঙ্গে অনুভূতি ও স্বভাববাদকে সমন্বিত করার কোন প্রয়োজন তখন আমি বোধ করিনি। আদর্শ ও বাস্তব, জড়প্রকৃতি ও আত্মার মধ্যে বিরোধ যে একটা বিশেষ সত্য, সেই বিষয়ক ধারণা আমার মনে ইতিপূর্বে বহিরঙ্গভাবে এসে গিয়েছিল, আরও পরে সেটা আত্মগত-ভাবে আসবে, যদিও বিবেকানন্দের

অভিজ্ঞতার রূপের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকবে। কিন্তু ঐকালে তাঁর সমস্যা আমার সমস্যা ছিল না, তাঁর সঙ্কটও আমার নয়।

"বিবেকানন্দ স্বীকার করলেন যে, তাঁর বুদ্ধি যদিও (ইউনিভার্সেল) নির্বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা বিজিত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় ব্যক্তি-অহং-এর অনুগত। তাঁর অভিযোগ হল, রক্তহীন বিবর্ণ হেতুবাদ—যা বাস্তবতার স্বরূপ নয়, শুধু পুঁথিগতভাবে সার্বভৌম—সে বস্তু প্রলোভন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তিনি জানতে চাইলেন, আমার দর্শন কি তাঁর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি আনতে পারবে; আত্মার উদ্ধারের জন্য কার্যতঃ শারীরিক মধ্যস্থতায় সমর্থ হবে? সংক্ষেপে তিনি যেন রক্তমাংসের মূর্তি নিয়ে দর্শনীয় সত্যকে চাইলেন; সর্বোপরি অধীর হয়ে আর্তনাদ করলেন এমন একটি শক্তির জন্য যার বাহু তাঁকে রক্ষা করবে, উন্নীত করবে, উদ্ধার করবে এই নিষ্ফলতা থেকে—তাঁর শূন্য মনে আনবে মহিমার প্লাবন। তেমন একজন গুরু চাই, আচার্য চাই, যাঁর রক্তমাংসের দেহাবলম্বনে পূর্ণতা প্রকটিত হয়ে বিবেকানন্দের বিক্ষুব্ধ আত্মায় আনবে শান্তি।

"দেহীর মধ্যে এই পূর্ণতার সন্ধান, নিজের মুক্তির জন্য এই বহিরঙ্গ শক্তির প্রার্থনা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধের কাছে যুক্তির বলিদানকে অপ্রজ্ঞাজাত দুর্বলতা বলেই ঐকালে আমার মনে হয়েছিল। তরুণ অনভিজ্ঞ আমি, নিজের সঙ্গে সংগ্রামে অস্থির একটি আত্মার সম্মুখীন হয়ে বলতেই পারলাম না—কোথায় তার শান্তি মিলবে! বিবেকানন্দ শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্যদের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আদর্শের দেহগত বাস্তবতা, সত্যের প্রত্যক্ষতা, পরিত্রাণ শক্তির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সেই সব প্রশ্নের ভিতরে ছিল অসচেতন সক্রেটিসীয় বিদ্রূপ! বিবেকানন্দ তিক্তভাবে অভিযোগ জানালেন—তিনি সুনীতি-সন্দর্ভ যথেষ্ট পড়েছেন, তত্ত্বকথা শুনতে বাকী নেই; কিন্তু ঐসব নীরস বিস্বাদ জিনিসে আর রুচি নেই। বহু মত, পথ, ও শিক্ষকের কাছে তিনি গেলেন, এবং এমন এক সংশয়ী সন্ধানই তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের নিকট হাজির করল, যিনি অন্তের অসাধ্য অধিকারের সুরে কথা বললেন এবং নিজ শক্তিতে বিবেকানন্দের আত্মায় আনলেন শান্তি, সত্তার ক্ষতকে করলেন নিরাময়। কিন্তু বিবেকানন্দের বিদ্রোহী মনীষা তখনো সম্পূর্ণভাবে গুরুর বশীভূত হয়নি, মন তখনো প্রবোধ মানছে না—গুরুর সান্নিধ্যে আসায় তাঁর মনে এই যে শান্তি নেমে আসে, একি মায়া নয়? প্রখর মনীষার সেই সংশয় দূর

হয়েছে অনেক পরে ধীরে ধীরে, এবং তা হয়েছে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে যে নিঃসন্দিগ্ধ আশ্বাসলাভ হয়, তারই ফলে।

"গভীরতম আগ্রহ নিয়ে আমি আমার চোখের উপর ঘটে যাওয়া এই রূপান্তর লক্ষ্য করতে লাগলাম। কালীপূজা এবং আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার মতো একজন তরুণ ও উগ্র বৈদান্তিক তথা হেগেলবাদী তথা বিপ্লবপন্থীর মনোভাব সহজেই অনুমেয়। অপরদিকে বিবেকানন্দের মতো একজন জন্ম-বিদ্রোহী—যিনি চিন্তায় স্বাধীন, বুদ্ধিতে সৃষ্টিশীল এবং প্রচণ্ড প্রতাপশালী, মানুষকে যিনি বশীভূত করেন অক্লেশে—সেই বিবেকানন্দ কিনা স্বয়ং বিদ্‌ঘুটে অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার ফাঁদে ধরা পড়লেন! অন্ততঃ আমার কাছে ব্যাপারটা ঐরকম বলে মনে হয়েছিল এবং আমার শুষ্ক হেতুর ধারণা এই ধাঁধার সমাধান করতে অসমর্থ হল। কিন্তু তখন যেটা বিবেকানন্দের ত্রুটি বলে মনে হয়েছিল, তার দ্বারাই 'হারানো প্রিয়' বিবেকানন্দ আমার কাছে প্রিয়তর এবং সেইহেতু অধিকতর সন্তাপকারণ হয়ে উঠলেন। এবং ব্যক্তিগত আবেগই—যে আবেগ তখন আমার বুদ্ধিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্কের পক্ষপাত থেকে জাত ঘৃণ্য জৈব ব্যাপার মাত্র—আমার মতো গৃহগুহাশ্রয়ী মানুষকে অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে বিবেকানন্দের গুরুকে দেখবার অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে বাধ্য করাল। সেখানে মন্দির-উদ্যানের শান্তিময় আশ্রয়ে এক সুদীর্ঘ গ্রীষ্মদিবসের প্রায় সমস্ত ক্ষণ কাটাবার পরে সূর্যাস্তকালে দৃষ্টিভ্রান্তিকর গর্জনশীল ঝঞ্ঝাবায়ু ও বজ্রপাতের মধ্যে যখন আমি প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন আমি দৈহিক ও নৈতিক সত্তা সম্বন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছি, আমার মনে তখন এই অস্পষ্ট সত্যবোধ জেগেছে যে, আপাতভাবে বিশৃঙ্খল উদ্ভট বস্তুকেও বিশ্বনিয়ম নিয়ন্ত্রিত করছে, যেটাকে বাইরে থেকে নিছক আত্ম-উৎসাদন বলে মনে হয়, সেটা আত্ম-আধিপত্যও হতে পারে, ইন্দ্রিয় তার ভ্রান্তি সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ হেতু ছাড়া কিছু নয়, এবং বাইরের ত্রাণ-শক্তির উপর বিশ্বাস আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌল কর্মের অস্পষ্ট প্রতিভাস। এই সমস্তেরই তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবনেতিহাসে, যিনি তাঁর গুরুর নিকট থেকে আকাঙ্ক্ষিত কৃপা ও করুণার সুদৃঢ় আশ্বাসকে লাভ করে পরবর্তী কালে 'সর্ব-মানবের' বাণী প্রচার করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন আত্মার সার্বিক আধিপত্যের সার্বভৌম তত্ত্ব।"

এই সুদীর্ঘ ও মনোরাজ্যের পরিবর্তনাদির বিশ্লেষণপূর্ণ দার্শনিক উদ্ধৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলেও আর একটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, শীল মহাশয় যৌক্তিক নিশ্চয়তা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির কথাই প্রধানতঃ বলিয়াছেন। স্বামীজী কিন্তু শুধু যুক্তি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির জন্য লালায়িত ছিলেন না; তিনি চাহিতেন অপরোক্ষ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি; আর সে অনুভূতি আসে ভগবদনুরক্ত শুদ্ধ হৃদয়ে—যুক্তিতর্ক বা ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া নহে।[৫] পরবর্তী কালে তিনি প্রায়ই বলিতেন, ধর্ম অনুভূতির বিষয়, এবং কোন স্থলে হৃদয় ও যুক্তির মধ্যে বিবাদ ঘটিলে স্বার্থহীন শুদ্ধ হৃদয়ের নির্দেশ ও উপলব্ধিই স্বীকার্য। ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, স্বামীজী কখনও ইন্দ্রিয়বোধের বেদীতে যুক্তিকে বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন কিংবা এমন কোন দর্শনের অনুসন্ধানে ফিরিতেন যাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দার্শনিক ব্যাখ্যা দেয়। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতকালে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি না পাইয়াই তাঁহার মনে অতৃপ্তি জাগিয়াছিল। তবু একথা অকাট্য সত্য যে, ধর্মানুশীলনের আকুল আকাঙ্ক্ষার ফলেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, উহার মধ্যে অনেক কিছু পাইবার আশা পোষণ করিয়াছিলেন এবং সমাজও তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। এখন আমরা সেই বিকাশধারারই অনুসরণ করি।

নরেন্দ্রের ধ্যানে রুচি বরাবরই ছিল; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উৎসাহ পাইয়া উহা আরও বর্ধিত হইল। আবার ধ্যানসিদ্ধ তিনি পূর্বেই ছিলেন; এখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বাল্যের শিব, সীতারাম ও অন্যান্য দেবদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া নিরাকারের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এখন তিনি প্রার্থনা করিতেন, "হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে তোমার সত্যস্বরূপ দর্শনের অধিকারী কর;" আর মন হইতে সর্বপ্রকার চিন্তা দূর করিয়া নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার

৫। "পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হ্যামিল্টন তৎকৃত দর্শনগ্রন্থের সমাপ্তিকালে বলিয়াছেন, 'জগতের নিয়ামক ঈশ্বর আছেন, এই সত্যের আভাসমাত্র দিয়া মানববুদ্ধি নিরস্ত হয়; ঈশ্বর কিংস্বরূপ এ বিষয় প্রকাশ করিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় না; সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের ঐখানেই ইতি, এবং যেখানে দর্শনের ইতি, সেইখানেই আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ।' হ্যামিল্টনের ঐ কথা নরেন্দ্রের বিশেষ রুচিকর ছিল এবং কথাপ্রসঙ্গে উহা তিনি সময়ে সময়ে আমাদের নিকট উল্লেখ করিতেন।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫ম খণ্ড, ১৯১-৯২ পৃঃ)।

ন্যায় উহাকে নিশ্চল রাখিতে অভ্যাস করিতেন। স্বল্পকাল এইরূপ অভ্যাসের ফলে তাঁহার অবস্থা এমন হইল যে, ধ্যানকালে তাঁহার সময় ও শরীরের জ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হইত। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে অনেক দিবস তিনি এইভাবে ধ্যানে বসিয়া রজনী অতিবাহিত করিতেন।

এই প্রকার ধ্যানান্তে একদিন তিনি এক দিব্য দর্শনের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেদিন ধ্যান শেষ করিয়া তিনি তখনও আসনে উপবিষ্ট আছেন; ধ্যানের ঝোঁক এবং আনন্দ তখনও চলিতেছে। অকস্মাৎ দেখিলেন দিব্যজ্যোতিতে ঘর পূর্ণ হইয়া গেল এবং এক অপূর্ব সন্ন্যাসী দক্ষিণ প্রাচীর ভেদ করিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু, মুখমণ্ডল প্রশান্ত, সর্ববিষয়ে উদাসীনতাবশতঃ একটা অন্তর্মুখীন ভাব। নরেন্দ্র অবাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন ও সেই সৌম্যমূর্তি যেন কিছু বলিবার জন্য ধীরপদক্ষেপে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নরেন্দ্র হঠাৎ ভয়ত্রস্ত হৃদয়ে উঠিয়া দ্বার অর্গলমুক্ত করিলেন এবং দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই মনে হইল, কাজটা ঠিক হইল না, সন্ন্যাসীর কথা শুনিলেই হইত। তৎক্ষণাৎ গৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলিতেন, এমন অপূর্ব সন্ন্যাসী তিনি আর কখনও দেখেন নাই—কি সৌম্যময় সুন্দর তাঁহার মুখের ভাব। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি সেদিন বুদ্ধদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন। *

বুদ্ধিভূমিতে ঐ কালে নরেন্দ্রনাথের অন্তরে যে ঝড় বহিতেছিল, তাহার আভাস শীল মহাশয়ের লেখনীমুখে প্রতিফলিত হইয়াছে। বুদ্ধি ও মনের বাড়তির পথে, বিশেষতঃ স্বাধীনচেতা নরেন্দ্রের উন্মুক্তদ্বার চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিপুল আলোড়ন উত্থিত হওয়া আশ্চর্য নহে। বরং আশ্চর্য এই যে, এত ঝড়ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও তিনি পথভ্রষ্ট হন নাই, যুদ্ধের ফলে অধিকতর বীর্য, সাহস ও রণকৌশল লাভ করিয়াছিলেন মাত্র। চিন্তারাজ্যের সহিত নিবিড় পরিচয় লাভের জন্য তিনি বহু পুস্তক পড়িতেন। অবশ্য তাঁহার উচ্চ নৈতিক মান তাঁহাকে নাটক-নভেল পাঠে নিমগ্ন করিতে পারিত না। তিনি পড়িতেন ইতিহাস, ন্যায়, দর্শন ইত্যাদি। এল্‌ফিন্‌স্টোন ও মার্শম্যানের ভারতেতিহাসের

---

* । 'বাণী ও রচনা', ৯।৭২ পৃঃ; এবং বাঙ্গলা জীবনী।

কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এফ. এ. অধ্যয়নকালে তিনি হোয়েটলি, জেভন্‌স্, মিল প্রভৃতি বহু গ্রন্থকারের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বি. এ. পড়িবার সময় ইংলণ্ডের ও ইউরোপীয় দেশগুলির ইতিহাসসমূহ[৭] এবং দর্শনশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইলেও তিনি কাণ্ট্, সোপেনহাওয়ার, আগস্ট কোম্‌ৎ ও জন্ স্টুয়ার্ট মিল-এর মতবাদ আগ্রহসহকারে পাঠ করেন। এরিস্টটলের মতও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অপর যেসব বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল, তন্মধ্যে গণিতজ্যোতিষ (অ্যাস্ট্রনমি) অন্যতম। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি 'গড্‌ফ্রেজ্ অ্যাস্ট্রনমি' নামক পুস্তকখানি আয়ত্ত করেন। তাছাড়া ফলিত গণিতের (এ্যাপ্লাইড ম্যাথেম্যাটিক্‌স্) আলোচনায় অতিশয় আনন্দ পাইতেন। অতুলবিক্রম সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁহার নিকট বীরের সম্মান পাইতেন এবং সম্রাটের সেনাপতিদের মধ্যে মার্শাল নে-কে তিনি খুব উচ্চাসন দিতেন। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে কাব্যজগতে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তাঁহার চিত্তহরণ করিতেন। তাঁহার দৃষ্টিতে কাব্য ছিল বহু বর্ণরঞ্জিত সুচিত্রিত ছবিরই সদৃশ মনোরম শব্দবিন্যাসে বিরচিত এমন একখানি মনোহারী চিত্র যাহা অন্তরে উচ্চ আদর্শের প্রেরণা জাগাইয়া মানুষকে অনায়াসে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে। নরেন্দ্র চিরজীবন ছিলেন সর্ববিষয়ে আদর্শবাদী। এইভাবে বুদ্ধিকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তিনি তাঁহার অনুসন্ধিৎসা-স্পৃহাকে আরও বহুদূরে বিচরণ করিতে দিতেন।

\বুদ্ধির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোর তার্কিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেহ কোন বিরুদ্ধ কথা বলিলে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাহাকে পরাজিত না করা পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হইতে পারিতেন না। বিচারকালে প্রতিবাদীর দুই-চারিটি কথা শুনিয়াই তিনি তাহার বক্তব্য বুঝিয়া লইতেন; কারণ তিনি বলিতেন, "পৃথিবীতে কয়টা নূতন চিন্তাই বা আছে? সে কয়টা জানা থাকলে এবং তাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি এ পর্যন্ত প্রযুক্ত হয়েছে তা আয়ত্ত থাকলে বাদীকে ভেবে চিন্তে উত্তর দেবার প্রয়োজন থাকে না।" এইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হইয়া তিনি দৈনিক পাঠ অল্প সময়েই শিখিয়া ফেলিতেন এবং বাকী সময় গল্প-গুজব, সঙ্গীত, ব্যায়ামাদিতে কাটাইতেন। ইহা দেখিয়া

৭। Green's *History of the English People*, Alison's *History of Europe*, Gibbon's *Decline and Fall of the Roman Empire* ইত্যাদি।

অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণাও পোষণ করিতেন—মনে ভাবিতেন, তিনি দাম্ভিক ও ব্যসনপ্রিয়। শৈশবে ও কৈশোরে যে অদম্য শক্তি আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্রের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া আত্মীয়স্বজনকে চাঞ্চল্যের আকারে বিব্রত করিত, তাহাই যৌবনের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশকামী হইয়া অজ্ঞাতপূর্ব রূপধারণপূর্বক অপরদিগকে বিভ্রান্ত করিত। নরেন্দ্রনাথের যথাসম্ভব পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য আমাদিগকে তাই মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয়গুলি ছাড়িয়া একটু অন্যদিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

সঙ্গীতচর্চার প্রসঙ্গে আমরা উস্তাদ বেণী গুপ্তের (বেণী বৈরাগীর বা বেণী অধিকারীর) নামোল্লেখ করিয়াছি। ইনি আহম্মদ খাঁর শিষ্য ছিলেন এবং কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় প্রকার সঙ্গীতে ইঁহার অধিকার ছিল। বিশ্বনাথবাবু পুত্রের সমস্ত গুণাবলীরই উৎকর্ষকামী ছিলেন। সুতরাং নরেন্দ্র এই উস্তাদের নিকট চারি-পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং গান ও বাজনা দুইই শিখিয়াছিলেন। তবে কণ্ঠসঙ্গীতেই তিনি সমধিক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে (১১৫ পৃঃ) কাশীনাথ ঘোষাল ছিলেন তাঁহার তবলা ও পাখোয়াজ শিক্ষার উস্তাদ। কাহারও কাহারও মতে নরেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর বেণী উস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষার পর বেণী উস্তাদের গুরু আহম্মদ খাঁর কাছে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি শিক্ষা করেন।[৮]

সঙ্গীতশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে নরেন্দ্রনাথ কিরূপ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দুইটি ঘটনা হইতে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয়। উহা বি. এ. পাসের দুই-তিন বৎসরের পরের কথা হইলেও আমরা এখানেই বলিয়া রাখি। প্রথমতঃ দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের (১৮৮৬ খৃঃ) কয়েক মাস পরেই শিবরাত্রি উপলক্ষে তিনি 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' ইত্যাদি গানটি রচনা করিয়া স্বয়ং উহাতে স্বরসংযোগ করেন, এবং অতঃপর ধ্রুপদাঙ্গ কয়েকটি গান রচনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুরসহ প্রচার করেন। এই বিষয়ে প্রকৃষ্টতর

৮। 'বিশ্ববিবেক', ২৩৬ পৃঃ। আহম্মদ খাঁর নিকট তিনি হিন্দী, উর্দু ও ফার্সী গান শিখেন। তাঁহার সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে আরও কয়েকজন কলাবতের নাম পাওয়া যায়—উজীর খাঁ, বড় ও ছোট দুন্নি খাঁ, কানাইলাল ঢেঁড়ী, জগন্নাথ মিশ্র, শঙ্কর (স্বামী জ্ঞানানন্দ রচিত 'শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি')। কিন্তু এই মত প্রমাণসহ বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় প্রমাণ 'সঙ্গীত-কল্পতরু'। অধুনা প্রকাশিত (অক্টোবর, ১৯৬৩) 'সঙ্গীত-সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিয়াছেন, "স্বামীজী ছিলেন না শুধুই গীতশিল্পী, ছিলেন সঙ্গীত-তত্ত্বানুসন্ধানেরও পথচারী…সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থখানির ঔপপত্তিক আলোচনাশৈলীই তাঁর সঙ্গীত-জ্ঞান-বিচক্ষণতার কথা প্রমাণ করে।" 'সঙ্গীত-কল্পতরু' প্রথম সংস্করণের প্রারম্ভে ৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকায় সুর, তাল, বাদ্যযন্ত্র, বাজনা, বোল, স্বরসাধনা, কন্‌সার্ট ইত্যাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে 'সঙ্গীত ও বাদ্য' এই শিরোনাম অবলম্বনে। পরিশিষ্টে ১৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'সাধক ও কবিগণের জীবনী' এই শিরোনাম অবলম্বনে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি অনেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বাকী 'সঙ্গীত-সংগ্রহ' নামক অংশে বহু শ্রেণীর বহু ভাষার সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণে এই প্রবন্ধদ্বয় বর্ণিতাকারে প্রথমাংশেই একত্রে মুদ্রিত হয়।

এখন প্রশ্ন এই—ভূমিকাটির রচয়িতা কে? বিভিন্ন কারণে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দই ইহার লেখক। এই বিষয়ক যুক্তিগুলি আমরা পর পর উপস্থিত করিতেছি। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে বলা হইয়াছে, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন একখানি বাঙ্গলা গানের পুস্তকের জন্য। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন যে, নরেন্দ্রনাথ বাঁয়া, তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রের বাজনা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, উহা বড়তলার বৈষ্ণবচরণ বসাক প্রকাশ করেন ও উহার একখানি পুস্তক বেলুড় মঠের পুস্তকাগারে আছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু লিখিয়াছেন, "প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনাদ্বারা তিনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন কি, কোন দরিদ্র পুস্তক প্রকাশককে তিনি ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।" অনেকে বৈষ্ণবচরণকে প্রকাশক মনে করিলেও, তিনি নরেন্দ্রনাথের সহকারী গ্রন্থকর্তা ছিলেন, প্রকাশক নহেন। আমরা বেলুড় মঠে সংরক্ষিত 'সঙ্গীত-কল্পতরু'র প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি; উহাতে লিখিত আছে "১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, আর্য-পুস্তকালয় হইতে শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত।" গ্রন্থকারের নামের স্থলে

আছে "শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত।" পুস্তকের প্রারম্ভে সহকারী গ্রন্থকার বৈষ্ণবচরণ তাঁহার 'বিশেষ কথা'য় লিখিয়াছেন, "প্রায় এক বৎসর অতীত হইল ইহার সঙ্কলন কার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্তবাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. মহাশয়ই প্রথমতঃ ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন; কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পুরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।" "অলঙ্ঘনীয় কারণের" মধ্যে তখন নিশ্চয় বরাহনগর মঠের প্রাথমিক কার্যের ব্যস্ততা এবং পিতৃসম্পত্তি লইয়া মকদ্দমা প্রভৃতি ছিল। বসাক মহাশয়ের 'বিশেষ কথা'-র তারিখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস, অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের কাছাকাছি (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)। এই হিসাবে দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ এই পুস্তকরচনায় হাত দেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে, হয়তো বা উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে। গ্রন্থখানি লোকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। বৈষ্ণবচরণ তৃতীয় সংস্করণের 'বিশেষ কথা'য় লিখিয়াছেন, "ছয় মাসের মধ্যে দুই সংস্করণে দুই সহস্র সঙ্গীত-কল্পতরু·· নিঃশেষিত হইয়াছে।" তখনকার দিনে ইহা খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু পরে "ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির" ফলে পুস্তকখানির নাম পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং নরেন্দ্রনাথের নামও পরিত্যক্ত হয়। পুস্তকখানির স্বত্ব ও কর্তৃত্ব লইয়া একটা বিবাদ কিছুকাল চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বেলুড় মঠে সংরক্ষিত প্রথম সংস্করণের পুস্তকখানির প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারদ্বয়ের নামের পশ্চাতে কে একজন কালী দিয়া লিখিয়াছেন "ও জ্ঞানচন্দ্র বসাক"। ঐ গ্রন্থখানির মালিক হিসাবে ইংরেজীতে জ্ঞানচন্দ্র বসাকের নাম লিখিত আছে এবং বর্ষ দেওয়া হইয়াছে ১৮৮৭। 'সঙ্গীত ও বাদ্য' নামক ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে তারিখসহ লিখিত আছে "জে. সি. বসাক কর্তৃক প্রদত্ত, ১।১।৮৮।"

এই সঙ্গে আর একটি কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেলুড় মঠের প্রাচীনগণ বলেন, বরাহনগরের প্রথমাবস্থায় ত্যাগী ভক্তগণ যখন কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় যাইতেন, তখন দুই-এক পয়সার জলযোগের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকানে উপস্থিত হইতেন। তিনি তখন দরিদ্র; অপরের দোকানে কাজ করিতেন। অতএব এই সুহৃদের সাহায্যকল্পে নরেন্দ্রনাথ গ্রন্থ রচনায় মন দেন এবং উপেন্দ্রনাথ ইহাতে উপকৃত হন। কিন্তু পরে পুস্তকের

স্বত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্রনাথ স্বভাবতই এই বিবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সরিয়া দাঁড়ান।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রীতি সম্বন্ধে একটি ঘটনা তাঁহার বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয়ের স্মৃতিকথা হইতে উদ্ধৃত করিলাম: "নরেন্দ্র তখন তাঁহার পিত্রালয়ে দুইবেলা কেবল আহার করিতে যান, আর সমস্ত দিবারাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাটীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। পাঠাভ্যাসের খাতিরেই যে এখানে থাকেন, তাহা নহে; নরেন্দ্র নিভৃতে থাকিতে ভালবাসেন। বাড়ীতে অনেক লোক, বড় গোলমাল, নিশীথে ধ্যান-জপের বড় ব্যাঘাত। মাতামহীর বাটীতে লোক বেশী নয়। দুই-একজন যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের দ্বারা নরেনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কচিকাচা ছেলে—যাহাদের দ্বারাই অধিক গোলমাল হয়, এখানে একটিও নাই। যে ঘরটিতে নরেন থাকেন, তা বার-বাড়ীর দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই উঠিবার সিঁড়ি, বন্ধু-বান্ধবদের যাঁহার যখন ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হন। নরেন নিজের এই অপুর্ব ছোট ঘরটির নাম রাখিয়াছিলেন 'টঙ'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, 'চল, টঙে যাই।' ঘরটি বড়ই ছোট—প্রস্থে চার হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা ছোট একটা বালিস। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া সপ পাতা। এক কোণে একটি তানপুরা, তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখন ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখন বা খাটিয়ার নীচে, কখন বা তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। ঘরের এক পার্শ্বে একটি খেলো হুঁকো, তাহার নিকট খানিকটা তামাকের গুল আর ছাই ঢালিবার একখানি সরা। তাহারই কাছে তামাক টিকে ও দেশলাই রাখিবার একখানি মৃৎপাত্র। আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর, মাদুরের উপরে, হেথা-সেথা ছড়ানো পড়িবার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ি খাটানো, তাহাতে কাপড় পিরান ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দুটি ভাঙ্গা শিশিও রহিয়াছে; সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল, তাহারই নজির। নরেন মনে করিলেই বাড়ী হইতে পরিষ্কার বালিস, উত্তম বিছানা, ও ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া দুই একখানি ছবি প্রভৃতি দিয়া ঘরটি বেশ সাজাইতে পারেন; করিতেন না যে, তাহার একমাত্র কারণ, তাঁহার ঐ সমস্ত দিকে কোন খেয়ালই ছিল না। সেজন্য ঘরের সর্বত্র

একটা যেন বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব। প্রকৃত কথা, আত্মতৃপ্তির বাসনা তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে কোন বিষয়ে দেখা যাইত না।

"নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় কোন বন্ধুর আগমন হইল, বেলা এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছিলেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন, 'ভাই রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।' অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারে সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন, 'তবে বাঁয়াটা নে।' বন্ধু বলিলেন, 'ভাই আমি তো বাজাতে জানি নে। ইস্কুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারি?' অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, 'বেশ করে দেখে নে দিখি। পারবি বই কি? কেন পারবিনি? কিছু শক্ত কাজ নয়। এমন করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তাহলেই হবে।' সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই-একবার চেষ্টা করিয়া কোন রকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন; গান চলিল।

"তাললয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল— টপ্পা, টপ-খেয়াল, ধ্রুপদ, বাঙ্গলা, হিন্দী, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখাইয়া দেন যে, একদিনে কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান, এমন কি সুরফাঁকতাল পর্যন্ত তাহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন; সেটা কেবল বাজনা কার্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই। হিন্দী গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সহিত সুরলয়ের অপূর্ব ঐক্য দেখাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল। বাড়ীর চাকর একটি মিটমিটে প্রদীপ দিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুজনের হুঁশ হইলে সেদিনকার মতো পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থ চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে নরেনের পাঠে কতই যে ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। নরেনের সহিত এই সময়ে যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তিনিই এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন, নরেন্দ্র নির্বিকার।" ('উদ্বোধন', ফাল্গুন, ১৩১৭)।

কলেজের সহপাঠীরা তাঁহার গান শুনিতে খুবই ভালবাসিত, এবং "এন্‌কোর প্লিজ্"—"চলুক, চলুক" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত ও প্রশংসিত করিত; তিনিও ভাবে মত্ত হইয়া সময় ভুলিয়া গাহিতে থাকিতেন। একদিন ইংরেজ অধ্যাপকের ক্লাশে আসিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ছেলেরা ধরিয়া বসিল, নরেন্দ্রকে গাহিতে হইবে। নরেন্দ্র গান ধরিলেন, ইতিমধ্যে অধ্যাপক দরজা পর্যন্ত আসিয়াই গান শুনিয়া আর ঘরে ঢুকিলেন না। গান থামিলে সহাস্যে প্রবেশ করিয়া গায়কের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ছাত্ররা কিন্তু কেহই গায়কের নাম বলিল না।

কোন কোন দিন এমন হইত যে, স্নান করিয়া কোথাও যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতেছেন, এমন সময় গান আরম্ভ হইল। অমনি গানে উন্মত্ত হইয়া স্নানাহার ও বাহিরে যাওয়ার কথা সবই ভুলিয়া গেলেন—শুধু গানই চলিতে লাগিল।

বন্ধুদের মজলিসে নরেন্দ্র উপস্থিত না থাকিলে সব যেন আলুনী ঠেকিত, অমনি প্রশ্ন উঠিত, "নরেন কোথা? নরেন কোথা?" তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানে আনন্দের তরঙ্গ উঠিত। সমস্ত কলেজ-জীবনে তিনি ছিলেন সহপাঠীদের নিকট প্রেমাস্পদ বন্ধু। গল্প, রহস্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ক্রীড়া, ব্যায়াম প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন নেতা—আনন্দবাসরের কেন্দ্রমণি। তাঁহার অভিনয়-প্রীতির কথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষ এই যে, তিনি রঙ্গমঞ্চেও চিত্তের উন্নতিসাধক নীতিপূর্ণ ভূমিকাই গ্রহণ করিতেন।

স্বামীজীর কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখিলে মন্দ হইবে না। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তৎপ্রণীত 'সঙ্গীত-সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু' পুস্তকখানিতে (২৬—২৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "গায়ক-মহলে যাকে বলে 'জোয়ারীদার' গলা, স্বামীজীর ছিল তাই। তাঁর কণ্ঠে—গায়কের অন্যতম প্রধান সম্পদ—জোয়ারী ছিল এবং তাঁহার স্বর ছিল পুরুষোচিত গম্ভীর ও গভীর।" রমাঁ রলাঁ লিখিয়াছেন, "বক্তৃতা আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঐশ্বর্যময় গম্ভীর কণ্ঠস্বর অধিকার করে ফেললে বিপুল মার্কিনী এ্যাংলো-স্যাক্সন শ্রোতৃমণ্ডলীকে—যাঁরা তাঁর বর্ণের জন্যে প্রথমে তাঁর প্রতি বিরাগ পোষণ করেছিল।……তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল (মিস্ জোসেফিন্ ম্যাক্লাউড্ একথা আমায় বলেছিলেন) ভায়োলোন সেলোর মতন চমৎকার, গম্ভীর হলেও তার মধ্যে প্রবল বিসদৃশ কিছু ছিল না—তা ছিল গভীর স্পন্দনে ভরা, যা সভাস্থল এবং শ্রোতৃবৃন্দের

অন্তঃস্থল পূর্ণ করে তুলত। শ্রোতাদের একবার চিত্তজয়ের সুযোগ পেলে তিনি তাঁর শ্রোতাদের মন এমন গভীর খাদে নিমগ্ন করতে পারতেন যে, তাদের অন্তর পর্যন্ত বিদীর্ণ হত। এম্মা কালভে, যিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁর কণ্ঠধ্বনির এইভাবে বর্ণনা করেন যে, তা ছিল খাদ ও তীব্র স্বরের চমৎকার মধ্যবর্তী এবং চীনা গঙের (কাঁসরের) মতো কম্পনময়।" ('দি লাইফ অব্ বিবেকানন্দ', ৫ পৃঃ)

পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রনাথ যখন খুবই বিপন্ন, সেই কালের কথা উল্লেখ করিয়া মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "মাস্টার মহাশয়ের বাড়ী অনতিদূরে, এইজন্য মাস্টার মহাশয় নরেন্দ্রের কাছে সর্বদাই আসিতেন এবং বাহিরের ঘরটিতে তক্তাপোশের উপর বসিয়া দুজনে ভজন গান শুরু করিতেন। নরেন্দ্রনাথের গলার স্বর মোটা ও খাদে, মাস্টার মহাশয়ের গলার স্বর মৃদু ও ললিত, অর্থাৎ একজনের হইল খাদ সুর, অপরের হইল মেয়েলী সুর। দুই জনের কণ্ঠস্বর মিশ্রিত হইয়া এক মধুর শব্দ নিঃসৃত হইত এবং তক্তাপোশ থাপড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ তাল দিত।" ('মাস্টার মহাশয়ের অনুধ্যান', ১০ পৃঃ)

"তাঁর গান যে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করত তার কারণ, তিনি সঙ্গীতে রসসঞ্চার করতে পারতেন। সঙ্গীতের মূলকথা যে রসসৃষ্টি তা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করতেন এবং সেজন্যেই তাঁর গান শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করত। তাঁর গানে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পেত। তিনি গান গাইতেন যথোচিত ভাব দিয়ে। সেজন্যে তাঁর সঙ্গীত উৎসারিত হত অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে।" (দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৬ পৃঃ)

বাঙ্গলা জীবনীর মতে নরেন্দ্রনাথ নৃত্যবিদ্যাও শিখিয়াছিলেন এবং উহাতে সুনিপুণ ছিলেন। "প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে বীরোচিত কলা বলিয়া নৃত্যবিদ্যার খুব আদর ছিল, এবং ধর্মোৎসবাদির সময় নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। নরেন্দ্র স্বাভাবিক কলানুরাগবশতঃ নৃত্যকালে অঙ্গসঞ্চালনের মাধুর্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন, আর সেই সঙ্গে যদি সঙ্গীতটি উচ্চ ভাবব্যঞ্জক হইত, তাহা হইলে ভাবের প্রেরণায় নৃত্যসৌষ্ঠব আরও বর্ধিত হইত।" (৭৪ পৃঃ)

আনন্দে তিনি মাতিতেন, অপরকেও মাতাইতেন। ছেলেবেলায় যেমন খেলাধূলায় সব ভুলিয়া যাইতেন, যখন যাহা করিতেন, সবটুকু মন দিয়াই তাহা করিতেন, যৌবনেও সেই নিজস্ব প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত। "পূর্বের ন্যায়

তখনও কোন একটা নূতন জিনিস বা বিষয় দেখিলেই সব ত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিতেন। ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় রসিক কেহ ছিল না। কোন ঘটনার কৌতুকের দিকটা সর্বাগ্রেই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইত। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকেই স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় ছিলেন। একে এই রঙ্গপ্রিয় প্রকৃতি, আবার যখন সকলে একত্র হইতেন তখন তাঁহাদের স্ফূর্তির বহর দেখে কে? এমন অনেক দিন গিয়াছে যেদিন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া সকলে সারা কলিকাতার পথে পথে গান গাহিয়া বেড়াইয়াছেন। রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে সকলে একত্রে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ, লম্ফ-ঝম্প, জলক্রীড়া হইত ও সঙ্গে সঙ্গে হাসি-তামাসা ও গল্পের বান ডাকিত। পূজাপার্বণ উপলক্ষে রাজপথসমূহ আলোকমালায় বিভূষিত হইলে এই সকল যুবকদল ভ্রমণে বহির্গত হইতেন ও উচ্ছ্বসিত আনন্দের রোলে গগন বিদীর্ণ করিতেন।" (ঐ, ৫৫ পৃঃ)

এত আনন্দ-বিহ্বলতার মধ্যেও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ছিল যে, নরেন্দ্র কখনও স্বীয় পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই সম্বন্ধে তাঁহার এক যৌবনসহচর—যিনি পূর্বে সুনীতি-কুনীতির ধার ধারিতেন না, কিন্তু পরে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন, "যৌবনে স্বামীজী পবিত্রতার জলন্ত বিগ্রহ ছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রায়ই অতিরিক্তমাত্রায় পবিত্রতাবাদী বলিয়া ঠাট্টা করিতাম; কিন্তু এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতে গেলে যেন আটকাইয়া যাইত; স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার তুলনায় আমি কত হীন।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "নরেনের ভেতর থেকে যেন একটা আধ্যাত্মিক তেজ ফুটে বেরোত, তার কাছে তিষ্ঠানো যেত না।" শুধু ইনি নহেন, নরেন্দ্রের অপর বন্ধুরাও তাঁহার এই সদ্গুণসম্ভূত তেজ অনুভব করিয়া সমীহ করিয়া চলিতেন।

নরেন্দ্রনাথের টঙ ছাড়িয়া আমরা একটু দিগ্‌দর্শন করিয়া আসিলাম; এখন আবার সেই টঙ-এর প্রসঙ্গেই ফিরিয়া যাই—তাঁহার পাঠাভ্যাসের আর একটু তথ্য সংগ্রহ করি। বি.এ. পরীক্ষার তখন আর হয়তো মাসখানেক মাত্র দেরি আছে, এমন সময় নরেন্দ্রের খেয়াল হইল, পাঠ্যপুস্তকমধ্যে বিপুল কলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাসখানি উলটাইয়া দেখা হয় নাই। তখন তিনি এক উপায় আবিষ্কার করিলেন। টঙের উত্তরে ত্রিতলে তদপেক্ষা বড় একখানি ঘর এবং

ঐ ঘরের পশ্চিমে একটি চোর-কুঠরী বা দো-ছত্রির ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরেরই মধ্য দিয়া তাহাতে প্রবেশের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বা প্রবেশমার্গ ছিল—হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিতে হইত। তাহার দক্ষিণে একটি জানালা। ঐ লুক্কায়িত স্থানে বসিয়া তিনি পাঠাভ্যাসে লাগিয়া গেলেন। উল্লিখিত সময়ে এক বন্ধু আসিয়া নরেন্দ্রকে ডাকিলে তিনি সাড়া দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধু বুঝিতেই পারিলেন না, কোথা হইতে আওয়াজ আসিতেছে। তখন নরেন বুঝাইয়া দিলেন, তিনি চোর-কুঠরীতে আছেন। সেখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্তা হইল। তাহা হইতে বন্ধু জানিলেন, নরেন্দ্র এই সঙ্কল্প করিয়া ঐ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়াছেন যে, গ্রীণের লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস আদ্যন্ত পুনরধ্যয়ন না করিয়া বাহির হইবেন না। তখনই ঐভাবে দুইদিন কাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর আর একদিন সেখানে থাকিয়া গ্রন্থখানি শেষ করিয়া তিনি বাহির হইয়াছিলেন।

সময়বিশেষে এইরূপ স্থির সঙ্কল্প লইয়া পাঠে নিরত হইলেও সাধারণতঃ তাঁহার মনে পরীক্ষার জন্য কোন উদ্বেগ দেখা যাইত না। বি.এ. পরীক্ষার প্রথম দিন প্রাতেই শয্যাত্যাগান্তে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি ক্রমে চোর-বাগানে সতীর্থ হরিদাস ও দাশরথির[১] বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার প্রায়ই যাতায়াত ছিল এবং পড়াশুনার সম্পর্কে আসিলেও গল্পগুজবে সময় কাটিয়া যাইত। সেসব আগের কথা ; কিন্তু আজ এই পরীক্ষার দিনে ! বন্ধুদের ঘরের কাছে আসিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন :

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি ;
গাহে যথা রবিশশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।

নরেন্দ্রের গলার স্বর শুনিয়া বন্ধুদ্বয় দ্বার খুলিয়া দেখেন তিনি পুস্তকহস্তে

১। হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকিল দাশরথি সান্যাল।

সস্মিতবদনে দণ্ডায়মান। বন্ধুদ্বয় প্রশ্ন করিলেন, "নরেন, এক্জামিনের দিন; কোথায় একটু আধটু খুঁতখাঁত যা আছে সেইটুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখছি সবই বিপরীত; বেড়ে ফুর্তি করছ!" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "হাঁ তাই তো করছি, মাথাটা সাফ রাখছি। মগজটাকে একটু জিরেন দেওয়া চাই, নইলে এই দুঘণ্টা যা মাথায় ঢোকাব, ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বই তো নয়? এতদিন পড়ে পড়ে যা হোল না, তা কি আর দু' ঘণ্টায় হয়? হয় না। এক্জামিনের দিন সকালবেলায় কেবল ফুর্তি, কেবল ফুর্তি করে শরীর-মনকে একটু শান্তি দিতে হয়, ঘোড়াটা ছুটে এলে তাকে দলাই-মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। মগজটাকেও তাই করতে হয়।"

সমকালীন একটি ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের বয়স্যপ্রীতি ও কৌতুকপ্রিয়তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বি. এ. পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দেওয়ার সময় আসিয়াছে এবং সকলেরই টাকার সংস্থান আছে; নাই শুধু চোরবাগানের বন্ধু গরীব হরিদাসের—সে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাছাড়া এক বৎসরের বেতন বাকী। অবশ্য এইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে টাকা মকুব করারও ব্যবস্থা ছিল, আর তাহার ভার ছিল রাজকুমার নামক কলেজের একজন বৃদ্ধ কেরানীর উপর। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় দেখিলেন, কোন প্রকারে পরীক্ষার ফি দেওয়া চলে কিন্তু বেতনের টাকা দেওয়া অসম্ভব। তবে রাজকুমারবাবু দয়াশীল বলিয়া পরিচিত ছিলেন—যদিও তাঁহার নেশা করার একটু দুর্নাম ছিল। সব শুনিয়া নরেন্দ্র হরিদাসকে ভরসা দিলেন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। দুই-একদিন পরে যখন রাজকুমারবাবুর টেবিলে খুব ভিড় জমিয়াছে এবং ছেলেরা একের পর এক টাকা জমা দিতেছে, তখন নরেন্দ্রনাথ ভিড় ঠেলিয়া গিয়া রাজকুমারকে বলিলেন, "মশাই, হরিদাস দেখছি মাইনেটা দিতে পারবে না; আপনি একটু অনুগ্রহ করে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাস করবে; আর না পাঠালে সব মাটি হয়।" রাজকুমার মুখবিকৃতি করিয়া বলিলেন, "তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিশ করতে হবে না; তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা! আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।" নরেন্দ্র তাড়া খাইয়া পলাইলেন, বন্ধুও হতাশ হইলেন। তবু নরেন্দ্র ভরসা দিয়া বলিলেন, "তুই হতাশ হচ্ছিস কেন? ও বুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি বলছি, তোর একটা উপায় করে দেব; তুই নিশ্চিন্ত হ।"

এদিকে নরেন্দ্র বাটীতে না ফিরিয়া হেদোর ধারে একটা গুলির আড্ডায় খবর লইয়া জানিলেন, রাজকুমার তখনও আসেন নাই। নরেন্দ্র তখন একটা গলিতে গা-ঢাকা দিয়া হেদোর দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন রাজকুমারকে গুলির আড্ডার দিকে চুপি চুপি আসিতে দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ গলির মুখে আসিয়া রাজকুমারের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়াই বৃদ্ধ প্রমাদ গণিলেন; তবু সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে দত্ত, এখানে কেন?" নরেন্দ্র হরিদাসের প্রার্থনা আবার পেশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখাইলেন, প্রার্থনা মঞ্জুর না হইলে গুলির আড্ডার কথা কলেজময় রটাইয়া দিবেন। বৃদ্ধ তখন বলিলেন, "বাবা, রাগ করিস কেন? তুই যা বলছিস তাই হবে। তুই যখন বলছিস, আমি কি তা না করতে পারি?" নরেন্দ্র তবু কৌতুকভরে জানিতে চাহিলেন, ইহাই যদি তাঁহার প্রকৃত মনোভাব, তবে সকালে ঐরূপ বলিতে কি আপত্তি ছিল? বৃদ্ধ বুঝাইয়া দিলেন, তখন মকুব করিলে তাহার দৃষ্টান্তে অপর ছেলেরাও ঐরূপ ধরিয়া বসিত; তবে বেতন মাপ হইলেও পরীক্ষার ফি-টা মকুব হইবে না ওটা দিতেই হইবে। নরেন্দ্রও সম্মতি জানাইয়া বিদায় লইলেন। এদিকে নরেন্দ্র চক্ষুর আড়াল হইলেই রাজকুমার একটু এদিক ওদিক তাকাইয়া গুলির আড্ডায় ঢুকিয়া পড়িলেন।

হরিদাসদের বাসা ছিল চোরবাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই নরেন্দ্র বন্ধুগৃহে আসিয়া দরজায় করাঘাত করিয়া গান ধরিলেন:

অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে!
ভানু নব তাঁর সেই প্রেমমুখ-ছায়া,
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্রভালে।
মধু-সমীরণ বহিছে শুভদিনে,
তাঁর গুণগান করি অমৃত ঢালে।
মিলিয়ে সবে যাই চল, ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে।

তারপর হরিদাসকে বলিলেন, "ওরে খুব স্ফূর্তি কর, তোর কাজ কত্তে

হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।" তারপর সে সন্ধ্যার কাহিনীটি—গা-ঢাকা দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া থাকা, রাজকুমারের চুপি চুপি আগমন ও সচকিতে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ, হঠাৎ নরেন্দ্রের আবির্ভাব, রাজকুমারের ভয়ে জড়সড় হওয়া, বেতন মাপ করিয়া গুলির আড্ডায় ঢোকা—ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গী সহকারে সকলকে দেখাইয়া ও শুনাইয়া হাসির ফোয়ারা ছুটাইলেন।

বেণী উস্তাদের গৃহ ছিল মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে। বেণী উস্তাদের পাড়ায় কেন, প্রায় বাড়ীরই কাছে একই স্ট্রীটের উপর ছিল অম্বু গুহের কুস্তীর আখড়া। উস্তাদের নিকট গান শিখিয়া নরেন্দ্রনাথ ঐ আখড়ায় কুস্তী শিখিতে যাইতেন। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ (বা ভাবী স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নরেন্দ্রেরই পাড়াতে থাকিতেন এবং নরেন্দ্রেরই সঙ্গে বহু জায়গায় যাতায়াত করিতেন। এই সূত্রে তিনিও অম্বু গুহের আখড়ায় ব্যায়ামাদি শিক্ষা করিতেন। তাছাড়া নরেন্দ্রের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজেও যাইতেন এবং সমাজের রেজেষ্ট্রিতে নাম লিখাইয়াছিলেন।

এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ পিতার আদেশে পিতৃবন্ধু এটর্নি শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র বসুর আফিসে শিক্ষানবিশরূপে কাজ করেন[১০] এবং পিতারই আদেশে ফ্রি ম্যাসনস্ লজেও ভর্তি হন (তখনকার দিনে উকিল, জজ, সরকারের বড় বড় অফিসার অনেকেই ফ্রি ম্যাসন্‌সদের দলে নাম লিখাইতেন)। বিশ্বনাথবাবু হয়তো ভাবিয়া থাকিবেন, সেখানে গেলে ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনে পুত্রের সুবিধা হইবে, কেননা সেখানে অনেক পদস্থ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইবে।[১১] নরেন্দ্রের ভ্রাতা মহেন্দ্রবাবু বলেন, বি. এ. পাসের পর বিশ্বনাথবাবু নরেন্দ্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার আশা পোষণ করিতেন, কিন্তু ঠিক তখনই দেহত্যাগ হওয়ায় তাহা হইয়া উঠে নাই।

ইহারই মধ্যে সময়ে সময়ে নরেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাবও আসিত। অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নরেন্দ্রকে জামাতারূপে পাইতে চাহিতেন এবং পিতা

১০। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে (১৫৬ পৃঃ) বি. এল পড়িবার সময় তিনি এটর্নি অফিসে যাতায়াত আরম্ভ করেন ; কিন্তু তখন পিতার দেহান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ দত্তের মতে বি. এ. পাস করার পর তিনি "পিতা বিশ্বনাথ ও খুল্লতাত তারকনাথের সহিত হাইকোর্টে যাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছেন" (পৃঃ ২৩)। আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গের' মত (৫।১৯৪ পৃঃ) অনুসরণ করিয়াছি।

১১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৫৭ পৃঃ।

বিশ্বনাথও চাহিতেন যে, এই বৈবাহিক সম্বন্ধ অবলম্বনে পুত্রের সাংসারিক উন্নতি হউক। বিশেষতঃ একটি প্রস্তাব খুবই লোভনীয় ছিল। এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে নরেন্দ্র তখনকার দিনে অতিবাঞ্ছিত আই. সি. এস. চাকুরির উদ্দেশে শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে যাইতে পারিতেন। কিন্তু নরেন্দ্র ইহাতে সম্মত হন নাই। অন্যান্য যেসব প্রস্তাব আসিয়াছিল সেগুলিও কোন না কোন কারণে নিষ্ফল হইয়া যায়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, নরেন্দ্রের অন্তরে মানবজীবনের একটা অত্যুচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিপদে তাঁহার জীবনগতিকে নিয়মিত করিতেছিল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে শাসন অতিক্রমে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। ধর্মরাজ্যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, চিন্তা-রাজ্যে পাশ্চাত্য ভাবরাশি তাঁহাকে কিছুকাল ভাবাইয়া তুলিলেও স্বমার্গে পরিচালিত করিতে পারে নাই ; সঙ্গীত, আমোদপ্রিয়তা প্রভৃতি তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সঙ্গীদের মধ্যে আনিয়া ফেলিলেও গভীর নীতিবোধ তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত হইতে দেয় নাই ; অধুনা সাংসারিক প্রলোভনও সমভাবে ব্যর্থকাম হইল।

এই প্রসঙ্গে একটি সমস্যা আমাদের মনে উঠে এবং তাহার উত্তরও সহজেই পাই। নরেন্দ্র এত প্রতিভাশালী হইয়াও পরীক্ষায় তেমন উচ্চস্থান অধিকার করিতেন না কেন ? আমরা দেখিয়াছি, এই ক্ষণজন্মা পুরুষের প্রতিভা ছিল বহুমুখী, আর ঐ সর্বতোমুখী শক্তি সুপ্ত না থাকিয়া একই কালে সকল দিকে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ ছিল। আবার পরীক্ষাটাকে তিনি কখনই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন নাই। উহার জন্য নেহাত যেটুকু সময় না দিলে চলে না, সেটুকুই মাত্র তিনি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাকী সময় তিনি কাটাইতেন স্বাভিলাষানুরূপ পাঠ্যবহির্ভূত গ্রন্থপাঠে, ব্যায়ামে, ক্রীড়াকৌতুকে, সঙ্গীতে, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদিতে। তাহার উপর শারীরিক অসুস্থতা, পিতার সহিত দূরে অবস্থান, পারিবারিক বিবাদবশতঃ গৃহপরিবর্তন প্রভৃতিও ছিল। আর ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা, যাহা তাঁহাকে জাগতিক অভ্যুদয়কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ভাবিতে দিত না। এই সর্বপ্রকার বিবদমান শক্তিসমূহের মধ্যে যাঁহাকে স্বাভীপ্সালাভের জন্য সতত যত্নপর থাকিতে হয়, বৌদ্ধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বোচ্চ আসন লাভ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

বুদ্ধি তাঁহার যথেষ্টই ছিল এবং বুদ্ধির জন্য তিনি তাঁহার অধ্যাপক এবং

কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেস্টি সাহেবের প্রশংসালাভও করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকৃতই একজন প্রতিভাসম্পন্ন বালক। আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন একটি ছাত্র আর দেখি নাই, এমন কি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রদের মধ্যেও নহে। এ বালক নিশ্চয়ই জগতে একটা দাগ রাখিয়া যাইবে।" শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মন্তব্য আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি, শীল মহাশয়ের মতে কলেজ-জীবনে নরেন্দ্র একটা বৌদ্ধিক অনিশ্চয়তা বা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তবু পরাজয় স্বীকার করিয়া তিনি অন্বেষণ হইতে বিরত হন নাই, বরং গভীরতররূপে পাশ্চাত্য দর্শনের অনুশীলন করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের সহিত পত্র-বিনিময়ও করিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকপ্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জন্য স্পেনসারের শিক্ষাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৫৪ পৃঃ)। শোনা যায়, স্পেন্সারের মতের কোন কোন বিষয়ে সমালোচনা করিয়া তিনি তাঁহাকে জানাইলে স্পেন্সার নরেন্দ্রকে দর্শনপ্রীতির জন্য প্রশংসা করেন এবং স্বীয় গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে সমালোচিত বিষয়ের সংশোধন করিতে সম্মত হন। (প্রমথনাথ বসু, ৭১ পৃঃ)

বুদ্ধির প্রাখর্য থাকিলেও নরেন্দ্রনাথ স্বীয় হৃদয়কে মরুভূমিতে পরিণত করেন নাই। এইজন্যই তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য তাঁহাকে বারংবার তাহাদের নিকট টানিয়া আনিত এবং তাহাদের সেবাদিতে নিয়োজিত করিত; তাঁহার সৌন্দর্যবোধ তাঁহাকে সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি চারুকলাতে পারদর্শিতা আনিয়া দিত; সত্যসন্ধিৎসা তাঁহাকে ধ্রুবতারার ন্যায় সর্বদা পথ দেখাইয়া চলিত এবং মঙ্গলবোধ তাঁহাকে পদস্খলন হইতে রক্ষা করিত। আবার মন উচ্চ উচ্চতর স্তরে উড্ডীয়মান থাকিলেও পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখদুঃখ তিনি ভুলেন নাই, অস্বীকারও করেন নাই। ভবিষ্যতে শিক্ষার কথা বলিতে গিয়া তিনি মানব-চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের উপরই জোর দিয়াছিলেন; আর স্বীয় দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার ক্ষেত্রে তাহাই দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই সে যুগে ধারণা ছিল, বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমকালীন ও সমসমান উৎকর্ষ অসম্ভব, হয়তো বা অবাঞ্ছনীয়—হৃদয়ের দিকে ঝুঁকিলে বুদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ক্রমে চারিত্রিক দুর্বলতা আসিয়া পড়ে। এ যুগেও বিজ্ঞানচর্চায় রত প্রতিভাবান অনেকে

ধর্মাদির প্রয়োজন স্বীকার করেন না। নরেন্দ্রনাথের জীবনে কিন্তু দেখিতে পাই, তিনি ছিলেন কঠোর ব্রহ্মচারী—ধনীর সন্তান হইয়াও ভূ-শয্যায় শয়ন করিতেন, এবং বেশভূষায় সম্পূর্ণ বিলাসিতা বর্জন করিতেন। তাঁহাকে বন্ধুরা অতিমাত্র নীতিপ্রবণ বলিয়াই জানিতেন। পরবর্তী কালে, আমেরিকায় থাকাকালে এক চিঠিতে (৬।৭।৯৬) তিনি লিখিয়াছিলেন, এমন এক সময় ছিল, যখন রাস্তার যে ফুটপাথ অনৈতিকতার আশ্রয়স্থল, তিনি তাহা এড়াইয়া চলিতেন। এইরূপ কঠোর জীবনযাপনের একটা যুক্তি এই পাওয়া যায় যে, ধর্ম ছিল তাঁহার মতে অপরোক্ষানুভূতির জিনিস, শুধু কথার কথা নহে। এই অনুভূতির জন্য প্রয়োজন আপ্রাণ সাধনা। আবার ভগবানের আসন স্থাপিত হয় বুদ্ধিপীঠে নয়, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-পবিত্রতা ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত এবং বুদ্ধিদ্বারা পরিমার্জিত হৃদয়-বেদীতে। হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন ছিল বিবেকানন্দ-বাণীর অন্যতম মর্মকথা, আর সে সমন্বয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল তাঁহারই নিজ জীবনে; কার্যে পরিণত বেদান্তের ভিত্তিও পাই এখানেই। জনসাধারণ এ তত্ত্ব তখন সহজে ধরিতে পারে নাই—এখনও পূর্ণভাবে বুঝিবার দিন ভবিষ্যতেরই গর্ভে নিহিত। অতএব সেই প্রায় শত বৎসর পূর্বে নরেন্দ্রকে ভুল বুঝিবার অবকাশ যথেষ্টই ছিল। বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনে উদ্যত নরেন্দ্ররই পক্ষে সম্ভব ছিল একদিকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং অপরদিকে 'ঈশানুসরণ', ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর কাব্য ইত্যাদির অনুশীলন। নেতির পথে তিনি চলেন নাই; কারণ তাঁহার ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন হৃদয়, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, সর্ব অধিষ্ঠানে।

নারায়ণ-সকাশে নর-ঋষি

নরেন্দ্রের জীবনের গতি ও উদ্দেশ্য অপরের নিকট অবোধ্য ও অজ্ঞাত থাকিলেও দক্ষিণেশ্বরে তখন এমন একজন ছিলেন যিনি তাহা ঠিক ঠিক জানিতেন এবং সে জীবনকে সার্থকতার দিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে এক অপূর্ব কাহিনী। ঘটনাপরম্পরা ক্রমেই নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার দিকে পরিচালিত করিতেছিল।

ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক সেদিন কোন কারণে ক্লাশে অনুপস্থিত থাকায় কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত উইলিয়ম হেষ্টি ছাত্রদিগকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পড়াইতেছিলেন—পাঠ্য কবিতাটি ছিল 'এক্‌স্কার্শন'। উহাতে কবি জানাইতেছেন কিরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুধাবন করিতে করিতে তাঁহার মন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যাইত। ছাত্রগণ অনন্যভূত তত্ত্ব ধারণা করিতে পারিতেছে না দেখিয়া হেষ্টি মহোদয় বুঝাইয়া বলিলেন, "মনের পবিত্রতা এবং বিষয়-বিশেষের প্রতি একাগ্রতার ফলে ঐরূপ অনুভূতি আসিয়া থাকে। অবশ্য ইহা দুর্লভ, বিশেষতঃ আধুনিক কালে। আমি এমন একজন মাত্র লোককে দেখিয়াছি যিনি মনের ঐ অতি শুভ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ; তিনি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস। তোমরা সেখানে গিয়া নিজে দেখিয়া আসিলে ইহা বুঝিতে পারিবে।"[১] নরেন্দ্রও সেদিন অপরদেরই মতো সে কথা শুনিলেন, কিন্তু তখনও পরম পুরুষের

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট স্বামীজির সহপাঠী হরমোহন মিত্র ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করেন—"একদিন আমাদের ইংরেজীর অধ্যাপক সাহেব ছেলেদের উপর খুব চটিয়া যান, ছেলেরা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা বুঝিতে পারিতেছিল না। তিনি বিরক্তিভরে টেবিল চাপড়াইয়া পা রাখিবার পা-দানিতে পদাঘাত করিয়া অবশেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ঠিক এই সময় আমিও একটা কাজে বাহিরে যাইতেছিলাম ; কিন্তু দেখিলাম অধ্যক্ষ মাননীয় হেষ্টি সাহেব ক্লাশের দিকে আসিতেছেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া হেষ্টি সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, 'অমুক মহাশয় বলেন ছেলেরা বোকা এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাব ধরিতে পারে না। হয়তো তিনি নিজেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে বুঝেন না ; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সমাধি প্রভৃতি হইত।' তারপর তিনি এই বলিয়া শেষ করিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে এমন এক ব্যক্তি বাস করেন যাঁহার সমাধি হয়, 'তোমরা তাঁহাকে দেখিয়া আস।' ক্লাশের ছাত্রেরা সেই প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিল।" (*Vivekananda : Patriot-prophet*, ১৫৫ পৃঃ)।

সান্নিধ্যলাভের মঙ্গল মুহূর্ত আসে নাই, নরেন্দ্রের মনে ঐ সংবাদটুকু একটা শুভ ও আকাঙ্ক্ষণীয় স্মৃতিরেখা রাখিয়া অতীতের বক্ষে মিলাইয়া গেল।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা তীব্রতর রূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি এবং কয়েকজন আগ্রহশীল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা করিতেন এবং ধ্যানান্তে মহর্ষি জানিতে চাহিতেন, কাহার কিরূপ অনুভূতি হইতেছে। নরেন্দ্র উপলব্ধি করিতেন, যেন একটা জ্যোতিবিন্দু ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে ভ্রূযুগল মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। তারপর ঐ বিন্দু হইতে বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য উজ্জ্বল রশ্মি চতুর্দিকে বিকিরিত হয়। ক্রমে তাঁহার চেতনা সসীমের গণ্ডি ছাড়াইয়া এক অসীমের দিকে প্রসারিত হয়; কিন্তু ঠিক এখানে আসিলেই ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়, আর সেই আলোকোদ্ভাসিত বিবিধ বর্ণ অন্তর্হিত হয়। মহর্ষি এই যুবকের যোগশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ধ্যানে উৎসাহ দিতেন, অপরের নিকট তাঁহার প্রশংসাও করিতেন। নরেন্দ্র শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে মহর্ষিভবনে যাইতেন ও স্বগৃহে নিয়মিত ধ্যান করিতেন। প্রাণের পিপাসা কিন্তু মিটিত না। এই অভাবসঞ্জাত অসন্তোষ যখন অসহ্য হইয়াছে, তখন তিনি একদিন আবেগভরে মহর্ষির নিকট চলিলেন—আজ চরম প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর আদায় করিতেই হইবে। মহর্ষি তখন গঙ্গাবক্ষে নৌকায় বাস করিতেছিলেন। দ্রুতপদে আত্মবিস্মৃত নরেন্দ্রনাথ ভিতরে অকস্মাৎ উপাসনামগ্ন মহর্ষির সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আবেগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?" সাগ্রহ যুবকের তীব্রকণ্ঠের এই সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নে মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া নরেন্দ্রকে দেখিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ উত্তর দিলেন না।—ক্ষণকাল নরেন্দ্রের নেত্রমধ্যে আপন দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "বৎস তোমার নয়নদ্বয় ঠিক যোগীর নয়নের ন্যায়।" নিষ্ফলপ্রয়াস নরেন্দ্র আবার কোলাহলময়ী মহানগরীর এককোণে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহর্ষির নিকট প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। অতঃপর অপর কোন কোনও ধর্মনেতার আশ্রয় লইয়া তিনি সেই একই প্রশ্ন তুলিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?" কিন্তু সকলেই নীরব! এখন কি হইবে? এমন সময় দক্ষিণেশ্বরের সেই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি মনে জাগিল, তাঁহার সহিত মিলনেরও এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথ যখন এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত

হইতেছেন তাহার পূর্বেই সিমুলিয়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি একদিন স্বীয় বাসভবনে ভক্তবৃন্দসহ শ্রীরামকৃষ্ণকে আমন্ত্রণপূর্বক একটি ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন করিলেন। সেদিন সে উৎসবে সুগায়কের প্রয়োজন ছিল। পাড়ার উদীয়মান সুকণ্ঠ যুবক নরেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের অপরিচিত ছিলেন না; অতএব সুরেন্দ্র তাঁহাকেই আহ্বান জানাইলেন। নরেন্দ্র সংবাদ পাইলেন, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনাইতে হইবে—সেই পরমহংস রামকৃষ্ণ যাঁহার প্রশংসা হেষ্টি সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলেন এবং যিনি হয়তো তাঁহার সেই উত্তরহীন জিজ্ঞাসার সমাধান করিতে পারিবেন। নরেন্দ্র সম্মত হইয়া সেখানে গেলেন এবং কলাবতের শিক্ষাগুণে সুসাধিতকণ্ঠে সুরতাললয় সহ ভজনগান শুনাইয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। নবাগত গায়কের শারীরিক লক্ষণ, ভাবতন্ময়তা প্রভৃতি সবই শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্য করিলেন এবং সেই প্রথম মিলনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে নরেন্দ্রের আত্মীয় রামচন্দ্রকে[২] নিকটে ডাকিয়া এই প্রিয়দর্শন, সর্বসুলক্ষণ যুবকের পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। আবার ভজন সমাপ্ত হইলে স্বয়ং যুবকের পার্শ্বে আসিয়া তাঁহার দৈহিক লক্ষণাবলী নিরীক্ষণান্তে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন।

কয়েক সপ্তাহ পরেই এফ. এ. পরীক্ষা হইয়া গেল এবং নরেন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে পাস করিলেন। অমনি শহরের এক ধনী পরিবার হইতে বিবাহের

২। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে (১৪০--৪১ পৃঃ) শ্রীরামচন্দ্র দত্ত ছিলেন কুঞ্জবিহারী দত্তের পৌত্র, আর নরেন্দ্রনাথের মাতামহী রঘুমণি দেবী ছিলেন কুঞ্জবিহারীর দৌহিত্রী। অতএব রামচন্দ্র ভুবনেশ্বরী দেবীর মামা। নরেন্দ্রের মাতামহী রঘুমণির জন্ম হয় আনুমানিক ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এবং দেহান্ত হয় ২০শে জুলাই, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার পিতা বিডন স্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ কুঞ্জবিহারী দত্তের প্রথমা কন্যা রাইমণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কুঞ্জবিহারীর পুত্র নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত পৈতৃক সম্পত্তি হারাইয়া দ্বিতীয় পুত্র রামচন্দ্রের সহিত বিশ্বনাথ বাবুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে রামচন্দ্রের সাধারণ বিদ্যালাভ হয়। পরে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়া বিবাহ করেন এবং রঘুমণি দেবীর ৭নং রামতনু বসুর লেনস্থ বাটীতে চলিয়া যান। ইহারও পরে তিনি মধুরায় লেনে নিজস্ব বাটী প্রস্তুত করেন। অতএব মহেন্দ্র নাথ দত্ত যদিও লিখিয়াছেন, "পূজনীয়া ভুবনেশ্বরী যদিও সম্পর্কে রামচন্দ্রের ভগিনী হইতেন" ইত্যাদি (৭ পৃঃ), তথাপি ইহা ভুল বলিয়াই মনে হয়।

প্রস্তাব আসিল। পাত্রী শ্যামবর্ণা বলিয়া কন্যাপক্ষ দশ সহস্র মুদ্রা যৌতুক দিতে সম্মত ছিলেন, এবং বিশ্বনাথবাবুর নিকটও এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হইয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বিবাহে অসম্মতি জানাইলেন। তখন বিশ্বনাথের অনুরোধক্রমে রামচন্দ্র ও অপর আত্মীয়বান্ধবগণ নরেন্দ্রকে নানাভাবে বুঝাইলেন, কিন্তু নরেন্দ্রের মত অপরিবর্তিত রহিল। রামবাবু বুঝিতে পারিলেন ধর্মভাবের প্রেরণাই নরেন্দ্রের এই অসম্মতির কারণ। পূর্ব হইতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকেও সেখানে লইয়া যাইতেন কিংবা যাইবার পরামর্শ দিতেন। অতএব নরেন্দ্রকেও খোলাখুলি ভাবেই বলিলেন, "যদি ধর্মলাভ করতেই তোমার যথার্থ বাসনা হয়ে থাকে তো ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থানে ঘুরে না বেড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট চল।" প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথও একদিন তাঁহারই গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার আহ্বান জানাইলেন। প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক নরেন্দ্রনাথ দুইজন বয়স্য ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত ঘোড়া-গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন (পৌষ-মাস, ১৮৮১ খৃঃ)।[৩] দক্ষিণেশ্বরে এই প্রথম মিলনের বিবরণ আমরা পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের অতুলনীয় ভাষায় উপস্থিত করিব ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।৫৭-৬২ পৃঃ)। 'লীলা-প্রসঙ্গ'কার বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন ঠিক তেমনি লিখিয়াছেন, যদিও ঠাকুরের মুখের কথা তিনি স্বীয় মার্জিত ভাষায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন:

"পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে (দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে) ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম নিজের শরীরের দিকে

৩। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে ইহা দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের প্রথম আগমন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার (৫।৫৫-৫৭ পৃঃ); 'কথামৃতে'র মতে প্রথম আগমন ও প্রথম সাক্ষাৎকার (৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ২য় পরিচ্ছেদ)। দ্বিতীয় মতে রাজমোহনের বাড়ীতে দ্বিতীয় মিলন হয়। সুরেন্দ্র মিত্রের বাড়ীর উৎসবের উল্লেখ 'কথামৃতে' নাই; বস্তুতঃ ঐ উৎসব 'কথামৃত'-কারের আগমনের পূর্বে হয়।

'লীলাপ্রসঙ্গ'কার পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"হেষ্টি সাহেবের নিকট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র ঠাকুরের কথা প্রথম শ্রবণ করিবার পর সুরেন্দ্রনাথের আলয়ে তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মসমাজে ইতিপূর্বে গতিবিধি থাকায় তিনি ঠাকুরের কথা ঐ স্থানেও শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়" (৫।৯৮)।

লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও শরীরের বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই। বাহিরের কোন পদার্থেই ইতরসাধারণের মতো একটা আঁট নাই; সবই যেন তার আলগা, এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব?

"মেজেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে, তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে সেইদিন দুই-চারিজন আলাপী ছোকরাও ছিল। বুঝিলাম, তাহাদের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়; ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান তখন সে দুই-চারিটি মাত্র শিখিয়াছে; তাহাই গাহিতে বলিলাম। তাহাতে সে ব্রাহ্ম-সমাজের 'মন চল নিজ-নিকেতনে' গানটি ধরিল এবং ষোল আনা মন প্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না—ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।[৪] পরে সে চলিয়া যাইলে তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে,

৪। 'কথামৃতে'র (ঐ) মতে নরেন্দ্র দুইখানি গান গাহিয়াছিলেন—

(ক) মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসারবিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন;
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে?
সত্যপথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন
গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্বস্ব হরণ,
তাই বলি মন রেখো রে প্রহরি
শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ
সে পান্থনিবাসিগণে।
যদি দেখ পথে ভয়েরই আকার
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার;
সেপথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন ডরে যাঁর শাসনে।

(খ) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে?
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে?
হৃদয়-কুটীর-দ্বার খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে?

বলিবার নহে। যেন কে গামছা নিঙড়াইবার মতো জোর করিয়া নিঙড়াইতেছে। তখন আপনাকে আর সামলাইতে পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশে ঝাউতলায় যেখানে কেউ বড় একটা যায় না, যাইয়া 'ওরে তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম। খানিকটা এইরূপ কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম। ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ঐরূপ হইয়াছিল। আর সব ছেলেরা যাহারা এখানে আসিয়াছে তাহাদের কাহারও কাহারও জন্য কখন কখন মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে।"

ঐদিনের ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্বোক্ত কথায় সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ একদিন স্বামী সারদানন্দকে উহার একটি পূর্ণতর বিবরণ দিয়াছিলেন। উহা এইরূপ :

"গান তো গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারান্দা আছে, তথায় লইয়া গেলেন। শীতকাল; উত্তরে হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারান্দায় থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল, সুতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন লোককে দেখিতে পাওয়া যাইত না। বারান্দায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন, তাহা একেবারেই কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরমস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে'—ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন। পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মতো আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ'—ইত্যাদি ("লীলাপ্রসঙ্গ", ৫।৬০ পৃঃ)।

"আমি তো তাঁহার ঐরূপ আচরণে একেবারে নির্বাক—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি? এতো একেবারে উন্মাদ! না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি—আমাকে এইসব কথা বলে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে খাবারগুলি দিন, আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইগে', তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও' বলিয়া সকলগুলি আমাকে খাওয়াইয়া তবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকট একাকী আসিবে?' তাঁহার ঐরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আসিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীদের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।"

গৃহমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আশে-পাশে বালক, যুবক ও বৃদ্ধ অনেকেই উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ঠাকুর নরেন্দ্রের উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ স্থির ধারণায় উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখ, দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জ্বল জ্বল করছে!" যাঁহারা ঠাকুরের এই কথা শুনিলেন, তাঁহারা অবাক হইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুরের কথাগুলিই যে শুধু অভিনব ছিল তাহা নহে, তিনি যে নরেন্দ্রের মধ্যে এইরূপ গভীর ভাবসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাও কম আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি ঘুমোবার আগে একটা জ্যোতি দেখিস?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ!" ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, "বাঃ সব মিলে যাচ্ছে। এ ধ্যানসিদ্ধ—জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ।"

নরেন্দ্র বসিয়া বসিয়া সব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন ঠাকুরের চালচলনে, কথাবার্তায়, অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মতো কিছুই নাই। বরং তাঁহার সদালাপ এবং ভাবসমাধি দেখিয়া নরেন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিল, ইনি সত্য সত্যই ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগী, এবং মুখে যাহা বলিতেছেন, তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি অতি সহজ সরল ভাষায় উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা বলিতেছিলেন; তাই নরেন্দ্রের মনে হইল "ইনি হয়তো সত্যই একজন উঁচুদরের

সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ !" অতএব যে প্রশ্ন আজ পর্যন্ত তিনি ধর্মাচার্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছেন, সেই প্রশ্ন লইয়াই তাঁহার দিকে আগাইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন ?" ঠাকুরও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি ; তবে এর চেয়েও আরো ঘনিষ্ঠরূপে।" তিনি আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ঈশ্বরদর্শন হয়, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে, ঠিক যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা চায় ? লোকে মাগ-ছেলের শোকে, বিষয়-আশয়ের দুঃখে ঘটি-ঘটি কাঁদে, কিন্তু ভগবানের জন্য কে তা করে ? সরলভাবে ভগবানের জন্য কাঁদলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন।" নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "উহাতে তখনই আমার প্রত্যয় জন্মিল। মনে হইল, তিনি অপর ধর্মপ্রচারকসকলের ন্যায় রূপক বা কল্পনার সাহায্য লইয়া ঐরূপ কথা বলিতেছেন না, সত্য সত্যই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণমনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন।" তখন তাঁহার ইতিপূর্বের আচরণের সহিত ঐ সকল কথার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া নরেন্দ্রের দৃঢ়নিশ্চয় হইল, ইংরেজ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গ্রন্থে যেসকল অর্ধোন্মাদের (মনোম্যানিয়াক-এর) কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইনিও ঐরূপ হইবেন। ঐরূপ নিশ্চয় করিয়াও কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরার্থে অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলেন না, নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য এরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম ; উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহা পবিত্র, মহা ত্যাগী, এবং ঐজন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন ঠাকুরের চরণবন্দনা করিয়া এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন।[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণকে বায়ুগ্রস্ত বলিয়া স্থির করিলেও তাঁহার সান্নিধ্যে যে দিব্যোল্লাস অনুভব করিয়াছেন তিনি তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। এতগুলি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঠাকুরের অনুরক্ত ভক্ত, তাঁহার মুহুর্মুহু সমাধি এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থান, তাঁহার চারিদিকের শান্ত পবিত্র পরিবেশ, ও মধুমাখা কথা এবং তাঁহার সান্নিধ্যপ্রভাবে ভগবৎপ্রবণতা—ইত্যাদি সমস্তই

৫। 'লীলাপ্রসঙ্গ'। ৫।৩১-৩২ পৃঃ এবং ইংরেজী-জীবনী ৪৬-৪৮ পৃঃ।

নরেন্দ্রের নিকট অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইলেও নরেন্দ্র তাঁহাকে নিজ জীবনের আদর্শ বা গুরুরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; সুতরাং দৈনন্দিন শতসহস্র কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় একমাস কালের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে পুনর্বার যাইয়া প্রতিজ্ঞারক্ষার কথা ভাবিতেই পারিলেন না। কিন্তু অবশেষে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে বলপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে লইয়া চলিল। কলিকাতা হইতে তিনি পদব্রজে সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে গমনের কথা তিনি নিজমুখে এইরূপ বলিয়াছিলেন:

"দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দূরে তাহা ইতিপূর্বে গাড়ী করিয়া একবার মাত্র যাইয়া বুঝিতে পারি নাই। বরাহনগরে দাশরথি সান্ন্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ী প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকটে পূর্ব হইতে যাতায়াত ছিল। ভাবিয়াছিলাম, রাসমণির বাগান তাহাদেরই বাটীর নিকটে হইবে; কিন্তু যত যাই, পথ আর ফুরাইতে চাহে না! যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কোনরূপে দক্ষিণেশ্বরে পৌছিলাম এবং একেবারে ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি পূর্বের ন্যায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত ছোট খাটখানির উপর একাকী আপনমনে বসিয়া আছেন—নিকটে কেহই নাই। আমাকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই একপ্রান্তে বসাইলেন। বসাইবার পরেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম, তিনি যেন কেমন একপ্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি কি বলিতে বলিতে স্থিরদৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। ভাবিলাম, পাগল বুঝি, পূর্বদিনের ন্যায় আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে। এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে স্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল, আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো, তুমি আমার একি করলে? আমার যে বাপ-মা আছেন?' অদ্ভুত পাগল আমার ঐ কথা শুনিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্ত-

দ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে!' আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ঐরূপ স্পর্শ করিয়া ঐ কথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম, এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। .

"বলিতে এত বিলম্ব হইলেও ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল এবং উহার দ্বারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি হইল? দেখিলাম তো, উহা এই অদ্ভুত পুরুষের প্রভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া সহসা লয় হইল। পুস্তকে মেস্‌মেরিজিম (মোহিনী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চারণ) ও হিপ্‌নটিজম (সম্মোহন-বিদ্যা) সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, উহা কি ঐরূপ কিছু একটা? কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্তে প্রাণ সায় দিল না। কারণ দুর্বল মনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐ সকল অবস্থা আনয়ন করেন। কিন্তু আমি তো ঐরূপ নহি; বরং এতকাল পর্যন্ত বিশেষ বুদ্ধিমান ও মানসিক বলসম্পন্ন বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আসিতেছি। বিশিষ্ট গুণশালী পুরুষের সঙ্গলাভপূর্বক ইতর-সাধারণে যেমন মোহিত এবং তাঁহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলি স্বরূপ হইয়া পড়ে আমি তো ইঁহাকে দেখিয়া সেইরূপ হই নাই; বরং প্রথম হইতেই ইঁহাকে অর্ধোন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তবে আমার সহসা ঐরূপ হইবার কারণ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; প্রাণের ভিতর একটা বিষম গোল বাধিয়া রহিল। মহাকবির কথা মনে পড়িল, 'পৃথিবীতে এবং স্বর্গে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, মানব-বুদ্ধি-প্রসূত দর্শনশাস্ত্র যাহাদিগের স্বপ্নেও রহস্যভেদের কল্পনা করিতে পারে না।' মনে করিলাম, উহাও ঐরূপ একটা। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, উহার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং দৃঢ় সংকল্প করিলাম, অদ্ভুত পাগল নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া আর যেন কখনও ভবিষ্যতে আমার মনের উপর আধিপত্যলাভপূর্বক ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত না করিতে পারে।

"আবার ভাবিতে লাগিলাম, ইচ্ছামাত্রেই এই পুরুষ যদি আমার ন্যায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের দৃঢ় সংস্কারময় গঠন ঐরূপে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাদার তালের মতো করিয়া উহাকে আপন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইঁহাকে পাগলই

বা বলি কিরূপে ? কিন্তু প্রথম দর্শনকালে আমাকে একান্তে লইয়া যাইয়া যেরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং যেসকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকলকে ইঁহার পাগলামির খেয়াল ভিন্ন সত্য বলিয়া কিরূপে মনে করিতে পারি ? সুতরাং পূর্বোক্ত অদ্ভুত উপলব্ধির কারণ যেমন খুঁজিয়া পাইলাম না, শিশুর ন্যায় পবিত্র এবং সরল এই পুরুষের সম্বন্ধেও কিছু একটা স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্ক সহায়ে প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই ; অদ্য সেই স্বভাবে দারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ফলে মনে পুনরায় সঙ্কল্পের উদয় হইল, যেরূপে পারি, এই অদ্ভুত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথা যথাযথভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে।

"ঐরূপে নানা চিন্তায় ও সঙ্কল্পে সেদিন আমার সময় কাটিতে লাগিল। ঠাকুর কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া গেলেন এবং পূর্বদিবসের ন্যায় নানাভাবে আমাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে এবং সকল বিষয়ে বহুকালের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতিপ্রিয় আত্মীয় বা সখাকে বহুকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের যেরূপ হইয়া থাকে, আমার সহিত তিনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। খাওয়াইয়া, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গ পরিহাস করিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার ঐরূপ ভালবাসা ও ব্যবহারও আমার স্বল্প চিন্তার কারণ হয় নাই। ক্রমে অপরাহ্ণ অতীতপ্রায় দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটে সেদিনকার মতো বিদায় যাজ্ঞা করিলাম। তিনি যেন তাহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া 'আবার শীঘ্র আসিবে, বল' —বলিয়া পূর্বের ন্যায় ধরিয়া বসিলেন। সুতরাং সেদিনও আমাকে পূর্বের ন্যায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল।" ('লীলাপ্রসঙ্গ' ৫।৮৫-৮৯)

ইহার কতদিন পরে নরেন্দ্রনাথ তৃতীয় বার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন জানা নাই ; তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং উপস্থিত সমস্যার শীঘ্র শীঘ্র সমাধান করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথের যে স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল তাহা হইতে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার অনুমান করেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে সন্দেহাদির নিরসনকল্পে তিনি এক সপ্তাহ পরেই আবার আসিয়া থাকিবেন। সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী যদু মল্লিক মহাশয়ের উদ্যানে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। যদুবাবু ও তাঁহার মাতা শ্রীরামকৃষ্ণের

প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং বাগানের মালির প্রতি আদেশ দেওয়া ছিল, তিনি বাগানে বেড়াইতে আসিলেই যেন গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা ঘর তাঁহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। ঐদিন নরেন্দ্রকে লইয়া বাগানে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ ভ্রমণ ও কথাবার্তার পর ঠাকুর তাঁহার সহিত ঐ ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র দূরে বসিয়া ঠাকুরকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুর সহসা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন এবং নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইলেন। ঐ সময় কি ঘটিয়াছিল তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।[৬] যখন সংজ্ঞা ফিরিল, তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন। ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর পরে ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন :

"বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইলে নরেন্দ্রকে সেদিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম —কে সে, কোথা হইতে (পৃথিবীতে) আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, কতদিন এখানে (পৃথিবীতে) থাকিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম, তাহার ঐ কালের উত্তরসকল তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। সেসকল কথা বলিতে নিষেধ আছে। উহা হইতেই কিন্তু জানিয়াছি, সে (নরেন্দ্র) যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ় সঙ্কল্প সহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে। নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ !" (ঐ, ৫।৯০-৯১ পৃঃ)

নরেন্দ্রনাথের স্বরূপসম্বন্ধে দিব্যদর্শনপ্রভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের আগমনের পূর্বেই যাহা জানিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও তিনি কথাপ্রসঙ্গে পরে একদিন ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন—"একদিন দেখিতেছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন

৬। "নরেন্দ্র—'যদু মল্লিকের রান্নাবাড়ীতে একদিন আমায় স্পর্শ করে কি মনে মনে বললেন, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম ; সেই নেশায় অমন এক মাস ছিলুম।" ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট)। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে এই ঘটনা হয় বৈঠকখানায়।

বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম, এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকল পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্যজ্যোতির্ঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা, দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদের মহত্ত্বের কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্যশিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল ; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে বুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষলোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও, তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, 'এ সেই ব্যক্তি'।" 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার লিখিয়াছেন, "দর্শনোক্ত দেবশিশুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অন্য এক সময়ে জানিয়াছিলাম, ঠাকুর স্বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন।" (ঐ, ৫।২১-২২ পৃঃ)

আর একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি আলোর রেখা যেন বারাণসীর দিক হইতে কলিকাতাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে, এবং তিনি সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে ; এখানকার লোক যে তাকে একদিন না একদিন এখানে আসতেই হবে।"

এদিকে এই তিন দিনের অভিজ্ঞতার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঠাকুর উন্মাদ নহেন, দৈবশক্তিসমৃদ্ধ ও ঈশ্বরানুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ। ঈশ্বরেচ্ছার সহিত স্বকীয় ইচ্ছা একীভূত হওয়ায় তিনি অপরের মহাকল্যাণ সাধনে সক্ষম। এবং এইরূপ ত্যাগ, পবিত্রতা, সরলতা ও করুণা বিভূষিত ব্যক্তির হস্তে স্বীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে পারিলে মানুষ কৃতকৃতার্থ হয়। বস্তুতঃ স্বীয় প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে যদিও তিনি গুরুকরণে আস্থা রাখিতেন না, তথাপি এই কয়দিনেব অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার মতপবিবর্তন ঘটিল। অবশ্য তখনও তিনি নির্বিচারে ঠাকুরেব সকল কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না, বিনা পরীক্ষায় এবং স্বীয় অনুভব-নিবপেক্ষভাবে কোন কথা মানিয়া লওয়ার মধ্যে তিনি কোন যৌক্তিকতা দেখিতে পাইতেন না। ফলতঃ এখন হইতে ঠাকুরের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে এক শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও নরেন্দ্রনাথের বিচারশক্তি সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিল। এই ভাবদ্বয়ের সম্মিলন ও সংঘর্ষ অবলম্বনেই অতঃপর এই লোকাতীত মহাপুরুষদ্বয়ের মানবীয় সম্বন্ধের বিকাশ ঘটিতে থাকিল। অর্থাৎ নরেন্দ্র যদিও এখন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই হইয়া গেলেন, তথাপি ঠাকুব তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করিলেন না—নরেন্দ্রের স্বাধীনতা অটুট রহিল।

ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারকালে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেসব কথা শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার যেরূপ অদ্ভুত আচরণ দেখিয়াছিলেন, উহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে একটু সময় লাগা আশ্চর্য নহে ; কারণ অবতারবাদে বিশ্বাস না থাকিলে ঐসব কথা ও আচরণের মর্মোদ্‌ঘাটন সম্ভবপর নহে। এদিকে নরেন্দ্রের যুক্তিপরায়ণ ও ব্রাহ্মভাবরঞ্জিত মন অকস্মাৎ তাঁহাকে অযৌক্তিক অবতারবাদ স্বীকার করিতে দিল না। ঠাকুর অবশ্য সবই জানিতেন—জানিতেন তিনি কে, নরেন্দ্র কে, এবং নরেন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহার প্রথম প্রয়োজন ছিল নরেন্দ্রনাথকেও ঐসব বিষয়ে অবহিত করানো।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম মিলনক্ষণে প্রকাশ্য ঘোষণার পরেও সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই, দ্বিতীয় দিনে নরেন্দ্রের ভয়বিহ্বলতা ঠাকুরের হাস্যোদ্রেক করিয়াছিল এবং প্রয়োজনসিদ্ধির পথেও অন্তরায় হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে ঠাকুর শুধু স্বীয় পূর্ব-ধারণার সত্যতা নির্ধারণে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মানবদেহ ধারণ ও মানবীয় সমাজে বসবাসের প্রয়োজনে নরেন্দ্রনাথকে যে বাহ্য যুক্তি-তর্ক ও আচার-ব্যবহারের মুখোস পরিতে হইয়াছিল, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৈবী অবচেতনা যাহাতে চেতনার স্তরে আত্মবিকাশ করিতে পারে তাহার সূত্রপাত করাও আবশ্যক ছিল। বস্তুতঃ পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন নরেন্দ্রের অন্তর্দেবতাকেও জাগাইয়া ছিলেন, সেদিন হইতেই নরেন্দ্রনাথের জীবনে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক বিকাশের সূত্রপাত। সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি তিনি, ঠাকুরের চিহ্নিত ব্যক্তি তিনি, জগৎকল্যাণে অবতীর্ণ তিনি—সবই ছিল ঠাকুরের নিকট অভ্রান্ত সত্য; কিন্তু নরেন্দ্রের চেতনার ভূমিতে এই আত্মতত্ত্বের বোধ জাগ্রত না হইলে এইসব তথ্য মানবসমাজে কার্যকর হইবে কিরূপে? সুতরাং ঠাকুরের সেদিনকার প্রয়াস গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ইহার প্রভাবে নরেন্দ্র ঠাকুরকে আর উন্মাদ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না; নরেন্দ্রের নিজের অসীম গুণাবলী সম্বন্ধে ঠাকুরের কথাগুলিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও ক্রমে সেগুলি তাঁহার আত্মবিশ্বাস জাগাইতে লাগিল; এবং ঠাকুরের পবিত্র জীবন, অপূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী ও দৃষ্টিভঙ্গী, এবং ঐ সকল তত্ত্বকথার গভীর অর্থ ও মনুষ্যসমাজের পক্ষে অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার যুক্তিবাদী মন ক্রমেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে লোকোত্তর পুরুষ, এমনকি অবতার বলিয়া মানিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু সেসব পরের কথা।

আপাততঃ নরেন্দ্রের সংশয়ের রূপ পূর্বেরই ন্যায় থাকিয়া গেল, যদিও অলক্ষিতে তাহার শক্তিহ্রাস পাইতে থাকিল। আপাততঃ নরেন্দ্র বিশ্বাসের প্রলেপ দিয়া যুক্তিকে নিরস্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। উপদেষ্টার প্রয়োজন বোধ করিলেও এমন কাহাকেও মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না, যাহার কথা নির্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান মানুষ হইয়া আসেন, ইহা অবিশ্বাস্য; হিন্দুর শত-সহস্র দেবদেবীকে স্বীকার করা দুর্বলতা বা কুসংস্কার মাত্র। বস্তুতঃ তাঁহার অন্তরে তখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তুমুল ঝড় চলিতেছে। পথ প্রায়শঃ নিবিড় তমসায় আবৃত থাকে; ইহারই মধ্যে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিত হইলে তিনি পথের

সন্ধান পাইয়া খানিক অগ্রসর হন। এই ভাবেই তিনি চলিতেছিলেন। চলিতে কষ্ট হইত; কিন্তু কষ্টের ভয়ে যোদ্ধা বিবেকানন্দ অসত্যের সঙ্গে বা যুক্তিবিহীন লোকপরম্পরার সঙ্গে আপোস করিতে সম্মত ছিলেন না; কারণ ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

এইরূপ স্বভাব লইয়া নরেন্দ্র আসিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে; আর এই বিচার-প্রবণতার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে দূরে না ঠেলিয়া বরং আরও সাদরে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছিলেন। নরেন্দ্র যে ভবিষ্যতের লোকশিক্ষক! সুতরাং মানবমনের অগ্রগতির পথের সহিত তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আবশ্যক, নতুবা বিবিধ-প্রকৃতির মনগুলিকে তিনি পরিচালিত করিবেন কিরূপে? আবার ঠাকুর জানিতেন, নরেন্দ্র অতি উচ্চস্তরের অধিকারী, অতএব তাঁহার অনুসন্ধিৎসাও হইবে সাধারণের তুলনায় অত্যধিক। তাই তিনি ভালবাসিয়া, বুঝাইয়া, নিজ জীবন দেখাইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে অধ্যাত্মপথে পরিচালিত করিতে থাকিলেন; তিনি জানিতেন, নরেন্দ্রের জীবনে সাফল্য অনিবার্য; সাম্প্রতিক সংশয়াদি ক্ষুদ্র বাধাগুলি তাঁহার অধ্যাত্মস্রোতকে প্রতিহত না করিয়া উহার শক্তি ও গতি-বেগকে বর্ধিত করিবে মাত্র। "আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?"—নরেন্দ্রনাথের এই যে অতিসাহসিক অনিবার্য প্রশ্ন, ইহা কোন সাধারণ ব্যক্তির অলস কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উচ্চারিত হয় নাই, ইহা সত্যের সম্মুখীন হওয়ার অদম্য সাহসেরই পরিচায়ক। সে সাহস সাফল্যমণ্ডিত হইতে বাধ্য। সেই শুভ প্রভাতের প্রতীক্ষায় শ্রীশ্রীঠাকুর সমস্ত ব্যবস্থা করিতে যত্নপর হইলেন।

'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা'

উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া প্রথম দিন হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। "অপরোক্ষ বিজ্ঞানসম্পন্ন মহানুভব গুরু সুযোগ্য শিষ্যকে দেখিবামাত্র আপনার সমুদয় জীবনপ্রত্যক্ষ তাহার অন্তরে ঢালিয়া দিবার জন্য আকুল আগ্রহে যেন এককালে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।" পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথ যখন নির্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য অতিমাত্র আগ্রহ দেখাইতেন, ঠাকুর তখন তাঁহাকে সমাধিভূমিতে আরূঢ় করাইবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা ও ঐ কার্যে তৎকালীন বিফলতার কথা উল্লেখ করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। ঠাকুর নরেন্দ্রের নির্বন্ধাতিশয়ের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কেন, তুই যে তখন বলেছিলি তোর বাপ-মা আছে, তাদের সেবা করতে হবে?" সেই দিনেরই কথা স্মরণ করিয়া আরও বলিয়াছিলেন, "দেখ, একজন মরে ভূত হয়েছিল। অনেক কাল একাকী থাকায় সঙ্গীর অভাব অনুভব করে সে চারদিকে অন্বেষণ করতে আরম্ভ করল। কেউ কোন স্থানে মরেছে শুনলেই সে সেখানে ছুটে যেত, ভাবত এবার বুঝি সঙ্গী জুটবে; কিন্তু দেখত মৃতব্যক্তি গঙ্গাবারিস্পর্শে বা অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার হয়ে গেছে। সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এসে সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় একাকী কাল যাপন করত এইরূপে সেই ভূতের সঙ্গীর অভাব কিছুতেই ঘুচে নাই। আমারও ঠিক ঐরূপ দশা হয়েছে। তোকে দেখে ভেবেছিলাম, এবার বুঝি আমার একটি সঙ্গী জুটল; কিন্তু তুইও বললি, তোর বাপ-মা আছে। কাজেই আমার আর সঙ্গী পাওয়া হল না।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।৯৮-৯৯ পৃঃ)। ঐ দিনের ঘটনা তুলিয়া ঠাকুর যখন নানা রঙ্গ পরিহাসে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন নরেন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা এবং তাঁহাকে আরও আপনার করিয়া পাইবার তীব্র ইচ্ছাই ঐ সকল কথায় প্রকাশ পাইত।

প্রথম দিনেই নরেন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সুস্পষ্ট ছাপ দেখিয়া ঠাকুর সবিস্ময়ে ভাবিয়াছিলেন, "কলিকাতার মতো স্থানে এমন সত্ত্বগুণী আধারও থাকতে পারে।" পরে ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে যখন প্রথম দেখি, তখন তার শরীরের হুঁশ ছিল না। যেই ছুঁলুম অমনি বাহ্যজ্ঞান

হারাইল।” শরীরের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, “তোর শরীরের সকল স্থানই সুলক্ষণাক্রান্ত, কেবল দোষের মধ্যে নিদ্রা যাইবার কালে নিঃশ্বাসটা কিছু জোরে পড়ে। যোগীরা বলেন, অত জোরে নিঃশ্বাস পড়িলে অল্পায়ু হয়।” নরেন্দ্রের মনোবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, “ধর্মানুরাগ, সাহস, সংযম, বীর্য এবং মহদুদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করা প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল নরেন্দ্রের হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রদীপ্ত রহিয়াছে।” বস্তুতঃ নানাভাবে যাচাই করিয়া ঠাকুর নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নরেন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বগুণী; তাঁহাতে কখনও মলিনতার স্পর্শ ঘটিতে পারে না। অতএব নরেন্দ্রের সাময়িক ছেলেমানুষি বা অনভিজ্ঞতাজনিত ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তিনি তাঁহার ভাবী নরেন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বকেই মানসচক্ষে দেখিতেন এবং উহার বাস্তব আভাস পাইবামাত্র ত্রুটিবিচ্যুতি ভুলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তাঁহার নিকট নরেন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন, নির্ভীক, সত্যবাদী, ও জগদম্বার চিহ্নিত পুরুষ। অতএব নরেন্দ্রকে তিনি প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেন। নরেন্দ্র ছিলেন সাধারণ মানবের অতি উচ্চে অবস্থিত মানবকল্যাণে অবতীর্ণ নর-ঋষি। তাই অপরের নিকট নরেন্দ্রের সম্মান বাড়াইবার জন্য এবং নরেন্দ্রেরও মনে আত্মশ্রদ্ধা জাগাইবার জন্য তিনি নরেন্দ্রের সেবা লইতে দ্বিধা প্রকাশ করিতেন; সেবার জন্য নরেন্দ্র লালায়িত হইলে বলিতেন, “তোর পথ আলাদা।”

নরেন্দ্রকে ঠাকুর কেন ভালবাসেন তাহা ঠাকুর স্বমুখে বিভিন্নকালে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি একদিন পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের (তদানীন্তন শরৎচন্দ্রের) সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া যদুনাথ মল্লিকের উদ্যানবাটীর প্রধান কর্মচারী রতন নামক এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, “এরা সব ছেলে মন্দ নয়—দেড়টা পাস করিয়াছে[১], শিষ্ট, শান্ত; কিন্তু নরেন্দ্রের মতো একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না। যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেন্দ্রের ভেতর এতটুকু মেকি নেই; বাজিয়ে দেখ, টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ কান টিপে কোন রকমে দু-তিনটে পাস করেছে—বাস্ এই পর্যন্ত!

১। শরৎচন্দ্র তখন এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

এ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে-খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কিছুই নয়! সে ব্রাহ্ম সমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়; কিন্তু অন্যসকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি? ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।১২৪-২৫ পৃঃ)।

একদিন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধর্মনেতৃবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপবিষ্ট আছেন, নরেন্দ্রও সম্মুখে আছেন এবং ভাবমুখে থাকিয়া ঠাকুর প্রসন্নমনে কেশবাদিকে দেখিতেছেন। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি নরেন্দ্রের উপর পতিত হইলে তিনি পরমস্নেহে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইলে তিনি বলিলেন, "দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার দেখিলাম কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে।" কেশব তখন চলিয়া গিয়াছেন; তবু নরেন্দ্র এইরূপ উচ্চ প্রশংসা অপাত্রে অর্পিত হইতেছে ভাবিয়া তীব্র প্রতিবাদ সহকারে বলিলেন, "মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার ঐরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে, কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয় এবং কোথায় আমার ন্যায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া। আপনি তাঁহাদিগের সহিত আমার তুলনা করিয়া আর কখনও ঐরূপ কথাসকল বলিবেন না।" নরেন্দ্রের এইরূপ নিরভিমানে ঠাকুর যদিও সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন, তথাপি স্বমতের পোষণকল্পে বলিয়াছিলেন, "কি করব রে? তুই কি ভাবিস আমি ঐরূপ বলিয়াছি? মা আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি। মা তো আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখন দেখান নাই, তাই বলিয়াছি।" এইরূপ কথা ঠাকুর অন্য সময়েও বলিতেন।[২]

এইরূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদী নরেন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে তো পারিতেনই না,

২। 'সৎকথা' ২য় ভাগে আছে—লাটু মহারাজের মতে কেশবের সম্মুখেও ঠাকুর একদিন ঐরূপ বলিলে, কেশব কহিয়াছিলেন, তিনিও চান যে নরেন্দ্র খুব বড় হউন। ঐ বিষয়ে ঠাকুর তখন নরেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, কেশবের একটুও হিংসা নাই (৫ পৃঃ)।

বিরক্তির সহিত এমন কথাও বলিয়া ফেলিতেন, "মা দেখাইয়া থাকেন, অথবা আপনার মাথার খেয়ালে ঐসব উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে ?" সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তিতর্ক তুলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে, স্নেহজনিত কল্পনা হইতে ঐরূপ বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়। তখন আবার ঠাকুরের মনে হইত, "তাই তো, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র তো মিথ্যা বলিবার লোক নহে।" আবার ইহাও ভাবিতেন, "কিন্তু আমি তো ইতিপুর্বে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, মা আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখন দেখান নাই।" এইরূপ পরিস্থিতিতে তিনি চিন্তাকুলিত মনে জগদম্বারই নিকট উপস্থিত হইয়া অবশেষে আশ্বাসবাণী শুনিতেন। "ওর (নরেন্দ্রের) কথা শুনিস কেন ? কিছুদিন পরে ও সব কথা সত্য বলে মানবে।"

নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের দিব্য সম্বন্ধের স্বরূপ কেবল নরেন্দ্রের কেন, অপরের পক্ষেও হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য ছিল। ঠাকুরেরই শ্রীমুখে অপরের ঐরূপ ভুল ধারণার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসত—একঘর লোক, তবু ওর দিক পানে চেয়েই কথা কইতাম। ও বলত, 'এদের সঙ্গে কথা কন', তবে কইতাম। যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম ; ওকে দেখবার জন্যে পাগল হয়েছিলাম। এখানেও (কালীবাড়ীর খাজাঞ্চী) ভোলানাথের হাত ধরে কান্না। ভোলানাথ বললে, 'একটা কায়েতের ছেলের জন্যে মশায়, আপনার এরূপ করা উচিত নয়।' মোটা বামুন (প্রাণকৃষ্ণ) একদিন হাতজোড় করে বললে, 'মশাই, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্যে আপনি এত অধীর হন কেন ?' " সরলচিত্ত ঠাকুর অপরের মতামতের উপর নির্ভর করিতেন এবং নিজ সমস্যা অপরকে শুনাইয়া উহার সমাধানের উপায় জানিতে চাহিতেন। তাঁহার দিব্যভাবভূমির সহিত অপরিচিত ব্যক্তি এইরূপ স্থলে কি আর করিতে পারে ? তাহারা লোকদৃষ্টি অবলম্বনে লোকোত্তর পুরুষের লীলা বুঝিতে না পারিয়া বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইত এবং ভোলানাথ বা মোটা বামুনের ন্যায় উহাই বাক্যে প্রকাশ করিত। তবে ভূয়োদর্শনের ফলে তাহাদের মত পরিবর্তিতও হইত। অন্ততঃ ভোলানাথের বেলায় ঐরূপ হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,"একদিন ভোলানাথকে বললুম, "হ্যা গা, আমার এমন হচ্ছে কেন ?' ভোলানাথ বললে, এর মানে 'ভারতে' (মহাভারতে) আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস

করে, সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।’ এই কথা শুনে তবে আমার মনে শান্তি হয়। তবুও আবার মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখব বলে বসে কাঁদতুম।” নরেন্দ্রকে তিনি কত ভালবাসিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “নরেন্দ্র বেশী আসে না—সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।”

নরেন্দ্রকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের ব্যাকুলতা সম্বন্ধে পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ (তখনকার বাবুরাম) একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছুকাল পরে বাবুরামের যাতায়াত শুরু হয়।[৩] একদিন তিনি রামদয়াল বাবুর সহিত সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধর্মালোচনান্তে প্রসাদধারণের পর ঠাকুরের ঘরের পূর্বভাগে কালীবাড়ীর উঠানের উত্তরদিকের বারান্দায় রামদয়াল বাবুর সহিত শয্যাগ্রহণ করিলেন। অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দের স্বমুখের বিবরণ এই: “শয়ন করিবার পর একঘণ্টা কাল অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের ন্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়াল বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘ওগো, ঘুমুলে?’ আমরা উভয়ে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, ‘আজ্ঞে না।’ উহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, ‘দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভেতরটা গামছা নিঙড়ানোর মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে, তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো। সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ; তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।’ রামদয়াল বাবু কিছুকাল পূর্ব হইতেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেজন্য ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ঠাকুরের ঐরূপ বালকের ন্যায় আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন, এবং রাত্রি পোহাইলেই নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিবেন, ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই রাত্রে ঠাকুরের

৩। ‘কথামৃতে’র ১ম ভাগের মতে (৬ পৃঃ) তিনি ১৮৮১-এর শেষ ভাগ ও ১৮৮২-এর প্রথম ভাগের মধ্যে আসিয়া পড়েন। কিন্তু ‘কথামৃত’ ৫ম ভাগ, ২০ পৃষ্ঠায় আছে, “ডিসেম্বর ১৮৮২। ......বাবুরাম নূতন নূতন আসিতেছেন।” ‘লীলাপ্রসঙ্গে’র মতে তিনি নরেন্দ্রের পরে আসেন (৫।১০৪ পৃঃ)। হরেরাম ঘোষের মতে তিনি আসেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল। আমাদের বিশ্বাস (‘কথামৃত’ প্রথম ভাগের মতানুযায়ী) ১৮৮২-এর প্রথম ভাগেই তাঁহার আগমন হয়।

সেই ভাবের কিছুমাত্র প্রশমন হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও, পরক্ষণেই ঐ কথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকট পুনরায় আগমনপূর্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার কি অদ্ভুত ভালবাসা; এবং যাহার জন্য ইনি ঐরূপ করিতেছেন, সে ব্যক্তি কি কঠোর! সেই রাত্রি ঐরূপে আমাদিগকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।" স্বামী প্রেমানন্দ তখনও নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হন নাই।

প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল কথিত আর একটি অনুরূপ ঘটনাও 'লীলাপ্রসঙ্গে' (৫।১০৬-৮ পৃঃ) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেদিনের কথা সান্ন্যাল মহাশয় বিবৃত করেন, সেদিন পর্যন্ত নরেন্দ্র দীর্ঘকাল না আসায় ঠাকুরের মন যেন নরেন্দ্রময় হইয়া আছে, তাঁহার মুখে নরেন্দ্রের গুণকীর্তন ভিন্ন অন্য কোন কথা নাই। তিনি বলিলেন, "দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বগুণী। আমি দেখিয়াছি, সে অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন।" বলিতে বলিতে ঠাকুর পুত্রবিরহকাতরা জননীর ন্যায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন; পরে কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া দ্রুতপদে উত্তর দিকের বারান্দায় চলিয়া গেলেন এবং রুদ্ধস্বরে এই বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন, "মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাকতে পারি না।" কিছুক্ষণ পরে নিজেকে কতক সামলাইয়া ঘরে ফিরিলেন এবং বলিলেন, "এত কাঁদলাম, কিন্তু নরেন তো এল না। তাকে একবার দেখবার জন্য প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিচ্ছে; কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বুঝে না।" ঐরূপ বলিতে বলিতে আবার বাহিরে গিয়া কাঁদিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বুড়ো মিন্‌সে, তার জন্যে এরূপ অস্থির হয়েছি ও কাঁদছি দেখে লোকেই বা কি বলবে বল দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না; কিন্তু অপরে দেখে কি ভাববে বল দেখি? কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পাচ্ছি না!" এই ঘটনায় সান্ন্যাল মহাশয় নরেন্দ্রের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতার যেমন চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন, দিন কয়েক পরে নরেন্দ্রের সহিত যখন তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়া গিয়াছে, তখন একদিন নরেন্দ্রের আগমনে

ঠাকুরের আনন্দোল্লাস দেখিয়াও তেমনি অবাক হইয়াছিলেন। সেদিন ঠাকুরের জন্মতিথিতে ভক্তগণ তাঁহাকে নববস্ত্র, ফুল-চন্দন ইত্যাদিতে সাজাইয়া আনন্দ ও কীর্তন করিতেছেন। তবু নরেন্দ্র না আসায় ঠাকুর চঞ্চল হইয়া আছেন। কখনও বা চারিদিকে তাকাইয়া ভক্তদিগকে বলিতেছেন, "তাই তো, নরেন এল না।" বেলা দুই প্রহরে নরেন্দ্র আসিয়া যাই ঠাকুরের পদপ্রান্তে প্রণাম করিলেন, অমনি ঠাকুর লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার স্কন্ধে বসিলেন এবং সমাধিস্থ হইলেন। ক্রমে সহজাবস্থায় ফিরিয়া তিনি নরেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে ও তাঁহাকে আহারাদি করাইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, সেদিন আর কীর্তন শুনা হইল না। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে ইহা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের (সম্ভবতঃ ফাল্গুন মাসের) ঘটনা।[৫] কাজেই আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসে দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন হইতে দীর্ঘ দুই বৎসরকাল নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উচ্ছ্বসিত দেবদুর্লভ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন। অবশ্য অনুপম ভালবাসা তিনি চিরকালই পাইয়াছিলেন ; কিন্তু পরে এইরূপ উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, নরেন্দ্রনাথের মন ছিল বিচারপ্রবণ ; এমন প্রাণঢালা ভালবাসার অধিকারী হইয়াও তিনি তখনও নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করিতেন না। এমন কি এই অনবদ্য স্নেহের উপরও তিনি নিঃসঙ্কোচে তাঁহার তীক্ষ্ণ সমালোচনাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেন। প্রথম প্রথম তিনি বুঝিতেই পারিতেন না, পরমহংসদেব তাঁহার জন্য এতটা করেন কেন। আবার ঠাকুরের স্নেহ ঠাকুরকে অপরের চক্ষে হেয় করিতে পারে এই চিন্তায়ও তিনি উদ্বিগ্ন হইতেন। সেজন্য তিনি সময়ে সময়ে এমন শ্রুতিকটু কথাও বলিয়া বসিতেন, "আপনার শেষকালে না ভরত রাজার অবস্থা হয়। ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে পরজন্মে হরিণজন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।" বালকপ্রায় সরলচিত্ত ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ঠিক বলেছিস। তাইতো রে, তাহলে কি হবে? আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না!" দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ঠাকুর দারুণ বিমর্ষ হইয়া জগদম্বাকে ঐ কথা জানাইতে গেলেন ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না, মা বললেন—

৫। 'কথামৃত'-কারের মতে "১৮৮৪ মধ্যে সান্যাল" দক্ষিণেশ্বরে আসেন (১।০ পৃঃ)। 'লীলা-প্রসঙ্গ'-এর মতে এই আগমন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে হওয়া আবশ্যক।

'তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস। যেদিন ওর ভেতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পাবি না'।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।১২৬)।

নরেন্দ্রের কথা তিনি তবু শুনিতেন এবং তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে হাস্য-রসের অবতারণা হইত। একদিন ঠাকুর ভক্তের স্বভাবের সহিত চাতকের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছিলেন, "চাতক যেমন নিজ পিপাসাশান্তির জন্য সর্বদা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং উহার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করে, ভক্তও তদ্রূপ নিজ প্রাণের পিপাসা ও সর্বপ্রকার অভাব মিটাইবার জন্য একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে"—ইত্যাদি। অমনি নরেন্দ্রনাথ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "চাতক বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য কিছু পান করে না ঐরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও ঐ কথা সত্য নহে; অন্য পক্ষিসকলের ন্যায় নদী প্রভৃতি জলাশয়েও পিপাসা-শান্তি করিয়া থাকে। আমি চাতক পক্ষীকে ঐরূপ জলপান করিতে দেখিয়াছি।" ঠাকুর বলিলেন, "সে কি রে? চাতক অন্য পক্ষীর ন্যায় জলপান করে? তবে তো আমার এতকালের ধারণা মিথ্যা হল, তুই যখন দেখিয়াছিস, তখন তো ঐ বিষয়ে আর সন্দেহ করিতে পারি না।" ঐরূপ বলিয়াও ঠাকুর কিন্তু শান্ত হইতে পারিলেন না। তাই তো, একটা ধারণা যদি এইভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে অন্য ধারণাগুলিরই বা কি হইবে? ইহার কয়েক দিন পরেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন মহাশয়, চাতক গঙ্গার জল পান করিতেছে।" ঠাকুর ব্যস্তভাবে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "কই রে?" নরেন্দ্র দেখাইয়া দিলে তাঁহার চোখে পড়িল একটি চামচিকা জলপান করিতেছে। তখন তিনি সহাস্যে বলিলেন, "ওটা চামচিকা যে! ওরে শালা, তুই চামচিকাকে চাতক জ্ঞান করিয়া আমাকে এতটা ভাবাইয়াছিস্? তোর সকল কথায় আর বিশ্বাস করিব না।" (ঐ, ১৮০ পৃঃ)।

সকল কথায় আস্থাস্থাপন না করিলেও নরেন্দ্রের অনেক কথাই তিনি শুনিবা-মাত্র উড়াইয়া দিতে পারিতেন না, যদিও অবশেষে জগন্মাতার বিপরীত নির্দেশ পাইলে তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিতেন। ঠাকুর সাকার দেবদেবী ও তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপাদিতে পূর্ণবিশ্বাসী হইলেও ঐ সকলে প্রত্যয়হীন নরেন্দ্রনাথ হয়তো বলিয়া বসিতেন, "রূপ-টুপ আপনার মাথার খেয়াল!" নরেন্দ্রের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি ফাঁপরে পড়িয়া মা কালীর নিকট নিবেদন

করিতেন, "মা, নরেন্দ্র বলে এসব আমার মাথার ভুল। সত্যি কি?" মা অমনি তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেন, "না ওসব ঠিক, ভুল নয়। নরেন্দ্র ছেলেমানুষ, তাই অমন বলে।" সরল মহাপুরুষ তখনি আশ্বস্তচিত্তে ফিরিয়া নরেন্দ্রকে শুনাইয়া দিতেন, "তুই যা খুশি বল না কেন, আমি বিশ্বাস করি না।" ঠাকুর নরেন্দ্রের এই প্রকার নির্ভীক উক্তিতে সাধারণতঃ বিরক্ত না হইলেও নরেন্দ্রের কল্যাণার্থ কখন কখনও একেবারেই যে চুপ করিয়া থাকিতেন, এইরূপও নহে। ঠাকুরের বিশ্বাস টলাইতে না পারিলেও এবং ঠাকুর তাঁহার কথা মানিয়া না লইলেও নরেন্দ্র যে কালে নিজ বিশ্বাসানুযায়ী ঠাকুরের ঐ প্রকার কথায় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, তখনকার কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর একদিন ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলত; আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, 'শালা, তুই আর এখানে আসিস না।' তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না।" ('কথামৃত', ৪।৮।৪)।

নরেন্দ্র "আপনার লোক" বলিয়াই ঠাকুর তাঁহার অনেক কিছু অম্লানবদনে সহ্য করিতেন। 'কথামৃতে'র (৫।১৬।২) একটি ঘটনা হইতে জানা যায়, নরেন্দ্রের বিদ্রূপোক্তি পর্যন্ত স্নেহময় ঠাকুরকে আনন্দ দিত। একদিন ঠাকুরের সম্মুখে গান গাহিবেন বলিয়া "নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন। ঠাকুর অধৈর্য হইয়াছেন। বিনোদ বলিতেছেন, 'বাঁধা আজ হবে, গান আর একদিন হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে, তানপুরাটি ভেঙ্গে ফেলি। কি টং টং—আবার তানা নানা নেরে নুম হবে। ভবনাথ—'যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়।' নরেন্দ্র (বাঁধিতে বাঁধিতে)—'সে না বুঝলেই হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'ঐ আমাদের সব উড়িয়ে দিলে!"

এখানে প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করিবার জিনিস এই যে, নরেন্দ্র কলাবতের নিকট যথারীতি সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া যন্ত্র ঠিক ঠিক সুরে না বাঁধিয়া গান গাহিতেন না—ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত বিরক্ত হইলেও নয়। 'কথামৃতে' (৪।২৩।৫) অনুরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত আছে; এখানেও উপযুক্ত যন্ত্র না থাকায় নরেন্দ্রনাথ গানে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু তখন পিতৃবিয়োগের পর পারিবারিক অশান্তিও চলিতেছে—সংসারের দুঃখকষ্টে নরেন্দ্র বিব্রত ও বিপন্ন, হয়তো বা বিভ্রান্ত। অতএব তাঁহার অস্বীকৃতি নিছক সঙ্গীতপ্রিয় মন হইতে উৎসারিত না

হইয়া একটা মিশ্র মনোভাব হইতেই উদ্‌গত হইয়া থাকিবে, যাহার ফলে ঠাকুর সেদিন একটু মর্মান্তিক ভর্ৎসনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে এত আত্মীয়তাবোধ জন্মিয়া গিয়াছে যে, ঐরূপ দু-একটি মন্তব্যে নরেন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হইতেন না। উহা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাইএর ঘটনা। "শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে)—'একটু গা না।' নরেন্দ্র—'ঘরে যাই, অনেক কাজ আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ—'তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোনা, তার কথা আনা আনা; যার আছে পোঁদে ট্যানা, তার কথা কেউ শোনে না। তুমি গুহদের বাগানে যেতে পার; প্রায় শুনি, আজ কোথায়?—না গুহদের বাগানে! একথা বলতুম না, তুই কেঁড়েমি করলি—'। নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন, বলছেন, 'যন্ত্র নাই, শুধু গান!' শ্রীরামকৃষ্ণ—'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা! এইতে পার তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!...বলরামের ভাব—আপনারা গাও, নাচ, আনন্দ কর!" শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র সেখানে থাকিয়াই গেলেন এবং গানও গাহিলেন। পরে অন্ততঃ তানপুরা জুটিয়াছিল—ইহার উল্লেখ 'কথামৃতে' আছে (৪।২৩।৬)। ঘটনাটি হয় কলিকাতায় বলরামগৃহে।

নরেন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহার ছিল সাধারণতঃ কুসুমাপেক্ষাও অতি কোমল, আবার স্থান বিশেষে বজ্রাদপি কঠোর। কিন্তু ঠাকুরের ব্যবহার বাহ্যতঃ কঠোর বা কোমল যাহাই হউক, অন্তরে তিনি সর্বদাই ছিলেন অতিমাত্র স্নেহ-প্রবণ; কচিৎ কখনও কঠোরতা প্রকাশ পাইলেও নরেন্দ্রের হিতসাধনার্থই ঐরূপ হইত, এবং সর্বক্ষেত্রেই উভয়ের আদান-প্রদানের মাধ্যম হইত একমাত্র ভালবাসা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে এক প্রধান সমস্যা ছিল, নরেন্দ্রের আধুনিক প্রভাবে গঠিত মনকে পূর্ণ সনাতন ভাবে রূপায়িত করা। ইহা সময়- ও ধৈর্যসাপেক্ষ ছিল। প্রয়োজন ছিল, শিষ্যকে অকস্মাৎ বীতোৎসাহ, বিভ্রান্ত বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন না করিয়া শনৈঃ শনৈঃ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়ার। ঠাকুরের এই প্রচেষ্টা স্থান কালাদি ভেদে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইত—কখনও জ্ঞাতসারে, কিন্তু প্রায়শঃ অজ্ঞাতসারে। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম; লোকাতীত পুরুষ কোন্ কৌশলাবলম্বনে অপরের মনের মোড় ফিরাইয়া উহাকে স্বমার্গে পরিচালিত করিতেন, কেমন করিয়া অপরের মনকে কাদার তালের মতো স্বহস্তে লইয়া নিজের ভাবে গড়িতেন, তাহা বুঝা বা লিখিয়া প্রকাশ করা ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা শুধু কিঞ্চিৎ আভাস পাইবার চেষ্টা করিতে পারি। আমরা

দেখি, যদিও নরেন্দ্র ঠাকুরকে একদিনেই মানেন নাই, তাঁহার কথাও নির্বিচারে স্বীকার করেন নাই, তথাপি আমূল পরিবর্তনেও খুব বেশী দেরী হয় নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন ঠাকুর বলিতেছেন, "ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাকার মানে না। (সহাস্যে) নরেন বলে পুত্তলিকা। আবার বলে, 'ইনি এখনও কালীঘরে যান'।" ইহা হইল নরেন্দ্রের অবিশ্বাসের নিদর্শন। আবার 'কথামৃতে'ই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর নরেন্দ্রের বিশ্বাসের কথা রহিয়াছে। নরেন্দ্র কুতূহলী হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন আপনি শশধরকে দেখতে গিয়ে তাদের একটা লোকের ছোঁয়া গ্লাস থেকে জল খেলেন না। আপনি কি করে জানলেন যে, সে লোকটার স্বভাব ভাল না?" প্রশ্ন শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "আগে বলতিস্ আমার অবস্থা মনের গতিক (হ্যালিউসিনেশন—মতিভ্রম)!" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "কে জানে! এখন তো অনেক দেখলাম, সব মিলছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে বাজাইয়া দেখিয়াছিলেন, নরেন্দ্রও তেমনি প্রতিপদে যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন—ঠাকুরের কথা ও কার্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা। এই প্রকারে নরেন্দ্রের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি দুইটি বিপরীত দিক অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঠাকুরের দিক হইতে একটা অধীর আগ্রহ ছিল, উপযুক্ত শিষ্যের মধ্যে আপনার অমূল্য অনুভূতি-সম্পদ্ ঢালিয়া দিয়া শিষ্যের জীবনকে দ্রুত পরিপূর্ণ করিতে, দ্বিতীয়তঃ শিষ্যের দিক হইতে একটা সতর্ক আকুলতা ছিল, সত্যকে এবং একমাত্র সত্যকেই প্রাণপণে গ্রহণপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ করিতে, আর সে সত্যলাভের জন্য তিনি উপযুক্ত মূল্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।[৫] নরেন্দ্র ঠাকুরকে পরখ করিয়া দেখিয়াছিলেন দুই প্রকারে—প্রথমতঃ দূর হইতে তটস্থ দ্রষ্টা হিসাবে ঠাকুরের জীবনধারা লক্ষ্য করা এবং দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন উত্থাপন বা বিশেষ উপায়াবলম্বনে পরীক্ষা করা। এই পরীক্ষারই একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইবে।

ঠাকুর ধাতব দ্রব্য মনেপ্রাণে সর্বতোভাবে এমনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন

৫। নিবেদিতা 'মাষ্টার এ্যাজ আই স হিম্' গ্রন্থে লিখিয়াছেন; "হঠাৎ কিছু মেনে নিতে স্বামীজী নিষেধ করতেন। 'আমি আমার গুরুদেবের সঙ্গে দীর্ঘ ছয় বৎসর ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিলাম, ফলে এই হয়েছে যে, আমি রাস্তার কোথায় কি আছে, তা তন্ন তন্ন করে জানি, এতটুকুও আমার অজ্ঞাত নেই'।"

যে, অজ্ঞাতসারে উঁহার দৈহিক স্পর্শ ঘটিলেও অতি যন্ত্রণায় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইত। নরেন্দ্র ঠাকুরের স্বমুখে এই কথা জানিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং মিলাইয়া দেখিবার ঔৎসুক্যও মনে জাগিয়াছিল। একদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে আসিয়া জানিলেন, তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন এবং শীঘ্রই ফিরিবেন। এই সুযোগে ঠাকুরের বিছানার নীচে একটি টাকা রাখিয়া তিনি পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে গেলেন ; যথাসময়ে ঠাকুর যখন ফিরিতেছেন, তখন সাড়া পাইয়া পঞ্চবটী হইতে আসিয়া তাঁহার ঘরে দাঁড়াইলেন। ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া বসিবার জন্য নিজ বিছানা স্পর্শ করিবামাত্র লাফাইয়া উঠিলেন এবং এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সেবক বিছানার চাদরখানি টানিয়া তুলিতেই রৌপ্যমুদ্রাটি টং করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া মৌনবিস্ময়ে বাহিরে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরও বুঝিলেন, নরেন্দ্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন ; তিনিও কোন কথা কহিলেন না, তবু মনে হইল, নরেন্দ্রের সৎসাহসে তিনি আনন্দিতই হইয়াছেন। (ইংরাজী জীবনী, ৬৭ পৃঃ)

আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নামে ভাবাবেগে মাতামাতি করাটা তেমন পছন্দ করিতেন না। কেন না আধুনিকদের ধারণা ছিল ভগবদ্ভাবে অধিক আত্মহারা হইলে মানবজীবন বিপর্যস্ত হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে নরেন্দ্র কিরূপে এই ভ্রান্তমতের পরিবর্তে সনাতন ধারায় পরিচালিত হইলেন, ঠাকুরের শ্রীমুখে তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। ঠাকুর সেদিন (১৫ই জুন, ১৮৮৪) প্রতাপচন্দ্র হাজরা মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমি নরেন্দ্রকে বলছিলুম, 'দেখ ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় নাকি যে এই রসের সাগরে ডুব দিই ? আচ্ছা, মনে কর, একখুলি রস আছে, তুই মাছি হয়েছিস ; তা কোন খানে বসে রস খাবি ?' নরেন্দ্র বললে, 'আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন ? কিনারায় বসবি কেন ?' সে বললে, 'বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব, আর প্রাণ হারাব।' তখন আমি বললুম, 'বাবা, সচ্চিদানন্দ-সাগরে সে ভয় নাই ; এযে অমৃতের সাগর ! ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয় ! ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড্‌ (মতিচ্ছন্ন) হয় না।" ('কথামৃত', ১।১০।৭)।

এইকালে নরেন্দ্রের এক অদ্ভুত অনুভূতি হইতে থাকে। প্রায়ই তিনি কলিকাতায় স্বগৃহে বসিয়া সুদূর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যাননিমগ্ন শ্রীমূর্তি দর্শন

করিতেন। একরাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন, "বল্ আমি তোকে ব্রজগোপী শ্রীরাধার সাক্ষাতে নিয়ে যাব।" নরেন্দ্র অনুসরণ করিলেন। একটু দূরে গিয়েই ঠাকুর তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কোথা আর যাবি?" এই বলিয়া তিনি রূপলাবণ্যময়ী শ্রীরাধিকার রূপ ধারণ করিলেন। এই দর্শনের ফল এই দাঁড়াইল যে, নরেন্দ্র যদিও পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের গানই প্রায়শঃ গাহিতেন, এখন তিনি শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের—অর্থাৎ ভগবানের প্রতি জীবের আকুল আবেদন-নিবেদন, বিরহ-কাতরতাদির গানও গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুভ্রাতাদের নিকট যখন তিনি এই স্বপ্নের কথা বলিলেন, তখন তাঁহারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর, এ স্বপ্নের মর্ম সত্য?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "নিশ্চয় করি।"

ধ্যানকালে নরেন্দ্র অনেক সময় নিজ প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইতেন—ঠিক যেন তাঁহারই আকার ও রূপাদি লইয়া আর একজন বসিয়া আছে এবং দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্তির হাব-ভাব চলন-বলন প্রভৃতি সমস্তই যেমন প্রকৃত ব্যক্তির অনুরূপ হইয়া থাকে, এই প্রতিমূর্তির ক্রিয়াকলাপও তেমনি হুবহু সেইরূপই হইত। নরেন্দ্র ভাবিতেন, "এ আবার কে?" শ্রীরামকৃষ্ণকে উহা জানাইলে তিনি উহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বলিয়াছিলেন, "ধ্যানের উচ্চ উচ্চ অবস্থাতে অমন হয়ে থাকে।"

নরেন্দ্রের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল তিনি ভাবে অভিভূত হইয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া যাইবেন। তিনি দেখিতেন, নিত্যগোপাল, মনোমোহন প্রভৃতি ঠাকুরের ভক্তগণ ভগবৎ-নাম-কীর্তন শুনিতে শুনিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কেমন মৃতপ্রায় ভূতলশায়ী হইয়া থাকেন। তাঁহার দুঃখ হইত যে, তিনি এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক আনন্দ সম্ভোগে বঞ্চিত আছেন। অতএব একদিন ঠাকুরের নিকট এই অতৃপ্তির কথা নিবেদন করিয়া ঐরূপ ভাবসমাধির জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে ঠাকুর স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "তুই এমন উতলা হচ্ছিস কেন রে? এতে কি যায় আসে? সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবাতে নামলে তোলপাড় হয়ে যায়, আর পাড়ের উপর জল উপছে পড়ে।" ('কথামৃত', ১।১৩।১)। তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, এইসব ভক্তরা ক্ষুদ্র ডোবার সদৃশ, সঙ্কীর্ণ আধার। ইহাদের মধ্যে একটু ভগবদ্ভক্তির আবেশ হইলেই ইহাদের হৃদয়ে ডোবার

তুফান উঠে, কিন্তু নরেন্দ্র হইতেছেন সায়ের দীঘি, তাই অত সহজে বিহ্বল হন না।

জগদম্বার নির্দেশে এবং স্বীয় পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রের উপর অশেষ বিশ্বাস রাখিতেন। ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া অপর ভক্তদের আহার, বিহার, শয়ন, নিদ্রা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি সর্ববিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিলেও তিনি নরেন্দ্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন ; ভক্তদের সমক্ষে স্পষ্টই বলিতেন, "নরেন্দ্র ঐ নিয়মসকলের ব্যতিক্রম করিলেও তাহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় হইবে না। নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ, নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ, নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া সর্বপ্রকার আহার্যদোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে ; সেজন্য যেখানে-সেখানে যাহা-তাহা ভোজন করিলেও তাহার মন কলুষিত বা বিক্ষিপ্ত হইবে না। জ্ঞানখড়্গ সহায়ে সে মায়াময় সমস্ত বন্ধনকে নিত্য খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে। মহামায়া সেজন্য তাহাকে কোন মতে নিজায়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না।" ('লীলাপ্রসঙ্গ' ৫।১২৭)।

সকাম বিষয়াসক্ত ভক্তেরা কখনও ঠাকুরকে মিছরি, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য উপহার দিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর উহা স্বয়ং গ্রহণ করিতেন না বা ভক্তদিগকেও দিতেন না—পাছে ভক্তির হানি হয়। তখন প্রশ্ন উঠিত, এ গুলির কি হইবে? ঠাকুর বলিতেন "যা নরেন্দ্রকে ঐ সকল দিয়ে আয়, সে ঐ সকল খাইলেও তাহার কোন হানি হইবে না।" ('লীলাপ্রসঙ্গ' ৫।১২৮)।

নরেন্দ্র হোটেলে খাইয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয়, আজ হোটেলে, সাধারণ যাহাকে অখাদ্য বলে, খাইয়া আসিয়াছি।" ঠাকুর বুঝিলেন, নরেন্দ্র ইহা বাহাদুরি প্রকাশের জন্য বলেন নাই, বরং তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, যাহাতে ঘরের ঘটি-বাটি প্রভৃতি নরেন্দ্রকে ছুঁইতে দিতে যদি আপত্তি থাকে তবে তিনি যেন পূর্ব হইতেই সাবধান হইতে পারেন। ঠাকুর বুঝিতে পারিয়া উত্তর দিলেন, "তোর তাহাতে দোষ লাগিবে না। শোর-গরু খাইয়া যদি কেহ ভগবানে মন রাখে, তাহা হইলে উহা হবিষ্যান্নের তুল্য ; আর শাক-পাতা খাইয়া যদি বিষয়-বাসনায় ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা শোর-গরু খাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে বড় নহে। তুই অখাদ্য খাইয়াছিস ; তাহাতে আমার কিছুই মনে হইতেছে না। কিন্তু ইহাদিগের (অর্থাৎ সম্মুখস্থ ভক্তদের)

কেহ যদি আসিয়া ঐ কথা বলিত, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারিতাম না।" (ঐ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিতেন, বিশ্বাস করিতেন, ভালবাসিতেন, ভালবাসিয়া অধ্যাত্ম-জীবনপথে সুপরিচালিত করিতেন। সে নিয়মনরীতি ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজস্ব এবং স্নেহপরিষিক্ত ; অনেক ক্ষেত্রে উহা আবার রঙ্গরসের রূপও ধারণ করিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

নরেন্দ্র একবার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কোন কোন ভক্তদের বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস বলিয়া নিন্দা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বিশ্বাসের আবার অন্ধ কিরে? বিশ্বাসমাত্রই তো অন্ধ। বিশ্বাসের কি আবার চোখ আছে নাকি? হয় বল শুধু 'বিশ্বাস' না হয় বল 'জ্ঞান'। তা না হয়ে আবার 'অন্ধবিশ্বাস', 'চোখওয়ালা বিশ্বাস'—এ কিরকম?"

প্রথম প্রথম নরেন্দ্রনাথ কালী কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবী মানিতেন না ; আবার অদ্বৈতমতও স্বীকার করিতেন না। "সবই ব্রহ্ম" এই কথা শুনিয়া তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, তাও কি কখন হয়? তাহলে ঘটিটাও ব্রহ্ম বাটিটাও!" সগুণ-নিরাকার-ব্রহ্মোপাসক নরেন্দ্র জীবব্রহ্মের অভেদ স্বীকারে কুণ্ঠিত হইতেন; বলিতেন, "ইহাতে আব নাস্তিকতাতে তফাত কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে?··· গ্রন্থকর্তা ঋষি-মুনিদের নিশ্চয় মাথাখারাপ হইয়াছিল ; নতুবা এমন সকল কথা লিখিলেন কিরূপে?" স্পষ্টবাদী নরেন্দ্রের স্বরূপের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ঠাকুর এরূপ বিসদৃশ সমালোচনাতেও বিচলিত না হইয়া শুধু হাসিতেন এবং উপযুক্ত শিষ্যের স্বাধীন চিন্তাধারাকে বলপূর্বক পরিবর্তিত না করিয়া যুক্তিপূর্ণ মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিতেন, "তা তুই ঐ কথা এখন নাই বা নিলি ; তাহলেও মুনি ঋষিদের নিন্দা ও ঈশ্বরের স্বরূপের ইতি করিস কেন? তুই সত্যস্বরূপ ভগবানকে ডাকিয়া যা ; তারপর তিনি তোর নিকটে যেভাবে প্রকাশিত হইবেন, তাহাই বিশ্বাস করিবি।" নরেন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে উত্তম অধিকারী জানিয়া অদ্বৈততত্ত্ব শুনাইতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে আসিলে 'অষ্টাবক্রসংহিতা'দি অদ্বৈতগ্রন্থ পাঠ করিতে দিতেন। এই প্রক্রিয়াবলম্বনে নরেন্দ্রের মতপরিবর্তন ঘটিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল।

ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদের মহলে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে তুমুল সমালোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তবু ঠাকুরের ধৈর্যচ্যুতি হয় নাই বা ঐ প্রচেষ্টাও মন্দীভূত হয় নাই। একদিনের ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াইল।

এইসব বিষয়ে কালীবাটী নিবাসী প্রতাপচন্দ্র হাজরা মহাশয় নরেন্দ্রের সহিত সহমত ছিলেন। হাজরা মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; এইজন্য তাঁহার মনে ধর্মলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকিলেও উহা সাংসারিক উন্নতিকামনার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার চরিত্রকে এক জটিল রূপ প্রদান করিত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাধনানিরত হইলেও সিদ্ধাইলাভের দ্বারা অর্থাভিলাষ মিটাইবার আশাও পোষণ করিতেন। আবার সমাগত শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী ভক্তদিগকে বুঝাইতে চাহিতেন তিনিও একটা কম সাধু নহেন। হাজরাকে ঠাকুর ভালরূপেই চিনিতেন; তাই যুবক ভক্তদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন। "হাজরা শালার ভারী পাটোয়ারী বুদ্ধি; ওর কথা শুনিসনি।" তবু হাজরার সহিত নরেন্দ্রের বেশ বন্ধুত্ব ছিল—তামাকু-সেবনের জন্যও বটে, এবং হাজরা মহাশয়ের সহসা কোন কথা না মানিয়া উহার বিরুদ্ধে তর্কযুক্তি খাড়া করার উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তার জন্যও বটে। উভয়ের ঐরূপ ভাব দেখিয়া ঠাকুর বলিতেন, "হাজরা মহাশয় হচ্ছেন নরেন্দ্রের ফেরেণ্ড (বন্ধু)।" নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিলে আনন্দের তুফান ছুটিত। নরেন্দ্র গানের পর গান গাহিয়া যাইতেন। ঠাকুর সে পবিত্র সুমধুর কণ্ঠে অধ্যাত্মতত্ত্ব শুনিয়া সমাধিস্থ হইতেন; আবার অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া কোন একখানি বিশেষ গান শুনিতে চাহিতেন। সর্বশেষে নরেন্দ্রের মুখে ভক্তিমূলক বা আত্মসমর্পণসূচক "তুঝসে হামনে দিলকো লাগায়া, যো কুছ হায় সো তুঁহী হায়" ইত্যাদি কিংবা ঐরূপ কোন গান না শুনিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। পরে অদ্বৈতবাদের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেক উপদেশ দিতেন; নরেন্দ্র শুনিয়া যাইতেন, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হইত না।

একদিন ঐরূপ উপদেশের পর হাজরার নিকট বসিয়া তামাকু-সেবন করিতে করিতে নরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "উহা কি কখন হইতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যাহা কিছু দেখিতেছি এবং আমরা সকলেও ঈশ্বর!" হাজরাও সেই ব্যঙ্গালাপে যোগ দেওয়ায় উভয়ের মধ্যে হাস্যের রোল উঠিল। ঠাকুর তখনও অর্ধবাহ্যদশায়। নরেন্দ্রের হাস্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পরিধানের বস্ত্রখানি

বগলে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং "তোরা কি বলছিস রে?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। অতঃপর কি ঘটিল তাহা আমরা নরেন্দ্রনাথের মুখেই শুনিব :

"ঠাকুরের ঐদিনকার অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্যসত্যই দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বরভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই। ঐরূপ দেখিয়াও কিন্তু নীরব রহিলাম, ভাবিলাম—দেখি কতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ভাব থাকে। কিন্তু সেই ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমিল না। বাটীতে ফিরিলাম, সেখানেও তাহাই—যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম, সেসকলই তিনি, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। খাইতে বসিলাম, দেখি, অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন করিতেছেন, সেসকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। দুই এক গ্রাস খাইয়াই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। 'বসে আছিস কেনরে? খা না'—মার ঐরূপ কথায় হুঁশ হওয়ায় আবার খাইতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে খাইতে, শুইতে, কলেজে যাইতে, সকল সময়েই ঐরূপ দেখিতে লাগিলাম এবং সর্বদা কেমন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম। রাস্তায় চলিয়াছি, গাড়ী আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু অন্য সময়ের ন্যায় উহা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না। মনে হইত, উহাও যাহা, আমিও তাহাই। হস্তপদ এই সময়ে সর্বদা অসাড় হইয়া থাকিত এবং আহার করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি হইত না; মনে হইত যেন অপর কেহ খাইতেছে। খাইতে খাইতে সময়ে সময়ে শুইয়া পড়িতাম এবং কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আবার খাইতে থাকিতাম। এক একদিন ঐরূপে অনেক অধিক খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহার জন্য কোনরূপ অসুখও হইত না। মা ভয় পাইয়া বলিতেন, 'তোর দেখছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অসুখ হয়েছে'; কখন কখনও বলিতেন 'ও আর বাঁচবে না।' যখন পূর্বোক্ত আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমিয়া যাইত, তখন জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত। হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে লৌহরেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল, অথবা সত্যকার। হস্তপদের অসারতার জন্য মনে হইত, পক্ষাঘাত হইবে না তো? ঐরূপে কিছুকাল পর্যন্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম, উহাই অদ্বৈতবিজ্ঞানের আভাস। তবে তো শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যাহা

লেখা আছে, তাহা মিথ্যা নহে। তদবধি অদ্বৈততত্ত্বের উপর আর কখনও সন্দিহান হইতে পারি নাই।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।১৩৮–৪০)।

নরেন্দ্রনাথ এখন সত্যই অনুভব করিতেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ও অপর অনেকের জীবনধারা ক্রমেই পরিবর্তিত হইতেছে এবং তাঁহারা ক্রমেই সত্যলাভের নিকটবর্তী হইতেছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে দুই প্রহরের কিছু পূর্বে শ্রীযুক্ত শরৎ ও শশী (স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) নরেন্দ্রভবনে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যে এই সব কথা বলিয়াছিলেন এবং নিজ অনুভূতিরও সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনের পর তিনি সন্ধ্যাকালে তাঁহাদিগকে লইয়া হেদুয়ায় বেড়াইতে গেলেন এবং কিন্নরবিনিন্দিত কণ্ঠে গান ধরিলেন :

প্রেমধন বিলায় গোরা রায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়!
(তোরা কে নিবি রে আয়!)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
প্রেমে শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়।
(গৌরপ্রেমের হিল্লোলেতে) নদে ভেসে যায়॥

গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "সত্যসত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুত শক্তি!" কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে, সেইটাকে; পরে কত কথা, কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন। সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন।"

এইভাবে আলাপপ্রসঙ্গে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। তখন নরেন্দ্র বলিলেন, "চল তোমাদিগকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি।" স্বগৃহের নিকটে পৌঁছিয়া শরৎচন্দ্রের মনে হইল, এত রাত্রে নরেন্দ্রকে জলযোগ না করাইয়া যাইতে দেওয়া চলে না। অতএব সকলে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে আসিয়াই নরেন্দ্র সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এ বাড়ী যে আমি ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। ইহার কোথা দিয়া কোথায় যাইতে হয়, কোথায় কোন ঘর আছে, সে

সকলই যে আমার পরিচিত—আশ্চর্য!" নরেন্দ্রজীবনের এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আমরা পূর্বেও করিয়াছি। যাহা হউক, জলযোগের পর শরৎ ও শশী বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন্দ্রকে তাঁহার বাটী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। ('লীলাপ্রসঙ্গ' ৫।১৪০-৪২)।

মূর্তিপূজা সম্বন্ধেও নরেন্দ্রের মত এক অতি বিষাদময় অভিজ্ঞতা অবলম্বনে পরিবর্তিত হইয়াছিল। সে কথা আমরা পরে বলিব। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র স্বীয় বিরুদ্ধ মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেসব শুনিয়াও ভবিষ্যতের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেন, স্থলবিশেষে একটু মৃদু আপত্তি জানাইতেন মাত্র। ঠাকুরের দর্শনলাভের পূর্বেই ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখাইয়া নরেন্দ্রনাথ সাকারোপাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, যদিও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া সমাজের সর্বপ্রকার সামাজিক রীতি-নীতি মানিয়া লইবার জন্য তখনও তাঁহার মন প্রস্তুত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) পূর্ব হইতেই তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন ; তাঁহারই আকর্ষণে তিনিও ঐ নিরাকারোপাসনার অঙ্গীকারপত্র সহি করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রথমে রাখালচন্দ্র ও কয়েক মাস পরে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যখন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, তখন নরেন্দ্র একদিন দেখিতে পাইলেন, রাখালচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মন্দিরে যাইয়া দেববিগ্রহ সকলকে প্রণাম করিতেছেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া রাখালচন্দ্রকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া পুনরায় মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে দূষিত হইতে হইয়াছে।" রাখাল নীরব রহিলেন, কিন্তু তদবধি কিছুকাল নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতেন। পরে ঠাকুর ঐসব জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ, রাখালকে আর কিছু বলিস্‌নি ; সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে ; তা কি করবে বল? সকলে কি প্রথম হইতে নিরাকার ধারণা করতে পারে?" নরেন্দ্রও তদবধি রাখালের প্রতি আর দোষারোপ করিতেন না।

ঠাকুর নিজে নরেন্দ্রকে দেবতাদিতে বিশ্বাসের কথা তো বলিতেনই, আবার ভক্তদের সহিত তাঁহার তর্ক বাধাইয়া দিয়া ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি সুকোমল ভাবরাশি যাহাতে তাঁহার চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আসার কয়েক সপ্তাহ পরে (২৬শে

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২) 'কথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম বা মাস্টার মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী-ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হন। তখন তিনি বরাহনগরে অবস্থান করিতে-ছিলেন বলিয়া কয়েকবার উপর্যুপরি কালীমন্দিরে আসেন। নরেন্দ্রনাথও ঐ সময়ে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপন করেন। তিনি পঞ্চবটীতলে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর সহসা আসিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্বক সহাস্যে বলিলেন, "আজ তোর বিদ্যাবুদ্ধি বুঝা যাবে। তুই তো মোটে আড়াইটে পাস করেছিস ; আজ সাড়ে তিনটে পাস করা মাস্টার এসেছে।* চল, তার সঙ্গে কথা কইবি।" অগত্যা নরেন্দ্রকে মাস্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া পরিচয় ও আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিতে হইল। এইভাবে তাঁহাদিগকে কথা কহিতে লাগাইয়া ঠাকুর নীরবে বসিয়া বার্তালাপ শুনিতে ও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে থাকিলেন। পরে মাস্টার মহাশয় চলিয়া গেলে বলিলেন, "পাস করলে কি হয় ? মাস্টারটার মাদীভাব, কথা কইতেই পারে না।" এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর ঐরূপে আমাকে সকলের সহিত তর্কে লাগাইয়া দিয়া তখন রঙ্গ দেখিতেন।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।১৩০-৩১)।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ববঙ্গের কর্মস্থল হইতে আসিয়া মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ করিতেন। ঠাকুর তাঁহার ভাবভক্তির প্রশংসা করিতেন। নিজের ভাবে যুক্তি তর্ক উপস্থিত করিয়া বা ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তিনি প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিতে পারিতেন। একদিন তিনি আসিলে ঠাকুর তাঁহার সহিত নরেন্দ্রের তর্ক লাগাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট কিন্তু কেদার সেদিন হার মানিতে বাধ্য হইলেন। তারপর কেদার বিদায়গ্রহণ করিলে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, কেমন দেখলি ? কেমন ভক্তি বল দেখি ! ভগবানের নামে একেবারে কেঁদে ফেলে ! হরি বলতে যার চোখে ধারা বয়, সে জীবন্মুক্ত। কেদারটি বেশ—নয় ?" এদিকে তেজস্বী নরেন্দ্র পুরুষের পক্ষে নারীসুলভ ভাব অবলম্বনকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সুতরাং ঠাকুরের কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "তা মহাশয়, আমি কেমন করিয়া জানিব ? আপনি বুঝেন, আপনি বলিতে

*। নরেন্দ্র প্রবেশিকা ও এফ. এ. পাস করিয়া বি. এ. পড়িতেছিলেন। আর মাষ্টার মহাশয় বি. এ. পাস করিয়া বি. এল. পড়িতেছিলেন।

পারেন। নতুবা কান্নাকাটি দেখিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝা যায় না। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে চোখ দিয়া অমন কত জল পড়ে। আবার শ্রীমতীর বিরহ-সূচক কীর্তনাদি শুনিয়া যাহারা কাঁদে তাহাদের অধিকাংশ নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত বিরহের কথা স্মরণ বা আপনাতে ঐ অবস্থার আরোপ করিয়া কাঁদে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐরূপ অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার ন্যায় ব্যক্তিগণের মাথুর কীর্তন শুনিলেও অন্যের ন্যায় সহজে কাঁদিবার প্রবৃত্তি কখনই আসিবে না।"

গিরিশচন্দ্র, হীরানন্দ, গোপালের মা প্রভৃতির সহিত এই জাতীয় বিচারের কথা 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতের' পাঠকগণ অবগত আছেন। আমরা 'কথামৃতে' (৩।১৫।২) উল্লিখিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত একটি বিচারের সারমর্ম নমুনা স্বরূপে উল্লেখ করিতেছি। সেদিন অবতারবাদ সম্বন্ধে কথা চলিতেছিল। নরেন্দ্র বলিলেন, "প্রমাণ না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন?" গিরিশ উত্তর দিলেন, "বিশ্বাসই যথেষ্ট প্রমাণ। এ জিনিসটা এখানে আছে, ইহার প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।" একজন ভক্ত বলিলেন, "বাইরের জগৎ বাইরে আছে, দার্শনিকরা কেউ প্রমাণ করতে পেরেছে? তবে বলছে, অনিবার্য বিশ্বাস।" গিরিশ বলিলেন, "তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না। হয়তো বলবে, ও বলছে, 'আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি', ও মিথ্যাবাদী, ভণ্ড।" তারপর কথা উঠিল, দেবতারা অমর কিনা। নরেন্দ্র আবার বলিলেন, "তার প্রমাণ কই?" গিরিশ বলিলেন, "তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।" নরেন্দ্র বলিলেন, "অমর—অতীত যুগেও ছিল —প্রমাণ চাই।" পল্টু চুপিচুপি মণির কথা শুনিয়া সহাস্যে নরেন্দ্রকে বলিলেন, "অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন, "নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে।" সকলে চুপ করিয়া আছেন। একটু পরে যোগীন বলিলেন, "নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।" ঠাকুর এই কথার অনুমোদনের জন্য নরেন্দ্রের চামচিকাকে চাতক বলিয়া ভ্রম করার গল্পটি সকলকে শুনাইলেন, আর বলিলেন, "সেই থেকে ওর কথা আর লই না।" আবার বলিলেন, "যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক হয়ে ওকে বললাম 'কথা কয় যে রে!' নরেন্দ্র বললে, 'ও অমন হয়।' তখন মার

কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, 'মা, একি হলো? এসব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে!' তখন দেখিয়ে দিলে, চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য, চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, 'এ সব কথা মেলে কেমন করে, যদি মিথ্যা হবে?' তখন বলেছিলাম, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি! তুই আর আসিস নাই।"

আবার বিচার শুরু হইল। নরেন্দ্র শাস্ত্র মানেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "তা বলে এসব (শাস্ত্রোক্ত বিষয়) নাই বলছি না। বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দাও।" তর্ক চলিতেই লাগিল। অবশেষে ঠাকুর বলিলেন, "শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু নিতে হয়—যে অর্থটুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে, তার মুখের কথা অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছু লই না।"

সময়বিশেষে বিচারে যোগ দিয়া ঠাকুর কিরূপে নরেন্দ্রের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করিতেন, তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত 'কথামৃতে' (১।১৪।৭-৮) পাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন, গিরিশ ও নরেন্দ্র যাহাতে ইংরেজীতে বিচার করেন। বিচার আরম্ভ হইল; কিন্তু ইংরেজীতে নহে, বঙ্গভাষায়। নরেন্দ্র বলিলেন, "ঈশ্বর অনন্ত, তাঁকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি সকলের ভিতরেই আছেন, শুধু একজনের (অর্থাৎ অবতারের) ভিতর এসেছেন, এমন নয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ সংশোধনকল্পে সস্নেহে বলিলেন, "ওর যা মত, আমারও তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে—শক্তিবিশেষ; তিনি কোনখানে অবিদ্যাশক্তির প্রকাশ, কোনখানে বিদ্যাশক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোনো আধারে শক্তি কম। তাই সব মানুষ সমান নয়।" শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সেখানে ছিলেন। তিনি ভক্ত, তাই বলিয়া উঠিলেন, "এসব মিছে তর্কে কি হবে?" ঠাকুর সায় না দিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "না না, ওর একটা মানে আছে।" অতএব তর্ক পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। গিরিশ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কেমন করে জানলে তিনি দেহধারণ করে আসেন না?" নরেন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে বলিলেন, "তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম্।" ঠাকুর আবার সংশোধন করিলেন, "না, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ আত্মা একই। ঋষিরা শুদ্ধ মন, শুদ্ধ আত্মার

দ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।" গিরিশ আবার বলিলেন, "মানুষকে জ্ঞানভক্তি দেবার জন্য তিনি দেহধারণ করে আসেন ; না হলে কে শিক্ষা দেবে?" নরেন্দ্র সহজেই উত্তর দিলেন, "কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।" ঠাকুর অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, অন্তর্যামিরূপে তিনি বুঝাবেন।" কিন্তু তর্ক ক্রমে ঘোরতর হইতে লাগিল ; হ্যামিল্টন, হার্বার্ট স্পেন্সার, টিণ্ডল, হাক্‌স্‌লী প্রভৃতির মত উদ্ধৃত হইতে লাগিল। তখন ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, "দেখ, ইগুলো আমার ভাল লাগছে না। আমি সব তাই দেখছি। বিচার আর কি করবো? দেখছি তিনিই সব। তিনিই সব হয়েছেন—তাও বটে ; আবার তাও বটে। এক অবস্থায় অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হয়ে যায়।...আবার দুথাক না নামলে কথা কইতে পারি না। বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছে—তাও আছে ; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে। আমি দেখছি, তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই জীব, জগৎ ও ঈশ্বর হয়েছেন।... আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ ; আর কি বিচার করব? দেখেছি, বিচার করে একরকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায় আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক! এর নাম অবতার। তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার করতে হয় না ; কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না।"

এইরূপ কত বিচারই চলিত! ঠাকুর কখনও উদাসীন শ্রোতারূপে বসিয়া থাকিতেন ; কখনও নিজ সিদ্ধান্ত জানাইতেন, কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বিচার বন্ধ করিতেন ; কখনও বা অন্যভাবে বৃথা তর্কের মোড় ফিরাইয়া দিতেন। আর সব সময়েই এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, প্রত্যক্ষানুভূতিই হইল একমাত্র জিনিস। হৃদয়ে যখন অনুভূতি জাগে তখন সব বিচারের অবসান হয়, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হৃদয়েই উদ্ভাসিত হয়। একদিন নরেন্দ্র ও ভক্তদের মধ্যে তুমুল বিচার চলিতেছে—ভগবান সগুণ না নির্গুণ ; ভগবান অবতার গ্রহণ করেন কিংবা উহা পৌরাণিক কাহিনী মাত্র? চুলচেরা বিচার চলিয়াছে শাস্ত্রের কথা লইয়া, এবং অবশেষে নরেন্দ্রেরই জয় হইয়াছে তিনি আর সমস্ত যুক্তিকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট আসিলেন এবং তাঁহারা শুনিলেন, তিনি গাহিতেছেন :

> মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে?
> সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?

অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তিসারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠুরী ভোর হলে সে লুকাবে রে!
ষড়দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহারে চুম্বক ধরে।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে,
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে ॥

অমনি তার্কিকগণ এক অপূর্বভাবে বিভোর হইয়া সেই সুধাময় কণ্ঠের মনোমুগ্ধকারী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন—এই তো তাঁহাদের সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি! বস্তুতঃ ঠাকুর নিজ অনুভূতির স্তর হইতেই কথা কহিতেন, এবং ইচ্ছামত সে অনুভূতি অপরের মনে অনুসংক্রামিত করিতে পারিতেন।

নরেন্দ্রনাথকে তিনি অলক্ষ্যে ও অপ্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিলেও সাধারণতঃ আপনভাবেই ধর্মজগতে অগ্রসর হইতে দিতেন। এই সমস্ত বিচারাদিকে তিনি অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্বীয় ধারণা পরিষ্কার করার উপায় ও বললাভের একপ্রকার ব্যায়াম বলিয়াই মনে করিতেন—সাধনাদ্বারাই তো সিদ্ধিলাভ হইবে। তিনি নরেন্দ্রকে বলিতেন, "আমি বলেছি বলেই কিছু মেনে নিবি না, কিন্তু নিজে সব যাচাই করে নিবি। মানলে বা না মানলেই তো আর বস্তুলাভ হবে না, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভূতি করলে তবেই হবে।"

নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর প্রথম হইতেই চিনিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "ও খাপ-খোলা তরোয়াল", "পুরুষের ভাব ওর ভেতর"; "ও অখণ্ডের ঘর"; "সপ্তর্ষির একজন"; "নরনারায়ণের নরঋষি"। ইঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, "এ নিত্যসিদ্ধের থাক।" আরও বলিতেন, "এ যেদিন নিজেকে জানতে পারবে সেদিন আর দেহ রাখবে না।" নরেন্দ্রের মায়ারাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার এত স্থিরনিশ্চয় ছিল এবং জগতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য নির্বাহের পূর্বেই পাছে নরেন্দ্র স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবৃত্ত হন এই বিষয়ে এতই ভাবনা ছিল যে, তিনি জগন্মাতার নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহাতে ঐরূপ না হয়। ঘটনাটি এই—একদিন ঠাকুর ভক্তদিগকে বলিতেছিলেন, "দেখ, এই নরেন রয়েছে! দেখ দেখ, নরেনের কি অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা—এ যেন সীমাহীন জ্যোতির

সমুদ্র! স্বয়ং মা মহামায়া যেন ওর দশ ফুট দূরের বেশী এগুতে পারেন না। মহামায়া ওকে যা বিভূতি দিয়েছেন, তা দিয়ে তিনি যেন তাঁর নিজেরই হাত-পা বেঁধে ফেলেছেন।" তারপরই তিনি মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা ওর ভেতর একটু মায়া প্রবেশ করিয়ে দে, নতুবা কোন কাজ হবে না।" নরেন্দ্রের প্রতিভা ও বৈরাগ্য দর্শনে সবিস্ময়ে ঠাকুর বলিতেন, "ওর মধ্যে শিবের শক্তি আছে।" নরেন্দ্রের পুরুষোচিত ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "ও হচ্ছে আমার শ্বশুর-ঘর।" কখনও বা রহস্যময় ভাষায় বলিতেন, "এর (নিজের) ভেতর যেটা রয়েছে সেটা মাদী, আর ওর (নরেন্দ্রের) ভেতর যেটা আছে, সেটা মদ্দ।" প্রকৃতপক্ষে উভয় আত্মা ছিলেন ঠাকুরের নিকট অভিন্ন—যদিও ভিন্ন পরিবেশহেতু প্রকাশ বিভিন্ন। 'কথামৃতে' আছে (৫।১৬।২) : "শ্রীরামকৃষ্ণ—'আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি ; আর আমি ওর অনুগত।' গিরিশ—'আপনি কারই বা অনুগত নন?' শ্রীরামকৃষ্ণ—'ওর মদ্দের ভাব (পুরুষ-ভাব), আর আমার মেদিভাব। নরেন্দ্রের উঁচু ঘর, অখণ্ডের ঘর।' "

ঠাকুর স্পষ্টতঃ নরেন্দ্রকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' আছে, "নবাগত শ্রেণীভুক্ত নরনারীদিগের তো কথাই নাই, পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে[৭] নির্দেশ করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বরকোটি অথবা শ্রীভগবানের কার্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি একদিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল ; এই কয়েকজনকে ঐ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও, ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহবা বড়জোর বিশ-দলবিশিষ্ট পদ্ম।' অন্য একসময় বলিয়াছিলেন, 'এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মতো একজনও কিন্তু আর আসিল না।' " (৫।২২২-২৩)।

'কথামৃতে' লিপিবদ্ধ এইজাতীয় অনেক কথা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে বিশেষ করিয়া চতুর্থ ভাগের (৪।২৩।৭) কয়েকটি কথার প্রতি পাঠক-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—'এতো ভক্ত আসছে, ওর মতো একটি নাই',

৭। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, যোগেন, নিরঞ্জন ও পূর্ণ।

'পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল', 'অন্যেরা কলসী ঘটি এসব হতে পারে—নরেন্দ্র জালা,' 'ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি—যেমন হালদার পুকুর', 'মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা-চক্ষু বড় রুই—আর সব···পোনা কাঠি বাটা ইত্যাদি', 'নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়।'

ফল কথা এই—নরেন্দ্রনাথের অত্যচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকিয়া ঐ শক্তি যাহাতে সমুচিত পথাবলম্বনে আত্মবিকাশলাভ করিয়া জগতের কল্যাণসাধনে পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত হয়—সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আন্তরিক উদ্যমের অন্ত ছিল না। উপযুক্ত শিষ্যের গতিবিধির প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিতেন, তাঁহাকে স্বাধীনতা দিতেন, উৎসাহ দিতেন, আবার প্রয়োজন স্থলে সাবধানও করিয়া দিতেন। শেষোক্ত বিষয়ে দুই-একটি দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। আর একদিন মাস্টার মহাশয়ের সহিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নৈতিকতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে নরেন্দ্র তৎকালীন ছাত্রসমাজের অনৈতিকতায় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "ওসব কথা কেন? ভগবানের কথা বল, আর কিছু না।" তিনি স্বীয় সন্তানদের মন শুভেরই দিকে আকর্ষণ করিতেন, অশুভের আলোচনায় কালক্ষেপণ পছন্দ করিতেন না। পুণ্যের অনুসরণের ফলে পাপ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়, প্রত্যুত পাপের চিন্তায় পাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এই স্বাভাবিক রীতি অবলম্বনেই তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী নিয়মিত হইত।

ভালবাসার টানে ও সদুপদেশ দানের প্রবল ইচ্ছায় ঠাকুর মাঝে মাঝে রামতনু বসুর লেনস্থ নরেন্দ্রের টঙে আসিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গীত শুনিতেন, সাধনাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন। ঠাকুরের ভয় ছিল, পাছে আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে নরেন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করিয়া বসেন। তিনি বলিতেন, "বার বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের ফলে মানবের মেধানাড়ী খুলিয়া যায়। তখন তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সকলে প্রবেশ ও উহাদের ধারণা করিতে সক্ষম হয়। ঐরূপ বুদ্ধিসহায়েই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তিনি কেবলমাত্র ঐরূপ শুদ্ধবুদ্ধির গোচর।" পাঠগৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর যখন একদিন ঐরূপ উপদেশ দিতেছিলেন, তখন নরেন্দ্রের মাতামহী আড়াল হইতে উহা শুনিয়া তাঁহার পিতামাতাকে জানাইয়া দেন। ইঁহাদের পূর্ব হইতেই সন্দেহ ছিল যে, ঠাকুর ঐ

বিষয়ে নরেন্দ্রের মনে অবশ্যই বিদ্বেষভাব রোপণ করেন। ঐ দিনের ঘটনায় উহার সমর্থন পাইয়া ইঁহারা অতঃপর নরেন্দ্রের বিবাহবিষয়ে আরও তৎপর হইলেন ; কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হইল না। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের প্রবল ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাদের সকল চেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছিল। সকল বিষয় স্থির হইবার পরেও কয়েক স্থানে সামান্য কথায় উভয় পক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া বিবাহসম্বন্ধ সহসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।"

ঠাকুরের শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য বহু কথা আমরা ('লীলাপ্রসঙ্গ' ৫।১৯৫-৯৭ পৃঃ হইতে) নরেন্দ্রনাথের শ্রীমুখেই শুনিতে পাই : "ঠাকুরের নিকটে কী আনন্দে দিন কাটিত ! খেলা রঙ্গরস প্রভৃতি সামান্য দৈনন্দিন ব্যাপারসকলের মধ্য দিয়া তিনি কিভাবে নিরন্তর উচ্চশিক্ষা প্রদানপূর্বক আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখন ভাবিয়া বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বালককে শিখাইবার কালে শক্তিশালী মল্ল যেরূপ আপনাকে সংযত রাখিয়া তদনুরূপ শক্তিমাত্র প্রকাশপূর্বক কখন যেন তাহাকে অশেষ আয়াসে পরাভূত করিয়া এবং কখনও বা স্বয়ং তাহার নিকটে পরাভূত হইয়া তাহার মনে আত্ম-প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়, আমাদিগের সহিত ব্যবহারে ঠাকুর এইকালে অনেক সময় ঠিক সেইরূপ ভাব অবলম্বন করিতেন। আমাদিগের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার বীজ ফুলফলায়িত হইয়া কালে যে আকার ধারণ করিবে, তাহা তখন হইতে ভাবমুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদিগের প্রশংসা করিতেন, উৎসাহিত করিতেন, এবং বাসনাবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পাছে আমরা জীবনের ঐরূপ সফলতা হারাইয়া বসি, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত আমাদিগের প্রতি আচরণ লক্ষ্য করিয়া উপদেশ-প্রদানে আমাদিগকে সংযত রাখিতেন। কিন্তু তিনি যে ঐরূপে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্যপূর্বক আমাদিগকে নিত্য নিয়মিত করিতেছেন, একথা আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না। উহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাপ্রদান এবং জীবন গঠন করিয়া দিবার অপূর্ব কৌশল।

"ধ্যান-ধারণাকালে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া মন অধিকতর একাগ্র হইবার অবলম্বন পাইতেছে না অনুভব করিয়া তাঁহাকে কি কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ঐরূপ স্থলে স্বয়ং কিরূপ করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে জানাইয়া ঐ বিষয়ে নানা কৌশল বলিয়া দিতেন। আমার স্মরণ হয়, শেষ রাত্রিতে ধ্যান করিতে বসিয়া আলমবাজারে অবস্থিত চটের কলের বাঁশীর শব্দে

মন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। তাঁহাকে ঐকথা বলায় তিনি ঐ বাঁশীর শব্দেতেই মন একাগ্র করিতে বলিয়াছিলেন এবং ঐরূপ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। আর এক সময়ে ধ্যান করিবার কালে শরীর ভুলিয়া মনকে লক্ষ্যে সমাহিত করিবার পথে বিশেষ বাধা অনুভব করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি বেদান্তোক্ত-সমাধি-সাধনকালে শ্রীমৎ তোতাপুরী দ্বারা ভ্রূমধ্যে মন একাগ্র করিতে যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন সেই কথার উল্লেখ-পুরঃসর নিজ নখাগ্রদ্বারা আমার ভ্রূমধ্যে তীব্র আঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঐ বেদনার উপর মনকে একাগ্র কর।' ফলে দেখিয়াছিলাম, ঐরূপে ঐ আঘাতজনিত বেদনার অনুভবটা যতক্ষণ ইচ্ছা সমভাবে মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং ঐকালে শরীরের অপর কোন অংশে মন বিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঐ অংশসকলের অস্তিত্বের কথা এককালে ভুলিয়া যাওয়া যায়। ঠাকুরের সাধনার স্থল নির্জন পঞ্চবটীতলই আমাদিগের ধ্যান-ধারণা করিবার বিশেষ উপযোগী স্থান ছিল। শুদ্ধ ধ্যান-ধারণা কেন, ক্রীড়াকৌতুকেও আমরা অনেক সময় ঐ স্থানে অতিবাহিত করিতাম। ঐ সকল সময়ও ঠাকুর আমাদিগের সহিত যথাসম্ভব যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্ধন করিতেন। আমরা তথায় দৌড়াদৌড়ি করিতাম, গাছে চড়িতাম, দৃঢ় রজ্জুর ন্যায় লম্বমান মাধবীলতার আবেষ্টনে বসিয়া দোল খাইতাম, এবং কখন কখন আপনারা রন্ধন করিয়া ঐ স্থলে চড়ুইভাতি করিতাম। চড়ুইভাতির প্রথম দিনে আমি স্বহস্তে পাক করিয়াছি দেখিয়া ঠাকুর স্বয়ং ঐ অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হস্তপক্ব অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না জানিয়া আমি তাঁহার নিমিত্ত ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদী অন্নের বন্দোবস্ত করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর মত শুদ্ধ-সত্ত্বগুণীর হাতে ভাত খেলে কোন দোষ হবে না।' আমি উহা দিতে বারংবার আপত্তি করিলে তিনি আমার কথা না শুনিয়া আমার হস্তপক্ব অন্ন সেদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসার আর একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন আমরা 'লীলা প্রসঙ্গ' হইতে তুলিয়া দিতেছি। এক সময় নরেন্দ্র দুই-এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারেন নাই। এদিকে তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল ঠাকুর ভাবিলেন, কলিকাতার অন্যত্র কোথাও গেলে হয়তো নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ নাও হইতে পারে, কিন্তু নরেন্দ্র সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সান্ধ্যোপসনাকালে ভজন গাহিতে

নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে ; সেখানে অবশ্যই দেখা হইবে। বিনা নিমন্ত্রণে হঠাৎ সমাজগৃহে উপস্থিত হইলে সমাজকর্তৃপক্ষ উহা কিভাবে গ্রহণ করিবেন, এই চিন্তাও ঠাকুরের মনে যে উদিত হয় নাই তাহা নহে, তবে তিনি ভাবিলেন ঐভাবে নববিধান-সমাজে গেলে তিনি যখন সাদরে গৃহীত হন, তখন সাধারণ-সমাজেও তাহাই হওয়া স্বাভাবিক ; শিবনাথ প্রভৃতির নিকটও তিনি তো অপরিচিত নহেন। শুধু একটি কথা ঠাকুর ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহার সম্পর্কে আসিয়া কেশবাদি ব্রাহ্মনেতাদের মনে ও আচারে ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া সাধারণ-সমাজের নেতারা সাবধান হইয়া গিয়াছিলেন এবং শিবনাথ প্রভৃতি অতঃপর দক্ষিণেশ্বরে তেমন যাতায়াত করিতেন না, বরং অসাক্ষাতে পরমহংসদেব সম্বন্ধে একটু-আধটু বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেন—তাঁহাদের মতে ঠাকুরের সমাধি স্নায়ুদৌবল্যের পরিচায়ক এবং ভগবান সম্বন্ধে অত্যধিক ভাবিতে গিয়া তাঁহাতে উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। যাহা হউক, ঠাকুর সেদিন সন্ধ্যাসমাগমে সরলমনেই সমাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

সান্ধ্য উপাসনা ও ধ্যান সমাপনান্তে আচার্য বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় অর্ধবাহ্যদশাপন্ন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বেদিকায় উপবিষ্ট আচার্যের দিকে ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমবেত উপাসকদের অনেকেই তাঁহাকে চিনিতেন ; কাজেই তাঁহার আগমনবার্তা অচিরে সমাজভবনের সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং ইতিপূর্বে যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই তাঁহারা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেহ বা বেঞ্চির উপর উঠিলেন। এইরূপে মন্দিরাভ্যন্তরে এক অবাঞ্ছিত চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল দেখিয়া আচার্যের ভাষণ থামিয়া গেল। ভজন-মণ্ডলীতে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ঝটিতি তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু আচার্য বা অপর কোন ব্রাহ্মনেতা অগ্রসর হইলেন না, বা সৌজন্য-প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করিলেন না। সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপহীন ঠাকুর বেদী-সমীপে আসিয়াই সমাধিস্থ হইলেন ; তখন বিশৃঙ্খলা চরমে উঠিল এবং অবস্থা আয়ত্তে আনার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ গ্যাস বন্ধ করিয়া একসঙ্গে সব আলো নিভাইয়া দিলেন। ইহাতে গণ্ডগোল বৃদ্ধি পাইল এবং অনন্যোপায় নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সমাধিভঙ্গের অপেক্ষা

ছিল ; এই প্রেমের উচ্ছ্বসিত বহিঃপ্রকাশও যে কিছুকাল-ব্যাপী ছিল, তাহা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের কথা হইতেই পাই। নরেন্দ্রের আগমনের প্রায় দুই বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে আসিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথকে "দূরে দেখিবামাত্র ঠাকুরের সম্পূর্ণ অন্তর যেন প্রবলবেগে শরীর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিত ! 'ঐ ন—', 'ঐ ন—' বলিতে বলিতে আমরা কতদিন ঠাকুরকে ঐরূপে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি তাহা বলা যায় না ?" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।১৮১)। নরেন্দ্রও ঠাকুরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন এবং সপ্তাহে দুই-একবার দক্ষিণেশ্বরে না আসিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না ; সুযোগ পাইলে সেখানে দুই চারিদিন থাকিয়াও যাইতেন।

এইরূপ হইলেও কিন্তু ইচ্ছাময় ঠাকুর নরেন্দ্রের প্রতি অকস্মাৎ এক অদ্ভুত ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। নরেন্দ্র আসিলেন, যথারীতি প্রণত হইলেন এবং সম্মুখে বসিয়া শ্রীমুখের বাণীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ঠাকুর কুশল প্রশ্নও করিলেন না, একবার মাত্র তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আপনমনে বসিয়া রহিলেন—যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত ! নরেন্দ্র ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি ভাবাবিষ্ট ; তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং হাজরা মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপে ও তামাকু-সেবনে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুর অপরের সহিত কথা কহিতেছেন শুনিয়া তিনি হয়তো আবার ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু এবারেও নরেন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ না করিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। এই প্রকারে সারাদিন কাটিয়া গেলেও ঠাকুরের ভাবান্তর হইল না দেখিয়া সন্ধ্যাসমাগমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নরেন্দ্র বিদায় লইলেন। ইহার পরও নরেন্দ্র পূর্বেরই ন্যায় নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন ; কিন্তু ঠাকুরের ঔদাসীন্য একই রকমে চলিতে লাগিল। এই ধারায় এক মাসেরও অধিক কাল কাটিয়া গেলে ঠাকুর যখন দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কোন ব্যতিক্রম হইতেছে না, তখন তাঁহাকে একদিন নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তো তোর সহিত একটি কথাও কহি না, তবু তুই এখানে কি করতে আসিস বল দেখি ?" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি ? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছা করে, তাই আসি।" ঠাকুর ঐ কথায় প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা করে) দেখছিলাম—আদরযত্ন না পেলে তুই পালাস কিনা ; তোর

মতো আধারই এতটা (অবজ্ঞা ও উদাসীনতা) সহ্য করিতে পারে—অপরে এত দিন কোন কালে পালিয়ে যেত, এদিক আর মাড়াত না।"

নরেন্দ্রনাথ আর একদিন আর এক প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ঠাকুর সেদিন নির্জন পঞ্চবটীতলে নরেন্দ্রকে আহ্বান করিয়া পরীক্ষাচ্ছলেই হউক কিংবা সত্যসত্যই যোগবিভূতি অর্পণের উদ্দেশ্যে হউক, তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, তপস্যাপ্রভাবে আমাতে অণিমাদি-বিভূতি-সকল অনেক কাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যাহাব পরিধানের কাপড় পর্যন্ত ঠিক থাকে না, তাহার এই সকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবসর কোথায়? তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে ঐসকল প্রদান করি; কারণ মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐসকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্যকালে ঐসকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি। কি বলিস?" এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া অধ্যাত্মজগতের চিরন্তন ইতিহাস। যমরাজের নিকট নচিকেতাকে এইরূপ পরীক্ষাই দিতে হইয়াছিল; যাজ্ঞবল্ক্যের সাক্ষাতে মৈত্রেয়ী এই জাতীয় পরীক্ষারই সম্মুখীন হইয়াছিলেন; উত্তরও ছিল সর্বক্ষেত্রে এক। আজ নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠেও সেই সুপ্রাচীন উত্তরই আবার প্রত্যুচ্চারিত হইল। তিনি প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, ঐ সকলের দ্বারা আমার ঈশ্বরলাভবিষয়ে সহায়তা হইবে কি?" ঠাকুর বলিলেন, "সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশ্বরলাভ করিয়া যখন তাঁহার কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইবি তখন উহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।" অর্থাৎ নচিকেতা বা মৈত্রেয়ীর নিকট সমস্যাটি যেভাবে আসিয়াছিল, নরেন্দ্রের নিকট তদপেক্ষাও জটিলতররূপে উপস্থিত হইল। তবু নরেন্দ্রের সেই একই উত্তর, "মহাশয়, আমার ঐসকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বরলাভ হউক; পরে ঐসকল গ্রহণ করা বা না-করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভূতিসকল এখন লাভ করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগকে অযথা ব্যবহার করিয়া বসি, তাহা হইলে সর্বনাশ হইবে যে!"

শ্রীশ্রীঠাকুর পরীক্ষা করিতেন ও শিখাইতেন; আবার নরেন্দ্রও শ্রীশ্রীগুরুর বাণী শুনিয়া শিখিতেন—কারণ ভগবান তাঁহাকে অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কারের মতে নরেন্দ্রনাথের অনুপম মেধাশক্তি ছিল পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহাকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

অন্য ভক্তগণ ঠাকুরের যেসব অমূল্য উপদেশ সাধারণভাবে গ্রহণ করিতেন কিংবা তৎপ্রতি অধিক মনোনিবেশ করিতেন না, সেগুলির মধ্যেও নরেন্দ্র-প্রতিভা অতিগম্ভীর ও ফলপ্রসূ মর্ম উদ্‌ঘাটন করিত। এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লিখিত হইয়াছে: ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। সদালাপ এবং মাঝে মাঝে রঙ্গরস চলিতেছে। কথায় কথায় বৈষ্ণবধর্মের প্রসঙ্গে ঠাকুর উপস্থিত সকলকে ঐ মতের মর্মকথা সংক্ষেপে বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন।' যেই নাম, সেই ঈশ্বর, নাম নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে। এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার—একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া—।" "সর্বজীবে দয়া" পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, এবং তারপর অর্ধবাহ্যদশায় ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

সকলেই শুনিয়া গেলেন মাত্র; কিন্তু ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক কঠোর নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন।··· ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।··· ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে।···কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যেসকল সাধক অগ্রসর হইতেছে, তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে।···যাহা হউক, ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

ফলতঃ বলিতে গেলে, ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দ নরেন্দ্রনাথের জীবনে অতি গুরুত্ব-পূর্ণ। ইহাই তাঁহার জীবনের সঙ্কটমুহূর্ত, ইহাই আবার তাঁহার জীবনে আলোকোদ্ভাসনের শুভলগ্ন—নরেন্দ্রনাথের স্বামী বিবেকানন্দে পূর্ণবিকাশের ভিত্তিপত্তন সম্ভবতঃ ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে। আমরা এক্ষণে এই গুরুত্বপূর্ণ বৎসরটির অধিকতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সাংসারিক বিপর্যয় ও নবালোক

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত তখন ভারতের রাজধানী মহানগরী কলিকাতার সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, আইন ব্যবসায়ে তিনি এমন সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন যে, উত্তর ভারতের দূর দূর নগরেও তাঁহাকে কার্যব্যপদেশে যাইতে হইত এবং সেসব স্থানে দীর্ঘকাল কাটাইতে হইত। তাঁহার আয় ছিল প্রচুর; কিন্তু আত্মীয়প্রতিপালন এবং বন্ধুদিগকে লইয়া সঙ্গীতোপভোগ ও ভোজনাদিতে ব্যয়ও হইত প্রচুর। অধিকন্তু যৌথপরিবারের উপার্জনহীন কর্তা কালীপ্রসাদ একদিকে যেমন ছিলেন অমিতব্যয়ী, অপরদিকে তেমনি ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বনাথের আয়ের উপর পূর্ণ দাবি রাখিতেন। পৈতৃক সম্পত্তি তো তিনি নষ্ট করিতেনই; অধিকন্তু বিশ্বনাথের অর্থেও ভাগ বসাইতেন। শেষদিকে বিশ্বনাথ বাবু তাঁহার কলিকাতার এটর্নি অফিসের উপর নজর রাখিতে পারিতেন না। জনৈক বন্ধুর উপর উহার ভার অর্পণ করিতে বাধ্য হন। বন্ধু এই সুযোগে বিশ্বনাথবাবুর নামে ঋণ করিয়া সেইসব অর্থ আত্মসাৎ করিতে থাকেন। কাজেই বিশ্বনাথ-পরিবারে তখন একটা বাহ্যিক আড়ম্বর থাকিলেও আর্থিক ও বৈষয়িক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরিবারটি যে কোন মুহূর্তে সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে পারিত। তখন পর্যন্ত একমাত্র ভরসা ছিল বিশ্বনাথের অপরিমিত অর্থোপার্জন এবং খুল্লতাতের অমিতব্যয়িতার পরেও রক্ষিত অবশিষ্ট যৌথ-সম্পত্তির যৎকিঞ্চিৎ অংশ। এই সম্পত্তিও পরে বিবাদাস্পদ হইয়া পড়ে। বিশ্বনাথের জীবনসন্ধ্যায় যৌথপরিবারে মনোমালিন্য বর্ধিত হওয়ায় তাঁহাকে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া স্ত্রীপুত্রসহ পৃথক অন্নের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং তজ্জন্য অস্থায়িভাবে ৭নং ভৈরব বিশ্বাস লেনের এক ভাড়া বাড়িতে চলিয়া যাইতে হয়। নরেন্দ্র তখন (১৮৮৩ খৃঃ ?) বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ভাড়া বাড়িটি মাতামহীর বাড়ীরই সন্নিকটে থাকায় তিনি দ্বিতীয় গৃহেরই দ্বিতলে পাঠাভ্যাস করিতেন। ইহারই কোন এক সময়ে তিনি পিতার আদেশে পিতৃবন্ধু নিমাইচন্দ্র বসু মহাশয়ের আফিসে এটর্নির কাজ শিখিবার জন্য শিক্ষানবিশরূপে ভর্তি হইয়া প্রতিদিন পিতা ও খুল্লতাতের সহিত আফিসে বাহির হইতে থাকেন। এইরূপ বহু ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পূর্বেরই ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন

এবং বন্ধুদের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। এমনি করিয়া জীবন সহজ সরল ভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল জানিবার পূর্বেই বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল।[১]

নরেন্দ্রের বন্ধু ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় বরাহনগরে বাস করিতেন, ও নরেন্দ্রের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। তাঁহার নারীসুলভ কোমল প্রকৃতি এবং নরেন্দ্রের সহিত প্রগাঢ় সৌহার্দ্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে রহস্য সহকারে বলিতেন, "জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয় ?" ভবনাথ সুবিধা পাইলেই নরেন্দ্রকে নিজগৃহে আনিয়া ভোজন করাইতেন। তাঁহার প্রতিবেশী সাতকড়ি লাহিড়ীর সহিত নরেন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের পূর্বপরিচিত দাশরথি সান্ন্যালের গৃহও নিকটেই ছিল। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন-কালে কিংবা বিশেষ নিমন্ত্রণব্যপদেশে নরেন্দ্রনাথ এইসব বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া কিছুকাল আমোদ-আহ্লাদে কাটাইতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি শনিবার অপরাহ্নে তিনি বরাহনগরে আগমনপূর্বক ভজনাদিতে রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত কাটাইয়া শয্যাগ্রহণান্তে বন্ধুদের সহিত নানাবিধ আলাপে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধু "হেমালী" রাত্রি প্রায় দুইটার সময় সেখানে আসিয়া খবর দিলেন, তাঁহার পিতা অকস্মাৎ ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গের বাহিরে স্বকার্যে নিযুক্ত থাকাকালে বিশ্বনাথ বাবুর বহুমূত্র রোগ হয় ; মৃত্যুর একমাস পূর্বে তিনি হৃদ্‌রোগেও আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী শয্যাগ্রহণ করেন। ইহার পরই একটি কার্যস্থলে যাইতে হয়। সেখান হইতে ফিরিয়া পত্নীকে বলেন যে, মক্কেল তাঁহাকে বহুদূরে আলিপুরে দলিলপত্র দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল, তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেছেন। অতঃপর রাত্রে আহারের পর বুকে ঔষধ মালিশ করাইয়া তামাক সেবন করিতে করিতে তিনি কিছু লেখাপড়ার কাজে মন দেন ; নয়টায় উঠিয়া বমি করেন এবং তারপরই রাত্রি দশটায় হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। পরদিন নরেন্দ্রের জন্য পাত্রী দেখিতে

১। এই অধ্যায়ের পারিবারিক ঘটনাবলী আমরা প্রধানতঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের *Swami Vivekananda Patriot-Prophet* হইতে লইলাম (১০২-৮ পৃঃ)। মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন'ও দ্রষ্টব্য।

যাওয়ার কথা ছিল এবং ঐজন্য বিশ্বনাথ বাবু বস্ত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সবই পণ্ড হইল।

পিতার ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াদি সমাপনান্তে নরেন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ। পিতা কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং প্রচুর ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। সুদিনের বন্ধুগণ ও পিতার অন্নে প্রতিপালিত আত্মীয়বৃন্দ এই দুর্দিনে সরিয়া দাঁড়াইলেন; পূর্বপুরুষের ভিটার অংশীদারগণ শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বনাথ পুত্রগণ দেখিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায্য পৈতৃক অংশ হইতেও বঞ্চিত হইতে বসিয়াছেন। বিশ্বনাথের জীবনকালেই সম্পত্তি বিভাগের মকদ্দমা শুরু হইয়াছিল (১৮৮৩-৮৪, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৮৮ পৃঃ, পাদটীকা), এবং তাঁহার পরিবার স্বগৃহচ্যুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে নরেন্দ্রনাথ মাতা ও ভ্রাতাভগিনীদের সহিত মাতামহীভবনে (৭নং রামতনু বসুর লেনে) আশ্রয় লইলেন। মকদ্দমা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এবং অবশেষে নরেন্দ্রাদি স্বীয় ন্যায্য অংশ পাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরী দেবী আপোসে মিটমাটেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেননা মকদ্দমায় অর্থব্যয় তো ছিলই, অধিকন্তু পারিবারিক কলহ শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য আদালতে পৌছায়, ইহা ভাবিতেও তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু অপরপক্ষ, বিশেষতঃ কালীপ্রসাদ-পত্নী, কোনও সম্মানজনক প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। প্রধানতঃ ইঁহারই অত্যাচারে ভুবনেশ্বরীকে গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইঁহার বধূ অর্থাৎ তারকনাথের পত্নী, তারকনাথের মৃত্যুর পর (১৮৮৬) ইঁহার হস্তে পুত্তলিকাবৎ পরিচালিত হইতেন। অতএব তারকনাথ যে প্রভূত অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্নী তাহা মকদ্দমায় খরচ করিয়া অবশেষে সর্বস্বান্ত হইলেন। আরও পরে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে উদরান্নের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল, তখন অতীতের অত্যাচার ভুলিয়া স্বামীজী তাঁহাকে অকাতরে সাহায্য করিয়াছিলেন। মকদ্দমায় জয়লাভের পর বিশ্বনাথের পরিবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু উহা অনেক পরের কথা, তখন নরেন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়াছেন, অতএব সম্ভবতঃ আর তাঁহার পক্ষে স্থায়িভাবে পিতৃগৃহে বাস করা সম্ভব হয় নাই।

মকদ্দমার একটি ঘটনা এখানেই বলিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। ইহা স্বামীজীর নির্ভীকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। এই বিপদকালে তিনি

পিতৃবন্ধু নিমাইচন্দ্র বসু ও ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সাহায্য লইয়াছিলেন। অপর পক্ষের ইংরেজ ব্যারিস্টার স্থির করিলেন, তাঁহাকে আদালতের সম্মুখে একজন একগুঁয়ে, খেয়ালী ছোকরা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে "চেলা" শব্দটিকে ঐ অর্থেরই দ্যোতক ভাবিয়া তাঁহার প্রতি আদালতে ঐ শব্দটিই প্রয়োগ করিলেন। বুদ্ধিমান নরেন্দ্র ইহাতে বিন্দুমাত্র না ঘাবড়াইয়া সাহেবের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহারই কথায় তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন "মহাশয় আপনি 'চেলা' শব্দটির অর্থ জানেন কি?" সাহেব দেখিলেন, তাঁহার ফন্দী ফাঁস হইয়া গিয়াছে, ছেলেটি তো বড় সুবিধার নহে! অধিকন্তু এইভাবে বেকায়দায় পড়িয়া তিনি জেরাও আবশ্যকানুরূপ চালাইতে পারিলেন না। ইংরেজ বিচারক নরেন্দ্রের সপ্রতিভ উত্তর শুনিয়া এবং তাঁহাকে আইন-ক্লাশের ছাত্র জানিয়া বলিলেন, "যুবক, তুমি একজন ভাল উকিল হইবে।" বিপক্ষের এটর্নিও আদালতের বাহিরে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি জজ সাহেবের সহিত সহমত, আইন-ব্যবসায়ই তোমার উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।"

অবশ্য এসব পরের কথা। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গৃহহীন, সম্বলহীন, বন্ধুহীন, অন্নহীন নরেন্দ্রনাথ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। এটর্নি আফিসের শিক্ষানবিশি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল, কারণ পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য তখন তাঁহাকে চাকুরির সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত। অথচ চাকুরি পাওয়া সহজ হইল না। তখন মাস্টার মহাশয় (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন এর একটি শাখার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বৌ-বাজারে ঐ উচ্চবিদ্যালয়ের একটি শাখা খুলিলে মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধে তিনি নরেন্দ্রনাথকে নূতন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। নরেন্দ্র এই কার্য একমাস পরেই ছাড়িয়া দেন। অতঃপর তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার জন্য আবেদন করেন ও এইজন্য পূর্বপরিচিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যভিক্ষা করেন; কিন্তু কৃতকার্য হন নাই।[২]

২। এই ঘটনা নরেন্দ্রনাথের বন্ধু হরমোহন মিত্রের মুখে একাধিকবার শুনিয়া ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বীয় গ্রন্থে (১১১ পৃঃ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক বিপর্যয় সম্বন্ধে 'কথামৃতে' এইসব উল্লেখ আছে: ৪।১৩।২, ১।১১।১

এইকালে শ্রীযুক্তা ভুবনেশ্বরী দেবীর সদ্‌গুণরাশির যে অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন : "স্বামীর মৃত্যুর পর দারিদ্র্যে পতিত হইয়া তাঁহার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার-পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তখন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের জন্য বিষণ্ণ দেখা যাইত না।...তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—এইরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী যেরূপ ধীরস্থিরভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তিশ্রদ্ধার স্বতই উদয় হয়।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।৮২-৮৩)।

পিতার মৃত্যুর পর তিন-চারি মাস কাটিয়া গেলেও দুঃখের লাঘব হওয়া দূরে থাকুক নিরাশার অন্ধকার নিবিড়তর হইতে লাগিল—নরেন্দ্র পথের সন্ধান পাইলেন না। নিজের অবস্থা তিনি স্বমুখে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে ছিন্নবস্ত্রে নগ্নপদে চাকুরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখে দুঃখী হইয়া কোনদিন সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিতে পারিত না; কিন্তু সর্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুইদিন পূর্বে যাহারা

("আমি ঈশানকে তোর কথা বলেছি"), ২।২৩।২, ২।২৩।৩, ২। পরিশিষ্ট ১, ৩. পরিশিষ্ট ১, পরিশিষ্ট ২, ("আমার জন্য মার কাছে টাকা প্রার্থনা করেছিলেন"), ৩।৮।১ ("মাঝে মাঝে খাইবার কিছু থাকে না"), ৩।৮।২, ৪।১৮।৪, ৪।১৯।১-২, ৪।২৯।১, ৩।২৩।২ ("তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে"), ৩।২৩।৩ ("একজন বন্ধু তাঁহাকে একশত টাকা ধার দিলেন; সেই টাকায় বাড়ীর তিন মাসের খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া আসিলেন)।

আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখন কখনও সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল—

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি

"শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হওয়ায় ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে নে, চুপ কর! ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকট ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে; আমারও একদিন লাগিত। কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিবে কেমনে![৩] প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম, গৃহে সকলের পর্যাপ্ত আহার্য নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোনদিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোন দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে ঘরে-বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুদিগের অনেকে পূর্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত

৩। "অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে, মাষ্টার মশাই, আপনি দুঃখকষ্ট পান নাই তাই; মানি দুঃখকষ্ট না পেলে ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ হয় না।" ('কথামৃত', ৩, পরিশিষ্ট)।

হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না ; তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল দুই-একজন কখন কখনও বলিত, 'তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও দুর্বল দেখিতেছি কেন, বল দেখি ?' একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

"যৌবনে পদার্পণপুর্বক যেসকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎ-সামান্য উপার্জন করিতেছিল, তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ইতিপুর্বে অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য হীনপথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম, তাহারা সত্যসত্যই আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিসম্পন্না রমণীর পুর্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণী ঐরূপ প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাই ভস্ম শরীরটার জন্য এতদিন কত কি তো করিলে! মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি ? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।'" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।১৯৯-২১৩)।

সম্ভবতঃ এইকালেরই এই জাতীয় একটি ঘটনা স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে বিবৃত হইয়াছে। বাল্যের বন্ধুরা যৌবনোদ্গমে সর্বক্ষেত্রেই যে সুমার্জিত নৈতিক মার্গে বিচরণ করে, ইহা সত্য নহে ; কেহ কেহ ভোগে মগ্ন হয় এবং অপরকেও দলে টানিতে চায়। ইহা সংসারের নিত্যকার ঘটনা। নরেন্দ্রনাথেরই কথায় প্রকাশ, এই জাতীয় বন্ধুদের হস্তে তিনি সম্পূর্ণ অব্যাহতি পান নাই। এক সন্ধ্যায় তাঁহার জনকয়েক বন্ধু তাঁহাকে গাড়ী করিয়া তাঁহাদের কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ এক উদ্যানবাটীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। এই সান্ধ্যভ্রমণের প্রকৃতি সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের কোন পুর্বাভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি সম্মত হইলেন এবং যথাকালে সকলের সহিত সানন্দে গাড়ী করিয়া আসিয়া এক উদ্যানবাটীর

ফটকে নামিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে এক সান্ধ্যোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। আনন্দ করিতেই তথায় আগমন; সুতরাং গান-বাজনা খুবই হইল, নরেন্দ্রও যথারীতি যোগ দিলেন। কিছু পরে তিনি ক্লান্ত বোধ করিলে বন্ধুরা পার্শ্ববর্তী একখানি ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, তিনি সেখানে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। তিনি একাকী শুইয়া আছেন এমন সময় বন্ধুদের দ্বারা প্রেরিত একটি যুবতী সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। ইহার পশ্চাতে কোনও চক্রান্ত আছে ইহা বুঝিতে না পারিয়া নরেন্দ্রনাথ এই আগমনকে সরলভাবেই গ্রহণ করিলেন, এবং যুবতীটি ঐ বাটীরই কেহ হইবে ভাবিয়া তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন। রমণীও স্বীয় দুঃখ-বিপদ-সঙ্কুল জীবনের অনেক ঘটনা শুনাইতে লাগিল। এইভাবে নরেন্দ্রের সবটুকু মন ও সহানুভূতি অধিকার করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া সে ক্রমে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিল এবং ঐ গৃহে আসার অভিপ্রায়ও খুলিয়া বলিল। অমনি নরেন্দ্র উপস্থিত বিপদের পরিচয় পাইয়া ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া বলিলেন, "মাপ করবেন; আমায় এখন যেতে হবে। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে, এবং আপনার মঙ্গল হোক, এই আমি চাই। আপনি যদি বুঝে থাকেন যে, এভাবে জীবনযাপন করা পাপ, তবে একদিন না একদিন আপনি এ থেকে উদ্ধার পাবেন নিশ্চয়।" নরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। রমণীও হতবুদ্ধি হইয়া বন্ধুদের নিকট ফিরিয়া বলিল, "একজন সাধুকে প্রলোভিত করতে পাঠিয়ে আপনারা বেশ মজা করলেন দেখছি।" এই বিসদৃশ ঘটনা একদিকে যেমন নরেন্দ্রচরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ করে, অপর দিকে তেমনি প্রমাণ করে, তাঁহার গুরুবল কিরূপ অমোঘ ছিল!

যাহা হউক, আমরা পুনর্বার 'লীলাপ্রসঙ্গোক্ত' নরেন্দ্রের আত্মজীবন-বর্ণনায়ই ফিরিয়া যাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "এত দুঃখ-কষ্টেও এতদিন আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ কিংবা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—এ কথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ-মননপূর্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যাত্যাগ করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন। 'চুপ কর, ছোঁড়া! ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান! ভগবান তো সব কল্লেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত

পাইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান কি বাস্তবিক আছেন এবং থাকিলেও আমাদের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি, তাহার কোন উত্তর পাই না কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা হইতে আসিল? মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়া এক সময় যাহা বলিয়াছিলেন, 'ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন?'—তাহা কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পুর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।

"গোপনে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখনও ঐরূপ করা দূরে থাকুক অন্তরের চিন্তাটি পর্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকট কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন তো তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা বা প্রয়োজন নাই, একথা হাঁকিয়া ডাকিয়া লোকের নিকট সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্পদিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি, এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয়ে গমনে পর্যন্ত কুণ্ঠিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রয় হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল, এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখকষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভাগী হইতে পারি—একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব, সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

"কথা কানে হাঁটে। আমার ঐসকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন, এবং যাহা রটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে ইসারায় জানাইলেন।"

ভক্তদেরই বা দোষ কি? তাঁহারা তো দিব্যদৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা অতি উচ্চ হইলেও এবং নরেন্দ্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ছেলেমানুষি ও অনভিজ্ঞতাজনিত অভিমান বলিয়া তিনি উড়াইয়া দিলেও অপর সকলেই ঐরূপ ভাবিবেন এবং করিবেন ইহা ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে। বরং দেখা যায়, অনেকেই সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করিতেন। অন্তর্দৃষ্টিশূন্য ও নরেন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ-পরিচয়-বিরহিত সাধারণের চক্ষে নরেন্দ্রের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশ্রদ্ধা দম্ভ বলিয়া প্রতিভাত হইত। তাঁহার অসীম তেজস্বিতাকে তাঁহারা ঔদ্ধত্য বলিয়া ভ্রম করিতেন, এবং তাঁহার কঠোর সত্যপ্রিয়তাকে মিথ্যাভান বা অপরিণত বুদ্ধির মূর্খতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। লোকপ্রশংসার প্রতি যিনি উদাসীন, যিনি সর্ববিষয়ে স্পষ্টবাদী, যাঁহার কোন ব্যবহারে কোন সঙ্কোচ নাই, এবং যিনি কাহারও ভয়ে কোন কার্য গোপনে করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ বিরুদ্ধ ধারণার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এইজন্য নরেন্দ্রের এক প্রতিবেশী একদিন শরৎচন্দ্রকে (স্বামী সারদানন্দকে) বলিয়াছিলেন, "এই বাটীতে একটা ছেলে আছে, তাহার মত ত্রিপণ্ডছেলে কখন দেখিনি; বি. এ. পাস করেছে বলে যেন ধরাকে সরা দেখে। বাপ-খুড়োর সামনেই তবলায় চাটি দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই চুরুট খেতে খেতে চললো—এইরূপ সকল বিষয়ে।"

ইহার সমর্থনে স্বামী সারদানন্দ নিজের একটি অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে নরেন্দ্রের গুণানুবাদ শুনিবার কয়েক মাস পূর্বে এবং নরেন্দ্রের সহিত কোনরূপ পরিচয়ের আগেই একবার তিনি এক সাহিত্যিক বন্ধুর আলয়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ঐ বন্ধুটি তখন গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটে নরেন্দ্রদের বাড়ীরই সম্মুখে এক ভাড়াবাড়ীতে ছিলেন। ঐ বন্ধুর বিবাহের পর স্বামী সারদানন্দ (তদানীন্তন শরৎচন্দ্র) লোকমুখে শুনিতে পান যে, বন্ধুর স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে এবং নানা অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন। সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য একদিন তিনি বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু ভিতরে ছিলেন, তাই তিনি বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় এক যুবক সেই ঘরে ঢুকিলেন এবং পরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে একটি তাকিয়ায় অর্ধশায়িত হইয়া গুণগুণ করিয়া একটি হিন্দী গানের অংশবিশেষ

গাহিতে লাগিলেন। গানের মধ্যে "কানাই" ও "বাঁশরী" এই শব্দদ্বয় শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল গানটি কৃষ্ণবিষয়ক। সৌখীন না হইলেও যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ, কেশের পারিপাট্য, উন্মনা দৃষ্টি, "কালার বাঁশীর" গান এবং উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি সব মিলাইয়া শরৎচন্দ্র সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন, এইরূপ লোকের সহিত মিশিয়াই বন্ধুর অধোগতি হইয়াছে, এ যুবক উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুরই অনুচর। একটু পরেই বন্ধু বাহিরে আসিলেন এবং শরৎচন্দ্রের সহিত দীর্ঘকাল পরে দেখা হইলেও দুই একটি বাক্যালাপের পরেই ঐ অপরিচিত যুবকের সহিত নানাবিধ দীর্ঘ আলাপে নিযুক্ত হইলেন। পরিস্থিতি বেদনাপ্রদ হইলেও ভদ্রতাহিসাবে বসিয়া বসিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহাদের সাহিত্যিক আলোচনা শুনিতে লাগিলেন। বন্ধু বলিতেছিলেন, রচনামাত্রকেই সাহিত্য বলা চলে ; আর যুবক বলিতেছিলেন, ভাবপ্রকাশের সঙ্গে সুরুচি এবং উচ্চ আদর্শও থাকা আবশ্যক। যুবক চসার প্রভৃতি ইংরেজ কবির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আপন পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং মানবসমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিলেন, এক শ্রেণীর লোক বিষয়কেই সত্য ভাবিয়া উহার ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে, আপাতসত্য বস্তুকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক উচ্চতর আদর্শ অনুভব করিয়া বহির্বিষয়কে সেই ছাঁচে গড়িতে চায়, আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করে। পরিশেষে তিনি বলিলেন, ঐরূপ আদর্শকে জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব।

এইসকল আলোচনায় সন্তোষ জন্মিলেও শরৎচন্দ্রের অনুমান হইল, এই যুবকের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নাই। তাহার কয়েক মাস পরে ঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রের প্রশংসা শুনিয়া যখন তাঁহাকে দেখিবার আগ্রহ জন্মিল এবং ঠাকুরের নিকট ঠিকানা জানিয়া লইয়া নরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না—উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর অনুচর সেই ত্রিপণ্ড যুবকই শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্র !

প্রসঙ্গাগত দৃষ্টান্ত হইতে ভক্ত ও অভক্ত সকলেরই মনে ঐকালে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিরূপ বিকৃত ও বিরুদ্ধ ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। যাহা হউক, আমরা এই প্রাসঙ্গিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার নরেন্দ্রনাথের স্বমুখোক্তিতেই ফিরিয়া যাই। ভক্তগণ ঔৎসুক্যভরে

তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া—তিনি নাস্তিক[৪], কুসংসর্গী, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি বিরুদ্ধ-ধারণারই আভাস দিলেন—এই কথার উল্লেখান্তে নরেন্দ্র আরও বলিয়াছিলেন, "আমাকে তাঁহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্বলতা, একথা প্রতিপন্নপূর্বক হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম, আমাব অধঃপতন হইয়াছে, একথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন ; বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম, ঠাকুরও হয়তো ইঁহাদের মুখে শুনিয়া ঐরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন—মানুষের ভাল-মন্দ মতামতের যখন এতই অল্পমূল্য, তখন তাহাতে আসে যায় কি ? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদের মুখে ঐ কথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ না কিছুই বলেন নাই ; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐ কথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল—'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর !'—তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ কর, শালারা! মা বলিয়াছেন, সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না। আর কখনও আমাকে ঐসকল কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।'

"এইরূপে অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি ? পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সাক্ষাৎকারের পরে, জীবনে যেসকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের কথা উজ্জ্বলবর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ

৪। নরেন্দ্র কি সত্যই কখনও নাস্তিক হইয়াছিলেন ? আমরা দেখিয়াছি, মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি একসময়ে ঐরূপ চিন্তায় নিরত ছিলেন, পিতৃবিয়োগের পরও নাস্তিকতার আভাস পাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ তিনি বলিতেছেন, "আমি নাস্তিক মত পড়ছি।" ('কথামৃত' ৩।৮।২)। আমাদের বিশ্বাস, ইহা অতি ভাসাভাসা ভাবেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কতকটা ভগবানের প্রতি অভিমানভরে, এবং কতকটা বৌদ্ধিক ঔৎসুক্যের ফলে—প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার চরিত্রের অন্তঃস্তল স্পর্শ করে নাই। এইরূপ না হইলে নরেন্দ্র-চরিত্র বুঝা এবং বুঝানো অসম্ভব। তাঁহার উদ্ধৃত স্বমুখোক্তিও আমাদের মতের সমর্থক।

করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই। দুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূরপরাহত হইয়া রহিল, সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না।

"গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল। এখনও পুর্বের ন্যায় কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্নপদে এবং ততোধিক অবসন্নমনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর একপদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর 'রকে' জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব, এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তি-প্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যেসকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এত দিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পুর্ণ, এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।

"সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতরসাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই—একথায় দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া পিতামহের ন্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মতো গৃহত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।' নানা ওজর করিলাম;

তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছি, এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণ-পূর্বক সজলনয়নে গাহিতে লাগিলেন—

কথা কহিতে ডরাই না কহিতেও ডরাই
আমার মনে সন্দ হয় বুঝি তোমায় হারাই, হা রাই!
আমরা জানি যে মন তোর দিলাম তোকে সেই মন্তর—
এখন মন তোর,
আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই॥

"অন্তরের ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; ঠাকুরের ন্যায় আমারও বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরূপ আচরণে অপর সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'ও আমাদের একটা হয়ে গেল।'[৫] পরে রাত্রে সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না; কিন্তু আমি যতদিন আছি, ততদিন আমার জন্য থাক।' বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।"

উদ্ধৃতি সুদীর্ঘ; কারণ প্রত্যক্ষানুভূতির স্বমুখোক্ত বিবরণ ধর্মের ইতিহাসে বড়ই বিরল; বিশেষতঃ মর্মন্তুদ দারিদ্র্যনিপীডনের সহিত ঈশ্বরীয় ভাবের, অশিবের সহিত শিবের যে দ্বন্দ্ব ইহজগতে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে; উহার

৫। 'কথামৃতে' (২।২৩।২) দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া (১৮৮৫ এর ১লা মার্চ) এই একই গান গাহিতেছেন; কিন্তু উভয়স্থলে কাল, ভাব ও পরিবেশ ভিন্ন। অতএব কেবল গানের একত্ব দেখিয়া ঘটনাদ্বয়কে অভিন্ন বলা চলে না। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র কাল বর্ষা, 'কথামৃতে'র কাল ফাল্গুনের মধ্যভাগ। 'লীলাপ্রসঙ্গে' গৃহত্যাগোন্মুখ নরেন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করা হইতেছে, 'কথামৃতে' গিরিশের সহিত বেশী মিশিতে বারণ করিয়া বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। 'লীলাপ্রসঙ্গে' কান্নার উল্লেখ আছে, 'কথামৃতে' নাই।

সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থবোধ নিজমুখে, নিজভাষায় এভাবে ব্যক্ত না হইলে ক্ষুদ্রাধিকারী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। লোকাতীত পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনে কিভাবে জগতের অনাবৃত প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়াছিলেন, মনে তখন কিরূপ ভাবরাশি ক্রীড়া করিতেছিল, এবং জগতের প্রলোভনকে পদদলিত করিয়া কিরূপে অনাবিল শান্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—এই সকল বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। কারণ পরে যখন শুনিতে পাই, স্বামীজী বনের বেদান্তকে লোকালয়ে আনিয়াছেন, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনেরই মধ্যে ধর্মের অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তখন উহার প্রকৃত অর্থ কি, এবং উহার পশ্চাতে কি কঠোর সাধনা রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে শুধু তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইলে চলিবে না, জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই সে বাণীর অর্থানুধাবন করিতে হইবে; দরিদ্রনারায়ণের পূজক দারিদ্র্যের পেষণ স্বয়ং কিভাবে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাও সবিশেষ জানিতে হইবে। স্বামীজীর বাণী ও রচনা তো শুধু আলঙ্কারিক শব্দরাশির সমাবেশ নহে, উহা জীবনানুভূতির রসে পরিপূর্ণ প্রেরণাপ্রদ জীবন্ত প্রাণপ্রবাহ।

তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা কিন্তু এখানেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। এ পর্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে, দুঃখরহস্য তিনি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন; কিন্তু মহামায়ার সহিত এখনও তাঁহার কোন আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। মায়ার অতি নিকটে আসিলেও তিনি এযাবৎ তাহার সহিত বিভেদ রাখিয়া দূর হইতে প্রতিস্পর্ধী বীরেরই ন্যায় তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন—সুখদুঃখময়ী মহামায়া রহস্যময়ীরূপেই তাঁহার নিকট ধরা দিয়াছেন। শ্রীগুরুর কৃপায় এক রোমাঞ্চকর ঘটনাবলম্বনে সে সম্বন্ধের রূপ পরিবর্তিত হইল।

পূর্ববর্ণিত ঘটনার পরদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া নরেন্দ্রকে আবার বাস্তবতার সম্মুখে নগ্নদৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইতে হইল। সংসারের শত চিন্তা আসিয়া আবার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল; অর্থোপার্জনের জন্য আবার তাঁহাকে রাস্তায় নামিতে হইল; কিন্তু এত করিয়াও পরিবারের ভরণপোষণের সুব্যবস্থা হইল না; তিনি নানা উপায়াবলম্বনে শুধু ঠেকা দিয়া যাইতে লাগিলেন মাত্র। এখানে সেখানে সাময়িক চাকুরি লইয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটিতে লাগিল। কিছুকাল পরে তাঁহার মনে হইল, "ঠাকুরের কথা তো ঈশ্বর শুনেন; তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের খাওয়া-পরার কষ্ট যাহাতে দূর

হয়, এরূপ প্রার্থনা করিয়া লইব ; আমার জন্য ঐরূপ করিতে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।" অমনি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলেন এবং নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, "মা ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই যা না কেন ? মাকে মানিস না—সেই জন্যই তোর এত কষ্ট।" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমি তো মাকে জানি না ; আপনি আমার জন্য মাকে বলুন—বলতেই হবে ; আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।" ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, "ওরে, আমি যে কতবার বলেছি, 'মা, নরেন্দ্রের দুঃখ-কষ্ট দূর কর !' তুই মাকে মানিস না ; সেই জন্যই তো মা শুনেন না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার ; আমি বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি—ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন ; তিনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন ?"

দৃঢ়বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন এরূপ বলিতেছেন, তখন মা আজ প্রার্থনা অবশ্যই শুনিবেন এবং আজই এই দুঃখ-দারিদ্র্যের উপর চিরযবনিকাপাত হইবে। অতএব নরেন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল এবং এক প্রহর অতীত হইয়া গভীর অমানিশা আরম্ভ হইল। তখন নরেন্দ্রনাথ শ্রীমন্দিরে মাতৃচরণে নিবেদন জানাইবার জন্য ঠাকুরের আদেশে সোৎসাহে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে তিনি একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন ; পা টলিতে লাগিল এবং মাকে সত্য সত্য দেখিতে এবং তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইবেন, এই অটুট বিশ্বাসে মন অন্য সমস্ত ভুলিয়া একান্ত একাগ্র হইয়া শুধু ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মা সত্যসত্যই চিন্ময়ী, সত্যসত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল এবং বারংবার প্রণাম করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও ; যাহাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি ঐরূপ করিয়া দাও।" শান্তিতে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল ; জগৎ সংসার এককালে বিলীন হইয়া হৃদয়ে শুধু মা বিরাজিতা রহিলেন।

ঠাকুরের নিকট ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, মার নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস তো ?" প্রশ্নে চমকিত হইয়া

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "না মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাই তো, এখন কি করি?" ঠাকুর বলিলেন, "যা যা, ফের যা, গিয়ে ঐ কথা জানিয়ে আয়।" নরেন্দ্র আবার মন্দিরে গেলেন, আবার মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সংসারের কথা ভুলিলেন এবং পুনঃপুনঃ প্রণাম পূর্বক মার নিকট জ্ঞানভক্তি লাভের প্রার্থনা জানাইয়া ফিরিলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কিরে, এবার বলিয়াছিস্ তো?" আবার চমকিত হইয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কি এক দৈবীশক্তি প্রভাবে সব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞানভক্তি লাভের কথা বলিয়াছি। কি হবে?" ঠাকুর বলিলেন, "দূর ছোড়া, আপনাকে একটু সামলাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না? পারিস তো আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা!" তিনি আর একবার গেলেন; কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র দারুণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন—একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে তিনি আসিয়াছেন! ঠাকুর যে বলেন, "রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকট লাউ-কুমড়া ভিক্ষা করা!" এযে সেই নিবুদ্ধিতা! এমন হীন বুদ্ধি নরেন্দ্রনাথের হইবে? তিনি লজ্জায় ঘৃণায় মর্মাহত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "অন্য কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও।"

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া তাঁহার মনে হইল, ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা; নতুবা তিন তিনবার মার নিকটে আসিয়াও বলা হইল না! কাজেই তিনি ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, "আপনিই নিশ্চিত আমাকে এইরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না।" ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, আমি যে কাহারও জন্য ঐরূপ প্রার্থনা কখনও করিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে উহা বাহির হয় না। তোকে বললুম, মার কাছে যাহা চাইবি তাহাই পাইবি; তুই চাহিতে পারিলি না। তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই, তা আমি কি করিব?" নরেন্দ্র তবু বলিলেন "তাহা হইবে না মহাশয়, আপনাকে আমার জন্য ঐ কথা বলিতেই হইবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস —আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না।" ঐরূপে যখন নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।"

বলা বাহুল্য, এই অভিজ্ঞতার ফলে নরেন্দ্রনাথের জীবনে অধিকতর পূর্ণতা

ও উদারতা উপস্থিত হইল। তিনি পূর্বে দেবদেবীর মূর্তিকে প্রণাম করিতে পারিতেন না; আজ উহার অর্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় তাঁহার হৃদয়কপাট খুলিয়া গিয়া এক অপূর্ব ভক্তিধারা নিঃসৃত হইতে থাকিল।

ঠাকুরের যে ইহাতে অশেষ সন্তোষ হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার শ্রীমুখেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর একাকী স্বকক্ষে বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্র বাহিরে এক পার্শ্বে নিদ্রিত রহিয়াছেন। ঠাকুরের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র। আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে, তাই মার কাছে টাকাকড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পারলে না। বলে—'লজ্জা করলে।' মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে, 'মার গান শিখিয়ে দাও।' 'মা ত্বং হি তারা' গানটি[৬] শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে; তাই এখন ঘুমুচ্ছে।" আবার সহাস্যে বলিলেন, "নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে—না?" বৈকুণ্ঠনাথও অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মহাশয়, বেশ হইয়াছে।" ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ছেলেমানুষের মতো হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?" ঐ কথাই বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়া তিনি আনন্দ করিতে লাগিলেন।[৭]

৬। (আমার) মা ত্বং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা,
তোরে জানি মা ও দীন-দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমিই আদ্যমূলে গো মা।
আছ সর্বঘটে, অক্ষপুটে—সাকার, আকার, নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা॥

৭। কেহ কেহ বলেন, নরেন্দ্রের গৃহত্যাগের সঙ্কল্পের তারিখ ১লা মার্চ, ১৮৮৫। এদিকে তিনি ১১ই মার্চ গিরিশবাবুর বাড়ীতে বসিয়া ঠাকুরকে বলেন, "কই, কালীর ধ্যান তিন-চার দিন করলাম, কিছুই তো হল না!" তাহাতে ঠাকুর উত্তর দেন, "ক্রমে হবে।" এই কথাবার্তা মা কালীকে স্বীকার করার পরে হওয়াই সম্ভব। অতএব মা কালীর নিকট অর্থ চাহিতে যাইবার তারিখ হইবে ২রা মার্চ

ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, একজন কৃতবিদ্য মেধাবী ব্রাহ্মযুবক প্রতিমাপূজা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই ঠাকুরের আনন্দ হইয়াছিল—এইরূপ ধারণা সত্য নহে। আমাদের বিশ্বাস, ঠাকুর এই স্বীকৃতিকে কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন নাই। জগতে বিভেদ-বিচ্ছেদ-জনিত সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, শিব-অশিবের মধ্যে যে বিরোধ চিরবিদ্যমান, তাহার অতীতে যাইবার জন্য বুদ্ধদেব নির্বাণের আশ্রয় লইয়াছিলেন নেতিমার্গে সমস্ত অস্বীকার করিয়া। মায়াবাদী তোতাপুরী প্রকৃতির ব্যাবহারিক মায়িক সত্তা স্বীকার করিলেও উহাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াই চলিতেন। তবু অবশেষে মা কালীর স্বীকৃতি অবলম্বনেই আসিয়াছিল তাঁহার অধ্যাত্মানুভূতির পরিপূর্ণতা। অদ্বৈতজ্ঞানে আরূঢ় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করিতেন না যে, শুধু চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, চক্ষু খুলিয়া নহে। তিনি ইতিমার্গে চলিয়া "সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"—এই তত্ত্বও সুপরিজ্ঞাত ছিলেন, আর দেখিয়াছিলেন, এখানেই সমস্ত জাগতিক দ্বন্দ্বের প্রকৃত সমাধান। ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট ক্লান্তদেহ নরেন্দ্রনাথ একদিন পথিপার্শ্বে 'রকে' শয়ন করিয়া অসামঞ্জস্যপূর্ণ অশিবময় সংসারে যে সামঞ্জস্যের আভাস পাইয়া দিব্য শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন, মা কালীতে তিনি আজ পাইলেন সেই অস্পষ্টোপলব্ধ সত্যেরই চাক্ষুষ রূপায়ণ। অসিমুণ্ডধারিণী বরাভয়করা নৃমুণ্ডমালিনী সহাস্যবদনা শ্বেতশিবারূঢ়া তমোবর্ণা রক্তরঞ্জিতাকায়া অশিবশ্মশানচারিণী সর্বাশিবরূপা সর্বমঙ্গলা সর্বস্বরূপা কালীর সর্বগ্রাসী অদ্বৈত-তত্ত্বের যিনি সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি ধন্য। নরেন্দ্রনাথ আজ সেই উদার অদ্বিতীয় সর্বময় তত্ত্বানুভূতিরই অধিকারী। সুপ্তোত্থিত নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ঐ দিবসের আচরণও তাই এই অনুভবেরই অনুরূপ হইয়াছিল। নরেন্দ্রকে যে গান পূর্বরাত্রে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারও মর্ম অনুরূপ।

নিদ্রাভঙ্গে বৈকালে প্রায় চারিটার সময় নরেন্দ্র ঠাকুরের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি হয়তো বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিবা-

হইতে ৭ই মার্চের মধ্যে কোনও একদিন (৭ ও ১১ এর মধ্যে তিন-চারিদিন ধ্যানের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে)। কিন্তু আমাদের মতে, আলোচ্য ঘটনাটি ১১ই মার্চের পূর্ববর্তী হইলেও উহা ২রা হইতে ৭ই মার্চের মধ্যবর্তী বলিয়া মানিয়া লইবার পক্ষে কোন অকাট্য যুক্তি নাই। আর স্বামীজীর গৃহ-ত্যাগের সঙ্কল্পের তারিখও ১লা মার্চ নহে (৫ম পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

মাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁহার গা-ঘেঁসিয়া—প্রায় তাঁহার ক্রোড়ে—আসিয়া বসিলেন এবং আপনার ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখছি কি—এটা আমি, আবার এটাও আমি! সত্য বলছি, কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না! যেমন গঙ্গার জলে একটি লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই—একটাই রয়েছে! বুঝতে পাচ্ছ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল—কেমন?" এইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তামাক খাব।" সান্ন্যাল মহাশয় ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া ঠাকুরের হুঁকাটি তাঁহাকে দিলেন। দুই-এক টানের পরেই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "কল্কেতে খাব।" কল্কেটি হাতে লইয়া দুই-চারিবার টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, "খা, আমার হাতেই খা।" নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কুচিত হইতেছেন দেখিয়া বলিলেন, "তোর তো ভারী হীনবুদ্ধি! তুই আমি কি আলাহিদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।" এই বলিয়া আবার কল্কের সহিত নিজের হাত নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিলেন। অগত্যা ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই-তিনবার তামাকু টানিয়া নরেন্দ্র নিরস্ত হইলেন। অমনি ঠাকুর আবার ঐ ভাবেই ধূম্র-সেবনে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।" কিন্তু সে কথা শুনে কে? "দূর শালা, তোর তো ভারী ভেদবুদ্ধি!" —এই বলিয়া ঠাকুর সেই উচ্ছিষ্ট হস্তেই ধূম্রপান করিতে করিতে ভাবাবেশে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দিলে যে ঠাকুর সে অন্ন আর গ্রহণ করিতে পারিতেন না, কাহারও, এমন কি নরেন্দ্রেরও মনে অশুচি চিন্তা আসিলে যে ঠাকুর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেন না, তাঁহার অদ্যকার এই অচিন্ত্য লীলা দেখিয়া হতভম্ব হইতে হয়! কথায় কথায় যখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল, তখন নরেন্দ্র ও বৈকুণ্ঠনাথ ঠাকুরের নিকট বিদায় লইয়া পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিলেন।

নরেন্দ্রের এই কালীন জীবনালোচনার পরিসমাপ্তির পূর্বে উল্লিখিত অগ্রভাগ-প্রদানের পরও খাদ্য গ্রহণ এবং নরেন্দ্রের স্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণে ঠাকুরের সঙ্কোচ-বিষয়ক ঘটনাদ্বয় বলিয়া রাখা ভাল। অপরকে কোন খাদ্যের অগ্রভাগ প্রদত্ত হইলে, উহা গ্রহণে ঠাকুরের আপত্তি থাকিলেও নরেন্দ্রের বেলায় অন্ততঃ একদিন ইহার অন্যথা হইয়াছিল। একবার অজীর্ণরোগে আক্রান্ত নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে

পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে না ভাবিয়া বহুদিবস ঠাকুরকে দেখিতে আসেন নাই। তাই ঠাকুর একদিন প্রাতঃকালে নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে আনাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত ঝোলভাতের অগ্রভাগ তাঁহাকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রকৃতির সহিত পরিচিতা শ্রীমা ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি আবার রাঁধিয়া দিবেন। তাহাতে ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কুচিত হইতেছে না। উহাতে কোন দোষ হইবে না, তোমার পুনরায় রাঁধিবার প্রয়োজন নাই।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।২৪৮)।

ইহাতে মনে করিলে চলিবে না যে, নরেন্দ্রের বেলায় ঠাকুর নির্বিচারে সব নিয়মই জলাঞ্জলি দিতেন। নরেন্দ্রের কল্যাণার্থ তিনি সময়বিশেষে বেশ কঠোরও হইতে পারিতেন। বিশেষতঃ আচারাদিতে শৈথিল্য দেখাইলেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঠাকুরের জীবনে কখনও বিন্দুমাত্র বেচালে পা-পড়ার কথা ভাবিতেও পারা যায় না—এমন কি নরেন্দ্রকে খুশী করিবার জন্যও নহে। 'কথামৃতে' (৩। পরিশিষ্ট, শেষ পৃষ্ঠা) নরেন্দ্রের স্বমুখকথিত যে বিবরণ আছে তাহাই এই বিষয়টি বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "এতো আমাকে ভালবাসা! কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন! অন্নদার সঙ্গে যখন বেড়াতাম, অসৎ লোকের সঙ্গে কখন কখন গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না, খানিকটা হাত উঠে আর উঠল না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্যন্ত উঠে আর উঠল না। বললেন, তোর এখনও হয় নাই।"

আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে, নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা এতই গাঢ় ও ঐকান্তিক ছিল যে, অপরের জন্য, এমন কি নিজেরও জন্য, তিনি যাহা করিতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের প্রয়োজনে তাহাও করিতেন। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যখন বাবা মারা গেলেন, মা-ভাইরা খেতে পাচ্ছে না, তখন একদিন অন্নদা গুহর সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি অন্নদা গুহকে বললেন, 'নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, এখন বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়।' অন্নদা গুহ চলে গেলে আমি তাঁকে বকতে লাগলাম; বললাম, 'কেন আপনি ওর কাছে ওসব কথা বললেন?' তিনি তিরস্কৃত হয়ে কাঁদতে লাগলেন ও বললেন, 'ওরে, তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে

ভিক্ষা করতে পারি!' তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন।" ('কথামৃত' ৩। পরিশিষ্ট)।

ভালবাসিতেন বলিয়াই তিনি তাঁহার হিতচিন্তা করিতেন, সদুপদেশ দিতেন, স্থলবিশেষে বিরক্তিও প্রকাশ করিতেন। কামকাঞ্চনত্যাগী শ্রীশ্রীঠাকুর কামকাঞ্চনে স্পৃহাশূন্য যুবক ভক্তদের অন্বেষণে ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে পাইয়াছিলেন ইঁহাদের মধ্যে সর্বোত্তমরূপে। কিন্তু বিধিনির্বন্ধে এমন নরেন্দ্রের জীবনেও পিতৃবিয়োগহেতু ও দারিদ্র্যবশতঃ এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হইল। অবস্থাবিবেচনায় কাঞ্চন ও চাকুরি বিরোধী ঠাকুরও স্বীকার করিলেন যে, মাতা প্রভৃতির উদরান্নের জন্য অর্থসঞ্চয় করা নরেন্দ্রের কর্তব্য। শিক্ষিত উচ্চকুলসম্ভূত যুবকের পক্ষে সহজে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করার আর একটি সহজ উপায় ছিল, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তি সে সুযোগ ছাড়ে না—নরেন্দ্র বিবাহ করিয়া শ্বশুরের প্রদত্ত যৌতুকের দ্বারা সহজেই দারিদ্র্য হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিতেন। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন থাকিলেও উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নরেন্দ্র চিরকালের মতো সংসারে ডুবিবেন ইহা শ্রীরামকৃষ্ণেরও মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমার বিবাহ হবে শুনে মা কালীর পা ধরে কেঁদেছিলেন, 'মা ওসব ঘুরিয়ে দে মা; নরেন্দ্র যেন ডুবে না'।" ('কথামৃত', ৩ পঃ ১)। পিতৃ-বিয়োগের পরও নরেন্দ্রের বিবাহের গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব আসিয়াছিল। 'কথামৃতে' দেখা যায় (৪।১২।১) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরকে জানাইতেছেন যে, আর. মিত্রের কন্যার সহিত নরেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে (১০৯ পৃঃ) শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহেরও কথা উঠিয়াছিল, এবং ঐ জাতীয় আরও কয়েকটি প্রস্তাব আসিয়াছিল। নরেন্দ্র ঐ সব ক্ষেত্রে নীরব দ্রষ্টামাত্র না থাকিয়া যথাসাধ্য বিরোধ করিয়াছিলেন—ইহা আমরা ধরিয়াই লইতে পারি। এইজন্যই মাস্টার মহাশয় একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রের মনের জোর খুব; আর ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "কোন বিষয়েই বা কম!"

আজ ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, দক্ষিণেশ্বরের প্রাথমিক দিন হইতেই ঠাকুর তাঁহার চিহ্নিত যুবক ভক্তদিগকে ত্যাগের পথে পরিচালিত করিয়া ভাবী সন্ন্যাসিসঙ্ঘের ভিত্তিপত্তন করিতেছিলেন। সঙ্ঘজীবনের মূলমন্ত্র প্রেম ও বৈরাগ্য। ঠাকুর ভালবাসা দিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইয়েরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস-ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মতো বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! এক তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারে অন্যসকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে।"

ভালবাসার সঙ্গে ছিল ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে ভগবানলাভের জন্য আপ্রাণ সাধনার উপদেশ ও তজ্জন্য উৎসাহ। গৃহীরা এইসকল পরিব্রাজকোচিত গুণাবলীর মর্মোপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিংবা এইসব উপদেশে বিভ্রান্ত হইয়া স্বপথচ্যুত হইবেন মনে করিয়া ঠাকুর সাধারণতঃ সকলের সম্মুখে এইসব কথা বলিতেন না। এই প্রকার উপদেশ প্রদানের পূর্বে তিনি একবার চারিদিকে দেখিয়া লইতেন, বিজাতীয় ভাবের কেহ আশেপাশে আছে কিনা। এই সতর্কতাবলম্বনের ফলে ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর অনেক গৃহী ভক্তকে এমন কথাও বলিতে শোনা যাইত যে, ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসী হইতে বলেন নাই, তিনি কেবল মানসিক ত্যাগের কথাই বলিয়াছেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তি করতলগত, অতএব পৃথক সাধনা অনাবশ্যক।[৮] সন্ন্যাসই যদি ঠাকুরের অভিপ্রেত হইত, তবে রামচন্দ্রাদি উচ্চাধিকারীকে তিনি ঐরূপ উপদেশ দিলেন না কেন?[৯] অধিকন্তু প্রামাণ্যগ্রন্থ 'কথামৃতে' বহির্সন্ন্যাসের উপর তেমন জোর দেওয়া হয় নাই কেন? অপর দিকে ঠাকুরের সন্ন্যাসি-শিষ্য সকলেই একমত যে, ঠাকুরই তাঁহাদিগকে গৃহত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। ঐসব গুহ্যোপদেশ নিভৃতে হইত কিংবা যেসব ছুটির দিনে ভক্তেরা সমবেত হইতেন, সেসব দিনে না হইয়া সপ্তাহের অন্যদিনে হইত, তাই 'কথামৃতে' উহার নিদর্শন অল্প। কিন্তু অল্প হইলেও 'কথামৃত' ভাল করিয়া পড়িলে উহাতেও যথেষ্ট প্রমাণ

৮। 'কথামৃত' (৩। পরিশিষ্ট)

"নরেন্দ্র—সাধন-টাধন যা আমরা করছি, এসব তাঁর কথায়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন। রামবাবু বলেন, 'তাঁকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি?'

"মাষ্টার—যার যেমন বিশ্বাস, সে না হয় তাই করুক।

"নরেন্দ্র—আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলেছিলেন।"

৯। রামচন্দ্রের মত পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল; তখন গৃহত্যাগ করিয়া তিনি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে থাকিতেন। তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যও ছিল।

পাওয়া যাইবে।[১০] আর এক কথা এই যে, গৃহস্থদের মঙ্গলের জন্য এবং তাহাদিগকে স্বীয় ধর্মজীবন-প্রণালীতে উৎসাহিত ও আস্থাবান করার জন্য ঠাকুর সন্ন্যাসের সহিত গার্হস্থ্য-জীবনের তুলনা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাধন-মার্গকেই সহজ ও সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিতেন; তিনি বলিতেন, "যে সন্ন্যাসী হইয়াছে, সে তো ভগবানকে ডাকিবেই; কারণ ঐ জন্যই তো সে সংসারের সকল কর্তব্য ছাড়িয়া আসিয়াছে—তাহার ঐরূপ করায় বাহাদুরি বা অসাধারণত্ব কি আছে? কিন্তু যে সংসারে পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি কর্তব্যের বিষম ভার ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ মনন করে, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হন; ভাবেন, 'এত বড় বোঝা স্কন্ধে থাকা সত্বেও এই ব্যক্তি যে আমাকে এতটুকু ডাকিতে পারিয়াছে, ইহা স্বল্প বাহাদুরি নহে, এই ব্যক্তি বীর ভক্ত'।" অধিকন্তু ঠাকুর নিজে গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করিতেন না, বৃক্ষতল, গিরিগুহা বা অরণ্যেও থাকিতেন না। অতএব সাধারণের মনে সন্দেহ জাগা অযৌক্তিক নহে।

তথাপি ইহা অকাট্য সত্য যে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরেই ত্যাগের বীজ বপন করেন। এই বীজই ক্রমে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে উপযুক্ততর পরিবেশ পাইয়া যথাকালে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ফুলফলান্বিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ তাঁহারই নিকট সঙ্ঘনেতৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১০। 'কথামৃত', ২।২৩।২, ৩।১৫।১, ৪।২০।২ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ) মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের যে প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায় উহাই ক্রমে বর্ধিত হওয়ায় ভক্তগণ ডাক্তার ডাকিয়া আনেন। ডাক্তার ঔষধ দিয়া বলেন যে, অধিক কথা কহা কিংবা পুনঃপুনঃ সমাধিস্থ হওয়া এই রোগের পক্ষে অপকারক; দেখাও গেল যে, উহাতে রোগের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ঠাকুরের পক্ষে এই উভয় নিষেধ পালন করা অসম্ভব ছিল—ভক্ত আসিলেই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অবিরাম ভগবৎকথা উৎসারিত হইত এবং ইহারই মধ্যে অথবা ভগবৎ-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইতেন। সেই কালেই যখন আবার পানিহাটির মহোৎসবে যোগ দিয়া ভাবাবেশে প্রায় আধঘণ্টা নৃত্যাদি করিলেন এবং সমাধিস্থ হইলেন, তখন রোগ এতটা বাড়িয়া গেল যে, চিকিৎসায়ও কোন ফল দেখা গেল না। অবশেষে ভাদ্রমাসের একদিন তাঁহার গলদেশ হইতে রক্তনির্গমন হইলে ভক্তদের দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পাইল।

সেদিন রাত্রে কলিকাতার এক ভক্ত-মহিলার গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণসহ ভক্তমণ্ডলীর ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঠাকুরের শরীর তখন অসুস্থ থাকায় সন্দেহ ছিল, তিনি মোটেই আসিতে পারিবেন কিনা। তথাপি সঠিক সংবাদ লইবার জন্য এবং সম্ভব হইলে তাঁহাকে লইয়া আসার জন্য একজন ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। উক্ত ভক্তের ফিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঠাকুরের আসা হইবে না; অতএব নিমন্ত্রিত ভক্তদের আহারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এমন সময় রাত্রি নয়টায় উক্ত ভক্ত আসিয়া খবর দিলেন, ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধি পাইয়া গলদেশ হইতে রক্ত-ক্ষরণ হইয়াছে; কাজেই তাঁহার আগমন অসম্ভব। অমনি নরেন্দ্র, গিরিশ, রামচন্দ্র, মাস্টার মহাশয়, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন, ঠাকুরকে কলিকাতায় আনাইয়া বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হইবে। নরেন্দ্র ঐ প্রথমাবস্থায়ই বুঝিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ঠাকুরের ক্যান্‌সার হইয়াছে এবং ঐ রোগের প্রতিকার নাই। ভোজনকালে নরেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া জনৈক যুবক যখন কারণ জানিতে চাহিলেন, তখন নরেন্দ্র বুঝাইয়া দিলেন, "যাঁহাকে লইয়া এত আনন্দ, তিনি

বুঝি এইবার সরিয়া যান। আমি ডাক্তারী গ্রন্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার-বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, ঐরূপ কণ্ঠরোগ ক্রমে ক্যান্সারে পরিণত হয়। অদ্য রক্ত পড়ার কথা শুনিয়া রোগ উহাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। ঐ রোগের ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।২৫২)।

কলিকাতায় আনার প্রস্তাবে ঠাকুরও সম্মত হইলেন। তাই কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটে একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লওয়া হইলে ঠাকুর সেখানে অবস্থানের জন্য দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া আসিলেন। কিন্তু ভাগীরথী-তীরে কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত তাঁহার পক্ষে ঐ স্বল্পায়তন গৃহে বাস সম্ভব হইবে না জানিয়া তিনি বাড়ী দেখিবামাত্র অনতিবিলম্বে পদব্রজে বলরাম-ভবনে চলিয়া গেলেন। কাজেই ঐ বাড়ী ছাড়িয়া এক সপ্তাহ মধ্যেই ৫৫নং শ্যামপুকুর স্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বৈঠকখানা' ভবন তাঁহার জন্য ভাড়া লওয়া হইল। আশ্বিনের মধ্যভাগে সেখানে আসিয়া ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীশ্রীমা, লাটু, কালী, শশী, ছোট গোপাল প্রভৃতি কেহ কেহ তাঁহার সেবার জন্য স্থায়ীভাবে সেখানে থাকিয়া গেলেন, এবং নরেন্দ্রনাথও সেখানে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। অপর যুবক ভক্তদের অনেকে সেখানে মাঝে মাঝে থাকিয়া বা বাড়ী হইতে যাতায়াত করিয়া পালাক্রমে সেবাকার্য চালাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য এই যুবকদের পরিচালনভার স্বভাবতই নরেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল। যুবকগণও সে নেতৃত্ব সর্বতোভাবে মানিয়া লইলেন।

পিতামাতাদির ভরসাস্থল এই যুবকবৃন্দ পড়াশুনা ছাড়িয়া এইভাবে শ্যামপুকুরে কাল কাটাইবেন, ইহা অভিভাবকদের অবশ্যই মনঃপূত ছিল না; তথাপি প্রথমাবস্থায় ইঁহাদের মনের দৃঢ়তা দেখিয়া ও ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা জানিতে না পারিয়া তাঁহারা চুপ করিয়াই রহিলেন। পরে ঠাকুরের অসুখের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন যুবকেরা অধিকাধিক সময় তাঁহারই নিকট কাটাইতে লাগিলেন এবং পড়াশুনার ক্ষতি হইতে থাকিল, তখন তাঁহাদের মনে প্রথমে সন্দেহ ও পরে শঙ্কা দেখা দিল; তাই স্ব স্ব সন্তানকে গৃহে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে ন্যায় অন্যায় নানারূপ উপায়ও অবলম্বিত হইল। এই বিপদকালে নরেন্দ্রের দৃষ্টান্ত, উদ্দীপনা ও উৎসাহ ব্যতীত যুবকগণ এই বিরুদ্ধ প্রভাব অতিক্রমপূর্বক গুরুসেবায় নিরত থাকিতে পারিতেন কিনা, কে বলিতে পারে?

এই কালে ঠাকুরের ব্যাধির কারণ এবং কতদিনে শরীর নিরাময় হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিত। একদল ভক্ত ভাবিতেন এবং প্রকাশ্যে বলিতেন—যুগাবতারের দেহ-ব্যাধি মিথ্যা ভান মাত্র। উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য তিনি ঐরূপ লীলার আশ্রয় লইয়াছেন এবং যখনই ইচ্ছা হইবে তখনই পুনরায় নীরোগ হইবেন। বিপুল বিশ্বাস ও অসীম কল্পনাশক্তি লইয়া নাট্যসম্রাট মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই দলের মুখপাত্র হইয়া উঠিলেন। অপর একদল বলিতেন—যে জগদম্বার অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচালিত হইয়া থাকেন, সেই মহামায়াই আপন গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি ঘটাইয়াছেন এবং জনকল্যাণসাধক সেই অভিপ্রায় চরিতার্থ হইলেই মা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া দিবেন ; সেই তাৎপর্য হয়তো ঠাকুরেরও অজ্ঞাত। তৃতীয় দলের মতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দেহমাত্রেরই ধর্ম ; ঠাকুরের ব্যাধিও ঐ প্রাকৃতিক নিয়মেই উপস্থিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত কোন রহস্যের অনুধাবন বৃথা। বলা বাহুল্য, ইহাদের প্রবক্তা ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ইঁহারা প্রাণপণে সেবা করিয়া ঠাকুরকে সুস্থ করিতে বদ্ধপরিকর থাকিলেও, যুক্তির পথ ছাড়িয়া নির্যুক্তিক কোন কাল্পনিক তত্ত্বের গোলকধাঁধায় ঘোরপাক খাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং অবসরকাল নিরর্থক জল্পনা-কল্পনায় না কাটাইয়া ঠাকুরের নির্দিষ্ট সাধনমার্গে ভগবান লাভের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টিত হওয়াকেই ইঁহারা পরম কর্তব্য মনে করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ও আচার-ব্যবহারেও এইরূপ সমালোচনা ও সৎ প্রচেষ্টার প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশিত হইত। যুবক ভক্তদিগকে তিনি এইসব বিষয়েই উৎসাহিত করিতেন।

এই সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসাব্যপদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করিয়া যখন তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন, তখন ঠাকুরও সুযোগ বুঝিয়া ডাক্তারের ধর্মবৃদ্ধির জন্য গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি বাছা বাছা ভক্তকে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পাঠাইতেন। এই সুযোগে নরেন্দ্রনাথের সহিত ভাববিনিময়ে মুগ্ধ হইয়া ডাক্তারবাবু একদিন তাঁহাকে স্বগৃহে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং সঙ্গীত-বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী জানিয়া ভজন-গান শুনাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ডাক্তারবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিলে প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য নরেন্দ্রনাথ দুই-তিন ঘণ্টাকাল তাঁহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। ডাক্তার শুনিয়া এত প্রীত

হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণকালে গায়ককে আদর ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এর মতো ছেলে ধর্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত; এ একটি রত্ন, যাতে হাত দিবে, সেই বিষয়েই উন্নতিসাধন করিবে।" ঠাকুর তদুত্তরে নরেন্দ্রের প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "কথায় বলে, অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন; সেইরূপ ওর (নরেন্দ্রের) জন্যই তো সব গো!" অতঃপর ডাক্তারবাবু শ্যামপুকুরে আসিয়া যখনই নরেন্দ্রকে কাছে পাইতেন, তাঁহার মুখে দুই-একটি ভজন না শুনিয়া বাড়ী ফিরিতেন না।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার স্বভাবতই অবতারবাদে বিশ্বাস করিতেন না এবং প্রায়শঃ ঐ মতবাদের প্রতি তীব্র শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেন। এই লইয়া গিরিশ ও নরেন্দ্রের সহিত বেশ বাদানুবাদও হইত। তাহার ফলে ডাক্তারবাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অপর পক্ষেরও অনেক কিছু বলিবার আছে; তাই তদবধি স্বীয় একান্ত বিরোধী মত প্রকাশে অপেক্ষাকৃত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। ('কথামৃত', ১।১৮।৬ দ্রষ্টব্য)।

তখন ভক্তদের মধ্যে ভাবুকতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ ঐ পথের বিপদাদি দেখাইয়া যুবক ভক্তদিগকে সহজ সরল পথে চলিতে সাহায্য করিতেন। বৈষ্ণবভাবপ্রধান রামচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গেরই অবতার; তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঐ বিষয়ে অনেকখানি রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা কহিতেন। ক্রমে গিরিশচন্দ্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্বলিত বিশ্বাসের সাহায্য পাইয়া রামবাবুর সাবধানতার বাঁধন ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি ঠাকুরকে প্রকাশ্যে চৈতন্যাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, ভক্তদের মধ্যে কে কোনরূপে পূর্বাবতারের সহিত আসিয়াছিলেন এবং বর্তমানেও আসিয়াছেন তদ্বিষয়ে জল্পনা-কল্পনায় নিরত হইলেন। আবার ভাবুকতার প্রাবল্যে যে ভক্তের যত অঙ্গবিকৃতি হইত বা বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পাইত, রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে তিনি ততই উচ্চাসন পাইতে থাকিলেন। ক্রমে অনেকেই সহজবুদ্ধি ও জ্ঞানবিচার সম্বলিত শুদ্ধ ভক্তিমার্গ বর্জনপূর্বক দৈবশক্তি প্রভাবে তাঁহাদের ধর্মজীবনে অকস্মাৎ অনেক কিছু ঘটিয়া যাইতে পারে এই আশায় ভাবাবেগ বাড়াইতে তৎপর হইলেন ও অজ্ঞাতের অকস্মাৎ আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। ফলতঃ তখন ভাবুকতার অবাধবৃদ্ধিতে সাধক-সমাজ-সম্মত ধর্মের প্রশস্ত রাজমার্গ

যেসব ত্যাগ, সংযম, নিষ্ঠা, বিচার প্রভৃতি নৈতিক গুণরাজির দ্বারা সুগঠিত, সেসব ইঁহাদের দৃষ্টিতে উপযুক্ত আদর পাইল না।

ইহারই মধ্যে আবার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা হইতে শ্যামপুকুরে আসিয়া (২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫) বলিলেন—তিনি ঢাকায় রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসিয়া ধ্যানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্দর্শন পাইয়াছেন এবং উক্ত দর্শন মাথার খেয়াল কিনা ইহা পরীক্ষার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বহুক্ষণ যাবৎ টিপিয়া দেখিয়াছেন। এই সংবাদটি ভাবুকতার অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ করিল এবং মনে হইল, ইহাই অতঃপর নির্বিবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলী-মধ্যে জ্বলিতে থাকিবে এবং অপর ক্ষীণালোকগুলিকে নিষ্প্রভ করিয়া আপন আধিপত্য স্থাপন করিবে। নরেন্দ্রনাথ ভাবসমাধির প্রতি বা ঐ প্রকার অতিপ্রাকৃত দর্শনাদির প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন না; এমন কি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উক্তপ্রকার বিবৃতি শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমিও এঁকে (ঠাকুরকে) নিজে অনেকবার (ঐভাবে) দেখেছি; তাই কি করে বলব, আপনার কথা বিশ্বাস করি না?" ('কথামৃত', ১।১৬।৫)। প্রত্যুত এই জাতীয় দর্শনাদিতে বিশ্বাস থাকিলেও এবং প্রবল ভাবাবেগে অঙ্গবিকৃতি ঘটে ইহা মানিলেও, নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ধারার নির্বাধ প্রশ্রয়ে অনেকে বিভ্রান্ত হইবে ও ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনে বিপর্যস্ত হইবে। তাই তিনি যুবকদিগকে বলিতে লাগিলেন, "যে ভাবোচ্ছ্বাস মানব-জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন উপস্থিত না করে, যাহার প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরক্ষণে কামকাঞ্চনের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তাহার গভীরতা নাই; সুতরাং তাহার মূল্য অতি অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিকৃতি, যথা অশ্রুপুলকাদি, অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও তাঁহার নিশ্চয় ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্বল্যপ্রসূত। মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশ্য কর্তব্য!" তিনি আরও বলিতেন, "ঐরূপ অঙ্গবিকার ও বাহ্যসংজ্ঞালোপের ভিতর অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। সংযমের বাঁধ যত উচ্চ এবং দৃঢ় হইবে, মানসিক ভাব তত গভীর হইতে থাকিবে এবং বিরল কোন কোনও ব্যক্তির জীবনেই আধ্যাত্মিক ভাবরাশির প্রবলতায় উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া ঐরূপ সংযমের বাঁধকেও অতিক্রমপূর্বক অঙ্গবিকার ও বাহ্যসংজ্ঞার বিলোপরূপে প্রকাশিত

হইবে! নির্বোধ মানব ঐ কথা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবিয়া বসে। সে মনে করে ঐরূপ অঙ্গবিকৃতি ও সংজ্ঞাবিলুপ্তির ফলেই বুঝি ভাবের গভীরতা সম্পাদিত হয় এবং তজ্জন্য ঐসকল যাহাতে তাহার শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা করিতে থাকে। ঐরূপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তাহার স্নায়ুসকল ক্রমে দুর্বল হইয়া ঈষণ্মাত্র ভাবের উদয়েও তাহাতে ঐ বিকৃতিসকল উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ প্রশ্রয়ে মানব চিররুগ্ন অথবা বাতুল হইয়া যায়। ধর্মসাধনে অগ্রসর হইয়া শতকরা আশী জন জুয়াচোর এবং পনর জন আন্দাজ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচজন মাত্র পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়া থাকে। অতএব সাবধান!" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।৩০৮-৯)। যুবক ভক্তগণ প্রথমেই নরেন্দ্রনাথের এইসকল কথা মানিয়া নেন নাই; কিন্তু পরে যখন পরীক্ষাবলম্বনে দেখিলেন, ভক্তদের কেহ কেহ সত্য সত্যই ইচ্ছাপূর্বক ভাবোচ্ছ্বাসলাভে বা উহার প্রকাশে সচেষ্ট এবং স্থলবিশেষে অপরের অনুকরণে ব্যাপৃত আছেন, তখন তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মন্তব্যের যাথার্থ্য মানিয়া আর আপনাদিগকে অভাগ্যবান মনে করিতে পারিলেন না।

নরেন্দ্রনাথ কিন্তু ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া বিবিধ উপায়ে ভাববিহ্বলতাকে সংযত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি কাহারও ভাবুকতায় বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা দেখিতে পাইলে সখ্যপূর্ণ ব্যঙ্গপরিহাসের আঘাতে ঐ ব্যক্তিকে অপ্রতিভ করিতেন। সম্প্রদায়বিশেষে প্রচলিত সখীভাবের অনুকরণে নিযুক্ত ভক্তদিগকে তিনি সখী-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন এবং ঐ ভাবের অনুরূপ অঙ্গভঙ্গাদি দেখাইয়া হাস্যের রোল তুলিতেন। পুরুষের পক্ষে ঐরূপ স্ত্রীজনোচিত অস্বাভাবিক হাবভাব তাঁহার অসহ্য ছিল; ঠাকুরের উপদিষ্ট জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই তিনি সমধিক আদর করিতেন। পরিহাসচ্ছলে তিনি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তদের নাম দিয়াছিলেন, 'শিবের ভূত', অথবা 'দানা'।

যুবক ভক্তদের সহিত তিনি ঐ কালে ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সংসারের অনিত্যতাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতেন। অবসরকালে সকলকে লইয়া ঐ সব ভাবের সঙ্গীতাদি গাহিতেন বা স্তবাদি পাঠ করিতেন। কখনও বা ঠাকুরের উপদেশাবলীর মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। অথবা 'ঈশানুসরণের' বচনবিশেষ শুনাইয়া

বলিতেন, "প্রভুকে যে যথার্থ ভালবাসিবে তাহার জীবন সর্বতোভাবে শ্রীপ্রভুর জীবনের অনুযায়ী গঠিত হইয়া উঠিবে ; অতএব ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক ভালবাসি কিনা, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহা হইতেই পাওয়া যাইবে।" আবার, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর"—ঠাকুরের ঐ কথা স্মরণ-পূর্বক বুঝাইয়া দিতেন ঠাকুরের সর্বপ্রকার ভাব-মহাভাবাদির উৎপত্তির উৎস ঐ জ্ঞান ; কাজেই ঐ জ্ঞান লাভই সর্বাগ্রে অত্যাবশ্যক। আবার বিচারবুদ্ধিকে সদাজাগ্রত রাখিতে হইবে। নূতন কোন তথ্যের সংবাদ পাইলে উহাকে তৎক্ষণাৎ বর্জন না করিয়া তিনি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত ছিলেন ; অপরকেও পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ বা বর্জন করিতে বলিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চিত্তৈকাগ্রতার দ্বারা অপরের ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভব এই কথা শুনিয়া তিনি একদিন ঠাকুরের ব্যাধি অপসারণার্থ যুবক ভক্তদের লইয়া রুদ্ধদ্বার গৃহে ঐরূপ চিন্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্নদৃষ্টি অপরের কৃত্রিম আচরণ কত সহজে ধরিতে পারিত তাহা কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত একদিনের ব্যবহার হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মহিমাচরণ সর্ববিষয়ে লোকমান্য পাইবার জন্য এত লালায়িত ছিলেন যে, ঐ উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় লইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি পণ্ডিত, ইহা দশজনকে বুঝাইয়া দিবার জন্য স্বীয় পুস্তকাধারে বহু মূল্যবান ও বৃহদাকার গ্রন্থ সাজাইয়া রাখিতেন। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত মহিমাচরণের গৃহে উপস্থিত হইয়া ঐসব পুস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্তী মহাশয়, আপনি এত গ্রন্থ সব পড়িয়াছেন?" উত্তরে তিনি সবিনয়ে উহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নরেন্দ্রনাথ কয়েকখানি পুস্তক হাতে লইয়া দেখিলেন উহাদের পাতা কাটা হয় নাই। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "কি জান ভায়া, লোকে আমার পড়া পুস্তকগুলি লইয়া যাইয়া আর ফিরাইয়া দেয় নাই ; তাহার স্থলে ঐ পুস্তকগুলি পুনরায় কিনিয়া রাখিয়াছি। এখন আর কাহাকেও পুস্তক লইয়া যাইতে দিই না।" নরেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বল্পদিনেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, চক্রবর্তী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকের সকলই ঐ প্রকার, অর্থাৎ তাহারাও অপঠিত। অতএব নরেন্দ্রের দৃঢ়ধারণা জন্মিল, ঐগুলি শুধু গৃহশোভা ও লোকমান্যের জন্য সংগৃহীত।

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে মহিমাচরণ বার কয়েক সেখানে

আসিয়াছিলেন। তিনি ঐসব সময়ে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর সাধারণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়া একতারা যোগে মন্ত্রসাধনা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে অপরের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন। গৈরিকপরিহিত, সুন্দরকান্তি, বিশাল-বপু চক্রবর্তী মহাশয়ের আকৃতি ও বাক্যচ্ছটায় কেহ কেহ মুগ্ধও হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার লোকমান্যের আকাঙ্ক্ষা জানিতেন বলিয়া কখনও বা বলিতেন, "তুমি পণ্ডিত, ইহাদিগকে (উপস্থিত ভক্তদিগকে) কিছু উপদেশ দাও গে।" একদিন ঐরূপ উপদেশ দিতে গিয়া চক্রবর্তী মহাশয় স্বীয় সাধনপথকেই শ্রেষ্ঠ ও সহজ প্রতিপন্ন করিতেছেন এবং যুবক ভক্তদের কেহ কেহ উহা নির্বিবাদে শুনিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের সহ্য হইল না। তিনি তর্কের অবতারণা করিয়া মহিমাচরণের কথা খণ্ডন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্নবাণে এরূপ বিদ্ধ করিতে থাকিলেন যে, গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া তিনি সেদিনকার মতো পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন।

চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রতি প্রয়োজনবোধে ঐরূপ ব্যবহার করিলেও, ঠাকুরের উপদিষ্ট "যত মত তত পথ" এই কথা সর্বাংশে মানিয়া লইয়া নরেন্দ্রনাথ অপর ধর্মাবলম্বীর প্রতি উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মান দেখাইতেন। প্রভুদয়াল মিশ্র নামক একজন খৃষ্টীয়ান ধর্মযাজক ঠাকুরকে দেখিবার জন্য শ্যামপুকুরে আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেও খৃষ্টধর্ম অবলম্বনপূর্বক ধর্মযাজকের কার্যে রত ছিলেন এবং গেরুয়া-পরিধান, যোগসাধনা ও স্বপাকভোজন করিতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার সমস্ত মর্মকথা জানিয়া লইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন, তিনি খাঁটি লোক, তখন তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন ; এবং নরেন্দ্রনাথেরই শিক্ষাগুণে অনেক যুবক মিশ্রমহাশয়কে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিলেন ও একত্রে ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নাদি ভোজন করিলেন। ঠাকুরকে ইনি সাক্ষাৎ ঈশা বলিয়া জানিয়াছিলেন।

একদিকে নরেন্দ্রনাথ যেমন অবিরাম চেষ্টা করিতেছিলেন যুবক ভক্তদিগকে ঈশ্বরাভিমুখে পরিচালিত করিতে এবং সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে, অপরদিকে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণেরও ঐ বিষয়ে আকুলতা কম ছিল না। এমন কি অনেকের বিশ্বাস ছিল, ভক্তদিগকে প্রেমসূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ দেখিবার জন্যই ঠাকুর স্বীয় শরীরে ব্যাধি স্বীকার করিয়াছিলেন। 'কথামৃত' (৪।১৯।১) হইতে এইরূপ জানা যায়—

মণি বলিলেন, "আপনার রোগ পর্যন্ত খেলার মধ্যে। এই রোগ হয়েছে বলে এখানে নূতন নূতন ভক্ত আসছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন, "ভূপতি বলে, রোগ না হলে শুধু বাড়ী-ভাড়া করলে লোকে কি বলত !"

শুধু নূতন ভক্ত আসা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত যুবকদিগের অনেককে সেখানেই থাকিতে হইত, এবং ঠাকুরের কলিকাতায় থাকার সুযোগে গৃহী ভক্তরাও ঘন ঘন সেখানে আসিতে পারিতেন, এইরূপ মেলা-মেশার ফলে ভাবগাম্ভীর্য, চিন্তার পরিশুদ্ধি, পরস্পরের প্রতি প্রীতিবৃদ্ধি প্রভৃতির অবকাশ ঘটিয়া সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাকার্য, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হউক, দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ বিভিন্ন ভক্তের জীবনগঠনে ঠাকুর কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নরেন্দ্রজীবনের অনুধ্যানে নিরত আমরা এযাবৎ শুধু নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আচরণের কথাই প্রধানতঃ উল্লেখ করিয়া আসিতেছি এবং পরেও তাহাই করিব। এখানে 'কথামৃত' হইতে (৪।২৯।১) উদ্ধৃত একটি দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই, ঠাকুর তাঁহাকে কিরূপে বৈরাগ্যে উৎসাহিত করিতেন।

"নরেন্দ্রের পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। মা ও ভাইএরা আছেন, তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে। নরেন্দ্র আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মধ্যে বিদ্যাসাগরের বৌবাজারের স্কুলে কয়েক মাস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বাটীতে একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন—এই চেষ্টা কেবল করিতেছেন। ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন ; নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে সস্নেহে দেখিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারকে)—আচ্ছা, কেশব সেনকে বললাম, 'যদৃচ্ছালাভ'। যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জন্য ভাবনা হয়না—সে মাসে মাসে মাসোহারা পায়। তবে নরেন্দ্রের এত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন ? ভগবানে মন সব সমর্পণ করলে তিনি সব জোগাড় করে দিবেন।

"মাস্টার—আজ্ঞা, হবে ; এখনও তো সময় যায় নাই।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে না। বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিব, তারপরে সাধনা করব—তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না। (সহাস্যে) গোঁসাই লেকচার দিয়েছিল ; তা বলে—দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া-দাওয়া এইসব হয়, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা

যেতে পারে। কেশব সেনও ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল—মহাশয়, 'যদি কেউ ঠিক ঠাক করে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা পারে কিনা? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি?' আমি বললাম—'তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কালসাপের মতো বোধ হয়। তখন টাকা জমাব, বিষয় ঠিকঠাক করব —এসব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয়-চিন্তা!' একটা মেয়ের ভারী শোক হয়েছিল। আগে নথটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে, তারপরে 'ওগো, আমার কি হলো গো!' বলে আছড়ে পড়ল; কিন্তু খুব সাবধানে, নথটা না ভেঙ্গে যায়।

"সকলে হাসিতেছেন। নরেন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাস্টার তাঁর মনের অবস্থা বুঝিয়াছেন।"

সেদিন অপরাহ্ণ দুইটায় নরেন্দ্রনাথ যে কয়টি গান গাহিলেন, সবই বৈরাগ্য-পূর্ণ—

"যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে" -ইত্যাদি

"অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তরযামিনী" —ইত্যাদি

"কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণসরোজে পরাণমধুপ চিরমগন না রয় হে" ইত্যাদি।

আমরা দেখিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে নরেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসংস্কার পরিবর্তিত হইতেছিল। তিনি প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। অবতারবাদ সম্বন্ধেও তাঁহার মত পরিবর্তিত হইতেছিল। শ্যামপুকুরে তিনি স্বমুখে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরোপম মহাপুরুষ। সেদিন (২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫, 'কথামৃত', ১।১৮।৬) ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত বিচার হইতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে নরেন্দ্র বলিলেন, "এঁকে আমরা ঈশ্বরের মতো মনে করি।·· আমি ঈশ্বর বলছি না, ঈশ্বরের তুল্য ব্যক্তি বলিতেছি।···নরলোক ও দেবলোক এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে যেখানে বলা কঠিন এ ব্যক্তি মানুষ না ঈশ্বর।" পাঠক হয়তো লক্ষ্য করিবেন, ইহা পূর্ণ ভগবত্তার স্বীকৃতি নহে। তবু পূর্বের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতির স্থলে এই স্বীকৃতিও বড় কম মূল্যবান নহে। নরেন্দ্রের এই ক্রমপরিবর্তন ঠাকুরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি একদিন (২০শে অক্টোবর, ১৮৮৫, 'কথামৃত', ৪।২৮।১) মাস্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে দেখছ না?—সব মনটা ওর

আমারই উপর আসছে।” অদ্বৈতবাদও তিনি স্বীকার করিয়া ঐদিকে খুব ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পরিচয় আমরা পরে পাইব।

* * *

শ্যামপুকুরে ডাক্তার ও সেবকদের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও ঠাকুরের রোগের উপশম হইল না। যেসকল ঔষধ পূর্বে স্বল্পাধিক ফলপ্রদ হইয়াছিল, তাহারাও আর উপকারে আসিতেছে না দেখিয়া ডাক্তারও চিন্তিত হইলেন এবং ভাবিলেন, কলিকাতার দূষিত বায়ু হইতে মুক্ত শহরতলীর কোন স্থানে থাকিতে পারিলে উপকার হওয়া সম্ভব ; অতএব ঐরূপ বাটীর সন্ধান চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই কাশীপুরে ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটীটি (বর্তমান ৯৯ নং কাশীপুর রোড) মাসিক ৮০৲ টাকা ভাড়ায় বন্দোবস্ত লইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেখানে আনা হইল। সুবৃহৎ না হইলেও চৌদ্দ বিঘা জমি জুড়িয়া অবস্থিত ও ফলপুষ্পের বৃক্ষাদিতে সুশোভিত উদ্যানবাটীটি মনোরম ছিল। উদ্যানের উত্তর সীমায় প্রায় মধ্যভাগে তিন-চারিখানি ছোট কুঠরি রন্ধন ও ভাণ্ডারাদির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে ইষ্টকনির্মিত প্রায় গোলাকার উদ্যানপথের দ্বারা পরিবৃত একখানি দ্বিতল বাসগৃহ। উহার নীচে চারিখানি ও উপরে দুইখানি ঘর। নীচে উত্তরাংশে দুইখানি ঘর পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত ; উহার পশ্চিমের ঘরখানি অপেক্ষাকৃত বড় এবং উহাতে দোতলায় যাইবার জন্য কাষ্ঠনির্মিত সোপানশ্রেণী। পূর্বের ছোট ঘরখানিতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী থাকিতেন। নীচের বৃহত্তম হল ঘরখানি মধ্যভাগে অবস্থিত এবং উহার দক্ষিণে আর একখানি বড় ঘর। ঐ ঘরের পূর্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারান্দা। এই হল ঘর ও উহার দক্ষিণের ঘরখানি সেবকদের শয়নাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। নীচের হলঘরের উপরে যে তুল্যায়তন ঘর ছিল, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন এবং শ্রীমায়ের উপরিস্থ ক্ষুদ্র ঘরখানিতে তিনি স্নানাদি করিতেন ও দুই-একজন সেবক অন্য সময়ে বাস করিতেন। উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পশ্চিমের প্রাচীরের গায়ে দ্বারবানের ঘর ও ঐ ঘরের উত্তরে লৌহময় ফটক। ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া গাড়ী চলিবার পথ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় অর্ধ বৃত্তাকারে প্রসারিত হইয়া বাসগৃহের চতুষ্পার্শ্ববর্তী গোলাকার পথের সহিত সংযুক্ত ছিল। বসতবাটীর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পুকুর, পুকুরের পূর্বদিকে পাকা ঘাট। উদ্যানের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একটি বড় পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর

উত্তর-পশ্চিম কোণে দুই-তিনখানি একতলা ঘর। তদ্ভিন্ন উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম কোণে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পশ্চিমে আস্তাবল ও উদ্যানের দক্ষিণ সীমার মধ্যভাগের সম্মুখে মালীদের জন্য দুইখানি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত গৃহ পাশাপাশি অবস্থিত। উদ্যানপথের উভয় পার্শ্ব পুষ্পবৃক্ষ শোভিত, অন্যত্র আম, কাঁটাল, লিচু প্রভৃতি ফলের গাছ। মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডগুলি শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত থাকিয়া উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।[১]

শ্যামপুকুরের বাটীতে ঠাকুর কিঞ্চিদধিক দুইমাস (সম্ভবতঃ অক্টোবরের আরম্ভ হইতে ১০ই ডিসেম্বর) এবং কাশীপুরের ঐ বাটীতে কিঞ্চিদধিক আট মাস (১১ই ডিসেম্বর—১৫ই আগস্ট) ছিলেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এই সার্ধ দশ মাসের মধ্যে ঠাকুরের ব্যাধিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভাবী সঙ্ঘ যেন আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বলা যাইতে পারে, দক্ষিণেশ্বরে যে বীজ প্রোথিত হইয়াছিল, শ্যামপুকুরে তাহা অঙ্কুরিত ও কাশীপুরে পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হইল। ইহা অংশতঃ সত্য হইলেও একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, শ্যামপুকুরে আমরা যেমন দেখিয়া আসিয়াছি, তেমনি কাশীপুরেও শ্রীশ্রীঠাকুর এই সঙ্ঘস্থাপনকার্যে নির্লিপ্ত সাক্ষী মাত্র ছিলেন না; প্রত্যুত জগদম্বার নিয়ন্ত্রণাধীনে তিনি ঐ বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন এবং ভক্তদিগের মনও ঐভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন, "মা তোকে তাঁর কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন"— "আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে। তুই যাইবি কোথায়?"— "এরা সব (বালক ভক্তগণ) যেন হোমা পাখীর শাবকের ন্যায়; হোমা পাখী আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া অণ্ডপ্রসব করে, সুতরাং প্রসবের পরে উহার অণ্ড-সকল সবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে—ভয় হয় মাটিতে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হয় না, ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্বে অণ্ড বিদীর্ণ করিয়া শাবক নির্গত হয়, এবং পক্ষ প্রসারিত করিয়া পুনরায় উর্ধ্বে আকাশে উড়িয়া যায়। ইহারাও সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ হইবার পূর্বেই সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে।" "তদ্ভিন্ন নরেন্দ্রনাথের জীবন গঠনপূর্বক তাঁহার উপরে নিজ ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষতঃ বালক ভক্তসকলের, ভারার্পণ করা এবং তাহা-

১। বর্ণনাটি 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে গৃহীত। সম্প্রতি বসতবাটীটি ঠিক পূর্বেরই মত পুনর্নির্মিত হইয়াছে; কিন্তু চতুষ্পার্শ্বের উদ্যানভূমি ও গৃহাদি পরিবর্তিত হইয়াছে।

দিগকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এই স্থানেই করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশীপুরের উদ্যানে সংসাধিত ঠাকুরের কার্য-সকলের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল তাহা বলিতে হইবে না" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।৩২৩)।

উদ্যানবাটীতে আসিয়াও উহার সৌন্দর্য ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ দেখিয়া ঠাকুর বেশ প্রীত হইলেন। ভক্তগণও তাঁহার সেবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হইলেন। বয়স্ক ভক্তগণ স্বভাবতই বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, নগর হইতে দূরবর্তী এই স্থানে উপযুক্ত-রূপ সেবার ব্যবস্থা করিতে হইলে লোকবল আবশ্যক এবং শ্যামপুকুরে যেমন কেহ কেহ স্বগৃহে আহারাদি সারিয়া শুধু সেবার জন্য সেখানে থাকিতেন, কাশীপুরে তাহা চলিবে না; এখানে অধিক সেবককে দিবারাত্র বাস করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে নেতারূপে তাঁহাকেই আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। নরেন্দ্র তখন বি. এল. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; তাছাড়া পৈত্রিক গৃহের বিভাগ লইয়া জ্ঞাতি-শত্রুদের সহিত হাইকোর্টে মকদ্দমা চলিতেছিল। এই উভয় কারণে তাঁহার কলিকাতায় থাকা অত্যাবশ্যক হইলেও তিনি ঠাকুরের সেবার প্রয়োজনে স্থির করিলেন, কাশীপুরেই থাকিবেন এবং সেখানেই অবসর মত পরীক্ষার পাঠ প্রস্তুত করিবেন। ফলতঃ তখন পর্যন্ত এই সঙ্কল্পই স্থির ছিল যে তিনি ঐ বৎসর আইন পরীক্ষা দিবেন; কারণ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, আইন ব্যবসায় অবলম্বনে কয়েকটি বৎসরের মধ্যে মাতা ও ভ্রাতাদের জন্য মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই সংসার ছাড়িয়া ভগবদারাধনায় রত হইবেন। নরেন্দ্রের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত আরও কয়েকজন যুবক ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া জুটিলেন। ঐরূপে শেষ পর্যন্ত যাঁহারা কাশীপুরে থাকিয়া সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা সংখ্যায় দ্বাদশ জন ছিলেন; তাঁহাদের নাম নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, বুড়ো গোপাল, কালী, শরৎ, শশী এবং হুটকো গোপাল। সারদা পিতার নির্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই-একদিন মাত্র থাকিতে পারিতেন। হরিশের কয়েক দিন আসার পর গৃহে ফিরিয়া মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। ইহা পরের কথা; আপাততঃ আমরা প্রথম কয়দিনের কথাই বলিতেছি।

নরেন্দ্রনাথ সকলের কার্য ভাগ করিয়া দিলেন; কে নিত্য ডাক্তারের বাড়ী

যাইবেন, কে কলিকাতায় বাজার করিবেন, কে বরাহনগরের বাজার করিবেন, কে কে গৃহাদি পরিষ্কার করিবেন, কাহারা পালাক্রমে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে থাকিবেন ইত্যাদি সমস্ত কাজের ব্যবস্থা তাঁহাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া করিতে হইল। সকল কার্যের সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত বালক ভক্তদের কেহই স্বল্পকালের জন্যও স্বগৃহে গেলেন না। একান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে তাঁহারা কোনও প্রকারে বাটীতে শুধু একটু সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা নিয়মিত-ভাবে বাড়ীতে আসিতে বা থাকিতে পারিবেন না। এইভাবে গৃহী ও ব্রহ্মচারী ভক্তেরা যখন একযোগে সেবায় বিভিন্ন দিকের দায়িত্ব লওয়ায় উহা সুশৃঙ্খলভাবে আপনা আপনি চলিতে লাগিল তখন নরেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, দুই-এক দিনের জন্য নিজ বাটীতে যাইবেন। রাত্রিকালে ঐ কথা জানাইয়া তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িয়া গোপাল, শরৎ প্রমুখ দুই-একজনকে বলিলেন, "চল, বাহিরে উদ্যানপথে পাদচারণ ও তামাকু সেবন করি।" বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি বলিলেন, "ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষার সঙ্কল্প করিয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে? সময় থাকিতে তাঁহার সেবা ও ধ্যান-ভজন করিয়া যে যতটা পারিস আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নে, নতুবা তিনি সরিয়া যাইলে পশ্চাত্তাপের অবধি থাকিবে না। এটা করিবার পরে ভগবানকে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইলে সাধন-ভজনে লাগিব, ঐ রূপেই তো দিনগুলো যাইতেছে এবং বাসনাজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। ঐ বাসনাতেই সর্বনাশ, মৃত্যু। বাসনা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।"

তখন পৌষ মাসের রাত্রি; চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, যেন সারা পৃথিবী ধ্যানমগ্ন! বৃক্ষতলগুলি তখন শুষ্ক ও পরিষ্কার। ভ্রমণ করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন এবং ভগ্নশাখাসমূহের একটি শুষ্ক স্তূপ নিকটেই রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "দে উহাতে অগ্নি লাগাইয়া; সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া থাকে, আর আমরাও ঐরূপ ধুনি জ্বালাইয়া অন্তরের নিভৃত বাসনাসকল দগ্ধ করি।" অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং চারিদিকের শুষ্ক শাখাগুলি টানিয়া আনিয়া, অন্তরের বাসনারাশিকে আহুতি দেওয়া হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া সকলে ঐগুলিকে ঐ আগুনে হোম করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহারা এক দিব্য আনন্দ অনুভব করিলেন। মনে হইল, যেন তাঁহারা এই প্রকারে শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকটবর্তী

হইতেছেন। এমনি করিয়া দুই-তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেলে এবং ইন্ধন শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা শয়নগৃহে ফিরিলেন। রাত্রি তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। পরদিন প্রভাতে সব শুনিয়া অপর ব্রহ্মচারীরা, তাঁহাদিগকে কেন ডাকা হয় নাই, এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র তখন সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমরা তো পূর্ব হইতে অভিপ্রায় করিয়া ঐ কার্য করি নাই, এবং এত আনন্দ পাইব তাহাও জানিতাম না। এখন হইতে অবসর পাইলেই সকলে মিলিয়া ধুনি জালাইব, ভাবনা কি ?" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫।৩৩২-৩৩)। এই প্রস্তাবানুযায়ী পরেও অনেকবার ধুনি জালাইয়া ধ্যানাদি হইয়াছিল।[২]

পূর্বাভিপ্রায় অনুসারে নরেন্দ্র ঐ দিন প্রাতেই কলিকাতায় গেলেন এবং একদিন পরে কয়েকখানি আইন-এর পুস্তকসহ উদ্যানবাটীতে ফিরিলেন। কিন্তু আমরা একটু পরেই দেখিব, আইন-পড়া তাঁহার আর হয় নাই।

এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নরেন্দ্রনাথের কথাবার্তার যে বিবরণ 'কথামৃতে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে যেসব তথ্য জানা যায়, তন্মধ্যে অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তখন নরেন্দ্রজীবনে অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তদুচিত ত্যাগ-তপস্যার ভাব অতি স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ২রা জানুয়ারি ধ্যানকালে তাঁহার কুণ্ডলিনী-জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। ৪ঠা জানুয়ারি সোমবারে উদ্যানবাটীর নীচে বসিয়া মাস্টার মহাশয়ের সহিত আলাপনকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "গত শনিবার এখানে ধ্যান কচ্ছিলাম ; হঠাৎ বুকের ভিতর কিরকম করে এল।" মাস্টার মহাশয় অনুমান করিয়া বলিলেন, "কুণ্ডলিনী-জাগরণ ?" নরেন্দ্র অনুমোদন করিলেন, "তাই হবে। বেশ বোধ হল—ইড়া-পিঙ্গলা। হাজরাকে বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে।" তিনি আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কাল, রবিবার উপরে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করলাম ; ওঁকে সব বললাম। আমি বললাম, 'সব্বাইএর হল, আমার হবে না ?'···তিনি বললেন, 'তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয় না—সব হবে। তুই কি চাস ?' আমি বললাম, 'আমার ইচ্ছা, অমনি তিন-চার দিন সমাধিস্থ

২। "অঙ্গভূষা শ্রীপ্রভুর নরেন্দ্র এখানে।
গোটা রাত্রি ধুনি-পাশে রহেন ধিয়ানে॥
ভস্মমাখা গোটা অঙ্গে কৌপীনধারণ।
পাতা আছে বাঘছাল যাহাতে আসন॥" (পুঁথি)

হয়ে থাকব। কখন কখনও এক একবার খেতে উঠব।' তিনি বললেন, 'তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে।[৩] তুই তো গান গাস—যো কুছ হ্যায় সো তুঁহী হ্যায়।'…তিনি বলিলেন, "তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয়, সমাধিলাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে।" (৩।২৩।২)। সে কথা মান্য করিয়া নরেন্দ্রনাথ বাড়ী গিয়াছিলেন। উহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা আমরা অচিরেই দেখিব। আপাততঃ নির্বিকল্প সমাধি না-পাওয়ার বিষয়টিই আর একটু আলোচনা করিব ; কেন না ইহা শুধু নরেন্দ্রজীবনের ধারা-পরিবর্তনকারী অন্যতম প্রধান ঘটনা নহে, আধুনিক যুগের পক্ষেও ইহা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য কালেরই কোন একদিন নির্বিকল্প সমাধিলাভের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে এজন্য ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য প্রথমে বলিলেন, "আমি ভাল হলে তুই যা চাইবি দেব।" নরেন্দ্র তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া বলিলেন, "কিন্তু আপনি যদি আর ভাল না হন, তাহলে আমার কি হবে?" তখন ঠাকুর কতকটা অন্যমনস্ক ও স্বগতভাবে বলিলেন, "শালা বলে কি?" তারপর ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুই কি চাস বল।" নরেন্দ্র জানাইলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচ-ছয় দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কতকটা উত্তেজিতকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিস নি। আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাব তো ভাজাও খাব, সিদ্ধও খাব, ঝোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধি অবস্থায় নির্গুণ ভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্তির ভেতর ঐহিক সম্বন্ধ-

৩। "মণি—'হাঁ উনি সর্বদাই বলেন যে, সমাধি থেকে নেমে এসে দেখে—তিনিই জীব জগৎ এই সমস্ত হয়েছেন। ঈশ্বরকোটির এই অবস্থা হতে পারে। উনি বলেন, জীবকোটি সমাধি-অবস্থা যদিও লাভ করে, আর নামতে পারে না।" (ঐ)।

বোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর—একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত তুই হ।"[৪]

প্রাচীন চিন্তাধারায় চলিতে চলিতে নরেন্দ্র আজ অকস্মাৎ যুগাবতারের নবীন বাণী স্বমুখে স্পষ্টতমরূপে শুনিলেন—বুঝিলেন, কেবল নিজমুক্তির জন্য লালায়িত থাকাও এক প্রকার স্বার্থপরতা; আজ মনে হইল, পরমহংসদেব যে বলিয়া থাকেন, 'চোখ বুঁজিলেই ভগবান আছেন, আর চোখ চাহিলে কি তিনি নাই?'—একথার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। কিন্তু বুদ্ধিতে এই নবালোক প্রতিফলিত হইলেও, হৃদয় দিয়া ইহা গ্রহণ করিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়াছিল; এই নবতত্ত্ব লাভ করিলেও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তখনও অতৃপ্ত রহিয়া গেল; তাই ঠাকুরের ধিক্কারবচনে নরেন্দ্রনাথের চক্ষে অজস্র অশ্রু বিগলিত হইলেও তাঁহার প্রাণ তখনও নির্বিকল্প-সমাধির জন্য পূর্বেরই ন্যায় লালায়িত রহিল। অবশেষে ঘটনাক্রমে একদিন সন্ধ্যার পরে তিনি চিরবাঞ্ছিত নির্বিকল্পভূমিতে আরূঢ় হইলেন। সেখানে তখন ছিলেন কেবল তিনি ও বুড়ো গোপালদা, বাকী সেবকরা তখন হয় ঠাকুরের সেবায় ব্যস্ত, নতুবা সন্ধ্যায় স্তিমিত আলোকে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্য স্থাপনপূর্বক কোন নিভৃত স্থানে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন কিংবা দূরে বৃক্ষতলে ভগবৎ-সঙ্গীতে নিরত। এমন সময় ধ্যানমগ্ন নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে উজ্জ্বল আলোকরাশি প্রজ্বলিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে উহার ক্রমবর্ধমান জ্যোতিঃ যেন চন্দ্র, সূর্য, আকাশ প্রভৃতিকে দূরে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে—তখন বিশ্বসংসার টলটলায়মান এবং মন বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া এক অখণ্ড জ্যোতিঃসমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে। দেশ-কাল-পাত্রের বোধ আর রহিল না—রহিল শুধু অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তা। নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "সেদিন দেহাদি-বুদ্ধির এককালে অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিয়েছিলুম, আর কি? একটু অহং ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই আমি আর ব্রহ্মের ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্রে জল, জল, আর কিছুই নাই। ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।" সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর তাঁহার মনে হইল যেন মস্তক ব্যতীত সমস্ত

৪। 'কথামৃতে'র পূর্বোক্ত ঘটনা ও এই ঘটনা বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, কেন না উভয় স্থলের উপদেশাদি সম্পূর্ণ পৃথক। 'কথামৃতে'র ঘটনা পূর্ববর্তী ও ইহা পরবর্তী।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছে। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ কাতর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এই আকস্মিক শব্দে গোপালদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; কর্ণে গেল, নরেন্দ্র বলিতেছেন, "গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল ?" গোপালদা ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার দেহের বিভিন্ন স্থান টিপিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেন নরেন, এই যে ?" তবু নরেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, শুধু মুখখানি আছে, আর কিছু নাই। অগত্যা কিংকর্তব্যবিমূঢ় গোপালদা অপরদের ডাকিয়া আনিলেন ; কিন্তু কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে উপরে ঠাকুরকে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি সহকারে বলিলেন, "বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ ঐ রকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।"

রাত্রি এক প্রহর পরে অনেকটা সহজাবস্থাপ্রাপ্ত নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর পদ-প্রান্তে উপনীত হইলেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন নাই, ধীরপদক্ষেপে সোপানারোহণ-কালে মনে হইতেছিল, চরণদ্বয় যেন চলিতেছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন ? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।" তারপর তিনি তাঁহাকে শরীরের প্রতি যত্ন লইতে এবং সঙ্গি-নির্বাচন-বিষয়ে অধিকতর সাবধান হইতে বলিয়া দিলেন।[৫]

এইকালে সাধনপ্রভাবে নরেন্দ্র এক অদ্ভুত রকমের দর্শন পাইতেন—ধ্যানের পর দেখিতেন যেন ঠিক তাঁহারই মতো আর একজন সেখানে রহিয়াছে ; তাহার আকার প্রকার গঠনাদি সমস্ত তাঁহারই অনুরূপ। তিনি আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেন, "এ আবার কে ?" ঐ প্রতিকৃতিটি অনেক সময় এক ঘণ্টারও অধিককাল থাকিত এবং তাঁহার সহিত কথা কহিত—তাঁহার চলন-বলন, কথাবার্তা ইত্যাদি সমস্তই অবিকল অনুকরণ করিত। এমন কি, তিনি মুখ ভেঙচাইলে ঐ

৫। "সেই অবস্থায় বোধ হল যেন আমার শরীর নাই, শুধু মুখটি দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন, আমার নীচে ঐ অবস্থাটি হল। আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম, বলতে লাগলাম, 'আমার কি হল ?' বুড়োগোপাল উপরে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন, 'নরেন্দ্র কাঁদছে।' তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল।' আমি বললাম, 'আমার কি হল ?' তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও আপনাকে জানতে পারলে দেহ রাখবে না ; আমি ভুলিয়ে রেখেছি।' ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট)।

প্রতিমূর্তিটি তাহাই করিত। প্রথম প্রথম এইরূপ দর্শনের পর ঠাকুরকে উহা জানাইলে তিনি ঐ বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা ধ্যানের উচ্চাবস্থার লক্ষণ।"

যাহা হউক, আমরা কাশীপুরের প্রথমবস্থার দিনগুলিতেই ফিরিয়া যাই। নরেন্দ্র তখনও আইন পড়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেন নাই। এদিকে ঐকালে তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধনস্পৃহা এত বর্ধিত হইয়াছিল যে, আইন-এর পুস্তক নিকটে থাকিলেও উহা পড়িবার প্রবৃত্তিই হইত না; বস্তুতঃ গৃহ হইতে পুস্তক আনিয়া রাখিলেও মোটেই পাতা উলটাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। মনে রাখিতে হইবে, ১১ই ডিসেম্বর সকলে কাশীপুরে আসেন। অতঃপর ৪ঠা জানুয়ারি সন্ধ্যায় মাস্টার মহাশয়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের যে আলাপের বিবরণ 'কথামৃতে' (৩।২৩।২) লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথের মনে তখন পড়িবার মতো ইচ্ছা জাগিতেই পারে না। তিনি মাস্টার মহাশয়কে ঐ সন্ধ্যায় বলিয়াছিলেন, "আজ সকালে বাড়ী গেলাম। সকলে বকতে লাগল, আর বললে—'কি হো হো করে বেড়াচ্ছিস? আইন একজামিন (পরীক্ষা) এত নিকটে, পড়াশুনা নাই, হো হো করে বেড়াচ্ছ!' মাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কিছু বললেন?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "না, তিনি খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। হরিণের মাংস ছিল, খেলুম, কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।" তিনি আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দিদিমার বাড়ীতে সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এল—পড়াটা যেন কী ভয়ের জিনিস! বুক আটু-পাটু করতে লাগল। অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই। তারপর বই-টই ফেলে দৌড়। রাস্তা দিয়ে ছুট! জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল। খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, গাময় খড়। আমি দৌড়াচ্ছি—কাশীপুরের রাস্তায়! 'বিবেক-চূড়ামণি' শুনে আরও মন খারাপ হয়েছে! শঙ্করাচার্য বলেন, এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে—'মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ'। ভাবলাম, আমার তিনটিই হয়েছে—অনেক তপস্যার ফলে মানুষজন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে, আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়েছে।… সংসার আর ভাল লাগে না, সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না, দুই-একজন ভক্ত ছাড়া।"

ঐ ৪ঠা জানুয়ারিই অপরাহ্ণ চারিটার সময় নরেন্দ্র আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বসিয়াছিলেন, তখন ঠাকুর মাস্টার মহাশয়ের দৃষ্টি নরেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া সঙ্কেতে বলিয়াছিলেন, "কেঁদেছিল···কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে এসেছিল।" কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র জানাইলেন, তিনি সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে বেলতলায় ধুনি জ্বালাইয়া তপস্যা করিতে যাইবেন। ঠাকুর বলিয়া দিলেন, বেলতলায় আগুন জ্বালাইলে নিকটবর্তী বারুদখানার কর্তৃপক্ষ বাধা দিবেন; পঞ্চবটীই ভাল, কিন্তু বড় শীত, আর অন্ধকার। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়বি না?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া-টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।" শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ আঙ্গুর আনিয়াছিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রথম দিয়া ভক্তদের মধ্যে হরিলুটের মতো ছড়াইয়া দিলেন ('কথামৃত', ৩।২৩।১)। নরেন্দ্র দুই-একজন ভক্তসহ সে রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। ঐ কালে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঐভাবে তপস্যা করিতে যাইতেন। 'কথামৃতে' (২।২৬।১) ইহার আরও উল্লেখ আছে।

আমরা এই বিবরণে একদিকে যেমন পাই নরেন্দ্রের তীব্রবৈরাগ্য এবং ঈশ্বরলাভের ব্যাকুল আগ্রহ,* তেমনি অন্যদিকে দেখি তাঁহার অত্যাশ্চর্য মাতৃভক্তি। এই হৃদয়বিদারক দ্বন্দ্ব তাঁহার জীবনে দীর্ঘকাল, হয়তো শেষ পর্যন্ত চলিয়াছিল। তবে এইকালে উহা চরম অবস্থায় পৌছাইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার মাতৃভক্তির পটভূমিকায় ঈশ্বরভক্তি আমাদের নিকট আরও জাজ্বল্যমান হয়, এবং আমরা বুঝিতে পারি, নরেন্দ্রনাথের ন্যায় বীর ও হৃদিমান সন্ন্যাসীই এইরূপ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

পরদিন (৫ই জানুয়ারি) বিকালে নরেন্দ্র জানাইলেন, তিনি আবার বাড়ী যাইবেন—এক বন্ধু তাঁহাকে একশত টাকা ধার দিতে রাজী ছিলেন, আর নরেন্দ্র আশা করিতেছিলেন যে, ঐ অর্থে তিন মাসের মতো বাড়ীর ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, এবং তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে সাধনা করিবেন ('কথামৃত',

৬। "নরেন্দ্রের ভারী ঘৃণা কামিনী-কাঞ্চনে।···
প্রবল বাসনা মনে সাধ উগ্রতর।
বিবেক-বৈরাগ্য কিসে হইবে প্রখর।···
অনুরাগ একমাত্র ব্রহ্ম নিরাকারে
অরূপ অগুণ যিনি মায়ার ওপারে।" (পুঁথি)।

৩।২৩।৩)। ইহারও পরে আমরা আবার দেখি, তিনি বলিতেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নূতন বিদ্যালয়ে কাজ না করিয়া বরং গয়াতে গিয়া একটা জমিদারির ম্যানেজারের কাজ করিবেন ('কথামৃত', ৪।৩৩।৩)। বাড়ীর দুর্দশা মনে জাগরূক থাকিয়া সর্বদা অশান্তি উৎপাদন করিতেছিল বলিয়া এই প্রকার আরও জল্পনা কল্পনা হয়তো সময় সময় উদিত হইত; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভগবানের আকর্ষণের চিরবর্ধমান প্রাবল্য সে-সব অভিপ্রায়কে ভাসাইয়া দিতেছিল—ইহাই হইল তাঁহার তখনকার মানসিক অবস্থা। সত্য বলিতে গেলে, তিনি তখন ত্যাগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ১৫ই মার্চের কথাবার্তা ইহাই প্রতিপন্ন করে। সেদিন নরেন্দ্র বলিলেন, "কেউ কেউ রাগে আমার উপর, ত্যাগ করবার কথায়।" অমনি ঠাকুর কহিলেন, "ত্যাগ দরকার।...একটা না সরালে কি আর একটা পাওয়া যায়?" নরেন্দ্র সায় দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ!" ঠাকুর আবার কহিলেন, "সেই-ময় দেখলে আর কিছু কি দেখা যায়?" নরেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "সংসার ত্যাগ করতে হবেই?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "যা বললুম, সেই-ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার-ফংসার আর কিছু দেখা যায়?" একটু পরেই ঠাকুর সস্নেহে নরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে ভক্তদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "খুব!" নরেন্দ্র সহাস্যে জানিতে চাহিলেন, "খুব কি?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "খুব ত্যাগ হয়ে আসছে।" (ঐ, ৩।২৪।৩)।

ইহারই কয়দিন মাত্র পরের কথা। এপ্রিলের গোড়াতে বৈরাগ্যের আকর্ষণে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে বা অপর কাহাকেও না জানাইয়া একদিন তারক ও কালীর সঙ্গে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া ও বালী স্টেশনে ট্রেন ধরিয়া বুদ্ধগয়া দর্শনে গেলেন। তখন কাশীপুরে বুদ্ধের জীবন ও মতবাদ সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে খুব আলোচনা হইত এবং 'ললিতবিস্তর' ও 'ত্রিপিটকা'দি পঠিত হইত। সুতরাং তিন জনেরই মন এইরূপ অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত ছিল। গমনকালে তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্বল ছিল একখানি গেরুয়া বহির্বাস ও স্কন্ধে একখানি কম্বল। গয়ায় পৌঁছিয়া তাঁহারা তথা হইতে পদব্রজে বুদ্ধগয়ায় গেলেন এবং সেখানে বোধগয়ার মঠে মহান্ত মহারাজের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তারপর ফল্গুনদীতে স্নানান্তে মন্দিরাদি দর্শন করিলেন ও পরিশেষে যে বোধিদ্রুমতলে ধ্যানমগ্ন তথাগত বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন, সকলে তাহার নিম্নে ধ্যানে রত হইলেন। যে বজ্রাসনে শাক্যসিংহ উপবেশন করিয়াছিলেন,

নরেন্দ্র তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। তিন জন পাশাপাশি ধ্যানে রত আছেন, এমন সময় নরেন্দ্র অকস্মাৎ ভাবাবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে তারকনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং মুহূর্তমধ্যে আবার সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধ্যানে বসিলেন। পরে তারকনাথ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "মনে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলাম।...সবই তো রয়েছে, কিন্তু তিনি কোথায়?...বুদ্ধদেবের বিরহ এত তীব্র বোধ হতে লাগল যে আর সামলাতে পারলাম না—কেঁদে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরলাম।"[৭] সেই রাত্রি ধ্যানেই কাটিয়া গেল। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, বুদ্ধগয়ায় কিছুদিন থাকেন; কিন্তু ভিক্ষালব্ধ মড়ুয়ার রুটি নরেন্দ্রের পেটে সহ্য হইল না। আবার শীতবস্ত্রের অভাবে রাত্রে নিদ্রারও ব্যাঘাত হইতে লাগিল। কাজেই তিন-চারিদিন পরেই তাঁহারা গয়া হইয়া কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। গয়ায় একদিন উপেনবাবুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ মৃদঙ্গের সঙ্গে খেয়াল ধ্রুপদ ইত্যাদি গাহিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের অজ্ঞাত স্থানে গমনের সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি নীরবে শুধু মৃদুহাস্য করিয়াছিলেন এবং কিছু পরে বলিয়াছিলেন, "সে কোথাও যাবে না, তাকে এখানে আসতেই হবে।" এই বলিয়া একটি গল্প শুনাইলেন, "দেখ, একটা ময়ূর একজনের বাগানে রোজ আসত; সে লোকটা খাবারের সঙ্গে একটু আফিঙ মিশিয়ে ময়ূরটাকে রোজ খেতে দিত। দিন কতক পরে ময়ূরটার এমনি অভ্যাস হয়ে গেল যে, বাগানে না এসে আর থাকতে পারত না। নরেনেরও জানবি সেই অবস্থা। এদিক ওদিক যাচ্ছে বটে, কিন্তু এখানে যে রস পেয়েছে, সে রস ছেড়ে যাবে কোথায়?" তবু তিন দিন পরেও যখন

৭। স্বামী অভেদানন্দের (কালীর) বিবরণ একটু অন্যরূপ। তাঁহার মতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, বুদ্ধগয়ায় পৌঁছার দ্বিতীয় দিন (৮ই বা ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬) প্রত্যূষে—যখন তিন জনে সারারাত্রি বোধিদ্রুম-তলে ধ্যানে কাটাইয়া পুনর্বার উষাকালে মন্দিরমধ্যে ধ্যানে বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের বামে ছিলেন কালী ও কালীর বামে তারক (স্বামী শিবানন্দ)। এই ঘটনা সম্বন্ধে নরেন্দ্র পরে কালীকে বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধমূর্তি থেকে তোমার পাশে তারকদার দিক দিয়ে একটা জ্যোতি পাস্ করে (বের হয়ে) গেল।" ('স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা')। সম্ভবতঃ এই বিবরণ শুনিয়াই স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু) বলিয়াছিলেন, "সেখানে (বুদ্ধগয়ায়) তো লোরেন (নরেন) ভাই তারকদার দেহে একটা জ্যোতি প্রবেশ করতে দেখেছিল।" এই বিবরণে বুদ্ধগয়ায় ৮ই বা ৯ই এপ্রিল উক্ত দর্শনলাভের কথা থাকিলেও উহা আরও দিন কয়েক পূর্বের ঘটনা বলিয়া মনে হয়, কেন না 'কথামৃত' (৩।২৫।১) ৯ই এপ্রিলে বলা হইতেছে, "নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন।"

তাঁহারা ফিরিলেন না, তখন সকলেরই খুব উদ্বেগ বাড়িয়া গেল। ঠাকুর কিন্তু মেঝেতে একটি দাগ কাটিয়া বলিলেন, "এর বেশী তাদের যাবার ক্ষমতা নেই।" অবশেষে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে তিনি একটি অঙ্গুলি চারিদিকে ঘুরাইয়া সকৌতুকে বলিলেন, "এবার সব এখানে ; আর যেখানেই যাওনা কেন কোথাও কিছু পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা।"

কাশীপুরে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে ৯ই এপ্রিল রাত্রে বুদ্ধদেবের মতবাদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়। উহাতে ঠাকুর ও নরেন্দ্র উভয়ে যোগ দেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব "নাস্তিক নয় ; তবে মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কী জান? বোধস্বরূপকে চিন্তা করে করে তাই হওয়া—বোধস্বরূপ হওয়া।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।" বুদ্ধের মতাবলম্বনে এইরূপ বিচার পরেও কিছু দিন ধরিয়া চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় ; কারণ ৫ই বৈশাখ এবং ৯ই বৈশাখও ঐ জাতীয় বিচারের কথা 'কথামৃতে' উল্লিখিত আছে। ঠাকুর এইসব বিচারের বিরোধিতা না করিলেও নরেন্দ্রের মনকে ভক্তির দিকেই আকর্ষণ করিতেন।

'কথামৃতে' আছে (৪।৩২।১) ঠাকুর বলিতেছেন, "ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়।···ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না, মহামায়ার পুজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, 'মা পথ ছেড়ে দাও, তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" তারপর নরেন্দ্রকে বলিলেন, "মায়াবাদ শুকনো। কি বললাম বল দেখি?" নরেন্দ্র বলিলেন, "শুকনো।" তখন ঠাকুর নরেন্দ্রের হাতমুখ স্পর্শ করিতে করিতে আবার বলিলেন, "এসব ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ—মুখ চেহারা শুকনো হয়।" বুদ্ধ ও বুদ্ধের চিন্তায় নিরত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথ তখন জ্ঞানের কথা খুবই বলিতেন। তাঁহার মুখে এমন কথাও শোনা যাইত, "আমি চাই শান্তি, আমি ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না ;—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্।" (ঐ ৩।২৬।২)। আবার ঠাকুর যখন বলিতেন, "আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে," তখন নরেন্দ্র উত্তর দিতেন, "হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলব না।" (ঐ ৪।৩৩।৩)। ঠাকুর জানিতেন, এইসব শুষ্ক জ্ঞানের কথা নরেন্দ্রের প্রকৃত স্বরূপের পরিচায়ক নহে—ঠাকুর যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিতেন, তিনি সেই উপাদানেই নির্মিত। মাস্টার মহাশয়ও ইহা জানিতেন ; তাই নরেন্দ্র যখন একদিন (১৭ই এপ্রিল, ঐ

৪।৩৩।৩) বলিলেন, "ঈশ্বর-টীশ্বর নাই", তখন মাস্টার মহাশয় সহাস্যে কহিলেন, "সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না।" এইরূপ বিচারপ্রবণতা যে কালে চলিতেছে, সেই সময়েই একদিন (২২শে এপ্রিল) সিন্ধুদেশীয় ভক্ত হীরানন্দ কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের আহ্বানে নরেন্দ্র আসিয়া হীরানন্দের সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে জ্ঞানের কথা তুলিলেন। শঙ্করাচার্য-রচিত 'নির্বাণষট্কম্' এবং 'কৌপীনপঞ্চকম্' আবৃত্তি করিলেন। কিন্তু ঠাকুরের আদেশে গাহিলেন— 'তুঝসে হ্যামনে দিল কো লাগায়া, যো কুছ হ্যায় সো তূঁহী হ্যায়।' ইত্যাদি। হীরানন্দ বলিলেন, "সব তূঁহী হ্যায়, এখন তুঁহু তুঁহু। আমি নয়; তুমি।" নরেন্দ্র তবু বলিলেন, "তুমি ও আমি, আমি ও তুমি। আমি বই আর কিছু নাই।" নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন, "যেন খাপ-খোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।" আর হীরানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন, "কি শান্ত! রোজার কাছে জাত-সাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে।" কী সুন্দর দুইখানি চিত্র, অথচ কেমন পরস্পরবিরোধী! এই বিরোধের সমাধানই তিনি চাহিয়াছিলেন নরেন্দ্রের জীবনে এবং পরে আমরা দেখিব, তিনি সফলকামও হইয়াছিলেন।

কেবল পরে কেন? ঐ কালেও আমরা নরেন্দ্রের ভক্তি-বিশ্বাসের পরিচয় পাই। রাখাল জানিতেন, নরেন্দ্র অবতারবাদ সম্বন্ধে তখনও সন্দিহান। রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণ সেদিন (১৫ই মার্চ) ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া অবতার-বাদ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া, ব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু কথা শুনিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, "দেখছি, এর ভেতর থেকেই যা কিছু।" নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝলি?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "যত দৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে।" অমনি রাখালের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ঠাকুর সানন্দে বলিলেন, "দেখছিস!" ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাহিতে আদেশ করিলেন। নরেন্দ্র গাহিলেন, "নলিনীদলগত জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনম্ অতিশয়চপলম্" ইত্যাদি বৈরাগ্যের গান। দুই-এক চরণ পরেই ঠাকুর বাধা দিয়া বলিলেন, "ওকি? ওসব অতি সামান্য। অমনি নরেন্দ্র গাহিলেন সখীভাবের গান—

কাঁহে সই, জিয়ত মরত কি বিধান।

ব্রজকে কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥ ইত্যাদি

তিনি আবার গাহিলেন—

তুমি আমার আমার বঁধু, (কি বলি, তোমায় বলি নাথ)।
(কি জানি, কি বলি আমি, অভাগিনী নারী জাতি)
তুমি হাথো কে দর্পণ, মাথা কে ফুল (তোমায় ফুল করে কেশে পরব বঁধু)। ইত্যাদি

ঐ দিনেরই আর একটি ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী সত্তার প্রতি নরেন্দ্রের বিশ্বাসের পরিচয় পাই। ঠাকুর তখন অচিরে নিজ দেহত্যাগের আভাস দিতেছিলেন। অমনি রাখাল অনুনয় করিলেন, "আপনি বলুন, যাহাতে আপনার দেহ থাকে।" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।" নরেন্দ্র তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।" ঠাকুর চুপ করিয়া যেন কি ভাবিতে লাগিলেন; পরে বলিলেন, "আর বললে কই হয়? এখন দেখছি, এক হয়ে গেছে।" (ঐ ৩।২৪।২)।

আমরা বলিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে কাশীপুরের উদ্যানবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পঞ্চবটিমূলে ধুনি জ্বালাইয়া সাধনা করিতেন। তিনি ধ্যান করিতে করিতে অনেক সময় ললাটের অভ্যন্তরে একটা ত্রিকোণাকার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন; উহাকে ঠাকুর ব্রহ্মযোনি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। অনেক সময় আবার দেখিতেন ধুনির পার্শ্বে বহু দেবদেবীর সমাগম হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কাশীপুরেও এইরূপ সাধনা চলিত। অধিকন্তু সেখানে নরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় শাস্ত্রপাঠ ও বিচারাদি অবিরাম চলিত। বাসগৃহের প্রাচীরে তিনি 'ললিতবিস্তরে'র শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই সঙ্কল্পটি কেবল শ্লোকমধ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া কাশীপুরে সমবেত ব্রহ্মচারিবৃন্দ তখন তাঁহাদের অবসরকাল তত্ত্বালোচনায় মুখরিত করিতেন আর ধ্যানমগ্ন তাঁহাদের সম্মুখে প্রজ্বলিত ধুনির অগ্নিতে নৈশ অন্ধকার উদ্ভাসিত হইত।

বুদ্ধগয়ায় গমনের পূর্ববর্তী দুইটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। নরেন্দ্রকে একলা পাইয়া ঠাকুর একদিন গোপনে বলিলেন, "আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নাই, তোর ভেতর দিয়ে করব, কি বলিস?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "না, তা হবে না।" ('কথামৃত', ৩ পরিশিষ্ট)। তথাপি ঠাকুর তাঁহার মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্র একদিন পরীক্ষা করিয়া ঐ শক্তির

পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। 'কথামৃতে' আছে "নরেন্দ্র—'কাশীপুরে তিনি শক্তি-সঞ্চার করে দিলেন।' মাস্টার—'যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জ্বেলে বসতে—নয় ?' নরেন্দ্র—'হাঁ, কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি, কালী বললে—কি একটা শক্ (ধাক্কা) তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।" (ঐ)। ঘটনাটি 'লীলাপ্রসঙ্গে' এইরূপ বিবৃত হইয়াছে —"আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক ভক্তদিগের তিন-চারি জন স্বামীজীর (নরেন্দ্রের) সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে।...দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার তামাক সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজীর ভিতর সহসা পূর্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অন্য কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে (কালীকে) বলিলেন, 'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাকতো!' ইতিমধ্যে তামাক লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বালক দেখিল, স্বামীজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাঁহার দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই-এক মিনিট কাল ঐভাবে অতীত হইবার পর স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, 'ব্যস, হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি ?' অভেদানন্দ, 'ব্যাটারি ধরলে যেমন কি-একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে ঐরূপ অনুভব হতে লাগল।'...পরে সকলে দুই প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অভেদানন্দ ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাঁহাকে ইতঃপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল।" নরেন্দ্রও উহা লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত একজনকে সঙ্কেতে দেখাইলেন। "রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী) পূজাগৃহে আসিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'ঠাকুর ডাকিতেছেন।' শুনিয়াই স্বামীজী বসতবাটীর দ্বিতল গৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। স্বামীজীকে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'কিরে, একটু জমতে না জমতেই খরচ?

আগে নিজের ভেতর ভাল করে জমতে দে, তখন কোথায় কিভাবে খরচ করতে হবে তা বুঝতে পারবি—মা ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভেতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা করলি বল দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল, ছয় মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল। যা হবার হয়েছে, এখন হতে আর অমনটা করিস নি। যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।'… ফলে দেখা গেল, অভেদানন্দ যে ভাবসহায়ে পূর্বে ধর্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার তো একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচার-বিরোধী অনুষ্ঠান সকল করিয়া ফেলিতে লাগিল।"[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বালক ভক্তদিগকে সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। কাশীপুরের দুই-একটি ঘটনাদৃষ্টে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ঠাকুর ঐ ভক্তদিগকে মাঝে মাঝে নিকটবর্তী গ্রামে ভিক্ষার জন্য পাঠাইতেন। তিনি বলিতেন মাধুকরীর অন্ন পবিত্র। ভক্তগণ ভিক্ষান্বেষণে বাহির হইয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, কোন গৃহস্থ সাদরে ভিক্ষা দিতেন, কেহবা কটু কথা শুনাইতেন। ভক্তেরা ঠাকুরের নিকট ফিরিয়া সব নিবেদন করিতেন। ঠাকুর ভিক্ষান্ন হইতে কদাচিৎ দুই-এক কণা গ্রহণ করিতেন। অতঃপর একদিন তিনি তাঁহাদিগকে গেরুয়া বস্ত্র অর্পণ করিলেন। সেবারে বুড়ো গোপালদার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, তিনি কলিকাতায় সমাগত গঙ্গাসাগরযাত্রী সাধুদিগকে গেরুয়া বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দান করিবেন। ঠাকুর উহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, কাশীপুরে সমবেত ত্যাগী ভক্তদের অপেক্ষা উচ্চস্তরের সাধুর অন্বেষণ বৃথা; ইঁহাদিগকে ঐ সকল বস্ত্র দিলেই যথেষ্ট পুণ্যলাভ হইবে। তদনুসারে গোপালদা দ্বাদশখানি গেরুয়া বস্ত্র ও সমসংখ্যক রুদ্রাক্ষের মালা আনিয়া ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তিনিও উহা যুবক ভক্তদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বহস্তে বিতরণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্ঘের ইহাই আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত বলিতে পারা যায়। এই ত্যাগীদের নাম—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন,

৮। 'স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কথা' গ্রন্থে (৫৭ পৃঃ) মূল ঘটনা স্বীকৃত হইলেও ভাবসঞ্চার স্বীকৃত হয় নাই; প্রত্যুত বলা হইয়াছে, স্বামীজীর কুণ্ডলিনী-জাগরণের ফলে ঐরূপ কম্পন ঘটিলেও ভাবসঞ্চারণ-শক্তি স্বামীজী তখনও অর্জন করেন নাই।

যোগীন্দ্র, তারক, শরৎ, শশী, কালী, লাটু ও বুড়োগোপাল। অবশিষ্ট বস্ত্রখানি কাহারও কাহারও মতে ছোট গোপাল পাইয়াছিলেন, কাহারও বা মতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অবশ্য শেষোক্ত দুইজনের কেহই সন্ন্যাসী হন নাই, যদিও গিরিশচন্দ্রকে অনেকে ভৈরবাংশে জাত বলিয়া মনে করিতেন; স্বামীজী তাঁহাকে এক শিবরাত্রিতে শিব সাজাইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; গৃহী ভক্তগণ প্রয়োজনীয় অর্থ দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যয় করিতেছিলেন, ডাক্তারের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, শ্রীমা পথ্যাদি যথাযথ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেছিলেন, কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধিই হইতেছে দেখিয়া নিরুপায় ভক্তদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। রাখাল ও নরেন্দ্র ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি মা কালীকে বলিয়া রোগ সারাইয়া লন; কিন্তু ঠাকুর তাহাতে সম্মত হন নাই। অবশেষে হতাশাচ্ছন্ন নরেন্দ্রনাথ কি ভাবিয়া, হয়তো বা দৈব সাহায্য লাভের আশায়, একদিন সন্ধ্যার পর হইতেই উচ্চৈঃস্বরে "রাম" "রাম" শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া বাগানের ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল মানসিক আবেগে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, অথচ অন্তরে দারুণ অশান্তির অগ্নি জ্বলিতেছিল। সমস্ত রাত্রি ঐভাবেই কাটিল, এবং রাত্রি যতই গভীরতর হইতে লাগিল, কণ্ঠধ্বনিও ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। রজনীর শেষভাগে ঐ রাম রামধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একজনকে বলিলেন, "যা, নরেন্দ্রকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।" কিন্তু নরেন্দ্রকে নিরস্ত করা সহজ হইল না। তখন জন কয়েক মিলিয়া প্রায় জোর করিয়াই তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তুই ওরকম করছিস কেন? ওতে কি হবে?" একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "দ্যাখ, তুই এখন যেমন করছিস, এমনি বারটা বছর (আমার) মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি করবি, বাবা?" (বাঙলা জীবনী)।[৯]

৯। মতান্তরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বলেন, "এ মন্ত্রটি আমি আমার গুরুর কাছে পেয়েছিলাম।" কথাটি শুনিবামাত্র নরেন্দ্রের মনে এক তীব্র আধ্যাত্ম প্রেরণা জাগ্রত হইল এবং তিনি সন্ধ্যা হইতে উন্মাদপ্রায় "রাম রাম" বলিতে বলিতে বাটীর চারি পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিলেন। ঠাকুর ঐ খবর পাইয়া বলিয়াছিলেন, "থাক খানিকক্ষণ ওভাবে; ও আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে।" কিছু পরে নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। (ইংরেজী জীবনী, ১৩০ পৃঃ)।

এই কালে নরেন্দ্রনাথের ধ্যানপরায়ণতা কতটা পরিপক্ক হইয়াছিল, তাহা একটি ঘটনা হইতে উপলব্ধ হয়। একদিন গিরিশ ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ এক বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিলেন, কিন্তু মশকের উৎপাতে গিরিশবাবুর চিত্ত স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং অনেক চেষ্টার পরও ঐ বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। তখন নরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না—দেখিলেন, নরেন্দ্র সুমেরুবৎ নিশ্চল, যদিও তাঁহার দেহে এত মশা বসিয়াছে যে মনে হয়, তাঁহার সর্বাঙ্গ কৃষ্ণ কম্বলে আবৃত! ইহা দেখিয়া গিরিশবাবু তাহাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন ; কিন্তু সাড়া পাইলেন না, অবশেষে উদ্বিগ্ন হইয়া যখন তিনি নরেন্দ্রের আসন ধরিয়া টানিলেন, তখন নরেন্দ্রের সংজ্ঞাহীন দেহ ভূতলে পড়িয়া গেল, এবং ইহারও অনেকক্ষণ পরে তিনি চৈতন্যলাভ করিলেন।

এখানে কাশীপুরের একটি অপ্রিয় ঘটনার উত্থাপন করিতেছি—ঘটনাটির গুরুত্ব বিবেচনায় নহে, প্রত্যুত তদবলম্বনে নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের যে অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই বলিবার জন্য। গৃহী ভক্তবৃন্দ প্রয়োজনানুরূপ অর্থ দিতেন এবং যুবকগণ উহা ব্যয় করিতেন। ব্যয়ের হিসাব রাখা উচিত ভাবিয়া রামবাবু, কালীপদবাবু ও সুরেন্দ্রবাবু হুটকো গোপালকে ঐ কার্যের ভার দিলেন। গোপালের বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না, তাই সুরেন্দ্র বলিলেন, গোপালের বাড়ীর ব্যবস্থা তিনিই করিবেন, গোপাল যেন কাশীপুরে ষোল আনা মন দিয়া ঠাকুরের সেবা করেন। রামবাবুরা মাঝে মাঝে হিসাব দেখিতেন। একবার খরচ অত্যধিক হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহারা হুলস্থুল লাগাইয়া দিলেন। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, নরেন্দ্র বাধ্য হইয়া উহা শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে নিবেদন করিলেন। তখন ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিলেন, "তুই আমাকে কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকব।"

"নরেন্দ্রে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়॥
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি মোরে তেমতি থাকিব॥
নরেন্দ্র বলেন, স্কন্ধে তোমায় লইয়া।
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া॥

এত শুনি গুণমণি কন বার বার।
গৃহীদের টাকাকড়ি লইও না আর॥" (পুঁথি)

রামবাবুদের টাকা লওয়া হইবে না; তবে খরচ চলিবে কি করিয়া? ঠাকুর বিভিন্ন ব্যক্তির কথা ভাবিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী মহাশয়ও সংবাদ পাইয়া টাকা আনিয়া রাখিয়া গেলেন; কিন্তু ঠাকুর তাহা লইলেন না। অতঃপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া গিরিশবাবুকে ডাকাইলেন। গিরিশচন্দ্র সব শুনিয়া যথেষ্ট সামর্থ্য না থাকিলেও বীর ভক্তেরই ন্যায় বলিলেন যে, তিনি ভিটামাটি বিক্রয় করিয়াও কাশীপুরের ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রস্তুত। অমনি যুবক-ভক্তগণ অপর অত্যন্ত-হিসাবী গৃহীদের শ্রীরামকৃষ্ণগৃহে প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন। অতএব সুরেন্দ্র, রাম ইত্যাদি সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে বঞ্চিত হইলেন। অবশেষে ঠাকুর তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

আমরা এ পর্যন্ত বার বার বলিয়া আসিয়াছি যে, কাশীপুরে ঠাকুর তখন অপরের হস্তে কার্যভার অর্পণপূর্বক লীলা-সংবরণে উদ্যত হইতেছিলেন। ইহা সত্য হইলেও এখানে স্বতই মনে হইবে, আমরা যে অর্থে সঙ্ঘগঠনের উল্লেখ করিয়া থাকি, তিনি সেই অর্থে কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া অকাট্য প্রমাণ আছে কি? বরং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এক সময়ে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর মতলব করিয়া কিছু করিয়াছিলেন, এইরূপ তাঁহার কখনও মনে হয় নাই। শ্রীমায়ের এই উক্তি সর্বতোভাবে শিরোধার্য; কেন না লোকাতীত পুরুষ কখনও মানবীয় মতিগতি লইয়া অহঙ্কারপূর্বক কার্যে ব্রতী হন না; শ্রীশ্রীজগদম্বার বিরাট আমিত্বের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আমিত্ব একীভূত হইয়া যাওয়ায় তাঁহার পক্ষে সসীম মানবসুলভ বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তমাত্র অবলম্বনে কোন কিছু করা সম্ভব ছিল না। তবে ইহাও স্বীকার্য যে, জগদম্বারই অচিন্ত্য বিধানে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহমন অবলম্বনে নবীন যুগের বাণী ও কার্যধারা মূর্তিপরিগ্রহ করিতেছিল, এবং তাই লোকদৃষ্টিতে বলা চলে যে, ঠাকুরের উৎসাহ, উদ্দীপনা, ইঙ্গিত ও কার্যাবলীর ফলস্বরূপে তাঁহার ভক্তসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছিল। নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর জগদম্বা তাঁহাকে জগৎকল্যাণ-সাধনার্থ ভাবমুখে থাকিতে বলিয়াছিলেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গে কাল কাটাইবার জন্য জগদম্বার নিকট ভক্তসমাগমের প্রার্থনা জানাইলে, সে প্রার্থনাপূরণের আশ্বাস পাইয়া তিনি কুটির ছাদে উঠিয়া ভক্ত-

দিগকে আকুলহৃদয়ে আহ্বান করিলেন, ভক্তগণ আসিলে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি উপদেশ দিয়া, ভক্তগৃহে উৎসবাদিতে যোগ দিয়া ও বিবিধ-রূপে ভক্তদের জীবন নিয়মিত করিয়া তিনি সকলকে এক অচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে বাঁধিলেন। তিনি অন্তরঙ্গ যুবকভক্তদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমার পাঁচফুলের সাজি", আর শ্রীমায়ের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন, "ওদের বেঁধে এক করতে পারতাম!" এইপ্রকার বিবিধ উক্তি ও প্রচেষ্টাতে আমরা ভক্তসঙ্ঘ-স্থাপনেরই আভাস পাই।

ইহারই মধ্যে আবার ভক্তদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করার ইঙ্গিতও পাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট ঠাকুর বলিতেছেন. "আশ্চর্য সব দর্শন হয়েছে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। এক-ধারে কেদার, চুনী, আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লালসুরকির কাঁড়ির মতো জ্যোতিঃ—তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ। ধ্যানস্থ দেখে বললাম, 'ও নরেন্দ্র!' একটু চোখ চাইলে—বুঝলাম, ওই এক-রূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, 'মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর, তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।' কেদার সাকার-বাদী, উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালাল।" ('কথামৃত', ৪।২৪।৩)। ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, "এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন।" উক্ত লীলায় ভগবতীর প্রভা যাহাতে স্বদেহাবলম্বনে অত্যধিক প্রকাশ না পায় তাহার প্রয়োজন দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এতে আগাছা পালায়। যারা শুদ্ধভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখে চলে যাবে। সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম—'মা ভক্তের রাজা হব।'...এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজ থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন।" 'কথামৃতে' এই জাতীয় কথা আরও বহু আছে; আমরা সেসব ছাড়িয়া নরেন্দ্রের কথাতেই ফিরিয়া যাই। নরেন্দ্রকে তিনি সঙ্ঘনেতারূপেই গড়িতেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রকাশ, তাঁহারই আহ্বানে নরেন্দ্র জগদম্বার কার্য-সাধনার্থ জগতে আসিয়াছিলেন; ঐ উদ্দেশ্য-সাধন-মানসে ঠাকুর তাঁহার সমাধির চাবি স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন; এবং ঐ প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল রূপেই তিনি নরেন্দ্রের জীবনধারা উপযুক্ত খাতে প্রবাহিত করিতেছিলেন। আমাদের

ইহাও স্মরণ আছে, দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাৎকার দিবসেই ঠাকুর নরেন্দ্রের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া স্তব করিতেছিলেন, "নারায়ণ, তুমি আমার জন্য রূপধারণ করে এসেছ!" তিনি আরও কহিয়াছিলেন, "মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব?'…তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি আর বললি, 'আমি এসেছি।' "কাশীপুরেই একদিন তিনি একখানি কাগজে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে।" নরেন্দ্র তাহাতে বলিয়াছিলেন, "আমি ওসব পারব না", তবু ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "তোর হাড় করবে।" শরতের (স্বামী সারদানন্দের) ভার তিনি নরেন্দ্রের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। অখণ্ডের ঘর হইতে আগত নরেন্দ্রের অমিত শক্তি যাহাতে সাধারণ মানবের হিতসাধনে নিয়োজিত হয়, সেই জন্য নরেন্দ্রের বিচারপ্রবণ মনকে ভক্তিরসসিঞ্চনে সুকোমল করিতে তিনি যত্নপর ছিলেন। তাই যে নরেন্দ্র স্বীয় অবস্থা সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। বাবুরামদের বাড়ীতে 'কিছু নাই' বোধ হল—যেন ঈশ্বর-টীশ্বর কিছুই নাই"—সেই নরেন্দ্রই ঠাকুরের শিক্ষাগুণে পরে কালী (স্বামী অভেদানন্দ) সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "কালী 'জ্ঞান জ্ঞান' করে; আমি বকি। জ্ঞান কততে হয়? আগে ভক্তি পাকুক। আবার তারকবাবুকে (ঠাকুর) দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন 'ভাবভক্তি কিছু শেষ নয়'।" ('কথামৃত', ৩। পরিশিষ্ট)।

ঠাকুর যেমন নরেন্দ্রকে শিষ্যমধ্যে সর্বোচ্চ আসন দিতেন, নরেন্দ্রনাথেরও গুরুভক্তি ছিল তেমনি অতুলনীয়। ক্যান্সার রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে তখন কেহই বিশেষ পরিচিত ছিলেন না; এবং অধুনা যদিও ইহা সুবিদিত যে, ক্যান্-সার ছোঁয়াচে রোগ নহে, তথাপি সেকালে উহা অবিসংবাদিত সত্য ছিল না। ইহার ফলে দেখা যাইত যে, ঠাকুরের যখন রোগবৃদ্ধি হইল, তখন অনেকেই এই বিষয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেন এবং তাঁহাদের ভাবভঙ্গিতে একটা আত্ম-রক্ষা করিয়া চলার চেষ্টা লক্ষিত হইত। এই মনোবৃত্তি দমন করিবার জন্য বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি জ্বলন্ত পাবকসদৃশ নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের পথ্যগ্রহণের পর তাঁহার নিষ্ঠীবনমিশ্রিত পথ্যের পাত্রটি হস্তে লইয়া অম্লানবদনে পথ্যাবশিষ্ট পান করিলেন। সেদিন হইতে সকলের সন্দেহ চিরতরে নিস্তব্ধ হইল। এইরূপ কতভাবেই

না স্বীয় শক্তিবলে এবং ঠাকুরের শিক্ষাগুণে নরেন্দ্রনাথ গড়িয়া উঠিতেছিলেন!

ক্রমে কাশীপুরের দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ভক্তদের মনে এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প। তখনও তাঁহার কর্তব্য শেষ হয় নাই। মহাসমাধির আগে হইতেই তিনি প্রতি সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথকে নিজ সকাশে আহ্বানান্তে অন্য শিষ্যদের বাহিরে যাইতে বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টাকাল রুদ্ধদ্বার কক্ষে ভবিষ্যৎ কর্মাদি সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। ক্রমে মহাসমাধির আর তিন-চারি দিন মাত্র বাকী আছে জানিয়া তিনি একদিন নরেন্দ্রকে ডাকিয়া সম্মুখে বসাইলেন এবং একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথ পরে বলিতেন, তখন তাঁহার অনুভব হইয়াছিল যেন, ঠাকুরের দেহ হইতে তড়িৎকম্পনের মতো একটা সূক্ষ্ম তেজোরশ্মি তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পরিশেষে তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। চেতনালাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুরের চক্ষে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। ইহাতে অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।" শুনিয়া নরেন্দ্রনাথও বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন—উদ্বেলিত ভাবাবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

লীলাবসানের দুইদিন পূর্বে নরেন্দ্রকে আবার বলিলেন, "দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।" ঠাকুরের সুস্থাবস্থায় এরূপ ক্ষেত্রে বেশ জোর করিয়াই নরেন্দ্রনাথ অনিচ্ছা জানাইতে পারিতেন, কিন্তু মহাসমাধি যখন প্রত্যাসন্ন তখন কে বৃথা কষ্ট দিতে সাহস পায়? রোগে শীর্ণকায়, ক্ষীণকণ্ঠ ঠাকুরের এই শেষ আদেশের বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি অসম্ভব ছিল। তখন নরেন্দ্রের সারা হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত ও এই প্রশ্নে ব্যাকুলিত, সত্য সত্যই কি প্রভুর লীলাবসান আগতপ্রায়? এতদিনে কি সব শেষ হইতে চলিল?

ঠাকুরের লীলাসংবরণের আর মাত্র দুই দিন বাকী আছে; তখনও নরেন্দ্রের বিচারপ্রবণ অথচ সত্যানুসন্ধিৎসু মন অবতারবাদ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারে

নাই ; অথবা অজ্ঞাত কোন দৈব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তখন তাঁহার অতি পবিত্র মনে এক অদ্ভুত জিজ্ঞাসার উদয় হইল—শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, তিনি তো অনেক সময় নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন ; এখন, এই সময় যদি বলতে পারেন, 'আমি ভগবান্', তবেই বিশ্বাস করি।" কি অপূর্ব লীলা! যেই চিন্তা উদিত হওয়া, অমনি সেই নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও ঠাকুর তাঁহার মুখের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত অতি পরিষ্কার নিরাবরণ আত্মপ্রকাশে নরেন্দ্রনাথ এমন বিস্মিত হইলেন যে, অকস্মাৎ সেখানে বজ্রপাত হইলেও তিনি তেমন চমকিত হইতেন না। তাঁহার সন্দেহ চিরতরে বিদূরিত হইল এবং এরূপ যুগাবতারের পুনঃপুনঃ আত্মপরিচয়প্রদানের পরও এতদিন ধরিয়া সন্দেহ পোষণ করিয়া শেষকালেও তাঁহাকে কষ্ট দিলেন, এই আত্মগ্লানিপূর্ণ চিন্তায় ও অনুতাপে জর্জরিত হইয়া তিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

তারপর আসিল শেষদিন—শ্রাবণ সংক্রান্তি, ঝুলন পূর্ণিমা (৩১শে শ্রাবণ)। ঠাকুর পাঁচ-ছয়টি বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীমা সেখানে আসিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকিলে ঠাকুর সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোমার ভাবনা কি? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। আর এরা (নরেন্দ্রাদি) আমার যেমন করেছে, তোমারও তেমনি করবে।" ক্রমে আসিল মহানিশা। ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত ফিসফিস করিয়া দুই-চারিটি কথা বলিলেন ; অতঃপর তিনবার মা কালীর নাম করিয়া মহাসমাধিতে লীন হইলেন—একটা আনন্দ-শিহরণে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল, মাথার কেশগুলি পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল এবং সমস্ত মুখখানি দিব্য-হাস্যে সমুজ্জ্বল হইল। তখন রাত্রি ১টা ২মিনিট (ইংরেজী মতে ১৬ই আগস্ট ১৮৮৬)।

পরদিন কাশীপুরের শ্মশানে শেষকৃত্য সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থিপূর্ণ পাত্রটি মস্তকে করিয়া আনিয়া উদ্যানবাটিতে তাঁহারই শয়নকক্ষে রাখা হইল এবং নিত্য-পূজাদির ব্যবস্থা হইল। ভক্তদের মুখে সমস্বরে উচ্চারিত হইল "জয় রামকৃষ্ণ", "জয় রামকৃষ্ণ", "জয় রামকৃষ্ণ!"

প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণমঠ

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে প্রবীণ ভক্তদের দৃষ্টিতে উদ্যানবাটী ধরিয়া রাখার আর কোন সার্থকতা ছিল না। ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া ছিল; সুতরাং মাসের বাকী ঐ কয়দিনের মধ্যে শ্রীমা ও সেবকবৃন্দ অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পূত ভস্মাস্থির সহিত তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি কাঁকুড়-গাছির যোগোদ্যানে লইয়া যাওয়া হইবে এবং মাসের শেষে বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—তাঁহাদের বিচারে এইরূপই স্থির হইল। অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত এই পুণ্যভূমি পরিত্যাগের কথা ভাবিতেও যুবক ব্রহ্মচারীদের কষ্ট হইতেছিল; কিন্তু নিঃসম্বল তাঁহারা কিই বা করিতে পারেন? অতএব বাকী যে কয়দিন হাতে ছিল, শুধু সেই সময়ের জন্য অনুরক্ত ভক্তদের কেহ কেহ দিবারাত্র সেখানে থাকিয়া ঠাকুরের স্মৃতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণে যত্নপর হইলেন; তাঁহার পূতাস্থিও শয্যার উপর স্থাপিত হইয়া ভক্তি-অর্ঘ্য পাইতে থাকিল। অবশিষ্ট ব্রহ্মচারীরা দিনে অন্ততঃ একবার সেখানে মিলিত হইতেন এবং অনেক সময় রাত্রিবাসও করিতেন। দুইজন একত্র মিলিত হইলেই ঠাকুরের অপূর্ব লীলা ও বাণী আলোচিত হইত; আর সন্ধ্যাসমাগমে সকলে ধ্যানে বসিতেন। পূজা, পাঠ, ধ্যান ও সদালোচনায় দিন যেন কোন দিক দিয়া কাটিয়া যাইত। শ্রীগুরুর অদর্শনে তাঁহাদের মনে যে বেদনা অহর্নিশ জাগরূক ছিল, তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় ঠাকুরেরই প্রদর্শিত সাধন-ধারায় গা ভাসাইয়া দিতেন। গৃহী শিষ্যদেরও কেহ কেহ মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতেন—সেখানকার প্রতি ধূলিকণা যে তাঁহাদের নিকট পবিত্র, প্রতিটি দ্রব্য কত শুভ মুহূর্তের স্মৃতি বহন করিত!

ঠাকুরের তিরোধানের এক সপ্তাহের মধ্যেই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। সেদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় ঠাকুরের ভক্ত হরীশের সহিত নরেন্দ্রনাথ উদ্যানবাটীর সম্মুখস্থ (পশ্চিমের) পুকুরধারে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন; এমন সময় দেখিলেন, ফটকের দিক হইতে রাস্তা ধরিয়া ঠাকুরেরই মতো এক শুভ্র বস্ত্রাবৃত উজ্জ্বল মূর্তি তাঁহাদেরই অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। নরেন্দ্রের মনে প্রশ্ন জাগিল, "ঠাকুর নাকি?" দিন কয়েক পূর্বে শ্রীমা যখন হাতের বালা খুলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ঠাকুর সশরীরে আবির্ভূত

হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কারণ ঠাকুর তো জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিয়াছিলেন. "আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?" অতএব মা সধবার চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছিলেন। একবার যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি আবারও তো আসিয়া ভক্তদিগকে শোকমুক্ত করিতে পারেন। অতএব নরেন্দ্রাদির সম্মুখে তাঁহার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব নহে। যুক্তিবাদী নরেন্দ্র তবু চুপ করিয়া রহিলেন, এবং ভাবিলেন, তিনি কাল্পনিক কিছু দেখিতেছেন না তো? এমন সময় হরীশও শ্রীরামকৃষ্ণসদৃশ সেই মূর্তি দেখিয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে ফিসফিস করিয়া বলিলেন, "ও কি? নরেন, দেখ দেখ!" তখন নরেন্দ্র স্পষ্টস্বরে ডাকিলেন, "কে ওখানে?" তাঁহার গলার তীব্র আওয়াজ শুনিয়া অপর সকলে দ্রুতপদে সেখানে আসিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ঐ মূর্তি নরেন্দ্র ও হরীশ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন উহার দশ হাত দূরে এক যুঁই ফুলের ঝোপ পর্যন্ত আসিয়া মিলাইয়া গেল। তখন লণ্ঠন আনিয়া চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, তবু কিছুই পাওয়া গেল না। এই দর্শনটি নরেন্দ্রের অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং উপস্থিত সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ঠাকুর সূক্ষ্মদেহে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। ফলতঃ ইহারও পরে শ্রীমা ও ঠাকুরের কোন কোন ভক্ত তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং অনেকে এখনও হইয়া থাকেন।

কাশীপুরের উদ্যানবাটী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ৬ই ভাদ্র শ্রীযুক্ত বলরাম বসু আসিয়া মাতাঠাকুরানীকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। রামচন্দ্রাদি প্রবীণ ভক্ত-বৃন্দ যুবকদিগকে পরামর্শ দিলেন, ঠাকুরই যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া পাঠাদিতে মনোনিবেশ করাই বিধেয়। অনেকে করিলেনও তাহাই। কিন্তু লাটু, তারক, কালী, বুড়োগোপাল প্রভৃতি হয় গৃহহীন ছিলেন, অথবা গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং তারক কাশীপুর ছাড়িয়া বৃন্দাবনে বলরামবাবুদের 'কালাবাবুর কুঞ্জে' গিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন। অতঃপর শ্রীমা যখন ১৫ই ভাদ্র বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, তখন কালী, লাটু ও যোগীনও তাঁহার সহিত তথায় যাইয়া ঐ একই বাড়ীতে উঠিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভস্মাবশেষ লইয়া একটু মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন উপার্জনক্ষম ভক্তদের মতে বাড়ী-ভাড়ার মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে ভস্মাস্থি

কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ইহাতে কিন্তু যুবকদের সম্মতি ছিল না, কারণ "ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্ত সকলে মিলিত হইয়া প্রথমে পরামর্শ স্থির হইয়াছিল, পূত ভাগীরথীতীরে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া উক্ত (তাম্র) কলস তথায় যথানিয়মে সমাহিত করা হইবে। কিন্তু ঐরূপ করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন দেখিয়া এবং অন্য নানা কারণে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের অনেকে কিছুদিন পরে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।... তাঁহাদিগের ঐরূপ মত পরিবর্তন ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারা পূর্বোক্ত তাম্রকলস হইতে অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বাহির করিয়া লইয়া ভিন্ন এক পাত্রে উহা রক্ষণপূর্বক তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে নিত্যপুজাদির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন" ('উদ্বোধন', ১৭শ বর্ষ, ৪৪০ পৃঃ)। পরে প্রথমোক্ত কলসটি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে ২৩শে আগস্ট (জন্মাষ্টমী দিবসে) যথানিয়মে নীত ও সমাহিত হয়। বলা বাহুল্য, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার উদার শান্তিপ্রবণ দূরদৃষ্টি লইয়া এই বিবাদে জড়িত হন নাই বরং প্রবীণ ভক্তদের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ও নিত্যগোপাল অগ্রণী হইয়া যখন যুবকদের কথা অগ্রাহ্য করিলেন, তখন তিনি সমবয়স্কদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "আমাদের একটু বিবেচনা করে চলা উচিত; পরে যেন লোকে না বলে যে রামকৃষ্ণের চেলারা চিতাভস্ম নিয়ে মারামারি করেছিল। ও ভস্ম তাদেরই নিয়ে যেতে দাও; আমরা যেন ঠাকুর যেমন বলে গেছেন তেমনি ভাবে জীবন গড়তে পারি। আমরা যদি আদর্শ মেনে চলতে পারি, তাহলেই তো ওসব স্মৃতিচিহ্নের পুজোর চেয়ে অনেক বড় কাজ হয়ে যাবে।" কাজেই কলস অর্পণের দিন স্থির হইয়া গেল। কিন্তু নিরঞ্জন অত সহজে ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না; শশীও তাঁহার সহিত সহমত ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে রাত্রি-কালে অতি গোপনে চিতাভস্ম পূর্বোক্তরূপে ভাগাভাগি করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র পরে ইহা জানিয়া সমবয়স্কদের কার্যের অনুমোদনই করিলেন, আবার কাঁকুড়-গাছির দলের সহিতও শোভাযাত্রা করিয়া গেলেন এবং ঐ অবশিষ্টাংশের সমাধি-কালে সকলের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিলেন।

আগস্ট মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশীপুরের উদ্যানবাটী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যে কয়জন যুবক শ্রীমায়ের পূর্বে বা সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তাঁহারা

ছাড়া আর সকলে বাড়ী ফিরিয়া পূর্ববৎ পড়াশুনায় বা অন্য কাজে মন দিলেন। ঠাকুর কয়েকজনকে গেরুয়া বস্ত্র দিয়াছিলেন এবং সকলকে ত্যাগের মহিমা শুনাইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ভার নরেন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ পরিস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের ঠিক পরেই সেই আদেশের রূপায়ণের সম্ভাবনা দেখা গেল না। যুবকদের সঙ্কল্প বয়স্কদের সহানুভূতি পাইল না। প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে যে মতানৈক্য কাশীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুদিন যাবৎ চলিয়াছিল এবং যাহা কাশীপুরের বায়াধিক্য, চিতাভস্ম সমাহিত করা প্রভৃতি ঘটনাবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহার সমাধানের উপায় তখনও যুবকদের আয়ত্তাধীন ছিল না। প্রাচীনদের ঐ সহানুভূতিশূন্যতার উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী কালে (১৮৯৫ খৃঃ) স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে—হাবাতে (গরীব ছোঁডা গুলো) মনে করে। কেবল বলরাম, সুরেন (সুরেন্দ্র মিত্র), মাস্টার ও চুনী বাবু এঁরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এঁদের ঋণ আমরা কখন পরিশোধ করতে পারব না।" আরও পরে আমেরিকায় 'আমার জীবন ও ব্রত' বিষয়ে বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেহ ছিল না।...একবার ভাবিয়া দেখুন, বারোটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প! সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর পরিণতি ঘটিল—রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল।...বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে? যে কল্পনার ফলে অপরকে (অর্থাৎ আত্মীয়বর্গকে) এত কষ্ট পাইতে হয়, সেই কল্পনার প্রতিই বা কে সহানুভূতি জানাইবে? একজন ছাড়া কেহই সহানুভূতি জানাইল না।" ('বাণী ও রচনা', ১০।১৬৪-৬৫)। সেই একজন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী; তাঁহার কথা পরে বলিব।

শুধু অল্পবয়স্ক বলিয়াই যে বয়স্কদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নরেন্দ্রাদির কথা উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা নহে, একটা আদর্শগত বিরোধও ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রবীণদের কাহারও কাহারও মতে সন্ন্যাসগ্রহণ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমোদিত ছিল না; সুতরাং মঠস্থাপনও নিরর্থক। 'কথামৃতে'র একস্থানে (১।১৩।৫) আছে: "আজ মহিমাচরণের সহিত ঠাকুরের কথাবার্তা

শুনিয়া কোন ভক্ত ভাবছেন, 'ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ করতে বললেন না, বরং বলেছেন, সংসার কেল্লাস্বরূপ ; এই কেল্লায় থেকে কাম ক্রোধ ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারা যায়।...অতএব এক রকমে বলা হলো, জীবন্মুক্ত সংসারে থাকতে পারে। আদর্শ—কেশব সেন ?" 'কথামৃতে' আরও আছে (২, পরিশিষ্ট ১) : "ঠাকুর কাহাকেও সন্ন্যাসীর বাহ্যচিহ্ন (গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি) ধারণ করিতে অথবা গৃহীর উপাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন নাই।... কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদের অন্তরে ত্যাগী করিয়া গিয়াছিলেন।" রামচন্দ্রাদি ভক্তগণ ইহাও বলিতেন যে, যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে অতিরিক্ত সাধনা নিষ্প্রয়োজন।

মঠকে কেন্দ্র করিয়া যুগবার্তা প্রচারের প্রয়োজন তখনও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় নাই—নারায়ণজ্ঞানে বিবিধ পন্থাবলম্বনে জীবসেবার কথা তো তখন কল্পনাতীত। কিন্তু শুদ্ধ চিন্তা হিসাবে ঐসব বিষয়ে অস্পষ্ট বিচার তখনও চলিত এবং দেখা যাইত যে ইহাতে মতানৈক্য আছে। 'কথামৃত' (২, পরিশিষ্ট ১) হইতেই উদ্ধৃতি দিই : "ধর্মপ্রচারের কথা পড়িল। মাস্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)—'বিদ্যাসাগর বলেন—...আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব ?'

"নরেন্দ্র—'যে এটা বুঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝবে কেমন করে ?'

"মাস্টার—আর পাঁচটা কি ?'

"নরেন্দ্র—'যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে ? স্কুল বুঝলে কেমন করে ? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে বিয়ে করে, ছেলে-মেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে ? যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।'

"মাস্টার (স্বগত)—'ঠাকুর বলতেন বটে, যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে। আর সংসার করা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যে, এসব রজোগুণে হয়। বিদ্যাসাগরের দয়া আছে বলে বলেছিলেন—এ রজো-গুণের সত্ত্ব, এ রজোগুণে দোষ নাই।'"

মাস্টার মহাশয় নরেন্দ্রাদির যথাসাধ্য সাহায্যার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকিলেও এবং অন্যান্য ভক্তদের ন্যায় তিনিও ঈশ্বরলাভের পর ধর্মপ্রচার ও নিষ্কাম

কর্মসম্পাদনের সম্ভাবনা স্বীকার করিলেও স্পষ্টতঃ বলিতেন, ঈশ্বরলাভের সাধন-রূপে সেবাব্রত উদ্যাপনের কথা ঠাকুর বলেন নাই। 'কথামৃতে'র পঞ্চম ভাগে তিনি লিখিয়াছেন, "গুরুদেবের মহামন্ত্র—আগে ঈশ্বরলাভ, তাহার পর অন্য কথা।...রাজনীতি প্রথম হইতে বলিলে চলিবে না। আগে অনন্যমন হইয়া ভগবানের ধ্যানচিন্তা কর, হৃদয়মধ্যে তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন কর। তাঁহাকে লাভ করিয়া তখন স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিবে।" (পরিশিষ্ট ২০-২১ পৃষ্ঠা)। অপর দিকে স্বামীজীর শিক্ষা ছিল নারায়ণবুদ্ধিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র রূপে জীবসেবা করিয়া শুদ্ধচিত্ত হওয়া এবং শুদ্ধচিত্তে ভগবদ্দর্শন করা।

আরও দেখা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমনের দ্বারা জগতে সুমহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে, এই বিশ্বাস ভক্তমাত্রেরই হৃদয়ে পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকিলেও, তাঁহার বাণীতে এমন একটা অভিনবত্ব আছে যাহার ফলে নবযুগের সূত্রপাত হইবে এবং সে নবযুগের সহিত প্রাচীনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিলেও ইহা প্রাচীনের পুনরাবৃত্তি বা অনুকৃতিমাত্র না হইয়া অভিনব সংস্কৃতির প্রেরণা আনিয়া দিবে ও বিশ্বমানবকে সমসূত্রে গাঁথিবে—এইরূপ বুঝিবার মতো সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল অতি অল্প কয়জনের। জনকয়েক ভাগ্যবান মাত্র ইহার আভাস পাইয়াছিলেন, এবং তদপেক্ষাও অল্পতর কয়েকজন ইহার বাস্তব রূপায়ণে জীবনপাত করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত দলের অগ্রণী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহারই স্বীকৃতি হইতে পাওয়া যায়, শ্রীমাও এই সত্যের সন্ধান জানিতেন, তাই তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া তিনি স্বীয় যুবক সন্তানদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ঠাকুর, তুমি এলে, এই কয়জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নাই। তোমার নাম করে, সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারবো না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাতকাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে আর তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে, আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্যই তো তোমার

আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।" ('শ্রীমা সারদাদেবী', ৪২৬-২৭ পৃঃ)। অবশ্য এই প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছিল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবটি সর্বকালিক বলিয়া আমরা এখানেই উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির ঠিক পরবর্তী দিনগুলি লোকদৃষ্টিতে বিষাদব্যাকুল, বিফলতাময় ও নৈরাশ্যপূর্ণ হইলেও ঠাকুর স্বয়ং অলক্ষ্যে নিজ উদ্দেশ্যসাধনের উপায় স্থির করিতেছিলেন। তাঁহার ভক্ত ও 'রসদ-দার' সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (যাঁহাকে অনেকে সুরেশ বলিয়া ডাকিতেন) একদিন আফিস হইতে ফিরিয়া পুজাগৃহে ঠাকুরের ধ্যানে মগ্ন আছেন, এমন সময় এক দিব্যদর্শন পাইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" শুনিয়াই সুরেন্দ্র উন্মত্তবৎ সমপল্লীবাসী নরেন্দ্রনাথের গৃহে দ্রুত উপনীত হইলেন এবং সমগ্র বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়া অশ্রুসিক্ত-কণ্ঠে সকাতরে বলিলেন, "ভাই, একটা আস্তানা করো, যেখানে ঠাকুরের ছবি ভস্মাদি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে রীতিমত পুজার্চনা চলতে পারে, যেখানে তোমরা কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা সেখানে গিয়ে জুড়ুতে পারব। আমি কাশীপুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।" নরেন্দ্র এই দানের কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং বাড়ীর সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনে গুরুভ্রাতা তারকনাথকেও পত্র লিখিলেন, তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন; বাড়ী পাইলেই তার করা হইবে এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আসিয়া নূতন মঠের কার্যভার লইতে হইবে। তারকনাথও তদনুসারে কাশীধাম পর্যন্ত আসিয়া দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলেন।

এদিকে নরেন্দ্রনাথের ও তাঁহার বরাহনগর-নিবাসী বন্ধু ভবনাথের অদম্য চেষ্টায় বরাহনগরের গঙ্গাতীরের নিকটে ভুবন দত্তের একটি জীর্ণ উদ্যানবাটী মাসিক এগার টাকা ভাড়ায় পাওয়া গেল। "ভুবন দত্তের বাড়ীটি ছিল আসলে টাকীর জমিদার মুন্সীবাবুদের। ঐ বাড়ীটি ছিল জীর্ণ ও পরিত্যক্ত। এই জন্য উহাকে সকলে 'পোড়ো বাড়ী' বলিত। ঐ জীর্ণ পোড়ো বাড়ীতে ছয়খানি মাত্র ঘর ছিল, ('আমার জীবনকথা' ১৩৫ পৃঃ)। ইহা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের

আশ্বিন মাসের (সম্ভবতঃ) প্রথমভাগের কথা।[১] বাড়ীভাড়া ও ট্যাক্সের জন্য ধার্য এগার টাকা ছাড়াও পাচক ব্রাহ্মণের বেতন মাসিক ছয় টাকা এবং মঠ-বাসীদের অন্যান্য খরচের টাকাও সুরেন্দ্রনাথ দিতেন। এইরূপে তাঁহার মাসিক দানের পরিমাণ লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হইয়া একশত টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। তাঁহার এই সহৃদয়তার কথা স্মরণ করিয়া 'কথামৃত'-কার লিখিয়াছেন, "ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারই হাতের গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ মূর্তিমান করিলেন।·· ভাই, তোমার গুণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ী-ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে, আসিয়া ভাইদের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।" (ঐ ২, পরিশিষ্ট ১)। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "সুরেশবাবুর নাম শুনেছিস তো? তিনিই এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরাহনগর মঠের সব খরচপত্র বহন করতেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবত।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৩৮)।

বাড়ী ভাড়া হইয়া গেলে সুরেন্দ্রবাবুর নির্দেশানুসারে ছোট গোপাল ঠাকুরের জিনিসপত্র সহ ঐ বাড়ীতে বাস করিতে গেলেন, আর তাঁহার সঙ্গে রহিলেন শশী নামক এক পাচক ব্রাহ্মণ। রাত্রে শরৎও আসিয়া থাকিলেন। এদিকে নরেন্দ্রের তার পাইয়া তারকনাথ সত্বর ফিরিয়া আসিয়া বলরাম-ভবনে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তিনি স্টেশন হইতে যে ঘোড়াগাড়ীতে আসিয়া-

১। সেপ্টেম্বরের শেষে বা অক্টোবরের গোড়াতে বাড়ী লওয়া হয়; কারণ 'কথামৃত'-কার ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিয়াছেন, "বরাহনগর-মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে।" (কথামৃত' ৪, পরিশিষ্ট ৩)। অতএব যদিও 'কথামৃত'-কারেরই মতে ছোটগোপাল কাশীপুর হইতে ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসগুলি লইয়া আসেন (২, পরিশিষ্ট ১), তথাপি আমাদের মনে হয়, বলরাম-ভবন হইতেই ঐসব আনা হয়; কারণ কাশীপুরের উদ্যানবাটী আগষ্টের শেষে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। "১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে বরাহনগর মঠের গোড়াপত্তন হয়।" ('আমার জীবনকথা'—স্বামী অভেদানন্দ, ১৩৫ পৃঃ)। তবে বাড়ীর মালিককে বলিয়া আপসে দুই-চারিটি জিনিস কাশীপুরে কিছুদিন রাখাও অসম্ভব ছিল না।

ছিলেন, সেই গাড়ীতেই তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্র ও রাখালের[২] সহিত বরাহনগর মঠে উপস্থিত হইলেন। তারক পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনিই হইলেন উক্ত মঠের প্রথম স্থায়ী ত্যাগী অধিবাসী। বুড়ো গোপাল ইহারই কোন এক সময়ে মঠে আসিলেন। কালীও একমাস পরে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মঠবাসী হইলেন। নরেন্দ্র, শশী, রাখাল, শরৎ, বাবুরাম এবং নিরঞ্জন প্রভৃতিরও মঠে যাতায়াত চলিতে লাগিল। লাটু ও যোগীন্দ্র তখনও বৃন্দাবনে। এইরূপে আশ্রয়হীন ও সহায়সম্বলশূন্য কালী, লাটু, তারক ও বুড়ো গোপালের বাসোপযোগী স্থানের ব্যবস্থা করা মঠস্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও ক্রমে উহার অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।[৩] এইভাবে সকলকে সমবেত করার পশ্চাতে নরেন্দ্রনাথের ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় অনেকখানি ছিল ; বস্তুতঃ এইজন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। বাড়ীর বৈষয়িক ব্যাপারে বিব্রত থাকিলেও তিনি প্রায়ই মঠে আসিতেন ও কর্মপরিদর্শন করিতেন ; ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইল যে, কার্যব্যপদেশে তিনি কলিকাতায় গেলেও রাত্রিবাস প্রায়শঃ মঠেই হইত এবং দিবসেরও বহুলাংশ সেখানেই যাপিত হইত। যুবক ভক্তদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তিনি তাঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত ত্যাগমূলক সাধনাদি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিতেন এবং সকলের মধ্যে যে বৈরাগ্যবীজ পূর্ব হইতেই প্রোথিত ছিল, তাহাকে দ্রুত অঙ্কুরিত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন।

এখানে বরাহনগরের মঠ-বাড়ীটির একটু বর্ণনা[৪] দেওয়া আবশ্যক : "মঠ বরাহনগরে পরামাণিক ঘাট রোডে টাকীর মুন্সীদের ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাৎ (পশ্চিম) ভাগের ভগ্ন জীর্ণ বাড়ীর উপরতলার ভিতরের অংশে ছিল। রাস্তার উপর একটা দরজা দিয়ে ঢুকে একটু খোলা জমি পার হলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে কাঠের রেলিং ও থামওয়ালা বারান্দার দক্ষিণ দিকের সামনের বড় ঘরটায় আমি

২। এখানে 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থের মত গৃহীত হইল। অদ্বৈতাশ্রমের ইংরেজী-জীবনীর মতে রাখাল তখন মুঙ্গেরে। মঠে তিনি যোগদান করেন অনেক পরে।

৩। "গোপাল দাদা, লাটু প্রভৃতির নিজেদের ঠিক গৃহ না থাকায় প্রথমে বরাহনগর মঠের নূতন ভাড়াবাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল। তারকদাও সেই মঠে থাকিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী প্রভৃতি তখন নিজের বাড়ীতে থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের সহিত বরাহনগর মঠে বাস করিত।" ('আমার জীবনকথা', ১৩৬ পৃঃ)।

৪। প্রথম বর্ণনাটি স্বামী বিরজানন্দের 'অতীতের স্মৃতি' (৩৫-৩৭ পৃঃ) হইতে গৃহীত।

(অর্থাৎ স্বামী বিরজানন্দ) আসার আগে (১৮৯১) ভাড়া ছিল ; পরে এমনি খোলা পড়ে থাকত। ভিতরের মঠের অংশ বাহির রাস্তা হতে দেখা যেত না। খুব নির্জন ছিল। এখন সমস্ত বাড়ীটি ভূমিসাৎ হয়েছে—বাহিরের অংশটি ছাড়া। ভিতরের মঠের অংশটার কোন ফটো পাওয়া যায় না। পেছনের দিকে শাকসবজির বাগান, সজনে গাছ, একটি বেলগাছ ও কয়েকটি নারিকেল ও আমের গাছ। একটি পুষ্করিণীও ছিল। বাগানে শাকসবজি বড় বিশেষ কিছু হত না—ডেঙ্গো ডাঁটা, দুচারটা কুমড়ো, শশা, কলা ইত্যাদি। এক উড়ে মালী ছিল, তাকে কেলো বলে ডাকত। তরকারি কিছু না থাকলে শশী মহারাজ মাঝে মাঝে বাগানে ঢুকে ডেঙ্গো, কুমড়ো শাক, সজনে ডাঁটা বা পাতা ফুল যা পেতেন নিমেষের মধ্যে ছিঁড়ে বা বঁটি দিয়ে কেটে আনতেন। আর কেলো মালী উড়ে ভাষায়, 'আরে আরে কি কর, কি কর, ওসব খা দিল, নিও না, নিও না' বলে পিছু পিছু তাড়া করত। কখন গাল পাড়ত, চেঁচাত ; কিন্তু শশী মহারাজ কিছুই ভ্রূক্ষেপ করতেন না, গোঁ-ভরে আপনার মনে চলে আসতেন। এই নিয়ে সকলে মিলে খুব হাসি ফুতি হত। যাহোক, মঠের সকলের সঙ্গে কেলো মালীর বেশ প্রীতির ভাব ছিল ; যখন সুবিধা হত তাকে প্রসাদ-মিষ্টান্নাদি দেওয়া হত।

"নীচের তলাটার ভিতর বাড়ীর দিকে বহু কালের আবর্জনায় ও জঙ্গলে এমন ভরে গেছল যে, তা শেয়ালের ও সাপের বাসা হয়েছিল। কেউ ভয়ে সেদিকে যেত না। প্রবাদ আছে, বহুকাল পুর্বে টাকীর দুর্দান্ত জমিদারদের আমলে সেখানে কত নরহত্যা হয়েছে। সেজন্য ওকে ভূতের বাড়ী বলত ও কেউ ভাড়া নিত না। মঠের এঁরা তাই দশ টাকায় ভাড়া পেয়েছিলেন। উপরতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাম দিকে 'কালী তপস্বীর ঘর', পরে ছোট ধাপ দিয়ে উঠে ও নেমে ভিতরের দিকে পুজার যোগাড়ের ঘর (যার মধ্যে মেঝেতে একটি ১ হাত × ১ হাত পরিমিত চৌকো মাটির হোমকুণ্ড ছিল), তার ভিতর দিয়ে ঠাকুর ঘরে যেতে হত। সোজা গিয়ে দালান ঘর দিয়ে সামনে রান্নাঘর, বাম হাতে লম্বা হলঘর (যাকে 'দানাদের ঘর' বলা হত), তারপরে পাশে খাবার ও মুখ হাত পা ধোবার ঘর, তারপর একটু অন্ধকার গলি পার হয়ে পায়খানা, নীচে সিঁড়ি নেমে বাগানের ভিতর দিয়ে পুকুরে যাবার পথ। হলঘরে দেওয়ালে নানা দেবদেবীর, অবতারদের, ও ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি টাঙানো ছিল। ঠাকুর-ঘরে ধুনো দিয়ে সেগুলির সম্মুখে শশী মহারাজ সন্ধ্যার সময় একহাতে ধুনচিতে

ধুনো জ্বেলে ও অপর হাতে একটি আলো নিয়ে 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব' বলে ধুনো দেখিয়ে ফিরতেন।...হলঘরের একধারে একটি কাঠের তক্তাপোশের উপর খানিকটায় সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও কিছু ইংরেজী বই উপর উপর সারি করে রাখা ছিল। বাকীটায় বাঁয়াতবলা, মৃদঙ্গ, খোল, করতাল থাকত। কাছের দেওয়ালে পেরেকে টাঙ্গানো তানপুরা। হলঘরই সাধুদের শয়নঘর ছিল, দর্শক ও ভক্তেরা এলে বসে কথাবার্তা হত, পরন্তু উহা সব কাজেই ব্যবহার হত। বিছানার মধ্যে মাদুর ও একটি করে ছোট বালিশ, এক এক জনের সারি সারি পাতা থাকত। আগন্তুকদের জন্য বা অন্যত্র বিছাবার জন্য দুচারখানি মাদুর ছিল, বা তাঁরা মেঝেতেই বসতেন।

"ঠাকুরঘরে মাঝখানে ঠাকুরের বিছানা—ভূমির উপর মাদুর, গদি, বালিশ, চাদর দিয়ে করা ছিল ও ঠাকুরের ফটো ছিল। বিছানার পাদদেশে ঠাকুরের অস্থির তাম্রকৌটা ও পাদুকা চৌকিতে রাখা ছিল। কোষাকুষি ও তাম্রকুণ্ডের সামনে বসে শশী মহারাজ নিত্য পূজাদি করতেন। শশী মহারাজের সন্ধ্যায় আরতি করা একটা অপূর্ব ব্যাপার ও দেখবার জিনিস ছিল। যখন তিনি ধূপ ধুনা, খোল করতাল বাদ্যের মধ্যে আরতির শেষ ভাগে চামর ব্যজন করতে করতে ভাবে উন্মত্ত হয়ে 'জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব' বলে ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে তালে তালে উদ্দাম নৃত্য করে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত নেচে নেচে ঘুরে ফিরতেন তখন সকলের মধ্যে কি এক অপুর্ব ভক্তিভাবের আবেশ হত তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত বাড়ীটি মনে হত যেন কাঁপছে।...দর্শকরা পাশে ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘর হতে তাঁর সঙ্গে সমস্বরে 'জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব' উচ্চারণ করতে করতে আবেগে নৃত্য করতেন। পরে সকলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে 'গুরুগীতা' হতে 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।' ইত্যাদি কয়েকটি শ্লোক ও শেষে পুজনীয় স্বামী অভেদানন্দজী বিরচিত একটি স্তবের শেষ অংশ 'নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃত বিগ্রহং বৈ। ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ'—আবৃত্তি করতেন ও 'জয় শ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়' বলে শেষ করতেন। প্রথম প্রথম ৺কাশীর বিশ্বনাথের আরতির 'ভজ শিব ওঙ্কার' ইত্যাদি স্তবটি সকলে সুর করে খোলকরতাল সহকারে গাইতেন, চামর ব্যজনের সময় থেকে 'জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব' বলে মাতামাতি হত।"

'কথামৃতে'ও আমরা অনুরূপ আর একটি বর্ণনা পাই ; কিন্তু পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে আমরা উহা হইতে শুধু নূতন অংশগুলি উদ্ধৃত করিব। "মঠের ভাইরা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন। যাঁরা নির্জনে ধ্যানধারণা ও পাঠাদি করিতেন, সর্বদক্ষিণের ঘরটিতে তাঁহারাই থাকিতেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া কালী ঐ ঘরে অধিকাংশ সময় থাকিতেন বলিয়া মঠের ভাইরা বলিতেন 'কালী তপস্বীর ঘর'। কালী তপস্বীর ঘরের উত্তরেই ঠাকুরঘর, তাহার উত্তরে ঠাকুরদের নৈবেদ্যের ঘর। ঐ ঘরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন। নৈবেদ্যের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর।···দানাদের ঘরের উত্তরে একটি ছোট ঘর—ভাইরা পানের ঘর বলিতেন। এখানে ভক্তেরা আহার করিতেন। দানাদের ঘরের পুর্বকোণে দালান। উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া-দাওয়া হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রান্নাঘর। ঠাকুর-ঘরের ও কালী তপস্বীর ঘরের পুর্বে বারান্দা। বারান্দার দক্ষিণে পশ্চিমকোণে বরাহনগরের একটি সমিতির লাইব্রেরী ঘর। এ সমস্ত ঘর দোতালার উপর। কালী তপস্বীর ঘর ও সমিতির লাইব্রেরী ঘরের মাঝখানে একতলা হইতে দোতলা উঠিবার সিঁড়ি। ভক্তদের আহারের ঘরের উত্তরদিকে দোতলার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা ঐ সিঁড়ি দিয়া সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেন। সেখানে উপবেশন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা বিষয়ে কথা কহিতেন। কখনও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, কখনও বা শঙ্করাচার্যের, রামানুজের বা যীশুখৃষ্টের কথা; কখনও বা হিন্দুদর্শনের কথা ; কখনও বা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের কথা, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের কথা।" (২, পরিশিষ্ট)।

দানাদের ঘরই ছিল তাঁহাদের সাধন-ভজন ও আলাপ-আলোচনাদির প্রধান কেন্দ্র। এখানে নরেন্দ্রনাথের দেবদুর্লভ কণ্ঠে সঙ্গীত শুনিয়া অপরেরা মুগ্ধ হইতেন, ভাবে বিভোর হইতেন। হরিনাম-কীর্তনাদিও এখানে হইত। আবার সঙ্গীত-শিক্ষা, শাস্ত্রপাঠ, ভক্তদের সহিত সদালাপ ইত্যাদিতেও ঐ গৃহখানি মুখর থাকিত। আর এই সর্বকার্যের মধ্যমণি ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। সুন্দর সুগঠিত তাঁহার সমুন্নত ও সবল শরীর, উজ্জ্বল তাঁহার দেহকান্তি, প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার চিহ্ন, প্রশান্ত বদনে বীরত্ব ও দৃঢ়সঙ্কল্প অঙ্কিত, আয়ত নয়নদ্বয়ে অপূর্ব মোহিনী শক্তি, চলন-বলনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস পরিস্ফুট, অথচ বেশভূষায় বৈরাগ্যের সুস্পষ্ট ছাপ, এবং আচার-ব্যবহারে অকপটতা,

সৌহার্দ্য ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা চিরপ্রকটিত; চিন্তায় তাঁহার অদ্ভুত সাহস, গাম্ভীর্য ও ভূয়োদর্শনের সমাবেশ, কার্যে মহাবীরসদৃশ ক্লান্তিহীনতা ও গুরুভক্তি। সমস্ত মিলিয়া এই নবীন যুবককে স্বতই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নেতা বলিয়া মনে হইত এবং কেহ না বলিয়া দিলেও তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হইত না। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে, নরেন্দ্রের প্রতি অগাধ ভালবাসার ফলে এবং নরেন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যুবক ভক্তগণ তাঁহাকে নির্বিচারে ও অবিসংবাদিতরূপে অগ্রাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "আমাদের সকলেরই মনে ছিল, মহাসমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ছেলেদের একত্রে রাখিয়া দেখাশোনা করিস।' আমরা ঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করাইয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিতভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজাপাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা, সুখ-সান্ত্বনার স্থল।" ('আমার জীবনকথা', ১৬৭ পৃঃ)।

বরাহনগর মঠের তখনও সবে প্রাথমিক অবস্থা চলিতেছে এবং ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে সম্ভবতঃ তারক, বুড়ো গোপাল, কালী ও শশী সেখানে স্থায়িভাবে আছেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত বাবুরামের বাড়ী আঁটপুর হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, বড়দিনে সেখানে যাইতে হইবে। প্রথমে কথা ছিল—নরেন্দ্র, বাবুরাম[৫] প্রভৃতি দু-চারিজন যাইবেন; কিন্তু ক্রমে জানাজানি হইয়া বেশ একটি বড় দল জমিয়া গেল—নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা ট্রেনে চড়িয়া সেখানে চলিলেন এবং সঙ্গে বাঁয়া-তবলা ও তানপুরা লইতে ভুলিলেন না। হাওড়া স্টেশন[৬] হইতে তারকেশ্বরগামী গাড়ীতে উঠিয়াই নরেন্দ্রনাথ গান ধরিলেন, "শিব শঙ্কর ব্যোম ব্যোম ভোলা" ইত্যাদি। এইভাবে সমস্ত পথটি গীতবাদ্য ও আমোদ-আহ্লাদে নিনাদিত করিয়া তাঁহারা হরিপাল স্টেশনে নামিলেন এবং সেখান হইতে আট মাইল পথ ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া সন্ধ্যার পূর্বে আঁটপুরে পৌছিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া বাবুরামের মাতা

৫। বাবুরাম তখন কলিকাতায় ছিলেন। ('আঁটপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গ'—শ্রীহরেরাম ঘোষ প্রকাশিত)।

৬। তখন হাওড়া ময়দান হইতে ছোট লাইন নির্মিত হয় নাই। (ঐ)।

শ্রীযুক্তা মাতঙ্গিনী দেবী আনন্দে আত্মহারা হইলেন ও সকলকে পুত্রবৎ গ্রহণপূর্বক আহার ও শয়নাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জমিদার-গৃহে লোকজনের অভাব না থাকিলেও ইঁহাদের আদর-যত্নের ভার তিনি স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন। পল্লীর শ্যামল নির্জনতার মধ্যে এই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবারে স্বচ্ছন্দে আহার-বিহারের সুযোগ পাইয়া ত্যাগী যুবকবৃন্দ ভগবদারাধনা ও ভগবচ্চিন্তায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা, উপদেশ, আদর্শ, জীবন ও তাঁহার অর্পিত দায় ইত্যাদিই তাঁহাদের অবিরাম আলোচনার বিষয় হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রব্যাখ্যা, স্তব-স্তুতি, ভজন-সঙ্গীত-কীর্তন ও জপধ্যান তো চলিতেই থাকিল। এইরূপ একটা জমাট ভাবের আকর্ষণে তাঁহারা যেন নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া নরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তায় পরিণত হইলেন। ইহারই মধ্যে ২৪শে ডিসেম্বর (১০ই পৌষ, শুক্রবার) এক অচিন্তনীয় ঘটনার ফলে আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার অনেক পরে বাহিরে ধুনি জ্বালিয়া নক্ষত্রখচিত উজ্জ্বল মুক্তাকাশের নিম্নে ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানবৃন্দ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানান্তে তাঁহারা ঈশ্বরালোচনায় রত আছেন এমন সময় নরেন্দ্রনাথ ক্রমে যীশুখৃষ্টের ত্যাগ-তপস্যাপূত অপূর্ব জীবন-কথা প্রাণস্পর্শী ভাষায় আদ্যোপান্ত অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর সেণ্ট্-পল্ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন ত্যাগী শিষ্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মবিসর্জনের ফলে কিরূপে খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টসম্প্রদায় প্রচারিত ও প্রসারিত হইল তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে এক ত্যাগৈশ্বর্যমণ্ডিত প্রেরণাময় নবীন রাজ্যে লইয়া গেলেন এবং সকলের নিকট সাগ্রহ আবেদন জানাইলেন, তাঁহারাও যেন যীশুখৃষ্ট ও তদীয় শিষ্যবৃন্দের ন্যায় পবিত্র জীবন গঠনপূর্বক উহা জগৎ-কল্যাণে উৎসর্গিত করিতে পারেন। সে প্রাণপ্রদ বাগ্মিতার প্রভাবে গুরুভ্রাতারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও পরস্পরের সম্মুখে ধুনির লেলিহান অগ্নিশিখাকে সাক্ষী রাখিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্বীয় অটুট সঙ্কল্প জানাইলেন—তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিবেন। সম্মুখস্থ অগ্নিশিখা তাঁহাদের ভাবোজ্জ্বল বদনোপরি প্রতিফলিত হইয়া সে আবেগময় প্রতিজ্ঞাকে ভাস্বরতর করিল, সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন অপূর্ব ভগবৎ-প্রেরণায় শিহরিয়া উঠিল, আর নীলাকাশ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া সে অনুপম দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। পুনর্বার সাধারণ ভূমিতে তাঁহাদের মন নামিয়া আসিলে তাঁহারা ভাবিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, সে সন্ধ্যাটি ছিল যীশু

খৃষ্টের 'আবির্ভাবের প্রাক্ক্ষণ'। পরবর্তী কালে সঙ্ঘগঠনে আঁটপুরের অবদানের কথা স্মরণপূর্বক পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ (তারকনাথ) বলিয়াছিলেন, "আঁটপুরেই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প দৃঢ় হল। ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করে দিয়েছিলেনই—ঐ ভাব আরও পাকা হল আঁটপুরে।" এইভাবে আঁটপুরে এক সপ্তাহ কাটাইয়া তাঁহারা মঠে বা কলিকাতায় স্ব স্ব স্থানে ফিরিলেন।

নরেন্দ্রনাথের এখন প্রথম কর্তব্য হইল, আঁটপুরে গৃহীত প্রতিজ্ঞা কার্যে পরিণত করিতে সকলকে সাহায্য করা। এজন্য আর তাঁহাকে বেশী পরিশ্রম করিতে হইল না, যদিও পূর্বে অবস্থা অন্যরূপ ছিল। অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত ইংরেজী জীবনী (পৃঃ ১৫৭-৫৮) এবং প্রমথনাথ বসু রচিত বাঙ্গলা জীবনী (পৃঃ ১৫৪-৫৫) হইতে আমরা জানিতে পারি, পূর্বে তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে সন্ন্যাস অবলম্বন করাইবার জন্য কতই না যত্ন করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র প্রথম দিকে বাড়ীর বৈষয়িক ব্যাপারে অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। উহা হইতে যেমনি তিনি একটু অব্যাহতি পাইলেন, এবং সন্ন্যাসের আদর্শ পালন বিষয়ে নিজেকে মুক্ত বোধ করিলেন, অমনি যে-সকল যুবক-ভক্ত স্বগৃহে ফিরিয়া পাঠাভ্যাসে নিরত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বরাহনগরে লইয়া আসিবার জন্য তাঁহাদের মনে বৈরাগ্যের তুফান বহাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি তাঁহাদের সহিত যুক্তিবিচারে রত থাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে চাহিতেন। নরেন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় গুরুভাইদের মনে পূর্বকথা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত এবং তৎকালের মতো সংসারবাসনা হীনপ্রভ হইত। কেহ কেহ নরেন্দ্রের আহ্বানে পাঠাদি ত্যাগ করিয়া বরাহনগরে যাইতেন; কিন্তু অভিভাবকের উৎপীড়নে দুই এক দিন পরেই আবার গৃহে ফিরিতেন। নরেন্দ্রও দমিবার পাত্র ছিলেন না। গৃহে ফিরিয়া নরেন্দ্রের পুনরাগমন-ভয়ে যখন তাঁহারা রুদ্ধদ্বারকক্ষে পাঠাভ্যাসে নিরত থাকিতেন, তখন নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ ঝড়ের মতো উপস্থিত হইয়া গৃহদ্বারে উপর্যুপরি করাঘাত করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করাইতেন এবং গুরুভ্রাতাকে রাজপথে টানিয়া লইয়া গিয়া অভিভাবকের অসাক্ষাতে অগ্নিময়ী বাণীর উৎস খুলিয়া দিতেন। তিনি কখন যে কাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, তাহার কিছুই ঠিক ছিল না। ইহা পূর্বের কথা। আঁটপুরের পরে ত্যাগাকাঙ্ক্ষা ত্বরান্বিত হইয়া অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করিল। ক্রমে শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, শরৎ, সারদা ও সুবোধ মঠেই বাস করিতে থাকিলেন। কয়েক মাস

পরেই বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত লাটু যোগদান করিলেন ; হরিরও আসিতে বিলম্ব হইল না। শ্রীমা বৎসরান্তে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে যোগীন্দ্রেরও মঠজীবন আরম্ভ হইল। গঙ্গাধর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গৃহত্যাগ করিয়া হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি স্থায়িভাবে মঠে আসিলেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে। আর সর্বশেষে অনেক পরে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে আসিয়াছিলেন হরিপ্রসন্ন। আর এক জনের নাম করা আবশ্যক। তিনি তুলসী। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণকে একাধিকবার দেখিয়া থাকিলেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশেন নাই এবং এই জন্য নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য না বলিয়া বরং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যরূপে পরিচয় দিতেই গর্ব অনুভব করিতেন। অবশ্য শেষ বয়সে তিনি এই মত পরিবর্তন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরূপেই আত্মপরিচয় দিতেন। যাহা হউক, এখন প্রশ্ন এই—ত্যাগী ভক্তবৃন্দ আনুষ্ঠানিকরূপে সন্ন্যাস লইলেন কবে এবং কিরূপে ?

মঠের আদিজীবনের কয়েকখানি চিত্র 'কথামৃত'কারের লেখনীমুখে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, অন্ততঃ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি শিবচতুর্দশী দিনে মঠের ত্যাগী যুবকবৃন্দের পরিধানে গেরুয়া-বস্ত্র ছিল ; ঐ বৎসর ৮ই মে তারিখেও গেরুয়া-বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ২১শে ফেব্রুয়ারির পূর্বের কোন বিবরণ 'কথামৃতে' নাই। তবু আমরা অনুমান করিতে পারি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত গেরুয়া-বস্ত্র অন্ততঃ ধ্যানাদিকালে মঠবাসীরা প্রথমাবধি ব্যবহার করিতেন। অতঃপর পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথা' হইতে জানা যায় (১৪০ পৃঃ), শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকালে তিনি একবার গয়ার নিকটবর্তী 'বরাবর' পাহাড়ে হঠযোগ শিক্ষা করিতে যান এবং ঐ অবসরে পাহাড়ের পাদদেশে বাসকারী জনৈক পরমহংসের নিকট হইতে সন্ন্যাসের মন্ত্রাদি লিখিয়া আনেন। মঠের প্রথমাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ একদিন সন্ন্যাসগ্রহণের বাসনা ব্যক্ত করিলে অভেদানন্দ ঐ কথা প্রকাশ করেন এবং নরেন্দ্রাদিকে যথাবিধি বিরজা-হোম করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসগ্রহণের পরামর্শ দেন। তদনুসারে নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, শশী, শরৎ, রাখাল, সারদা, লাটু ও কালী প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে বিরজা-হোম সম্পাদনপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহা ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের প্রথম দিকের (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের, জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের) কথা। এই বিবরণে আরও উল্লেখ আছে যে, নরেন্দ্র ব্যতীত অপর সকলে ঐ দিনই

তাঁহাদের অধুনাপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাস-নামগুলি গ্রহণ করেন; কিন্তু নরেন্দ্রনাথের নাম হয় বিবিদিষানন্দ। দ্বিতীয় আর একটি বিবরণ আমরা পাই স্বামী শিবানন্দের একখানি পত্রে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি তিনি গঙ্গাধরের প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক নাম পরিবর্তন করিয়াছেন। পত্রে এইরূপ একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে—

নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ স্বামী
যোগেন—যোগানন্দ স্বামী
বাবুরাম—প্রেমানন্দ স্বামী
লাটু—অদ্ভুতানন্দ স্বামী
শশী—রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী
হরিবাবু—তুরীয়ানন্দ স্বামী
তুলসী—নির্মলানন্দ স্বামী
দক্ষ—জ্ঞানানন্দ স্বামী
কালী—অভেদানন্দ স্বামী
গোপাল দাদা—অদ্বৈতানন্দ স্বামী

পত্রের নীচে লেখক তারকনাথের নিজ সহি আছে শিবানন্দ এই নামে। আশ্চর্যের বিষয়, এই তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ নাই। আর একটি বিবরণ পাই স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'য়। তাঁহার মতে সন্ন্যাসীরা মঠে অবস্থানকালে গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করিলেও বহির্গমনকালে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন। স্বামী শিবানন্দের পত্রেও দেখা যায় তিনি গঙ্গাধরকে সাবধান করিতেছেন, পত্রের ঠিকানায় যেন সন্ন্যাস-নাম না লিখিয়া বসেন। মনে হয় গেরুয়াবস্ত্রের ন্যায় সন্ন্যাস-নামও তখন ব্যবহার করিতে বিশেষ বিঘ্ন ছিল; হয়তো বঙ্গসমাজের অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ। সন্ন্যাসের প্রতি সামাজিক বিরোধের আভাস আমরা পরে পাইব। স্বামী অখণ্ডানন্দ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের দুই বৎসরের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, সুবোধ, লাটু, গোপাল (দাদা), তারক ও কালী বিরজা-হোম সম্পাদনপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অবশ্য ঐকালে গঙ্গাধর তিব্বত-ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তিনি সন্ন্যাস-নামগুলিরও উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বিবরণত্রয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিরোধ থাকিলেও—(সুপ্রাচীন কালের কথা স্মরণ করিয়া লিখিতে গেলে

এইরূপ সামান্য অসামঞ্জস্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক)—কালী ও গঙ্গাধরের বিবরণদ্বয় হইতে জানা যায়, নরেন্দ্রনাথ ইহারই কোন এক সময়ে পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্ব হইতেই স্থায়িভাবে মঠে বাস করিতে থাকেন, কেন না তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথের মতে "নরেন্দ্রনাথ সংসারত্যাগ করিয়া সাধু হইলে আমাদের মাতামহী রঘুমণি দেবী ছিলেন আমাদের প্রধান ভরসাস্থল, তাঁহার সহিত আমরা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাস করি।" এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমরা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমাদের মাতামহীর ৭ নং রামতনু বসু লেনের বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে থাকি।" অবশ্য নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-গ্রহণই এই গৃহপরিবর্তনের কারণ ছিল না। বিশ্বনাথবাবুর জীবনকালেই পারিবারিক কলহের ফলে তিনি ভাড়া-বাড়ীতে চলিয়া যান, সম্ভবতঃ সেই একই কারণে এবং সম্পত্তি লইয়া মকদ্দমা চলিতে থাকায় ভুবনেশ্বরী দেবী স্বামীর দেহত্যাগের পরও বাহিরে থাকা শ্রেয়ঃ মনে করেন। ('বাণী ও রচনা' ৬।২৮৮ দ্রষ্টব্য)। নরেন্দ্রনাথের ৪।৭।৮৯ তারিখের পত্রে প্রকাশ, ঐ মকদ্দমা মিটিয়াছিল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং উহাতে দত্তপরিবার সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। বরাহনগর-মঠে বাস করিতে থাকিলেও বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ও সম্পত্তির সাবালক মালিক হিসাবে নরেন্দ্রনাথকেই হাইকোর্টে যাইয়া মকদ্দমার তদ্বির করিতে হইত। এই কার্যের সুবিধার জন্য, অপরের বৃথা ঔৎসুক্য ও প্রশ্নাদি এড়াইবার অভিপ্রায়ে এবং সন্ন্যাসগ্রহণের ফলে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন শত্রুদের এইরূপ যুক্তি হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পক্ষে তখন গেরুয়া পরিধান না করা বা সন্ন্যাস-নাম ব্যবহার না করার একটা বিশেষ যুক্তি ছিল। আরও একটা যুক্তি ছিল—দশনামি-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অজ্ঞতা। হয়তো বা ইংরেজ সরকারও শিক্ষিত যুবকদের এইরূপ আচরণের বিরোধী ছিলেন।

বাঙ্গলা সমাজ তখনকার দিনে শঙ্করাচার্যানুমোদিত বৈদিক সন্ন্যাস ও অদ্বৈত বেদান্তমতের সহিত তেমন পরিচিত ছিল না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত শ্বেতবস্ত্রপরিহিত বৈরাগিসম্প্রদায়কে তাহারা চিনিত। গঙ্গাসাগরযাত্রী বা জগন্নাথযাত্রী জটাজুটধারী নাগাদের অথবা সামান্য গেরুয়াবস্ত্রাচ্ছাদিত দুই-চারিজন সন্ন্যাসীকে তাহারা দেখিয়াছে, চড়কের সন্ন্যাসী ও বিরল মুষ্টিমেয় কৌল

সন্ন্যাসীকেও তাহারা চিনিত, কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকরা দলে দলে মা-বাবাকে কাঁদাইয়া ও সাংসারিক সচ্ছলতাকে পায়ে ঠেলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে মঠজীবন যাপন করিবে এবং গুরুপূজারূপ বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র অবলম্বনে বেদান্ত-সম্মত সাধনমার্গে অগ্রসর হইবে—ইহা এক নবীন অভিজ্ঞতা। এই ধারার পুষ্টিতে সমাজের কল্যাণ না হইয়া বরং অকল্যাণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ জনপ্রিয় হয় নাই—ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। স্বামী বিরজানন্দ তাঁহার 'অতীতের স্মৃতি'তে (৩৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "পাড়ার লোকেরা তখন মঠের বিরুদ্ধে ছিল ও নানা মিছে অপবাদ রটনা করত। যখন সাধুরা গঙ্গাস্নান করতে যেতেন, দুষ্টু ছেলেরা বক দেখাত ও বলত, 'ওরে সব রাজহংস যাচ্ছে', আর প্যাঁক প্যাঁক করত।" পাড়ার লোকের সন্দেহ কত প্রবল ও কুৎসিত ছিল তাহার পরিচয় একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। স্বামী সারদানন্দের (শরৎ এর) গলার স্বর নারীজনোচিত কোমল ছিল ; তিনি যখন গাহিতেন তখন দূর হইতে সহসা বামাকণ্ঠ বলিয়া ভ্রম হইত। এক রাত্রে তিনি মঠে গান ধরিয়াছেন, এমন সময় পল্লীর কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল, মঠে নিশ্চয় নারীসমাগম হইয়াছে। এহেন ভ্রষ্টাচার হাতেনাতে প্রমাণ করিয়া ভণ্ড সাধুদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার প্রলোভন সামলাইতে না পারিয়া জন কয়েক সেই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইলেন এবং বহির্দ্বার রুদ্ধ থাকায় প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া সঙ্গীত-সভায় অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, এতো নারী নহে, এযে পুরুষ ! অতঃপর নিজেরাই জব্দ হইয়া অধোবদনে ত্রুটিস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য, সাধুরা বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি না দেখাইয়া তাহাদিগকে সহাস্যে বিদায় দিলেন।

ইহার পর আমরা 'কথামৃত'-কারের বিবৃতি অবলম্বনে মঠের প্রাথমিক জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভে যত্নপর হইব। ২১শে ফেব্রুয়ারির (১৮৮৭) শিবরাত্রি ব্রতের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ('কথামৃত', ৪, পরিশিষ্ট)। সেদিন সকাল নয়টার সময় মাস্টার মহাশয় মঠে দানাদের ঘরে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই সুকণ্ঠ গায়ক তারকনাথ নরেন্দ্রের সদ্যোরচিত গান ধরিলেন—

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, ববম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল।

গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল-ত্রিশূল রাজে।
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্কভাল।

মাস্টার মহাশয় দেখিলেন, ঘরে উপস্থিত আছেন নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, হরীশ, সিঁথীর গোপাল ও সারদা। নরেন্দ্র তখন বাড়ীর মকদ্দমায় ব্যস্ত, সেদিনও কলিকাতায় গিয়াছিলেন; সবেমাত্র মঠে ফিরিয়াছেন। এমন সময় কালী তাঁহাকে ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মকদ্দমার খবর কি?" নরেন্দ্রনাথ কিন্তু জানিতেন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে ইহাতে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছে, অপর সন্ন্যাসীদের এই ব্যাপারে না থাকাই ভাল। অতএব তিনি বিরক্তিভরে উত্তর দিলেন, "তোদের ওসব কথায় কাজ কি?" রাত্রে বেলতলায় চারি প্রহরে চারি বার পূজা হইল; অবসরকালে গীতাপাঠাদি ও নৃত্যগীতও হইল। পূজান্তে পরদিবস প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া নরেন্দ্রনাথ নূতন গৈরিকবস্ত্র পরিলে দেখা গেল "বসনের সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁহার মুখের ও দেহের তপস্যাসম্ভূত অপূর্ব স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতি মিশিয়াছে। বদনমণ্ডল তেজঃপরিপূর্ণ, আবার প্রেমানুরঞ্জিত—যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সাগরের একটি ফুট জ্ঞানভক্তি শিখাইবার জন্য দেবদেহ ধারণ করিয়াছেন, অবতারলীলায় সহায়তার জন্য।" তারপর ভক্তগণ পারণের জন্য বলরামবাবুর প্রেরিত ফল-মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় চিত্র পাই ২৫শে মার্চ তারিখে ('কথামৃত', ৩। পরিশিষ্ট)। মাস্টার মহাশয় আসিয়া আরতি দর্শন করিলেন এবং স্তবপাঠে যোগ দিলেন। "জয় শিব ওঙ্কার! ব্রহ্মাবিষ্ণু সদাশিব। হর হর মহাদেব!"—বিশ্বনাথের এই স্তবটি গঙ্গাধর কাশীধাম হইতে আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তখন সর্বদা মঠে যাতায়াত করিতেন। ঐদিন মাস্টার মহাশয় নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পূর্বজীবন সম্বন্ধে, বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। এই আলোচনাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা হইতে অনেক উদ্ধৃতি আমরা পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি।

তৃতীয় চিত্রটি পাই ৭ই মে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ('কথামৃত', ২। পরিশিষ্ট)। সেদিনও নরেন্দ্রনাথের সহিত মাস্টার মহাশয়ের পূর্বদিনেরই ন্যায় আলোচনা হয়; কিন্তু উহা বরাহনগর-মঠে না হইয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে মাস্টার মহাশয়ের বাড়ীর নীচ তলায় হইয়াছিল। একটু পরেই সাতকড়িবাবু গাড়ী করিয়া

সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক, আফিসে কাজ করেন, বাড়ী বরাহনগরে এবং মঠবাসীদিগকে বড় ভালবাসেন। নরেন্দ্র ও মাস্টার মহাশয় সেই গাড়ীতেই উঠিয়া বরাহনগর-মঠে চলিলেন। নরেন্দ্র তখন মঠের নেতা। মঠে ফিরিয়া খবর পাইলেন, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে সারদা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া নরেন্দ্র অতি বিব্রতভাবে মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন আমার বিষম মুশকিল। এখানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি। আবার ছোঁড়াটা কোথায় গেল!" রাখাল দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে নরেন্দ্রনাথ জানিতে পারিলেন, সারদা এক পত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম এই—বাড়ীর লোকে উৎপাত করে বলিয়া এবং মনে নানা বিপরীত চিন্তা উঠে বলিয়া তিনি বৃন্দাবন যাইতেছেন। আবার মুখেও বলিয়া গিয়াছেন—নরেন্দ্রনাথ বাড়ীর মকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া তাঁহারও ভয় হয়, পাছে তাঁহাকেও ঐভাবে বাড়ী ফিরিতে হয়। শুনিয়া নরেন্দ্র গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

মাস্টার মহাশয় সেবারে পাঁচ দিন মঠে ছিলেন। তখন দেখিয়াছিলেন, 'যোগবাশিষ্ঠ' প্রায়ই পড়া হইত এবং অনুরূপ সদালোচনাও হইত। মঠবাসীরা সকলেই গেরুয়া কাপড় পরিতেন। শশী নিত্যপূজা করিতেন, সকলে গঙ্গাস্নান করিতেন, ঠাকুরকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন এবং আরতিতে যোগ দিতেন।

এদিকে একদিন পরেই সারদা ফিরিয়া আসিলেন; তিনি কোন্নগরের বেশী যাইতে পারেন নাই। সেই দিনই আবার শশীর বাবা আসিয়া শশীকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন; তিনি গেলেন না। তারপর নরেন্দ্র কালী-তপস্বীর ঘরে বসিয়া সারদার সহিত অনেক সদালোচনা করিলেন এবং মাঝে মাঝে গান গাহিয়া, শাস্ত্রবাক্য শুনাইয়া এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞান হইতে যুক্তির অবতারণা করিয়া তাঁহার মনে ভগবান-লাভের আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়তর করিয়া দিলেন, বৈরাগ্য-ভাবও বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিলেন।

সর্বশেষ চিত্রটি ৯ই মে (১৮৮৭) তারিখের ('কথামৃত, ১। পরিশিষ্ট)। সেদিনের বিশেষ ঘটনা—রবীন্দ্র নামক একটি ছেলে মঠে আসিলে তাহাকে থাকিতে দেওয়া হয় এবং নরেন্দ্র তাঁহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দেন; কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফিরিয়া যায়। অপর ঘটনা 'চৈতন্যচরিত'-পাঠ। গিরিশচন্দ্রের রচিত 'বুদ্ধচরিত' ও 'চৈতন্যচরিত' নূতন আসিয়াছে এবং মঠের একজন সুর

করিয়া একটু ব্যঙ্গভাবে 'চৈতন্যচরিত' পড়িতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র বইখানি কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন, "এইরকম করে ভাল জিনিসটা মাটি করে?" তিনি নিজে চৈতন্যদেবের প্রেমবিতরণের কথা পড়িয়া শুনাইলেন।

এই চিত্রাবলী হইতে আমরা প্রাথমিক মঠজীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদ্রষ্টার লেখনী-প্রসূত কিঞ্চিৎ নিখুঁত বিবরণ পাইলাম। এখন সাধারণভাবে ঐ কালের বিভিন্ন দিকের আলোচনায় অগ্রসর হই। প্রথমে গ্রাসাচ্ছাদনের কথাই ধরি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মিত্র ত্রিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া একশত টাকা পর্যন্ত মাসিক দিতেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বলরামবাবু, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি কেহ কেহ কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। কিন্তু কোন কালেই ব্যয়ের অনুপাতে যথেষ্ট অর্থাগম হইত বলিয়া মনে হয় না। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথা' হইতে জানা যায়, "তারকদাদা, আমি, লাটু, গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায় বাহির হইয়া সামান্যভাবে যে চাউল প্রভৃতি পাইতাম তাহাই পালা করিয়া রান্না কবিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম।·· অবশ্য আহার একবেলাই জুটিত।" (১৩০ পৃঃ)। ইহা ঠিক কোন কালের ঘটনা জানি না; তবে অবস্থার ইতরবিশেষ হইলেও মোটামুটি সকলকে অতি দরিদ্রাবস্থায়ই দিন কাটাইতে হইত, ইহা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল বলরামবাবু ও ২৫শে মে সুরেন্দ্রবাবু দেহত্যাগ করিলে অবস্থা যে অতীব সঙ্কটজনক হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। এমন কি, এক সময়ে মঠের ব্যয়নির্বাহের জন্য শশীকে শিক্ষকতাকার্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল—যদিও উহা স্বল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। সেই দুর্দশার দিনে গিরিশবাবু অকাতরে দান করিয়াছিলেন। সময় হিসাবে এই দুরবস্থার ক্রমিক বিবরণ দেওয়া অসম্ভব; আমরা জ্ঞাত ঘটনাগুলি সাধারণভাবে বলিয়া যাইব মাত্র।

বরাহনগরের দারিদ্র্যের বর্ণনা করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বহু পরে একদিন বলিয়াছিলেন, "খরচপত্রের অনটনের জন্য কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শশীকে কিন্তু ঐ বিষয়ে কিছুতেই রাজী করাতে পারতুম না। শশীকে আমাদের মঠের কেন্দ্রস্বরূপ বলে জানবি। এক এক দিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হল, তো নুন নেই। এক একদিন শুধু নুনভাতই চলেছে। তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। জপধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাসছি। তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ,

নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলেছে। আহা সেসব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি?" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৩৯)। স্বামী প্রেমানন্দও একসময়ে বলিয়াছিলেন, "একবেলা ভাত কোন দিন জুটত, কোন দিন জুটত না। থালা-বাসন তো কিছু নেই! বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে লাউগাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা আনতে গেলে উড়ে মালী যা-তা বলে গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হত। তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ আর ভাত—তা আবার মানপাতায় ঢালা! কিছু খেলেই গলা কুট কুট করত। এত যে কষ্ট, ভ্রূক্ষেপ ছিল না—পূজা, ধ্যান, জপ, কীর্তন সর্বক্ষণ চলেছে।"

সুরেন্দ্রনাথ যতদিন ছিলেন, ততদিন তিনি যে মঠের খবর রাখিতেন না, এমন কথা বলা চলে না। আসল কথা এই—ত্যাগীরা সকলেই ছিলেন ভদ্রসন্তান; নিজের অভাবের কথা অপরকে বলা ছিল তাঁহাদের পক্ষে মহা লজ্জার কথা। আর ঠাকুরের নামে যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি এতটুকু তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেন না? ভগবান স্বয়ংই তো গীতামুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" তবু সুরেন্দ্রনাথ সাধ্যমত খবর রাখিতেন এবং সাধ্যমত ব্যবস্থাও করিতেন। দূরে থাকিতেন বলিয়া সর্বদা যাতায়াত তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; শেষ দিকে রোগশয্যা গ্রহণ করিলে উহা অসম্ভব হইয়া পড়িল। সব ভাবিয়া তিনি ছোট গোপালকে এই বলিয়া মঠে থাকিতে রাজী করাইয়াছিলেন, "আমি তোমার সংসারের সব খরচ নিজের ঘাড়ে লইলাম; তুমি মঠে থাকিয়া মঠের গৃহকর্মাদি করিবে এবং প্রত্যহ বা একদিন অন্তর আমার নিকট আসিয়া মঠের ভাইদের খবর দিবে। বিশেষ করিয়া এইটি মনে রাখিও যে, যখনই তাহাদিগের খাদ্যাদির অভাব দেখিবে তখনই যেন তাহা আমার কর্ণগোচর হয়।" গোপাল পরমহংসদেবের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন; এবং সন্ন্যাসগ্রহণেরও ইচ্ছা পোষণ করিতেন, কিন্তু দুইটি অল্পবয়স্ক ভ্রাতা ও বিধবা মাতার গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব স্কন্ধে আরোপিত থাকায় তাহা হইয়া উঠে নাই। এখন পোষ্যদের অন্যভাবে বন্দোবস্ত হইবে এবং তিনিও সাধুভাবে মঠবাসের সুযোগ পাইবেন দেখিয়া গোপাল সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। মঠে যখনই অনটন-অনাহার ঘটিত অমনি তিনি সুরেন্দ্র-বাবুকে খবর দিতেন এবং সুরেন্দ্রবাবুও তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

১৮৮৭ সালে বরানগর মঠে

বাম হইতে দক্ষিণে দণ্ডায়মান : স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ, দেবেন্দ্র মজুমদার, মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম), ত্রিগুণাতীতানন্দ, মুস্তাফী
উপবিষ্ট : স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং অভেদানন্দ

কিনিবার অর্থ দিতেন ; সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করিয়া দিতেন, তাঁহার নাম যেন প্রকাশ না পায়। কারণ তিনি জানিতেন, কথাটা ছড়াইয়া পড়িলে মঠের ভাইরা তাঁহার সাহায্য লইতে সঙ্কুচিত হইবেন। গোপাল তাই দ্রব্যসম্ভার লইয়া মঠে আসিয়া সাধুদের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেন, "ও এসব একজন ভদ্রলোক পাঠিয়ে দিলেন। আমি তো কিছুতেই নেব না, কিন্তু তিনি ভারী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন—কি করি ? কাজেই নিয়ে আসতে হল।"

আর ছিলেন সহায়ক শ্রীযুক্ত বলরাম বসু। তিনি একদিন অকস্মাৎ মঠে আসিয়া স্বচক্ষে সাধুদের অনাহারের চিত্র দেখিয়া এমন মর্মাহত হইলেন যে, বাড়ী ফিরিয়া গৃহিণীকে জানাইলেন, তিনি সেদিন ভাত ও তেলাকুচো পাতার সুক্তো ছাড়া আর কিছু খাইবেন না। গৃহিণী ভাবিলেন, "এমনি পেটরোগা লোক ; হয়তো সেদিন অসুখ বাড়িয়াছে।" কিন্তু পরে প্রকাশ পাইল, মঠের ভাইদের দুরবস্থা দেখার পর তাঁহার আর আহারে রুচি নাই। বলা বাহুল্য, অতঃপর বলরামবাবু সুবিধামত মাঝে মাঝে কিছু তরিতরকারি ও খাদ্যাদি মঠে পাঠাইয়া দিতেন।

ঐ অভাবের দিনে তৃতীয় একজন বন্ধুর আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহার নাম যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। স্বামী বিরজানন্দ লিখিয়াছেন, "মঠের প্রায় গোড়া থেকেই পাড়ার যোগেন চাটুয্যে বলে বয়োজ্যেষ্ঠ ও কিছু পৈতৃক-বিষয়সম্পন্ন এক ভদ্রলোক আসতেন। তিনি খুব ফুর্তিবাজ ছিলেন, খুব গল্প জানতেন। স্বভাব বেশ উদার ছিল। খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতেন। লোকে বলত তিনি খেয়ে খেয়ে ফতুর হয়েছিলেন। মঠের সকলকে ভালবাসতেন। আগে যখন অনেক সময় মঠে খাবার কিছুই বড় থাকত না, জানতে পেরে বাজার থেকে জিনিসপত্র নিজে কিনে এনে দিতেন।...১৮৯৭ সালে স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে ফিরলে তাঁর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়েছিলেন, নাম হয়েছিল—স্বামী নিত্যানন্দ।" ('অতীতের স্মৃতি', ৪১-৪২ পৃঃ)।

মঠের বস্ত্রাদিও অতীব দরিদ্রোচিত ছিল—পরিধানের জন্য প্রত্যেকের কৌপীন ও একখণ্ড গেরুয়া বহির্বাস। বাহিরে যাইবার কালে আবশ্যক হইবে বলিয়া সকলের জন্য একখানি সাদা কাপড় ও একখানি সাদা চাদর দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো থাকিত ; যাঁহার যখন প্রয়োজন হইত, তিনি উহা লইয়া যাইতেন। গৃহসজ্জার উপকরণের মধ্যে ছিল প্রত্যেকের জন্য এক একখানি

চাদর-ঢাকা মাতুর, গুটিকতক জপের মালা, দেওয়ালের গায়ে খান কয়েক ঠাকুর-দেবতার ছবি ও বন্ধুদের দেওয়া প্রায় শত খানেক বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী পুস্তক। এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল বলিয়াই বোধ হয়, কেননা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ ও পরবর্তী কালের বর্ণনা দিতে গিয়া স্বামী বিরজানন্দ লিখিয়াছেন: "মঠে অনেকেই বহুসময় কৌপীনমাত্র পরতেন, বাইরে গেলে বহির্বাস। মাসে একবার মাথা, গোঁফ, দাড়ি মুণ্ডন করতেন। সকলের যৎসামান্য কাপড়-চোপড় দড়ির আলনায় ঝোলানো থাকত—অন্য কোন বাক্স ছিল না।" (ঐ, ৪৩ পৃঃ)।

তারপর সাধনের কথা। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি হইতেই আরম্ভ করি: "ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপধ্যান করতুম! তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান করে, কেউ না করে—ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশ ছিল না। শশী চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরসেবা নিয়েই থাকত এবং বাড়ীর গিন্নীর মতো ছিল। ভিক্ষা-শিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর যোগাড় ওই সব করত। এমন দিনও গেছে যখন সকাল থেকে বেলা চারটা পাঁচটা পর্যন্ত জপধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে হিঁচড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি! ('বাণী ও রচনা', ৯।২৩৮ পৃঃ)।

আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখিতে বসিয়াছি, অতএব প্রসঙ্গক্রমে অপর গুরুভ্রাতাদের কথা আসিয়া পড়িলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলার স্থান ইহা নহে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে গুরুভ্রাতাদের সমবেত চেষ্টা তো ছিলই, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবদানও ছিল, কিন্তু আমরা বরাহনগর মঠের সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র না আঁকিয়া নেতার কথাই বিশেষ করিয়া বলিতে বাধ্য। তবু সেই প্রারম্ভিক দিনগুলিতে শশীর বিষয়ে আর একটু বলিলে মন্দ হইবে না; কারণ ইহাতে একদিকে যেমন শশীর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অপরদিকে তেমনি বরাহনগরের প্রাথমিক দিনগুলি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। সেই প্রারম্ভাবস্থায় শশীর কৃতিত্ব অপূর্ব। আমরা দেখিয়াছি, নরেন্দ্রও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। আর একবার তিনি আমেরিকা হইতে লিখিয়াছিলেন, "শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে! তাহার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা

মহাভিত্তিস্বরূপ।" মঠের ভাইরা যখন ভগবান লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষায় এদিক-সেদিক তীর্থদর্শনে যাইতেন বা দূরদূরান্তরে তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন, তখন শশীই মঠের ঠাকুর-পূজা ইত্যাদি লইয়া অটল অচল সুমেরুবৎ বরাহনগরে অবস্থান করিতেন। একদিনের জন্যও তাঁহার বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তি হইত না। অভাবের দিনে সন্ন্যাসীরা ভিক্ষায় বাহির হইতেন; কোন দিন শুধু অল্প অন্ন লইয়া ফিরিতেন, কোন দিন বা রিক্তহস্তে আসিতেন। এমনি একদিন চারিজন সাধু ফিরিয়া যখন ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছুই দিতে পারিলেন না, তখন সিদ্ধান্ত হইল, অনাহারে থাকিয়া সেদিন সারাক্ষণ ভজন করা হইবে। যেমন কথা, তেমনি কাজ। কিন্তু ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা না করিয়া শশীর তো শান্তি নাই। তিনি অপরের অজ্ঞাতসারে এক পরিচিত প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেলেন। বাটীর অপর সকলেই মঠের বিরোধী; অতএব ঐ প্রতিবেশী বন্ধু শশীর বিবরণ শুনিয়া জানালা গলাইয়া পোয়াটাক চাল, গোটা কয়েক আলু ও একটু ঘৃত দিলেন। উহাতেই সেদিন ঠাকুরের ভোগ হইল। অবশেষে প্রসাদের কয়েকটি পিণ্ড পাকাইয়া শশী দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ভজন নিরত সাধুদের প্রত্যেকের মুখে এক একটি পিণ্ড গুঁজিয়া দিলেন। সাধুরা খাইয়া সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই শশী, এ অমৃত কোথায় পেলে ভাই?" তিনি ছিলেন যেন মঠের মা। সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখা, সর্ববিষয়ে তত্ত্বাবধান করা ও সব জিনিসপত্র ঠিক ঠাক রাখা ছিল তাঁহার স্বেচ্ছায় স্বীকৃত কর্তব্য। আর ঠাকুরসেবার প্রতিটি অঙ্গ যাহাতে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়, সেদিকে ছিল তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

অর্থাভাবে লোক রাখা সম্ভব হইত না বলিয়া গৃহস্থালীর সব কাজই তাঁহাদিগকে স্বহস্তে করিতে হইত। ঝাঁট দেওয়া, পায়খানা সাফ করা, বাসন-মাজা, জল-তোলা—এমনকি, মাঝে মাঝে রন্ধনাদিও করিতে হইত। নরেন্দ্র-নাথের তখন কাজের উদ্যম অফুরন্ত—সারাদিন যেন কাজই করিয়া চলিয়াছেন। স্বয়ং ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া অপরদের জাগাইবার জন্য গান ধরিতেন "জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী। নয়ন মেলিয়া দেখ করুণা-নিধান পাপতাপহারী।" ইত্যাদি। তারপর দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দৈনিক কার্য জপধ্যান ও সৎপ্রসঙ্গাদিতে কাটিয়া গেলে তৃতীয় প্রহরে শশী তাঁহাদিগকে টানিয়া আহারে বসাইতেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐরূপ চলিবার পর সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টাব্যাপী

শ্রীরামকৃষ্ণারাত্রিকাদি আরম্ভ হইত এবং সকলে তাহাতে যোগ দিতেন। আরাত্রিকান্তে ছাদে বসিয়া 'সীতারাম'-নাম-গান বা অন্য প্রকার ভজনাদি চলিত গভীর রাত্রি পর্যন্ত। অবশ্য সকলেই যে সমভাবে সব কার্যে যোগ দিতেন, এমন বলা চলে না। একজন অধ্যয়নাদিতেই প্রায় সমস্ত সময় কাটাইতেছেন ও গৃহকর্মের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া যখন সমালোচনা খুব মুখর হইয়া উঠিল, তখন নরেন্দ্রনাথ একদিন বিরক্তিভরে বলিলেন, "তোদের একটা ভাই যদি শুধু পড়াশুনা নিয়েই থাকে তো এত গাত্রদাহ কেন? নিয়ে আয় তোদের কত হাণ্ডা বাসন আছে ; আমি একাই মেজে দেব।" বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজে নামিয়া পড়িলেন এবং অতঃপর ঐ জাতীয় সমালোচনাও থামিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রীতির কথা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, তাঁহার উৎসাহ অপরেও সঞ্চারিত হইত। শরৎ তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিখিতেন। কালী শিখিতেন বাদ্য। আর তাঁহার সঙ্গীতের ও সঙ্গতের সাথী হইতেন অপর অনেকে, বিশেষতঃ বুড়োগোপাল ও তারকনাথ। গোপালদাদা বাঁয়া-তবলা বাজাইতেন ; পাখোয়াজীর অভাব মিটাইবার জন্য কালী ওস্তাদের সাহায্যে ঐ বিদ্যা কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করেন। মধ্যে মধ্যে ভক্তগৃহেও নরেন্দ্রের ধ্রুপদগানের আসর বসিত। অভেদানন্দজী উল্লেখ করিয়াছেন—রামবাবু, গিরিশবাবু ও বলরামবাবুর গৃহে ঐরূপ সভায় নরেন্দ্রনাথের সহিত তিনিও উপস্থিত ছিলেন। ('আমার জীবনকথা', ১৪৩ পৃঃ)।

এইভাবে ভক্তদের আমন্ত্রণে মঠের বাহিরে গিয়া মাঝে মাঝে ভগবৎ-সঙ্গীতাদি করিলেও কিংবা ভক্তগৃহে উৎসবাদিতে যোগ দিলেও তখনকার দিনে নরেন্দ্রনাথের জীবন ছিল প্রধানতঃ মঠকেন্দ্রিক। সেখানে থাকিয়া আপনার অন্তরতম প্রদেশে ডুবিয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার সেইসব দিনের সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কতদিন যে তিনি সন্ধ্যায় ধ্যানে বসিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, তাহার হিসাব কে রাখে? এই সুদীর্ঘ একাগ্রতার ফলে তখন তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয় সর্বদা রক্তোৎপলবৎ প্রতিভাত হইত এবং মুখমণ্ডলে এক দিব্যভাব ও প্রাণে অপূর্ব অনুপম আনন্দ চিরবিরাজিত থাকিত। সমাগত ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য সাধুরাও তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-তপস্যার কথা স্মরণ করিয়া নিজদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন, "ওঃ! ঠাকুরের কি অদ্ভুত বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা ছিল। তিনি যা দেখাইয়াছেন আমরা তার এক

আনাও করিতে পারিতেছি না। হায়, হায়, আমাদের কি দুর্ভাগ্য!" আবার নরেন্দ্রনাথ যখন দেখিতেন, কঠোর তপস্যার ফলে গুরুভ্রাতাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা হইতেছে, তখন নেতার কর্তব্য সম্পাদনে উদ্যত হইয়া বলিতেন, "তোরা কি মনে করেছিস, সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? তা হয় না রে? রামকৃষ্ণ পরমহংস পৃথিবীতে একটাই জন্মায়—একবারই আসে।" অন্য সময়ে বলিতেন, "তাঁর মুখে পিঁপড়ে আর চিনির পাহাড়ের কথা শুনেছিস তো? তোরা হচ্ছিস সেই পিঁপড়ে, আর ভগবান চিনির পাহাড়। তোদের এক একটা দানা পেলেই পেট ভরে যায়; কিন্তু মনে কচ্ছিস পাহাডটাসুদ্ধ টেনে নিয়ে যাবি!"

দানাদের ঘর কখন কখনও জমজমাট হইত দেশ-বিদেশের নানা চিন্তাধারায়—আলোচনা, বিশ্লেষণ, গ্রহণ, বর্জন, তুলনা ইত্যাদিতে। কাণ্ট্, হেগেল, স্পেন্সার ইত্যাদি দার্শনিকগণ, এমন কি নাস্তিক, জড়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদীরাও এই বাদানুবাদ হইতে বাদ পড়িতেন না। গীতা, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ মতবাদ, বৈষ্ণবমত, শৈবমত—ইত্যাদি বহু বিষয় এই আসরে আলোচনাপ্রসঙ্গে আসিয়া পড়িত। বস্তুতঃ সে গৃহখানি যেন এক শিক্ষাকেন্দ্রে বা মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। আর এই কেন্দ্রের মধ্যমণি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। আলোচনা আরম্ভ করিতে গিয়া তিনি এমন একটা কিছুর দিকে ঝোঁক দেখাইতেন, যাহাতে প্রায় অপর সকলে তাঁহার প্রতিপক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। তিনিও তর্কের অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেন। আবার তাঁহারা যখন যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেন না, তখন তাঁহাদেরই পক্ষ গ্রহণপূর্বক স্বীয় মতকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেন। যদি প্রশ্ন উঠিত ঈশ্বর আছেন কিনা, নরেন্দ্র পূর্বপক্ষ গ্রহণ করিয়া বলিতেন, ঈশ্বর নাই; উহা মনের কল্পনা মাত্র। আবার তিনিই পরে প্রমাণ করিতেন, ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু। এমনিভাবে শঙ্করের দর্শন কখনও নরেন্দ্রের পূর্বপক্ষের আঘাতে ধূলিসাৎ হইত এবং পরমুহূর্তে তাঁহারই উত্তরপক্ষের যুক্তিবলে অটুট সৌধরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ষড়্দর্শনেই নরেন্দ্র অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেন। আবার হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার আচার-বিচার, পূজা-সাধনা ইত্যাদিও সে বিচারের খোরাক জোগাইত। সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আসিয়া পড়িত। এইসব আলোচনাপ্রসঙ্গে নিত্যনূতন চিন্তাধারায় ও

আধুনিক গবেষণায় প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রনাথ দেখাইয়া দিতেন, সমস্ত ক্ষেত্রেই ঠাকুরের জীবন ও বাণী কিরূপ অদ্ভুত আলোকসম্পাত করিয়াছে। কোন দিন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন কথা আসিয়া পড়িলে হয়তো উপর্যুপরি কয়েক দিন তাহারই আলোচনা চলিত। এইরূপে 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থখানি তন্ন তন্ন করিয়া অধীত হইল। হীনযান মহাযান সম্প্রদায়দ্বয়ের নবপ্রকাশিত বহু গ্রন্থ সে পাঠাগারে পঠিত ও আলোচিত হইল। ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মনেতাদের জীবন ও বাণীর সহিত সেখানে ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ ঘটিল। পরেই আবার যীশুখৃষ্ট তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল, 'ঈশানুসরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাদের আয়ত্ত হইয়া গেল। আনুষঙ্গিকভাবে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্, ইগ্নেসিয়াস্ লায়লা প্রভৃতি সাধুদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভও হইল। নরেন্দ্রনাথ ঐকালে প্রমদাদাস বাবুকে যেসব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সংস্কৃতভাষা, বিশেষতঃ বৈদিক সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিও তখন তাঁহাদের সবিশেষ আগ্রহ ছিল।

নরেন্দ্রনাথ কখনও বা ভারতীয় ইতিহাস বা সমাজ-ব্যবস্থার আলোচনায় মাতিয়া উঠিতেন। ভারতীয় সভ্যতার ঐক্য কোথায়, শ্রীরামচন্দ্র হইতে সম্রাট আকবর পর্যন্ত ভারতসন্তানগণ কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ের বিচারে তিনি দিনের পর দিন নিরত থাকিতেন। বিদেশের ইতিহাস—যথা গিবনের রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনের কাহিনী, কার্লাইলের ফরাসী-বিপ্লবের ইতিবৃত্ত—তাঁহার আলোচনায় একটি বিশিষ্ট স্থান পাইত। জোয়ান অব আর্ক-এর জীবনী তিনি আলোচনা করিতেন, আবার ভারতীয় বীরাঙ্গনা—ঝাঁসীর রাণী—তাঁহার নিকট প্রচুর সম্মান পাইতেন।

এই সময়ে বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় পর্বগুলি সাদরে পরিপালিত হইত। যথা বড়দিনের রাত্রে ধুনির চতুষ্পার্শ্বে অর্ধশায়িতাবস্থায় খৃষ্টের আবির্ভাব ও বার্তা-প্রচারের প্রসঙ্গ চলিত। একদিন গুড্ ফ্রাইডে উপলক্ষে তাঁহারা সমস্ত দিবস উপবাসে কাটাইয়াছেন, এমন সময় দ্বারে একজন ইউরোপীয় অভ্যাগতের কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "কে আছ, খৃষ্টের দোহাই, দ্বার খোল!" অমনি দ্বার খুলিয়া সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন—এই শুভদিনে একজন খৃষ্টানের মুখে খৃষ্টের কথা শুনিবেন। কিন্তু লোকটি বলিল, সে স্যালভেশন আর্মির সভ্য এবং তাহারা দুইটি মাত্র পর্ব পালন করে—যীশুর ও জেনারেল বুথের জন্মদিন।

গুড্ ফ্রাইডে ইত্যাদি সম্বন্ধে সে কিছু বলিতে পারিবে না। সন্ন্যাসীরা অবাক হইয়া বলিলেন, "সে কি? যেদিন আপনাদের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করিলেন, সেদিনের কথাও আপনি জানেন না?" সে বেচারী অপ্রস্তুত হইয়া দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার স্মৃতিকথায় এমন একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহার স্থান কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। হয়তো উহা এই কালেরই ঘটনা, এই ভাবিয়া আমরা যথাসম্ভব গুপ্ত মহাশয়েব ইংরেজী বর্ণনানুযায়ী উহা এখানে উপস্থিত করিলাম। নরেন্দ্রনাথ তখন তাঁহার জনকয়েক গুরুভ্রাতার সহিত কলিকাতার উপকণ্ঠে বাস করিয়া অধ্যয়নাদি করেন এবং সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী জনকল্যাণসাধনে ব্রতী হন। একদিন এক বাঙ্গালী পুলিস কর্মচারী তাঁহাকে নিজবাটীতে দ্বিপ্রহরে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এই ব্যক্তির সহিত পূর্বেই নরেন্দ্রনাথের বাটীর লোকদের আলাপ-পরিচয় ছিল। কর্মচারীটি ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন। নরেন্দ্র সেখানে যাইয়া দেখিলেন, আরও অনেকে উপস্থিত; ভদ্রলোক খুবই ব্যস্ত। ক্রমে সকলে চলিয়া গেলেও ভোজনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না; প্রত্যুত ভদ্রলোক নরেন্দ্রের নিকট জানিতে চাহিলেন, কেন তাঁহারা ঐ আড্ডা জমাইয়াছেন, কারণ বাহিরে ধর্মভাব দেখাইলেও নরেন্দ্রের ঐ দলটি প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আর নরেন্দ্রই উহাদের দলপতি। মনে রাখিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' তখন ইংরেজ সরকারকে এইরূপ মঠকেন্দ্রিক রাজদ্রোহ সম্বন্ধে অবহিত করাইয়াছে। অতএব সরকারী কর্মচারীর নিকট নরেন্দ্রাদি সম্বন্ধে এই সন্দেহ অদ্ভুত না ঠেকিলেও নরেন্দ্র প্রথমে এই প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতেই পারিলেন না; তিনি ভদ্রভাবে ষড়যন্ত্রাদির কথা অস্বীকার করিলেন মাত্র। কিন্তু কর্মচারী সেসব কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, তাঁহার নিকট অকাট্য প্রমাণ আছে; তবে নরেন্দ্র সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি তাঁহাকে শাস্তি না দিয়া রাজসাক্ষী করিবেন। অমনি নরেন্দ্রনাথ ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সবল সুগঠিত দেহ সমুন্নততর করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "মিথ্যা অছিলায় আমায় ডেকে এনে আপনি আমার ও আমার সাথীদের বিরুদ্ধে ভূয়ো অভিযোগ করছেন, এই আপনার পেশা! তবু অপমান সহ্য করাই আমার শিক্ষা। আমি যদি অপরাধী ও ষড়যন্ত্রী হতুম তো কোন সাহায্য আসার আগেই আমি আপনার

ঘাড় মটকে দিলে কেউ কিছু করতে পারত না। সেসব কথা থাক ; আমি আপনাকে নির্বিবাদে ছেড়ে যাচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া তিনি বিদায় লইলেন। সেই ক্রুদ্ধ বীরমূর্তি দর্শনে জাঁদরেল পুলিস কর্মচারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। ('রেমিনিসেন্সেস্ অব্ স্বামী বিবেকানন্দ', ৯-১০ পৃঃ)।

নগেন্দ্রবাবুর স্মৃতিলিপিতে যে জনকল্যাণ-সাধনের উল্লেখ আছে, উহার সমর্থন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বিরচিত বাঙ্গালা জীবনীতেও পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন : "সন্ন্যাসীদের কর্মশীলতা শুধু পঠন-পাঠন, তর্ক-আলোচনাতেই নিবদ্ধ ছিল না। আর একটি জিনিসের অঙ্কুর এখন হইতে দেখা দিয়াছিল—সেটা হইতেছে সেবাধর্ম।...তখনও স্বামীজীর উপদেশে এই সকল সন্ন্যাসীরা নিজেরা না খাইয়াও ক্ষুৎকাতর দরিদ্র ও অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে আহার করাইতেন এবং গৃহী গুরুভ্রাতাদিগের পীড়া বা বিপদের সময় প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্য করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন কি কুষ্ঠরোগীর পর্যন্ত শুশ্রূষা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।" (১৭৫ পৃঃ)।

মঠের গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও ঐকান্তিক অধ্যাত্মসাধনার মধ্যেও প্রাণখোলা ও নির্দোষ হাস্যকৌতুকের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন আনন্দময় মহাপুরুষ ; সুতরাং অমৃতের সন্তানগণ কেন অমৃতের অধিকারী হইবেন না? রঙ্গরসপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও ছিলেন সকলের পথপ্রদর্শক। এতদ্ব্যতীত তারকনাথ, যোগীন্দ্র এবং অপর কেহ কেহ বিচিত্র কথাবার্তা, এবং অদ্ভুত ভাবভঙ্গী ও কার্যকলাপের মাধ্যমে হাসির ফোয়ারা ছুটাইতেন। লাটু সেসকল দিনের কথা স্মরণ করিয়া ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "হামাদের মধ্যে তারকদা ছিল ভারী আমুদে।...কেবল লোকদের নকল করত আর বলত, 'তোদের নিয়ে একটু হাসি-ঠাট্টা করি বলে তোরা রাগ করিস নি ভাই।'"

মানবজীবনের এই সকল অত্যাবশ্যক ও অবর্জনীয় বিভিন্ন দিকের সহিত বরাহনগর-মঠের মূলধারা—আধ্যাত্মিকতা—চিরকাল শুধু গতানুগতিকভাবে অব্যাহত ছিল না, প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। দুঃখ, দারিদ্র্য, অপমান, অত্যাচার, অনাহার, রোগযন্ত্রণা ইত্যাদি সত্ত্বেও মঠবাসীরা সেসব দিনে যে আধ্যাত্মিকতার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা শতশত বৎসর নির্বিবাদে বহু সহস্র জীবনকে ফুলফলান্বিত করিবে—ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহাদের সে

কৃচ্ছ্রতাও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। কি উৎসাহ ও উদ্যমের দিনই না ছিল সেগুলি! আর তথাকার চিন্তা ছিল কতই না উদার ও সর্বতোমুখী! সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঠাকুরের ভাবরাশি সমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে মূর্তিপরিগ্রহের পূর্বে যে পরিবেশমধ্যে ঐকান্তিকভাবে লালিত-পালিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাহা বরাহনগরমঠে পূর্ণমাত্রায় সৃষ্ট হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রত্যেকটি সন্তান সেখানে সমবেত প্রচেষ্টা ও নিজস্ব উদ্যমের ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বজনীন ভাবাবলম্বনে অথচ নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে ভাবী বিরাট কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সে প্রস্তুতির মধ্যে একটা সার্বিক উদ্যম সুপরিস্ফুট ছিল—আধ্যাত্মিক, মানসিক, বৌদ্ধিক সর্বপ্রকার উন্নতির প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অবশ্য সর্ববিষয়ে অনুকূল ছিল না; এই ত্রুটি তাঁহারা কষ্টসহিষ্ণুতা ও যত্নাধিক্যের দ্বারা পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন—যদিও ইহার ফলে অনেকেরই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং কাহাকে কাহাকে অল্পবয়সেই দেহত্যাগও করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেসব পরের কথা। মঠজীবনের প্রথমাবস্থায় এই গভীরতার সঙ্গে ছিল সমগ্র বিশ্বের জন্য সামূহিক চিন্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও সাধনা যেমন ছিল দিগন্ত-প্রসারী, ইঁহাদেরও প্রস্তুতির ক্ষেত্র ছিল তেমনি সুবিশাল—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সর্বদেশের চিন্তাজগতে পরিব্যাপ্ত। তাঁহারা যেন তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন শুধু ভারতের জন্য নহে, পরন্তু বিশ্বমানবের জন্য।

উত্তর ভারত পর্যটন

স্বামী অভেদানন্দের মতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসাবলম্বনপূর্বক স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম পরিবর্তন হইলেও নূতন নাম তখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। আমরা বরং জানি যে, পরিব্রাজকরূপে ভারত-পরিভ্রমণকালে তিনি আত্মপরিচয় গোপন রাখিবার জন্য বিভিন্ন নামের আশ্রয় লইতেন এবং ইহাও জানা যায় যে, কিছুদিন বিবিদিষানন্দ নামটি ব্যবহারের পর উহা বর্জনপূর্বক স্বামী সচ্চিদানন্দ নাম গ্রহণ করেন ; সর্বশেষে আমেরিকা গমনের প্রাক্‌কালে তাঁহার নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ, এবং এই নামেই তিনি জগদ্বরেণ্য হন। বন্ধুবান্ধব ও অনুগতরা কিন্তু তাঁহাকে স্বামীজী বলিয়া ডাকিতেন। আমরাও অতঃপর তাঁহাকে স্বামীজী, স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু বিবেকানন্দ নামে উল্লেখ করিব। তাঁহার গুরুভ্রাতারাও এখন সন্ন্যাসী। অতএব অতঃপর তাঁহাদেরও সন্ন্যাস নামই ব্যবহার করিব।

ভগিনী নিবেদিতার মতে গুরু, গীতা ও গঙ্গা—অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ, হিন্দুশাস্ত্র ও পুণ্যভূমি ভারত—এই ত্রিধারার সম্মিলনে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসিয়া অধ্যাত্ম রাজ্যের প্রেরণা ও অনুভূতি-সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় জীবনে যে পথানুসরণে তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহার সমর্থন ও সাক্ষ্য এবং তাহার পক্ষ-প্রতিপক্ষাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষ পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন অতীত যুগের মুনি ঋষি ও পূর্বসূরিদিগের দ্বারা প্রচারিত শাস্ত্রগ্রন্থে। আর অধ্যাত্মবিষয়ে মননের সহায়করূপে তিনি লাভ করিয়াছিলেন গুরুভ্রাতা, বন্ধুবান্ধব ও অতিথি-অভ্যাগতদিগকে। অতঃপর গুরুমুখে শ্রুত ও শাস্ত্রে লব্ধ তথ্যসমূহের চাক্ষুষ রূপায়ণ তিনি দেখিয়াছিলেন জন্মভূমি ভারতের বাস্তব জীবনে—তীর্থযাত্রাকালে মঠ-মন্দির আশ্রমে, সাধু ও পণ্ডিতবর্গের সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে, অগণিত জনসাধারণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ ও আলাপ-ব্যবহারের মাধ্যমে। স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দ[১] ঐসব দিনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,

১ স্বামী নির্মলানন্দ প্রথমে এই দাবি করিতেন, পরে প্রকারান্তরে অস্বীকারও করিতেন।

"সেসব কি গুলজারের দিনই গিয়াছে, এক মিনিট হাঁফ ছাড়িবার জো ছিল না, দিনরাত বাইরের লোক আসা-যাওয়া করিতেছে। পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন—ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে; কিন্তু স্বামীজী এক মুহূর্তও তাহাতে কাতরতা, বিরক্তি বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন না। কি আধ্যাত্মিক বিদ্যা, কি সাধারণ বিদ্যা—তিনি সর্বদা সকল বিষয় আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। বড বড় পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির আগমন হইয়াছে—তাঁহারা সন্ন্যাসীদের সহিত ধর্ম বা দর্শনাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত বচন ও শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া গোঁড়ামির ভিত্তি পাকা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমনি সময়ে স্বামীজী প্রবল যুক্তির অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মতসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেন। তিনি দেখাইতেন যে, সংস্কৃতবিদ্যা বা শাস্ত্রের মূলসকল এ দেশীয় লোকের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনের উন্নতি ও অবনতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। দেশকে উপেক্ষা করিয়া দেশবাসীর প্রাণের নিকট হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া শাস্ত্রকে দেখিলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মবোধ হওয়া দুঃসাধ্য। শাস্ত্র কতকগুলি মনগড়া কাল্পনিক নিয়ম মাত্র নহে; কিন্তু জাতির গঠন ও পরিপুষ্টিই তাহার মুখ্যতম উদ্দেশ্য।

"আবার যখন খৃষ্টীয়ান পাদরী আসিয়া হিন্দুধর্মের অসারত্ব প্রতিপাদন মানসে তর্ক জুড়িতেন, তখন তাহাদের উৎপাত নিবারণের জন্যও তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত। কিন্তু সে ক্ষুরধার বুদ্ধির নিকট উহারা অগ্রসর হইতে পারিবে কিরূপে? তাহাদের সকল বিতণ্ডা খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইত। অবশেষে যখন তাহারা তর্কে বিধ্বস্ত হইয়া পরাজয় স্বীকারের উপক্রম করিত, তখন আবার স্বামীজী তাহাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় খৃষ্ট-হৃদয়ের অদ্ভুত প্রেমের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিতেন।"

স্বদেশকে শাস্ত্রের রূপায়ণ-ক্ষেত্ররূপে উল্লেখ করিয়া স্বামী সদানন্দ ভগিনী নিবেদিতার কথিত তৃতীয় উপাদানের গুরুত্ব-বিষয়েই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গঙ্গা বলিতে নিবেদিতা স্বামীজীর স্বদেশ পুণ্যভূমি ভারতকেই বুঝিয়াছিলেন; আর স্বামীজীর দৃষ্টিতেও পুতসলিলা জাহ্নবীর দানস্বরূপ প্রাপ্ত সুজল সুফল স্বদেশ ছিল ভাগীরথীরই ন্যায় পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র অথবা বিরাট মহামায়ারই কায়াবিশেষ—গঙ্গারই মতো জাগ্রতা দেবতা। গুরু ও শাস্ত্রের পর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি এখন ভারতেরই দিকে আকৃষ্ট হইল। আমরা বলিতে চাহি

না যে, পূর্বে তিনি কখনও ভারতের কথা ভাবেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জীবনে এই ত্রিধারা সম্মিলিতভাবে সদা প্রবাহিত থাকিলেও ঐতিহাসিক ক্রমবিশ্লেষের দিক হইতে দেখিতে গেলে মনে হয় সময়বিশেষে এক একটি ধারা প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং চাহিয়াছিলেন, ভাবজগৎ ও মর্ত্যজগৎকে দুই অতিবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিমধ্যে সীমায়িত না রাখিয়া ঐ দৃষ্টিদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সূত্র দেখাইতে—অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে ধূলিসাৎ করিয়া নহে, প্রত্যুত যে ঈশ্বর সাধারণতঃ জগদতীতরূপে প্রতিভাত হন, তাঁহাকে নিখিল বিশ্বের আধার ও সর্বানুস্যূতরূপে অনুভব করিয়া। এইজন্যই তিনি নরেন্দ্রকে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া থাকিতে দেন নাই, এইজন্যই নরেন্দ্র শক্তি স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, এইজন্যই তিনি সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন —চোখ বুজলে তিনি আছেন, চোখ চাইলে কি নাই? অতএব এখন বিধি-নির্দেশেই স্বামীজীর ভারত পর্যটন আরম্ভ হইল।

পর্যটনস্পৃহা ভারতের পরিব্রাজকদের মজ্জাগত। কথায় বলে—"রমতা সাধু বহতা পানি"—সাধু যদি প্রবহমানা নদীর মতো অবিরাম চলিতে থাকেন, তবে স্রোতস্বতীতে যেমন ময়লা জমে না, সাধুর জীবনও তেমনি নিষ্কলঙ্ক থাকে। আর বিভিন্ন তীর্থে ভগবান কত বিবিধভাবে বিরাজিত থাকিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন এবং নির্বিচারে কৃপা বিতরণ করিতেছেন, তাহা দেখিতে কোন্ ব্যক্তির না হৃদয়ে উৎসাহ জাগে? বিশেষতঃ যাঁহারা ভগবান লাভের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা যে তাঁহাকে সমস্ত সম্ভব স্থলে খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা তো অতি স্বাভাবিক। নবপ্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মঠের সাধুদের জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। মঠপ্রতিষ্ঠার পর হইতেই কেহ না কেহ প্রায়ই বাহিরে যাইতেন, কখন কখনও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী) এবং আরও দুই-একজন ছাড়া মঠ শূন্যপ্রায় হইয়া যাইত। কেহ যাইতেন অল্প কালের জন্য, কেহ যাইতেন সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রা ও তপস্যায়। এদিকে স্বামীজী চাহিতেন, তাঁহার গুরুভ্রাতারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকুন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে গড়িয়া উঠুন। সেই প্রথমবারে যখন স্বামী ত্রিগুণাতীত (সারদাপ্রসন্ন) পদব্রজে বৃন্দাবনের উদ্দেশে বাহির হইয়া কোন্নগর হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন কথাচ্ছলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল) যেই বলিলেন, "আমি নিজেও মনে কচ্ছি একবার তীর্থ ভ্রমণে বেরুবো", অমনি স্বামীজী ভর্ৎসনা করিলেন, "হাঁ, তা যাবে বই কি!

ঐ রকম ভবঘুরের মতো বেড়ালেই ভগবান সশরীরে দেখা দেবেন আর কি!" অপরকেও তিনি প্রয়োজনস্থলে ঐরূপ বলিতেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর চিরন্তন ধারা, দৈব নির্দেশ এবং তৎকালীন পরিবেশ হইতে উদ্ভূত এই আগ্রহ প্রতিহত করা তখন সম্ভব হয় নাই—কারণ ঐ ধারার স্থান গ্রহণ করিতে পারে এমন কোন পরিকল্পনা তখনও রূপ পরিগ্রহ করে নাই। বিশেষতঃ এক মহাসুদূরের অস্পষ্ট আহ্বান স্বামীজীর নিজের হৃদয়-কোণকেও ক্ষণে ক্ষণে আলোড়িত করিত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রথম প্রথম মঠটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ভয়ে এই ভাব চাপিয়া রাখিলেও তাঁহার কথাবার্তায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া বাহির হইত; অন্তর্নিহিত রুদ্ধ আবেগ মাঝে মাঝে ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় সবেগে বাহির হইয়া অপর সন্ন্যাসীদের মনকেও পরিব্রাজক-জীবনের জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিত, অচঞ্চল থাকিতেন শুধু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী)। তাঁহার সম্বন্ধে স্বামীজী নিজে বলিয়াছিলেন, "আমি সকলের মনে আগুন জ্বালিয়েছিলুম, সকলকে মঠ ছাড়িয়ে ভিক্ষাবলম্বী সন্ন্যাসী করেছিলুম, পারিনি শুধু শশীকে। শশীকে জানবি মঠের মেরুদণ্ডস্বরূপ।"

বরাহনগরের প্রথমাবস্থায়, অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্বামীজী বড় একটা বাহিরে যাইতেন না—মঠেই থাকিতেন। তখন স্বাস্থ্য উদ্ধারাদির জন্য অল্প কয়েক দিন দুই-তিনটি জায়গায় ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন মাত্র। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি জ্বর-বিকারে ভুগিয়াছিলেন এবং রোগমুক্ত হইয়া বৈদ্যনাথ ও শিমূলতলায় বার কয়েক গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্রাবলী হইতে জানা যায় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি অযোধ্যা হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ঐ সূত্রে আরও জানা যায়, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কামারপুকুরে গিয়াছিলেন। এইসব কথা আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। প্রথম প্রথম এইরূপই চলিয়াছিল, কিন্তু পরে পরিব্রাজকজীবনের আকর্ষণ প্রবলতর হইয়া উঠিল। প্রারম্ভাবস্থায় বাহিরে যাইবার পূর্বে প্রত্যেকবারই বলিয়া যাইতেন, "এই শেষ, আর ফিরছি না।" কিন্তু প্রতিবারই কোনও না কোন কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মঠে ফিরিতে হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি যে সুদীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হন তাহা হইতে ফিরিয়া আসা সম্ভব হইয়াছিল, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ছয় বৎসর পরে। তন্মধ্যে ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতভ্রমণের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে। ঐ সময়ে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা অপরে জানে না অথবা এমন কত আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইয়াছে, যাহা

স্বামীজী ব্যতীত আর কাহারও জানার সম্ভাবনা ছিল না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার সহিত তাঁহার কোনও গুরুভ্রাতা বা শিষ্য থাকিতেন বলিয়া আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। ঐ কালমধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু) ব্যতীত অপর গুরুভ্রাতাদের সকলেরই সহিত তাঁহার মিলন ঘটিয়াছিল এবং ইঁহাদের জীবনী ও বাণীতে ও পত্রাবলী ইত্যাদিতে স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষতঃ স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা' খুবই মূল্যবান। এতদ্ব্যতীত স্বামীজীর নিজের বক্তৃতা ও বার্তালাপে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, যদিও সেগুলি অস্পষ্ট ও তাহাদের স্থানকালাদি নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। এই সকল অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ না হইলেও মোটামুটি একটা ধারাবাহিক বৃত্তান্ত উপস্থিত করা একান্ত অসম্ভব নহে।

মঠ ছাড়িয়া দূরবর্তী তীর্থ দর্শনের সঙ্কল্প লইয়া তিনি প্রথম গমন করেন বারাণসীধামে। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ এবং ঠাকুরের ভক্ত বলরামবাবুর পুত্র রামবাবুর গৃহশিক্ষক ও তাঁহাদেরই গুরুবংশীয় শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য (বা ফকির)। ৺বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে তিনি এক সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন এবং পূতসলিলা সুরধুনী, পূজা-ধ্যানাদিনিরত সহস্র নরনারী, অগণিত মন্দির এবং ৺বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও দুর্গাদেবীর বিগ্রহ দর্শনে তাঁহার মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আর এই পবিত্র ধামে ভগবান বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের কীর্তিকলাপ স্মরণে তাঁহার ঐতিহাসিক চেতনা অতিশয় প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। একদিন ৺দুর্গামন্দির হইতে প্রত্যাবর্তনকালে[২] একপাল বানর তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহার ভয় হইল, বানররা তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে; সুতরাং তিনি দ্রুত পলাইতে লাগিলেন, কিন্তু বানররাও পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। এমন সময় একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ডাকিয়া বলিলেন, "থামো, জানোয়ারদের সম্মুখে রুখিয়া দাঁড়াও।" তদনুসারে স্বামীজী নির্ভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাকে বিগতভয় দেখিয়া বানরগুলি এক মুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইল ও পরে পলায়ন করিল। পরবর্তী জীবনে আমেরিকায় বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইহার মর্মকথা শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন, "অতএব, প্রকৃতির সম্মুখে রুখিয়া দাঁড়াও; অবিদ্যার সম্মুখে

২ বাঙ্গালা জীবনীর মতে প্রভাতে মন্দিরে যাইবার কালে।

রুখিয়া দাঁড়াও ; মায়ার সম্মুখে রুখিয়া দাঁড়াও! কখনও পলায়ন করিও না।" তিনি বুদ্ধদেবের কীর্তিস্থল সারনাথ দেখিতেও গিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন ঐ স্থানের ভগ্ন স্তূপ ও মঠাদি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

কাশীতে তিনি শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাসের আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। ইনি স্বামীজীকে বঙ্গের কৃতিসন্তান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ করাইয়া দেন এবং স্বামীজী তাঁহার সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। বিদায়ের পর ভূদেববাবু মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আশ্চর্য বটে! এই অল্প বয়সেই এত অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি! আমি বলিতে পারি, ইনি ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইবেন।" স্বামীজী স্বনামধন্য পুজ্যপাদ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকেও দেখিতে গিয়াছিলেন। ইনি তখন মৌনাবলম্বনে স্বাত্মধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। স্বামীজী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এককালে এই মহাপুরুষের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ আছে কিনা? মৌন মহাপুরুষ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, দ্বৈতবোধ থাকিলে ভেদ আছে, নতুবা এক। অতঃপর স্বামীজী ভারতবিশ্রুত বিদ্বান সাধু স্বামী ভাস্করানন্দকে দর্শন করিতে গেলে কথায় কথায় কাম-কাঞ্চন-জয়ের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। ভাস্করানন্দের বক্তব্য ছিল, "কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে কিনা সন্দেহ।" এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের মূর্ত বিগ্রহ এবং তাঁহার শিক্ষা এই যে, কামকাঞ্চনত্যাগ ব্যতীত ঈশ্বরদর্শন সুদূর পরাহত ; তিনি তাঁহার ত্যাগী সন্তানদিগকে এই সত্য নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন ও অতি যত্নসহকারে শিখাইয়াছিলেন। অতএব স্বামীজী আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "কি বলেন মহাশয়, সন্ন্যাসধর্মের মূল ভিত্তিই যে ওই!" ভাস্করানন্দ ইহাতে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি জান?" স্বামীজী তখনও দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি নিজে এরূপ ব্যক্তি দেখিয়াছি।" একদিকে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ, অন্যদিকে ভাস্করানন্দের বহুল অভিজ্ঞতাজনিত বদ্ধমূল ধারণা। এরূপ বিরোধস্থলে সিদ্ধান্ত না হইয়া বিতণ্ডার উদ্ভব হয় ; অতএব স্বামীজী সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ইহার বহু বৎসর পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ভাস্করানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাদিগকে যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও গুরুভ্রাতা জানিয়া বিশেষ সমাদর করেন ও স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ দেখান।

কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ স্বামীজীর যাওয়া সম্ভব হয় নাই; শুধু সংস্কৃতে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ভাস্করানন্দ কোন কালেই জানিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই পূর্বদৃষ্ট যুবকই স্বামী বিবেকানন্দ।

কাশী হইতে বরাহনগরে ফিরিয়া স্বামীজী অভ্যাসানুরূপ ধ্যান-ধারণা, আলাপ-আলোচনা ও শাস্ত্রপাঠাদিতে ডুবিয়া গেলেন। পার্থক্যের মধ্যে কেবল এই যে, এই তীর্থদর্শনকালে তিনি ভারতাত্মার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছিলেন ও বহু বিচিত্র মতবাদেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পূর্বাপেক্ষা প্রসারিত হওয়ায় এখন তিনি চাহিতেন যে, গুরুভ্রাতাদের চিন্তারাজ্যও অনুরূপ বিস্তারলাভ করুক। চকিতে তাঁহার মনে ধর্মপ্রচারের সঙ্কল্প উঠিত এবং দুঃস্থ ও নিপীড়িতদের দুঃখমোচনার্থ কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অভিলাষ জাগিত। বেদান্ততত্ত্বকে কার্যে পরিণত করার চিন্তায় তাঁহার মন উদ্বেলিত হইত। গুরুভ্রাতাদের মধ্যেও তিনি ধর্মের এই নবীন ধারণা অনুসংক্রামিত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। সেই আদিযুগেও তিনি তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্যদের গৃহে ধর্মপ্রচারের জন্য যাইতে বলিতেন; কিন্তু সাধুরা তখন প্রচারবিরোধী—তাঁহাদের মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, গুরুপ্রদর্শিত পথে চলিয়া ঈশ্বরলাভ। স্বামীজীও তো পূর্বে এই মতই পোষণ করিতেন। সকলের প্রবক্তৃরূপে স্বামীজীও বলিতেন—ঈশ্বর-লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য; জীবন গঠিত হইয়া গেলে প্রচারকার্য পরোক্ষভাবে আপনা-আপনি হইতে থাকে, যেমন হইতেছিল মৌনী মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর বেলায়। তীর্থ হইতে ফিরিয়া তিনি এখন বলিতেন—"সকলেই প্রচারকার্যে রত; কিন্তু তারা সেটা অজ্ঞাতসারে করে। আমি সেটা জেনেশুনে করব, এমন কি, তোরা যে আমার গুরুভাই, তোরাও যদি তার প্রতিবন্ধক হোস, তবু আমি ছাড়ব না—দীনহীন চণ্ডালের কুটীরে পর্যন্ত গিয়ে প্রচার করে আসব। প্রচার মানে ভাবের বহিঃপ্রকাশ। ত্রৈলঙ্গ স্বামী মৌন আছেন এবং কথা বলেন না বলে কি প্রচার করছেন না? তাঁর মৌনই যে তাঁর ভাষণ। এমন কি গাছপালাও প্রচার করছে—শিক্ষা দিচ্ছে।"

প্রাচীন চিন্তাধারায় অভ্যস্ত মন অকস্মাৎ নূতন ধারায় চলে না; বুদ্ধি নবীনপথের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও প্রাণ সহজে সাড়া দেয় না—প্রাচীনকে নবীন পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াসাধিক্যের প্রয়োজন হয়, জাগতিক অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যের জন্যও অপেক্ষা করিতে হয়। স্বামীজীর মনে গণনারায়ণের

সেবার আকৃতি জাগিতেছিল ; কিন্তু উহা তখনও তাঁহার হৃদয়ে তেমন এক অনিবার্য শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই যাহা সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া আপন পথ করিয়া লইতে প্রস্তুত। তখনও স্বামীজীর প্রস্তুতির সময় পুর্ণ হয় নাই, আর সে প্রস্তুতি ঘটিতেছিল প্রধানতঃ বরাহনগরেরই আব-হাওয়ার মধ্যে। স্বামীজী ছিলেন ভগবানেরই চিহ্নিত ধর্মবক্তা, যাঁহার জ্বালাময়ী ভাষণ মৃত প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিবে, নিরাশ হৃদয়ে আশার স্রোত প্রবাহিত করিবে, আর সে সব সচেতন বাণীর প্রথম শ্রোতা ছিলেন বরাহনগরেরই ভ্রাতৃবৃন্দ ও মুষ্টিমেয় ভক্তগণ। ভাবী বিবেকানন্দ এই ভাবেই রূপ পরিগ্রহ করিতেছিলেন।

এই বারে স্বামীজীর বরাহনগরে অতি অল্প দিনই অবস্থিতি ঘটিয়াছিল ; কারণ সন্ন্যাসীর নির্জন তপস্যার আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই মনে জাগিতেছিল। অতএব শীঘ্রই আবার উত্তর ভারতের তীর্থদর্শনে নির্গত হইলেন। তাঁহার প্রথম গন্তব্য স্থল ছিল বারাণসী। সেখানে শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মিত্র মহাশয় ধনবান এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের (গঙ্গাধরের) সহিত তাঁহার পুর্বেই পরিচয় ছিল। প্রমদা-বাবুর সহিত স্বামীজীর এই পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং উভয়ের মধ্যে অতঃপর বহু পত্রবিনিময় হইতে থাকে। তাঁহাকে লিখিত স্বামীজীর পত্রসমূহ স্বামীজীর গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

কাশী হইতে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগানে মুখরিত অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণপুত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিলেন। রামায়ণের সহিত সুপরিচিত তাঁহার মনে তখন অতীতের কত অপুর্ব স্মৃতিই না ভাসিয়া উঠিয়াছিল! অযোধ্যার পর লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হইয়া তিনি অযোধ্যা-রাজ্যের নবাবগণের কীর্তির সাক্ষ্যস্বরূপ উদ্যান, প্রাসাদ ও মসজিদ প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে আগ্রায় উপস্থিত হইলে মোগল সম্রাটদের অক্ষয় কীর্তি তাজমহল, আগ্রা দুর্গ প্রভৃতির অপুর্ব ভাস্কর্য তাঁহাকে আত্মহারা করিল। তাজকে বিভিন্ন দিক হইতে, আলোছায়ার বিভিন্ন পরিবেশমধ্যে এবং ঐতিহাসিক বিবিধ পরিপ্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া এবং উহার শিল্প-কুশলতার মুল্যায়ন করিয়া যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না ; বহু বার সেখানে গিয়া এবং বহু ভাবে দেখিয়া কেবলই ভাবিতেছিলেন—ভারতীয় শিল্প এককালে কি অদ্ভুত উৎকর্ষই না লাভ করিয়াছিল! তিনি বলিতেন,

"এই অত্যাশ্চর্য সৌধের প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থান ধৈর্যসহকারে সারাদিন ধরিয়া দেখিতে হয় এবং সম্পূর্ণরূপে ইহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে হইলে অন্ততঃ ছয় মাস দরকার।" আগ্রার দুর্গের কক্ষগুলি, মন্ত্রণাগৃহ, মসজিদ ইত্যাদি একের পর এক দেখিতে দেখিতে তিনি মোগল গৌরবের স্মৃতিতে ডুবিয়া গিয়াছিলেন।

আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া তিনি আগস্ট মাসের প্রারম্ভে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ ত্রিশ মাইল পথ তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু-হস্তে এবং দুই একখানি গ্রন্থ মাত্র সম্বল করিয়া পদব্রজে অতিবাহিত করিলেন। বৃন্দাবন পৌঁছিবার দুই মাইল পূর্বে দেখিলেন, একব্যক্তি পথের ধারে বসিয়া ধূমপান করিতেছে। স্বামীজী তখন শ্রান্ত ও ক্লান্ত এবং ভাবিলেন একটু ধূমপান করিলে নিজেকে অধিকতর সতেজ বোধ করিবেন। অতএব ধূমসেবীর নিকট যাইয়া তাহার ছিলিমে দুই একটা টান দিবার আগ্রহ জানাইলে সে অতি সঙ্কুচিতভাবে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি সাধু, আর আমি ভঙ্গী (মেথর)।" স্বামীজীরও মনে তখন অকস্মাৎ দৃঢ়মূল জাত্যাভিমান এবং আভিজাত্যের সংস্কার মস্তকোত্তলন করায় তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন এবং আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বেশী দূর যাইতে না যাইতেই তিনি ভাবিলেনঃ "আমি না সন্ন্যাসী হইয়াছি এবং জাতিবোধ, পারিবারিক সম্বন্ধ এবং এই জাতীয় অপর সব কিছুই ত্যাগ করিয়াছি! অথচ আমিই তাঁহার ছোঁয়া ছিলিমে তামাক খাইতে পারিলাম না! এ সবই শুধু দীর্ঘ সংস্কারের ফল।" এরূপ চলিতে পারে না। অতএব তিনি আবার সেই ভঙ্গীর সন্ধানে ফিরিলেন, ফিরিয়া দেখিলেন, তাহাকে যেখানে ফেলিয়া গিয়াছিলেন সেখানে বসিয়াই সে তখনও ধূম্রপানে নিরত। স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, "বাবা, এক ছিলিম তামাক সেজে দে না।" ভঙ্গী এবারেও পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল ; কিন্তু স্বামীজী কোন আপত্তি শুনিলেন না, তিনি অবশ্যই তামাক খাইবেন। অগত্যা লোকটি ঐ ছিলিমেই তামাক সাজিয়া দিল এবং উহা পান করিয়া স্বামীজী পুনর্বার বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর মুখে এই কাহিনী শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি গাঁজাখোর, তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কলকে টেনেছিলে।" তদুত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "না, জি. সি., সত্যই আমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছা হয়েছিল। সন্ন্যাস নিয়ে পূর্ব সংস্কার দূর হয়েছে কিনা, জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কিনা, পরীক্ষা করে

দেখতে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা মহা কঠিন—কথায় ও কাজে একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই।” জনৈক শিষ্যকে তিনি পরে বলিয়াছিলেন, “বাবা, তুই কি ভাবিস জীবনে সন্ন্যাসের আদর্শ পালন করা এতই সহজ! জীবনে আর কোন পথ এত কষ্টসাধ্য ও কঠিন নয়, খাড়া পাহাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে এতটুকু পা ফসকালে সোজা নীচে গিয়ে পড়বি। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়, জাতিবর্ণ, প্রভৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি হয়েছে কিনা। সেদিন আমার এই শিক্ষা হয়েছিল যে, কাউকে ঘৃণা করা চলবে না; বরং ভাবতে হবে যে, সকলেই ভগবানের সন্তান।”

বৃন্দাবনে পৌছিয়া তিনি বলরামবাবুদের ঠাকুরবাড়ী ‘কালাবাবুর কুঞ্জে’ আশ্রয় লইলেন। এখানে আসিয়া তিনি যেন রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাবিলাসের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইলেন এবং উহার ভাববন্যায় ভাসিয়া চলিলেন, নিজেকে সামলানো দুরূহ হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী তখন তাঁহার নিকট জীবন্ত বলিয়া মনে হইল এবং বৃন্দাবনে কয়েকদিন (১২ই হইতে ২০শে আগস্ট) কাটিবার পর ঐ ভগবল্লীলার নিবিড়তম পরিচয়লাভের জন্য পার্শ্ববর্তী অন্যান্য লীলাক্ষেত্র-দর্শনে চলিলেন। তাই আমরা তাঁহাকে একদা গোবর্ধনগিরিতে দেখিতে পাই। গোবর্ধন-পরিক্রমাকালে তিনি এই সঙ্কল্প করিলেন যে, অপ্রার্থিত ভাবে যে ভিক্ষা মিলিবে তাহাতেই তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবেন, এতদ্ব্যতীত কাহারও নিকট কিছু চাহিবেন না। প্রথম দিন দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার তাড়না অসহ্য হইয়া উঠিল, আবার তখন বৃষ্টিপাতও হইতে থাকিলে তাঁহার কষ্ট যেন সীমাতিক্রম করিয়া চলিল। ক্ষুধা ও পথশ্রমে হীনবল হইয়া তিনি কোন প্রকারে পথ বাহিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতেছে; কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। লোকটি তথাপি ক্রমেই তাঁহার নিকটবর্তী হইতে লাগিল এবং ডাকিয়া বলিল, সে তাঁহার জন্য খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছে। ইহা দৈবপ্রেরিত বলিয়া মনে হইলেও, ইহাতে সত্যই ভগবানের ইঙ্গিত আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য স্বামীজী দৌড়িয়া পলাইতে চাহিলেন। তখন লোকটিও ছুটিল এবং বহু দূরে গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ঐ ভোজ্যদ্রব্য স্বীকার করিতে অনুরোধ জানাইল। স্বামীজী যখন অবশেষে উহা গ্রহণ করিলেন তখন ঐ

ব্যক্তি আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া গেল। জনহীন প্রদেশে ভগবানের এই করুণার প্রমাণ পাইয়া স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল।

গোবর্ধন হইতে তিনি রাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। এখানে কৌপীন ব্যতীত তাঁহার কোন বহির্বাস ছিল না। অতএব স্নানের পূর্বে উহা খুলিয়া এবং ধৌত করিয়া শুকাইতে দিলেন এবং স্নানের জন্য কুণ্ডে অবতরণ করিলেন। স্নানান্তে তীরে উঠিয়া দেখেন কৌপীন নাই। এদিক সেদিক চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, এক বৃক্ষশাখায় একটি বানর তাঁহার কৌপীন লইয়া বসিয়া আছে। অনেক চেষ্টায়ও বানর যখন কৌপীন ছাড়িতে প্রস্তুত হইল না, তখন রাধারাণীর প্রতি অভিমানভরে স্বামীজী স্থির করিলেন, লজ্জানিবারণার্থ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিবেন এবং সেখানে অনাহারে দেহত্যাগ করিবেন। তিনি যখন ঐরূপ অভিপ্রায়ে ঐদিকে চলিয়াছেন, তখন একব্যক্তি একখানি নূতন গেরুয়া বস্ত্র ও কিছু খাদ্য লইয়া তাঁহার নিকট আসিল এবং তাঁহাকে ঐসকল গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিল। ঐ ব্যক্তি হয়তো সমস্ত ঘটনাটি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, ইহাও রাধারাণীরই আশীর্বাদ মনে করিয়া স্বামীজী ঐ উপহার গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি যখন কুণ্ডপার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন, তখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিলেন, যেখানে কৌপীন শুকাইতে দিয়াছিলেন, ঠিক সেখানেই উহা পড়িয়া আছে।[৩] এই সকল ঘটনা হইতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ভগবানের মঙ্গলহস্ত তাঁহাকে সর্বদা রক্ষা করিতেছে।

অতঃপর আমরা স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাই বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে হাতরাস রেল স্টেশনে। স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুপ্ত শিক্ষাবস্থায় মুসলমান প্রভাবসম্পন্ন জৌনপুর শহরে থাকার ফলে নিজ মাতৃভাষা বাংলা অপেক্ষা হিন্দী ও উর্দুর সহিত অধিক পরিচিত ছিলেন, আর যেন ছিলেন অমায়িকতা, সারল্য ও পুরুষোচিত তেজের প্রতিমূর্তি। তিনি কার্যব্যপদেশে সেদিকে যাইবার সময় দেখিলেন, একজন সাধু প্ল্যাটফর্মে

৩। ঘটনাটি ইংরেজী জীবনী অনুযায়ী (১৭৫ পৃঃ) লিপিবদ্ধ হইল। বাঙ্গলা জীবনীর বিবরণ একটু অন্যরূপ (১৮৫ পৃঃ)। ঐ মতে বানরটি কৌপীন ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য করিয়াছে দেখিয়া তিনি বনাভিমুখে চলিলেন। অমনি ঐ লোকটি তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তিনি দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। লোকটিও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া নিজ বাড়ীতে আনিল ও ভোজ্য দ্রব্য ও নববস্ত্র দান করিল।

মাটির উপর বসিয়া আছেন। যুবক সন্ন্যাসীর মুখে এমন একটা সৌম্যভাব বিদ্যমান ছিল, যাহাতে আকৃষ্ট হইয়া শরচ্চন্দ্র ভাবিলেন, সাধুর জন্য কিছু করিতে পারিলে ভাল। অতএব নিকটে গিয়া প্রাথমিক অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী আপনি কি ক্ষুধিত?" সাধু উত্তর দিলেন, "হাঁ।" শরৎ বলিলেন, "তবে দয়া করে আমার ঘরে আসুন।" স্বামীজী বালকোচিত সারল্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি খেতে দেবেন?" শরচ্চন্দ্র এক পারস্য-দেশীয় কবির ভাষায় বলিলেন, "হে প্রিয়, তুমি আমার ঘরে এসেছ, আমি সুন্দর মসলা সহ আমার কলিজাটা রেঁধে তোমায় খাওয়াব।" স্বামীজী আতিথ্যগ্রহণে স্বীকৃত হইলে শরচ্চন্দ্র তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং দৈনিক কার্য সমাপনান্তে সাধুটিকে ভাল করিয়া দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইলেন। স্বামীজীর চক্ষুই বিশেষভাবে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা ও অনুরাগে মনপ্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল। তিনি পরে বলিতেন, "আমি স্বামীজীর সেই ভয়ঙ্কর চক্ষু দুইটিরই পিছু লইলাম।" স্বামীজীর গুণমুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে দিনকতক হাতরাসে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন আর বলিলেন, "আমায় কিঞ্চিৎ উপদেশ দিন।" উত্তরচ্ছলে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য হইতে সুন্দরের প্রতি মালিনীর উক্তিটি স্বামীজী সুর করিয়া গাহিলেন—

বিদ্যা যদি লভিতে চাও, চাঁদমুখে ছাই মাখ,
নইলে এই বেলা পথ দেখ।

শরচ্চন্দ্র তখনই বলিলেন, "স্বামীজী, আপনি যা বলবেন আমি তাই করতে রাজী আছি; আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধরচন্দ্র গুপ্ত অনেক পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং শরচ্চন্দ্রের নিকট ইহা নূতন নহে। স্বামীজী তখনই কিছু বলিলেন না।

কথায় কথায় স্বামীজী শুনিতে পাইলেন, ব্রজেনবাবু নামক এক ভদ্রলোক নিকটেই থাকেন। যতটুকু শুনিলেন, তাহাতে স্বামীজীর মনে হইল ইনি যেন তাঁহার পরিচিত; অতএব ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শনমাত্র চিনিতে পারিলেন এবং ব্রজেনবাবু স্বামীজীকে কিছুদিন স্বগৃহে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সুতরাং দিন কয়েক পরে শরৎবাবুর গৃহে ফিরিয়া যাইবেন এই অঙ্গীকার জানাইয়া

স্বামীজী আপাততঃ সেখানেই থাকিয়া গেলেন। ঐ বাটীতে অবস্থানকালে তাঁহার আকর্ষণে বাঙ্গালীটোলার লোক যেন সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিছুদিন পুর্বে ইহাদের মধ্যে বেশ একটু দলাদলি ও মনোমালিন্য চলিতেছিল; স্বামীজীর উপস্থিতিতে উহা বিদূরিত হইল। সমাগত ব্যক্তিদের সহিত তিনি ধর্ম ও স্বদেশ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। শরৎবাবু এবং তাঁহার বন্ধু নটকৃষ্ণ-বাবুর গৃহেও তিনি প্রায়ই যাইতেন এবং তাঁহাদের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ইঁহাদের আগ্রহে স্বামীজী অতঃপর কিছুদিন ইঁহাদেরই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং পুর্বেরই ন্যায় আগন্তুক ব্যক্তিদের সহিত সদালাপে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠসঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তিও নিত্য তাঁহার আসরে যোগ দিতেন। সন্ধ্যাকালটা সঙ্গীতেই ব্যয়িত হইত।

একদিন শরচ্চন্দ্র স্বামীজীকে বলিলেন, "আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?" মুহূর্তমাত্র নীরব থাকিয়া স্বামীজী বলিলেন, "দেখ বাবা, আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল—কি করে এটা উদ্‌যাপিত হবে। এ ব্রত পরিপুর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি—আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে আধ্যাত্মিকতা অতি ম্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতার বলে জগৎ জয় করতে হবে।" সে কথার প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় শরচ্চন্দ্র হৃদয়ের পুর্ণ আবেগ লইয়া বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি স্বামীজী, কি করতে হবে বলুন।" সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু গ্রহণ করে এই মহাকার্যে ব্রতী হতে রাজী আছ? তুমি কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারবে?" শরচ্চন্দ্র নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, "পারব" এবং পরীক্ষা দিবার জন্য ভিক্ষাপাত্রহস্তে স্টেশনের কুলিদের গৃহে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া গেলেন। শরচ্চন্দ্রের মনের দৃঢ়তা ও সৎসাহস দর্শনে স্বামীজী অতীব প্রীত হইলেন।

শরচ্চন্দ্রের ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের দিনগুলি আনন্দেই কাটিতেছিল, কিন্তু একদিন সকালে স্বামীজী ঘোষণা করিলেন, তিনি হাতরাস ত্যাগ করিবেন। শরচ্চন্দ্রকে বলিলেন, "আর আমার এখানে থাকা চলবে না। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের এক জায়গায় অধিক দিন থাকা উচিত নয়। তা ছাড়া আমি

তোমাদের ভালবাসার টানে পড়ে যাচ্ছি—এও তো ধর্মজীবনের একটা বন্ধন। আমায় আর পীড়াপীড়ি করো না।" স্বামীজীকে বিদায়ের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় দেখিয়া শরৎ ও তাঁহার বন্ধু অতীব দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন তাঁহাদিগকে তাঁহার শিষ্য করিয়া লন। স্বামীজী বলিলেন, "কেন ? তোমরা কি মনে কর যে, আমার চেলা হলেই ধর্মজীবনে তোমাদের সব পাওয়া হয়ে যাবে ? মনে রেখো, ভগবান সর্বব্যাপী। তাহলে তোমরা যাই করো না কেন, তা তোমাদের ধর্মের সহায় হবে। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের এখানে ফিরে আসব।" শরচ্চন্দ্র কিন্তু তবু পশ্চাৎপদ হইলেন না, অগত্যা স্বামীজী তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। তারপর শরৎ তাঁহার কার্যভার অপরকে দিয়া স্বামীজীর সহিত হৃষীকেশ চলিলেন।[৪]

কল্পনার চক্ষে সন্ন্যাসীর জীবন যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া শরচ্চন্দ্র দেখিলেন উহা তদপেক্ষাও কঠিন। গৃহসুখে অভ্যস্ত তাঁহার দৃষ্টিতে এই সন্ন্যাসজীবন বহু কঠোর সাধনা, অনিশ্চয়তা ও কায়ক্লেশের সমষ্টিস্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইল ; তিনি যেন এই বিপদসঙ্কুল জীবন সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। শরচ্চন্দ্র পরে বলিয়াছিলেন, "একবার হিমালয়ের পাহাড়গুলিতে ভ্রমণকালে আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন ও মূর্ছিত হয়ে পড়লে স্বামীজী শুশ্রূষা করে আমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। আর একবার এক ভয়াবহ, খরস্রোতা ও পিচ্ছিল-প্রস্তরাকীর্ণ পার্বত্য স্রোতস্বিনী অতিক্রমকালে তিনি সহিসের মতো আমার ঘোড়াটিকে ধরে ধরে নিয়ে চলেছিলেন। আমার জীবনরক্ষার জন্য তিনি কতবারই না নিজ জীবন তুচ্ছ করেছিলেন। বন্ধুগণ, আমি তাঁর কথা কি করে বলব ? শুধু বলতে পারি—তিনি ছিলেন প্রেমময়, প্রেমমূর্তি, প্রেমস্বরূপ ! আমি যখন এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, কোন প্রকারে টলে-মলে চলতে পারি, তখন তিনি আমার সব জিনিস এমন কি জুতা পর্যন্ত নিজ স্কন্ধে বহন করেছেন।" তাই আমরা দেখিতে পাই, পরে যখন গুরুতর রোগাক্রান্ত শরচ্চন্দ্র একবার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিয়া স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে কি শেষপর্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন, তখন স্বামীজী স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনার সহিত বলিয়া-

৪। এই সকল ঘটনার বিবরণ বাঙ্গলা জীবনীতে একটু অন্যরূপ (পৃঃ ১৪৩-৪৮, ৩য় সংস্করণ) ; আমরা অদ্বৈতাশ্রমের ইংরেজী জীবনীর অনুসরণ করিলাম (পৃঃ ১৭৫-৭৭)।

ছিলেন, "কি আহাম্মক ! তোর কি মনে নেই যে, আমি তোর জুতো পর্যন্ত রয়েছি ?" আর একবার ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা এক জায়গায় আসিয়া দেখিলেন, মানুষের কতকগুলি অস্থি ও গেরুয়া বস্ত্রের জীর্ণ খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্বামীজী ঐ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখ, ওখানে একজন সাধুকে বাঘে খেয়েছে ; তোর ভয় হচ্ছে কি ?" শিষ্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না স্বামীজী, আপনি কাছে থাকলে কোনো ভয় নেই।" পরবর্তী কালে চিত্তের যে দৃঢ়তা এবং অপরের মনে সাহস সঞ্চারের ক্ষমতা স্বামীজীর জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, এই আদিযুগেও, যখন তিনি একজন অতি সাধারণ সাধু ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না, তখনও তাহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, ইহা শরচ্চন্দ্রের কথা হইতেই প্রমাণিত হয়।

হৃষীকেশে স্বামীজী শিষ্যসহ অপর সাধুদেরই ন্যায় বাস করিয়াছিলেন। এখানে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত পরিবেশ পাইয়া স্বামীজী বিশেষ প্রফুল্ল ছিলেন এবং সাধনভজনে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।[৫] গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি এবং নাতিদূরবর্তী হিমালয়ের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। কিন্তু এমনি সময়ে শিষ্য কঠিন রোগাক্রান্ত হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে হাতরাসে লইয়া চলিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, তিনি হৃষীকেশে দীর্ঘকাল বাস করিবেন এবং পরে কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে যাইবেন ; কিন্তু আপাততঃ সে বাসনা ত্যাগ করিতে হইল। অতএব গুরু ও শিষ্য দুই জনই হাতরাসে ফিরিলেন। ইহাতে পুরাতন বন্ধুরা সকলেই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু হৃষীকেশে থাকা-কালে ম্যালেরিয়ার বীজাণু স্বামীজীর দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাই তিনি প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বরাহনগরের সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহাকে সেখানে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। ইতিমধ্যে স্বামী শিবানন্দ

৫। 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' (১৮৯ পৃঃ) একটি ঘটনা বলা হইয়াছে ; শরচ্চন্দ্র একদিন উভয়ের জন্য খিচুড়ি রাঁধিতেছেন এমন সময় স্বামীজী দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে গমনোদ্যত হইয়া বলিলেন, "তুই দেখছি গুপ্ত, আমার পায়ের বেড়ি হলি। আমি সব ছেড়ে একা বেড়াচ্ছি, তুই এসে এক উৎপাত জুটলি। এবার আমি নিজের ভাবে চললুম—আর এখানে নয়।" তিনি সত্যই চলিয়া গেলেন। শরচ্চন্দ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনাহারে বসিয়াই আছেন, এমন সময় তিন-চারি ঘণ্টা পরে স্বামীজী আসিয়া বলিলেন, ক্ষুধা পাইয়াছে, তিনি খাইবেন ; আর বলিলেন যে, শরচ্চন্দ্র সত্যই তাঁহার পায়ের বেড়ি। তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া সম্ভব নহে।

(তারক) উত্তরাখণ্ড দর্শনমানসে যাত্রা করিয়া হাতরাসে পৌছিয়া স্বামীজীর সংবাদ পাইলেন এবং বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক গুরুভ্রাতাকে লইয়া বরাহনগরে ফিরিয়া চলিলেন। যাত্রাকালে স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে বলিয়া গেলেন তিনিও যেন সুস্থ হইয়া বরাহনগরে যান। কয়েক মাস পরে শরচ্চন্দ্র যখন পুনর্বার স্বাস্থ্যলাভ করিলেন, তখন চাকুরি ত্যাগ করিয়া মঠে উপস্থিত হইলেন এবং বিধিমত সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক স্বামী সদানন্দ নামে পরিচিত হইলেন।

এবারে স্বামীজী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে বরাহনগর মঠে পৌছিয়া পূর্ণ একটি বৎসর গুরুভ্রাতাদের সহিত আনন্দে কাটাইলেন—শুধু মাঝে একবার ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাতের জন্য শিমূলতলায় গিয়াছিলেন। তিনি হাতরাস হইতে ফিরিয়া অবশ্য অধিকাংশ সন্ন্যাসীকেই মঠে দেখিতে পান নাই ; কারণ তখন তাঁহারা তীর্থাদিতে ভ্রমণে বা তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু গৃহী ভক্তেরা সকলেই স্বস্বগৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন। পূর্বের ন্যায় এবারেও স্বামীজী অবশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের সহিত ধ্যান-ধারণাদিতে ডুবিয়া গেলেন—শুধু বিশেষ এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্রত উদ্‌যাপনের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা স্বামীজী স্পষ্টতর ও অধিকতর তেজোময় ভাষায় গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ভবিষ্যতে তিনি যে অগ্নিময়ী বাণী উচ্চকণ্ঠে দ্বিধাহীনভাবে জগতের সর্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ পূর্বাভাষ এই সময়েই পাওয়া গিয়াছিল—পার্থক্য ছিল প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং স্পষ্টতায়। তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করিয়া অখণ্ড ভারতের কথা ভাবিতে বলিতেন ; আর বুঝাইয়া দিতেন যে, হিন্দুধর্ম একটা জীবন্ত ও সক্রিয় বস্তু এবং বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহার ভাবধারায় একটা বিশেষত্ব ও সুগভীর তাৎপর্য আছে। আবার শুধু ভাবুকের দৃষ্টিতে না দেখিয়া মার্জিত বুদ্ধির সাহায্যে নিজ ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিতে এবং তাহাকে স্বার্থপর বিরোধীদের ঘাতপ্রতিঘাত হইতে রক্ষা করিতেও তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া তিনি উহার মৌলিক তথ্যগুলি তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। তখন পুস্তক কিনিবার মতো অর্থ তাহাদের ছিল না ; অতএব তিনি তাঁহার কাশীর বন্ধু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু বেদান্তগ্রন্থ ও বেদপাঠের সাহায্যের জন্য একখানি পাণিনি-

ব্যাকরণ ভিক্ষা চাহিয়া লইলেন। ১৯।১১।৮৮ তারিখের একখানি পত্রে তিনি প্রমদাদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদিগের মত, যাহা করিতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণ করিব। অতএব পাণিনিকৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব—এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক!...এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৮২)।

এই সময়ে হিন্দুদের সামাজিক ব্যবস্থাসম্পর্কিত সমস্যাও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে তিনি বহু অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারত-ভ্রমণকালেও তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতের জনসাধারণ কিরূপে স্মৃতি-শাস্ত্রের দ্বারা নিপীড়িত হইতেছে। প্রাচীনকালে যুগপ্রয়োজনে সমাজ পরিবর্তিত হইত; কিন্তু সমসাময়িককালে উহা অচলায়তনে পরিণত হইয়াছিল। তখন বেদে শূদ্রের অধিকার নাই; জাতিবিভাগ মূলতঃ গুণানুরূপ ও ব্যক্তিগত সামর্থ্যের তারতম্যানুযায়ী পরিকল্পিত হইয়া থাকিলেও তদানীন্তন সমাজে উহা বংশগত ও অপরিবর্তনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এই সমস্ত দেখিয়া স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, এই পঙ্গুত্বসম্পাদক উৎপীড়ন হইতে সমাজকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে, বৈদিক জ্ঞান সর্বস্তরে নির্বিচারে প্রচার করা। ভারতের পুনরভ্যুত্থানের পূর্বে উচ্চাবচ সকলকে বেদ-উপনিষদের মর্মবাণীর সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এই সমুদয় প্রশ্ন ও সমস্যা এবং তাহাদের সম্ভাব্য উত্তর ও সমাধান তাঁহার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন উপস্থিত করিত এবং তিনি প্রমদাবাবুকে এই সকল বিবিধ বিষয়ে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, স্মৃতিশাস্ত্র, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদিকে অখণ্ড মানবজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া খণ্ডশঃ গ্রহণ করিতে পারেন নাই—তাঁহার যেন কেবলই মনে হইতেছিল জীবনের এই সমুদয় বিভাগের পশ্চাতে অবশ্যই কোন সমন্বয়-ভিত্তি আছে যাহা সত্য এবং প্রাচীন ঋষিদের অনুভূতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে সর্বপ্রকার বিরোধের সামঞ্জস্য হইতে পারে এবং সকল বিচ্ছেদের মধ্যেও মিলন

ঘটানো যাইতে পারে, তিনি তাহারই অন্বেষণ করিতেছিলেন। প্রমদাবাবুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "নানাপ্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে। শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত পাঁচ-সাত বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানা প্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপুর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পুর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না—ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।" (৪।৭।৮৯ তারিখের পত্র, 'বাণী ও রচনা', ৬।২৮৭-৮৮)।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন আবার কলিকাতার নিকটে থাকিয়া মাতা ও ভ্রাতাদের অসহনীয় দারিদ্র্য নিত্য স্বচক্ষে দেখিতে হইতেছে অথবা উহার খবর শুনিতে হইতেছে। ঐ পত্রেই তিনি প্রমদাবাবুকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। ইঁহাদের অবস্থা পুর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমনকি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর। কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া, তাহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মতো বিদায় হইতে পারি—আপনি আশীর্বাদ করুন।...কারণ 'আমরা জগতের দুঃখ-কষ্টের ক্রুশ ঘাড়ে লইয়াছি। হে পিতঃ, তুমি উহা আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও, যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি।'*"

মন তখন তাঁহার প্রায়ই দীর্ঘ-তীর্থদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইত; তাই একাধিকবার প্রমদাদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই কাশী যাইবেন।

*। 'ঈশানুসরণ'।

তখন গঙ্গাধর তিব্বতে ভ্রমণ করিতেছেন এবং পত্র লিখিয়া অপরের মনেও অনুরূপ পর্যটন-বাসনা জাগাইতেছেন। আরও চারিজন গুরুভ্রাতা তখন হিমালয়ে তপস্যায় নিরত; কাজেই স্বামীজীর পক্ষে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি একটু এদিক-সেদিক ঘুরিয়াও আসিতেছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে তিনি শ্রীমা ও অপর অনেক গুরুভ্রাতার সহিত আঁটপুরে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে গমন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে পথে ভেদবমি হওয়ায় স্বামীজী অসুস্থশরীরে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন।[৭] সেখানে আসিয়াও দীর্ঘকাল যাবৎ মাঝে মাঝে জ্বর হইতে থাকে। তাই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি (সম্ভবতঃ জুন মাসে) শিমূলতলায় গিয়া কিছুকাল বাস করেন। "কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে অত্যন্ত উদরাময় হওয়ায়" পলাইয়া আসেন। ('বাণী ও রচনা', ৬।২৮৪-৮৭)। অবশেষে ডিসেম্বর মাসের শেষে তিনি তীর্থদর্শনেচ্ছায় বাহির হইয়া পড়িলেন এবং প্রথম বৈদ্যনাথধামে উপনীত হইয়া সেখানে কিছুদিন বাসের পর ২৬শে ডিসেম্বর এক পত্রে প্রমদাবাবুকে জানাইলেন, "দুই-এক দিনেই ৺কাশীধামে ভবৎ-চরণ সমীপে উপস্থিত হইব।...ইচ্ছা আছে, তথায় কিছুদিন থাকিব এবং আমার মন্দভাগ্যে বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা কি করেন দেখিব। এবার 'শরীরং বা পাতয়ামি, মন্ত্রং বা সাধয়ামি' প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—কাশীনাথ সহায় হউন।" (ঐ, ২৯৮)।

স্বামীজীর অভিপ্রায় যেমনই হউক, বিশ্বনাথের বিধান কিন্তু অন্যরূপ ছিল। বৈদ্যনাথে সংবাদ আসিল, স্বামী যোগানন্দ (যোগেন্দ্র) এলাহাবাদে জলবসন্তে শয্যাগত; কাজেই স্বামীজী তৎক্ষণাৎ প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে দিনকয়েক ভুগিয়াই যোগানন্দ সুস্থ হইলেন। তখন স্বামীজী স্থানীয় লোকদের সহিত মিশিয়া ধর্মালাপাদি করিবার অবকাশ পাইলেন। ইঁহারাও তাঁহার পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন, অমায়িক ব্যবহার, তেজোময়ী বাণী, সুমধুর বাক্যালাপ ও

৭। স্বামীজীর পত্রাবলী পড়িয়া ঠিক বুঝা যায় না, কামারপুকুরে যাইবার পথে কিংবা ফিরিবার পথে ভেদবমি হইয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ বলেন, তিনিও ঐ দলে ছিলেন এবং স্বামীজীদের সহিত ঠাকুরের দেশে ও জয়রামবাটিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসুখের উল্লেখ করেন নাই। 'আমার জীবন কথা', (১৫০--৫১ পৃঃ)। তাই আমরা ফিরিবার সময়েই উহার অনুমান করিলাম।

সুকণ্ঠ সঙ্গীতাদিতে মুগ্ধ হইলেন। আলোচনাকালে তিনি সামাজিক দুর্নীতিগুলির অশেষ নিন্দা করিতেন; পরমুহূর্তেই আবার সনাতন ধর্মের মূল তথ্যাবলীর প্রশংসায় মাতিয়া উঠিতেন। এখানে তিনি এমন একজন ধার্মিক মুসলমানের সহিত পরিচিত হন, যাঁহার "মুখের প্রতিটি রেখা বুঝাইয়া দিতেছিল যে, তিনি পরমহংসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এখানে তিনি গাজীপুরের প্রসিদ্ধ মহাত্মা পওহারী বাবার গুণগ্রামের সবিশেষ সংবাদ পাইলেন। পওহারীজীর নাম তিনি দক্ষিণেশ্বরেই শুনিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তাঁহার দর্শনাভিলাষও তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। এখন সুযোগ পাইয়া তিনি বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে গাজীপুর যাত্রা করিলেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি তথায় পৌছিলেন। (২৪।১।৯০ এর পত্র দ্রষ্টব্য)।

গাজীপুরে তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রায়বাহাদুর শ্রীগগনচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ের গৃহে বিভিন্নকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। সতীশবাবু ছিলেন তাঁহার কলিকাতার বাল্যসখা। এই গৃহে শহরের বহু ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। গগনবাবুর বাড়ীতেও প্রতি রবিবারে ধর্মসভা বসিত এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীতাদিও হইত। গাজীপুরের সকলেই তাঁহাকে "বাবাজী" বলিয়া ডাকিত। সমাগত ভদ্রমহোদয়দের সহিত সামাজিক আচারব্যবহারেরও আলোচনা হইত। ঐকালে স্বামীজীর কেবলই মনে হইত গাজীপুরের শিক্ষিত সমাজ কতখানি স্বধর্মবিমুখ ও পাশ্চাত্ত্য জড়বাদে প্রভাবিত হইতেছে। তিনি এক পত্রে (২৪।১।৯০) প্রমদাবাবুকে লিখিলেন, "এ স্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র, কিন্তু বড় পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন; আর দুঃখের বিষয় যে, আমি পাশ্চাত্ত্য ভাবমাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত। কেবল আমার বন্ধুর ওসকল ভাব বড়ই কম। কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে! কি জড়বাদের ধাঁধাই লাগাইয়াছে! বিশ্বনাথ এইসকল দুর্বল হৃদয়কে রক্ষা করুন।···ভগবান শুকের জন্মভূমিতে আজি বৈরাগ্যকে লোকে পাগলামি ও পাপ মনে করে! অহো ভাগ্য!" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩০৩-৪)। স্থানীয় সমাজ-সংস্কারকদিগকে তিনি অপরের নিন্দাবাদের পথ ছাড়িয়া দিয়া গণশিক্ষাবিষয়ে অধিক মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, বিদ্রূপ, বিবাদ, গালিবর্ষণ ইত্যাদি অপেক্ষা বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি অধিকতর ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। স্বামীজী কিন্তু গাজীপুরে

এইসকল কাজের জন্য আসেন নাই—এগুলি অবান্তর মাত্র। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পওহারী বাবার সাক্ষাৎকার।[৮]

পওহারী বাবা কাশীর নিকটবর্তী এক গ্রামে[৯] ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর গাজীপুরে আসিয়া তাঁহার এক বিদ্বান খুল্লতাতের শিক্ষাধীনে ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। খুল্লতাত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর তিনি সত্যের অনুসন্ধানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ইহারই এক সময়ে কাথিয়াওয়াড়ের গীর্ণার গিরির চূড়ায় তিনি যোগসাধনে দীক্ষিত হন। গীর্ণার হইতে কাশীধামে ফিরিয়া তিনি গঙ্গাতীরে এক গুহাবাসী সন্ন্যাসীর দর্শন পান এবং তাঁহার নিকট অদ্বৈত-বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। তারপর দীর্ঘকাল তপস্যা ও তীর্থপর্যটনে কাটাইয়া তিনি গাজীপুরের পুরাতন আবাসে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর শীঘ্রই কাশীধামের গুরুর আদর্শে শহরের দুই মাইল উত্তরে নদীতীরে একটি গুহা নির্মাণ করাইয়া উহাতে তপস্যায় নিরত হন। স্বামীজী যখন গাজীপুরে যান, তখন গুহাটি চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত থাকায় কেহ সেখানে যাইতে পারিত না। বাবাজী দিনের অনেকটা অংশ গুহামধ্যেই কাটাইতেন এবং রাত্রে নদীর অপর তীরে গিয়া সেখানেও সাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। আহারের মধ্যে ছিল শুধু একমুষ্টি নিমপাতা অথবা গোটা কয়েক লঙ্কা। তিনি সর্বপ্রকার কর্মকেই ভগবানের আরাধনার মর্যাদা দিতেন। ইষ্টদেবতাকে ভোগনিবেদনান্তে তিনি সে প্রসাদ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া সমাগত সাধু ও দরিদ্রদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ তিনি এতই স্বল্পাহারী ছিলেন যে, লোকেরা তাঁহার নাম দিয়াছিল 'পওহারী (বা পবন-আহারী) বাবা'। ক্রমে লোকেরা দেখিল, তিনি গুহার মধ্যে দিনের পর দিন, এমনকি মাসাবধি কাটাইয়া দেন, আর তাহারা অবাক হইয়া ভাবিল, "ইনি বাঁচেন কি করিয়া? মরিয়া যান নাই তো?" দীর্ঘকাল পরে

৮। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ-চরিতে'র মতে (১৪৭-৪৯ পৃঃ) স্বামীজী হাতরাস হইতে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া কিছুদিন পরে গাজীপুরে যাইয়া পওহারী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সেখানে কিছুদিন বাস করেন। পরে একদিন সহসা বরাহনগরে ফিরিয়া আসেন। দ্বিতীয়বারে গাজীপুরে পৌঁছেন ২২শে জানুয়ারি, ১৮৯০ খৃঃ। আমরা এই বিবরণের কোন প্রমাণ পাই নাই; বরং স্বামীজীর পত্রাবলী হইতে মনে হয়, ২২শে জানুয়ারি ১৮৯০ খৃঃ এর পরে পওহারী বাবার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ঐ গ্রন্থের নূতন সংস্করণে শুধু দ্বিতীয় বারের উল্লেখ আছে।

৯। মতান্তরে জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর গ্রামে ('বাণী ও রচনা', ২য় সং, ৮।৩৪৭)।

দেখা গেল, তিনি বাঁচিয়া আছেন ঠিক, এবং ইচ্ছানুসারে আড়ালে থাকিয়া দুই-চারিটি কথাও বলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি মোটেই বাহির হইতেন না। অবশেষে একদিন গুহামুখ হইতে মাংসপোড়ার গন্ধ ও প্রচুর ধূম বাহির হইতে দেখিয়া লোকেরা গুহার মধ্যে তাকাইয়া দেখিল, বাবাজী বিরাট হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বদেহকে উহাতে আহুতি দিয়াছেন—তাঁহার আত্মা ইতিমধ্যেই দেহপিঞ্জর পরিত্যাগপূর্বক সমাধিমার্গে পরমাত্মায় মিলিত হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য পরের কথা। আমরা যেকালের কথা বলিতেছি, তখনও পওহারী বাবার নাম লোকমুখে ফিরিত এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষে দূরদূরান্তর হইতে জনসমাগম হইত। অতএব স্বামীজী যে এরূপ মহাপুরুষের দর্শনের জন্য লালায়িত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

বাবাজীর দর্শন কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। গুহার উপরে একখানি কুঠিয়া ছিল। কথা বলিতে চাহিলে বাবাজী গুহামুখে অবস্থিত ঐ কুঠিয়ায় উঠিয়া আসিয়া রুদ্ধদ্বারের আড়াল হইতেই তাহা করিতেন। স্বামীজীও তাই সহজে দর্শন পান নাই। পরিশেষে বহু চেষ্টার পর সফলকাম হইয়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রমদাবাবুকে লিখিলেন, "বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ,—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাবাজীর ইচ্ছা—কয়েক দিবস এখানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এ স্থানে থাকিব।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩০৬)। বাবাজীর নিকটেই থাকিবার অভিপ্রায়ে স্বামীজী অতঃপর গগনবাবুর "উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত, উদ্যান-সমন্বিত ও চিমনিদ্বারা শোভিত" এক বাগান-বাড়ীতে থাকার সঙ্কল্প করিলেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দকে পত্রযোগে জানাইলেন: "এখানে একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে একটি ছোট্ট বাঙ্গলা-ঘর আছে, ঐ ঘরে থাকিব এবং উক্ত বাগান বাবাজীর কুটিরের অতি নিকটে। বাবাজীর একজন দাদা ঐখানে সাধুদের সৎকারের জন্য থাকে, সেই স্থানেই ভিক্ষা করিব।" (ঐ, ৩১৮ পৃঃ)। বাবাজী উদ্যানবাটীর সমীপে গঙ্গার কিনারে এবং দীর্ঘ সুড়ঙ্গের ভিতর সমাধীস্থ হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। স্বামীজী তখন দুই মাস ধরিয়া কোমরের ব্যথায় ভুগিতেছেন। তাই নিকটে থাকিলেও বাবাজীর সহিত নিয়মিত

সাক্ষাৎকার সম্ভব হইত না, বাবাজী কিন্তু লোক পাঠাইয়া তাঁহার খোঁজ খবর লইতেন। স্বামীজীর আর এক অসুবিধা এই ছিল যে, তিনি এইকালে পেটের অসুখে ভুগিতেছিলেন; ভিক্ষালব্ধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহার সহ্য হইত না। তথাপি রাজযোগী, মিষ্টভাষী, বৈষ্ণবভাবাপন্ন বাবাজীর আশ্বাস পাইয়া তিনি উদ্যানবাটীতে পড়িয়া রহিলেন। স্বামীজী জানিতেন, তাঁহার এই উদার জ্ঞানলাভস্পৃহা বরাহনগর মঠের অনেকেই ভালচক্ষে দেখিবেন না; তবু তিনি স্বীয় সঙ্কল্পে অটল রহিলেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিলেন, "আমার মূলমন্ত্র এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরাহনগরের অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল ও গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি, কারণ সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।" আর অখণ্ডানন্দকে সাবধান করিয়া দিলেন, "আমি গাজীপুরে আছি, একথা বরাহনগরের কাহাকেও লিখিও না।" (ঐ)।

গাজীপুরে অবস্থানকালে স্বামীজীর সহিত অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের আলাপ হয়। গগনবাবু আফিং বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রস্ সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। রস্ সাহেবও ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখে হিন্দুধর্মের অনেক তত্ত্ব জানিয়া লন এবং হোলি সম্বন্ধে তাঁহাকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী ঐ প্রবন্ধ লিখিয়া দেন। এইরূপে স্বামীজীর বিদ্যাবত্তায় আনন্দিত হইয়া রস্ সাহেব স্থানীয় জেলা জজ পেন্নিংটন সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেন। জজ সাহেব স্বামীজীর মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া এরূপ আকৃষ্ট হন যে, তিনি তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইয়া উহা প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। কর্ণেল রিভেট কার্ণাক নামক আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিতও বেদান্ত সম্বন্ধে স্বামীজীর সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। বস্তুতঃ তখন যেন স্বামীজী আচার্যের ভাবে ভাবিত ছিলেন এবং অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে বিরাজমান থাকিয়া স্বীয় প্রভাবে অপরের হৃদয় আলোকিত করিতেছিলেন। অথচ তিনি তখন শিক্ষার্থী হিসাবে পওহারী বাবার নিকট যাইতেন! ইহার তাৎপর্য কি? আমাদের মনে হয়, রাজযোগের ক্রিয়া ও তথ্যাদি আহরণ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কারণ অধ্যাত্মজ্ঞান তো তিনি পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাইয়াছিলেন—ঐ জন্য অন্যত্র যাওয়া অনাবশ্যক ছিল। সে যাহা হউক, আমরা পূর্ববৃত্তান্তেরই অনুসরণ করি।

স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বীয় অভিপ্রায় গোপন রাখার জন্য অনুরোধ করিলেও স্বামীজী স্বয়ং ঐ বিষয়ে গোপনতার আশ্রয় লন নাই ; কারণ ঐ কালেই তিনি গাজীপুর হইতে অনেককে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং কাহাকে কাহাকেও বাবাজীর সংবাদও দিয়াছিলেন। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, গাজীপুরে প্রথমাগমন-কালে বাবাজীর সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ ধারণাই থাকুক না কেন, ক্রমে উহার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আর ঐ কালে তাঁহার মনে অন্যান্য চিন্তাও চলিতেছিল। পত্রযোগে তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত তিব্বত ভ্রমণের ইচ্ছা জানাইয়া তাঁহাকে গাজীপুরে আসিতে লিখিয়াছিলেন। মঠের অপর গুরুভ্রাতাদের সংবাদও তিনি রাখিতেন। স্বামী অভেদানন্দ (কালী), সারদানন্দ (শরৎ) প্রভৃতি তখন হৃষীকেশে তপস্যা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ স্বামী অভেদানন্দের অসুখের খবর পাইয়া স্বামীজী উদ্বিগ্ন হইলেন এবং স্বামী সারদানন্দের নিকট তার ও টাকা পাঠাইলেন ও অভেদানন্দকে কাশী চলিয়া যাইতে লিখিলেন, কাশীতে প্রমদাদাসবাবুকেও অনুরোধ জানাইলেন যাহাতে অভেদানন্দের থাকার সুব্যবস্থা হয়। ঐ সময়ে গিরিশবাবুর এক পত্র হইতে স্বামীজী জানিতে পারেন যে, শ্রীমাকে কলিকাতায় আনানো সম্বন্ধে বলরামবাবুর সহিত গিরিশচন্দ্রের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। প্রতিকারকল্পে তিনি বলরামবাবুকে লিখিলেন : "মাতাঠাকুরানীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম, তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি?" (ঐ, ৩০৯)। গাজীপুরে থাকাকালে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজার জন্য একবার (১২ই মার্চ) বরাহনগরে গোলাপফুল পাঠাইয়াছিলেন। অর্থাৎ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ গাজীপুরে অবস্থান করিলেও তিনি ঠিক পূর্বেরই ন্যায় বহির্জগতের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখিয়াছিলেন। গাজীপুরের জলবায়ুর গুণে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল। তবে কোমরের ব্যথা সহজে সারে নাই, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল ; কারণ ফেব্রুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া এপ্রিল পর্যন্ত তিনি গাজীপুর হইতে যত চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই ইহার উল্লেখ আছে। এক সময়ে পেটের অসুখও হইয়াছিল। তখন বাসস্থানে প্রচুর লেবু গাছ থাকায় তিনি যথেষ্ট লেবু খাইতেন।

এই সব কথা না ভাবিয়া স্বামীজীর তৎকালীন মনোভাবের দিকে তাকাইলে

মনে হয়, চরম অধ্যাত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাহাই ঘটুক, নিম্নভূমির বিভিন্ন স্তরে আত্মবিষয়ক সত্যলাভের জন্য তিনি তখন ছটফট করিতেছিলেন এবং যেখানে উহা পাইবার সম্ভাবনা দেখিতেছিলেন সেখানেই ছুটিয়া গিয়া অদম্য উৎসাহে উহার আহরণে রত হইতেছিলেন। ৩১শে মার্চ গাজীপুর হইতে তিনি প্রমদাদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব? মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এজন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল; কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" (ঐ, ৩২৫-২৬ পৃঃ)। বড় আশা করিয়া তিনি পওহারী বাবার নিকট আসিয়াছিলেন এবং প্রায় তিন মাস সেখানে কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু আশা পুর্ণ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি সন্ন্যাসী এবং মায়াবরণ ছিন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি কঠোর হইতে পারিতেন না। গুরুভ্রাতাদের প্রতি তিনি যেমন সর্বদা অতীব স্নেহপরায়ণ ছিলেন, বন্ধু বা গুরুজনের প্রতিও তেমনি প্রীতি বা শ্রদ্ধা-পরায়ণ ছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব হইত না। তাই তিনি প্রমদাবাবুকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি জানেন না।—কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্বনাশ করিতেছে। একটুতেই এলাইয়া যাই। কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি।" (ঐ, ৩১৯ পৃঃ)। অতএব পওহারী বাবার নিকট কিছু পাইবার আশা নাই, এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবার পরও যে তিনি গাজীপুরে আরও প্রায় এক মাস থাকিয়া গেলেন ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। এইভাবে দেখিলে তাঁহার ৩রা মার্চ তারিখের এই পত্রাংশের মর্ম বুঝিতে পারি—"পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই; কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, 'উলটা সমঝলি রাম!'—কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধ হয় ইনি এখনও পুর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত এবং বড় গুপ্ত-ভাব। সমুদ্র পুর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইঁহাকে উদ্বেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি; এবং বিদায় লইয়া শীঘ্রই প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল করিয়াছেন! বাবাজী ছাড়েন না, আবার গগনবাবু ছাড়েন না।" (ঐ, ৩১৯ পৃঃ)। ফলতঃ

তাঁহার তখনই যাওয়া হইল না—যদিও পওহারীজী সম্বন্ধে তাঁহার উদ্ধৃত মত অপরিবর্তিতই রহিল এবং গাজীপুর হইতেই পুনবার লিখিলেন, "বাবাজী মিষ্টি মিষ্টি বুলি বলেন, আর আটকাইয়া রাখেন।" (ঐ, ৩২৬ পৃঃ)। এইরূপ বিফলতা সত্ত্বেও হয়তো তিনি আরও কিছুদিন গাজীপুরেই থাকিয়া যাইতেন ; কিন্তু আর একটি স্নেহের টান তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সে কথায় আমরা ফিরিয়া আসিব ; আপাততঃ গাজীপুর-প্রসঙ্গে আরও কিছু বলিতে হইবে।

স্বামীজীর ৩১শে মার্চের পত্র হইতে জানা যায়, ঠিক ঐ তারিখের পূর্বে "কয়েক দিবস" তিনি ঐ উদ্যানবাটীতে ছিলেন না ; এবং সেই দিবসই পুনবার চলিয়া যাইবেন। কে জানে এই অজ্ঞাতবাসের সহিত স্বামী প্রেমানন্দের গাজীপুরে অবাঞ্ছিত আগমনের সম্পর্ক ছিল কিনা। বরাহনগরের সাধুরা স্বামীজীর দীর্ঘানুপস্থিতি ও বাবাজীর সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে বেশ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাই স্বামী প্রেমানন্দ ঐ সময়ে গাজীপুর আসিয়া তাঁহাকে বরাহনগরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বামীজী ইহাতে রুষ্ট হইয়া সম্ভবতঃ আত্মগোপনের জন্য অন্যত্র চলিয়া যান। তাই পূর্বোক্ত ১৫ই মার্চের পত্রেই তিনি বলরামবাবুকে জানাইয়াছিলেন, "বাবুরাম হঠাৎ এস্থানে আসিয়াছে, তাহার জ্বর হইয়াছে ; এমন অবস্থায় বাহির হওয়া ভাল হয় নাই।...আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম।...আর পত্র লিখিবেন না, কারণ আমি এস্থান হইতে চলিলাম। বাবুরাম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবেন।" মনে রাখিতে হইবে, এই পত্রেই অভেদানন্দকে টাকা পাঠাইবার উল্লেখও আছে এবং অপর পত্রে বাবুরামের (প্রেমানন্দের) প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্য অনুশোচনাও দেখা যায়। অতএব স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃপ্রীতির অভাব ছিল না ; কিন্তু তিনি স্বীয় স্বাধীনতায় কাহারও হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। ৩১শে মার্চের পত্রে প্রমদাবাবুকে তিনি প্রেমানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার সহিত আমি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি। অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি,...আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি ? মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবা-রাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে ?" ঐ পত্রে দ্বিতীয় বার অজ্ঞাতবাসে যাওয়ার কথা এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ

এস্থানের কিয়দ্দূরে এক গ্রামে গুপ্তভাবে কিছুদিন থাকিব ; সেস্থান হইতে পত্র লিখিবার কোন সুবিধা নাই।" এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইয়াছিল কিনা তাহা নির্ণয় করা এখন অসম্ভব। সম্ভবতঃ যাওয়া হয় নাই ; কেন না, ২রা এপ্রিলও তিনি গাজীপুরে ছিলেন এবং অভেদানন্দের পীড়ার সংবাদ পাইয়া ও বলরাম বাবু ১৩ই এপ্রিল দেহত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া কলিকাতায় দ্রুত ফিরিয়া যাইবার পুর্বে হাতে সময়ও খুব বেশী ছিল না। ৬ই জুলাইএর পত্রে তিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, "এবারে আমার গাজীপুর পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না, অথবা কলিকাতায় আসিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু কালীর পীড়ার সংবাদে আমাকে কাশী আসিতে হইল এবং বলরামবাবুর আকস্মিক মৃত্যু আমায় কলিকাতায় টানিয়া আনিল।"

এই কালের ঘটনাবলীর অনুধ্যান করিলে এই অনুমান আসিয়া পড়ে যে, কাশীপুরে স্বামীজীর মনে নির্বিকল্প সমাধিলাভের যে আকূতি জাগিয়াছিল, উহা যেন গাজীপুরে উপযুক্ত পরিবেশ পাইয়া হঠাৎ পুর্ণবেগে পুনরুজ্জীবিত হইল এবং তাঁহাকে আত্মানুসন্ধানে প্রোৎসাহিত করিয়া আর সব ভুলাইয়া দিতে উদ্যত হইল। অপর দিকে ঠাকুর যেমন তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার নির্বিকল্পের দ্বার অবরুদ্ধ থাকিবে এবং তাঁহাকে ঠাকুরের কাজ করিতে হইবে—তদনুসারে সেই দ্বিতীয় নিয়োগাধীনে তিনি সাধনার সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে পরকল্যাণসাধনেও আত্মহারা হইতেছিলেন। তাই ঈশ্বরাভিমুখ ও ভগবদর্পিতজীবন লাভ করিয়াও স্বামীজী অপরকেও সেই পথে অনুপ্রাণিত করিতে কিংবা অপরের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে সতত উন্মুখ ছিলেন। এই উভয় ধারার, কিংবা মৌলিক একই ধারার সমান্তরাল দ্বিবিধ বিকাশ লইয়াই যেন স্বামীজীর জীবন।

গাজীপুরে কিঞ্চিদধিক দুই মাস থাকাকালে আরও একটি অপুর্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত স্বামীজীর অলৌকিক সম্বন্ধ স্ফুটতররূপে প্রকটিত হইয়াছিল এবং উহার ফলে গাজীপুরে থাকার মূল প্রয়োজন—অর্থাৎ বাবাজীর নিকট সাধনমার্গের উপদেশলাভ অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত হইয়াছিল। ঘটনাটি প্রাণস্পর্শী ও অতীব গুরুত্বপুর্ণ। বাবাজী যখন স্বামীজীকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে এবং স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে সম্মত হইতেছিলেন না, তখন একদা স্বামীজী ভাবিলেন, হয়তো বা বাবাজীর নিকট দীক্ষা

লইলে পথ সুগম হইতে পারে। পূর্ণতর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তখন তাঁহার মনে এতই প্রবল যে, ঐজন্য তাঁহার নিকট কিছুই অসাধ্য ছিল না। সঙ্কল্প যখন স্থির হইয়া গেল এবং পরদিনই দীক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন ঐ রাত্রে উদ্যানবাটীতে একাকী এক খাটিয়ায় শুইয়া এইসব কথাই ভাবিতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার কক্ষ এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল, আর তিনি চাহিয়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে সশরীরে উপস্থিত—তাঁহার সস্নেহ অথচ বেদনাভরা ছল ছল চক্ষু দুইটি তাঁহারই নয়নোপরি নিবদ্ধ। স্বামীজী আর স্থির থাকতে পারিলেন না—তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত ও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, আর তাঁহার বাকস্ফূর্তি হইল না। মন তখন আত্মগ্লানিতে পূর্ণ ও নয়নযুগল অশ্রু-ভারাক্রান্ত। অতএব দীক্ষার দিন আপাততঃ স্থগিত রহিল। তবু মনের দ্বন্দ্ব দূর হইল না। দুই-একদিন পরেই আবার সেই সঙ্কল্প উদিত হইল; কিন্তু পুনবার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু ঘটিল যাহা স্বামীজী কোনদিন প্রকাশ করেন নাই। এইরূপ পাঁচ-ছয় বার[১০] ঘটিবার পর স্বামীজীর মন হইতে ঐ ইচ্ছা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল—আর শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ সর্বদাই তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া পূর্ণমহিমায় বিরাজিত ছিলেন, পরবর্তী কালের জন্য তেমনি চিরবিরাজমান রহিয়া গেলেন, সেখানে আর কাহারও প্রবেশের অবকাশ ঘটিল না। স্বামীজী অনেক দিন পরে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' এই কবিতা রচনা করিয়া উক্ত ঘটনাটি জনসমাজে প্রকাশ করেন। কবিতাটির ('বাণী ও রচনা,' ৬।২৭২ পৃঃ) একাংশে আছে—

ছেলে খেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা' পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে;
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।

১০। 'বাণী ও রচনা' (৯।২৩১-৩২)তে একুশ দিন দর্শনলাভের কথা ও হঠযোগে পারদর্শী পওহারী বাবার শিক্ষাধীনে শরীর শক্ত করার অভিপ্রায় উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জীবনী-গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছি।

অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ—
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?

আর ঐ কবিতায়ই আছে—

দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পায়।
…তব বাণী
—শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত
সাধিতে তোমার কাজ।

আমাদের বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণের এই দিব্যাবির্ভাব ৩রা মার্চের পুর্বেই হইয়াছিল; কারণ ঐ দিনই স্বামীজী প্রমদাবাবুকে লিখিয়াছিলেন, "বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি; কিন্তু উপুড হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ। খালি গ্রহণ! অতএব আমিও প্রস্থান।" পুনশ্চ দিয়া আবার লিখিতেছেন —"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না।…এখন সিদ্ধান্ত এই যে, রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই; সে অপুর্ব সিদ্ধি, আর সে অপুর্ব অহেতুকী দয়া, সে প্রগাঢ় সহানুভূতি বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত 'মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা'" (ঐ, ৩২০-১ পৃঃ)।

সব জানিয়া-শুনিয়াও স্বামীজী যে গাজীপুরে আরও একমাস রহিলেন তাহার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা, স্নেহপ্রবণতা, বা সৌজন্য। অথবা তিনি আচার্য, আচার্যের প্রতিটি বাক্যের পশ্চাতে অভিজ্ঞতা থাকিলে উহা শ্রোতার নিকট অধিকতর গ্রহণীয় হয়; হয়তো বা এই জন্যই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর মুখে এই বাণী প্রচার করাইলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর অন্যত্র যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, অনধিকার চর্চা ছাড়িয়া আমরা স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীতে ফিরিয়া যাই।

স্বামীজী গাজীপুর ত্যাগ করিবার পরও বাবাজীকে ভুলেন নাই; তাঁহার

বক্তৃতাদিতে তিনি বহুবার এই মহাপুরুষের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাবাজীর নিকট তিনি শিখিয়াছিলেন, "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি"—সাধন অনুযায়ী যখন সিদ্ধি, তখন সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল না হইয়া সাধনা পূর্ণপ্রযত্নে করা আবশ্যক। আর শিখিয়াছিলেন, "গুরুকে ঘরমে গৌ কা মাফিক পড়ে রহো"—গুরুর আশ্রয়ে তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়া থাকাই কর্তব্য ; সেরূপ করিলে কৃপা হইবেই। বাবাজীর গুহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ফটো ছিল, আর তিনি বলিয়াছিলেন, "ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।" এইসব শুনিয়াও বাবাজীর প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা বর্ধিত হইয়া থাকিবে। বাবাজীর দেহত্যাগের পর স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে একটি সুন্দর ইংরাজী প্রবন্ধ লিখেন। উহার সমাপ্তিবাক্য এই—"বর্তমান লেখক এই পরলোকগত মহাত্মার নিকট গভীরভাবে ঋণী ; সেজন্য তাঁহার (লেখকের) প্রেমাস্পদ ও তৎসেবিত শ্রেষ্ঠ আচার্যদিগের অন্যতম (এই) মহাত্মার উদ্দেশ্যে—এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অযোগ্য হইলেও উৎসর্গীকৃত হইল" ('বাণী ও রচনা,' ৮। ৩৭৫)।

গাজীপুরে প্রথম গমনকালে কিংবা গাজীপুর ত্যাগ করিয়া যাইবার কালে[১১] যে একটি আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ আমরা পাই, তাহার সঠিক কাল নির্ণয় করিতে না পারিলেও এখানে বলিয়া রাখা মন্দ হইবে না। তিনি যখন ট্রেন হইতে গাজীপুরের অপর পারে তাড়িঘাট স্টেশনে নামিলেন, তখন মধ্যাহ্নকাল। স্বামীজীর সম্বলের মধ্যে ছিল হস্তে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট, একখানি কম্বল এবং পরিধানে গেরুয়া আলখাল্লা। সঙ্গে আর কিছু—এমন কি জলপাত্র পর্যন্ত নাই। চৌকিদার তাঁহাকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছায়ায় বসিতে দিল না, বাহির করিয়া দিল। তিনি অগত্যা কম্বলখানি ভূমিতে পাতিয়া বিশ্রামাগারের বাহিরে একটি খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিলেন। আশে পাশে অনেক লোক ছিল ; তাহাদের মধ্যে উত্তর ভারতীয় একজন বেনে স্বামীজীর ঠিক সম্মুখে ছাউনির নীচে শতরঞ্চিতে আরামে বসিয়া ছিল এবং স্বামীজীকে ক্লান্ত ও বিশুষ্ক-

১১। ইংরেজী জীবনী ও বাঙ্গলা জীবনীতে ট্রেন হইতে অবতরণের কথা থাকায় মনে হয়, ইহা গাজীপুরে যাইবার কালের ঘটনা ; কিন্তু বাঙ্গলা জীবনীতে আবার গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, গাজীপুর হইতে ফিরিবার কালের (এপ্রিলের) ঘটনাও হইতে পারে, কারণ তিনি গাজীপুরে আসিয়াছিলেন জানুয়ারির শেষে ও চলিয়া গিয়াছিলেন এপ্রিলের গোড়াতে।

বদন দেখিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি ও তাহার কয়েকজন সহচর স্বামীজীর সহিত রেল গাড়ীর একই কামরাতে বসিয়া আসিয়াছিল এবং পথেও ঐরূপ করিতে ছাড়ে নাই। স্বামীজীর সঙ্গে পয়সা না থাকায় তাঁহার পক্ষে কোন স্টেশনে পানীয় জল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই, এদিকে উক্ত বেনে পানি-পাঁড়েদিগকে পয়সা দিয়া অনায়াসে ঐসব স্টেশনে জল লইয়াছে এবং তামাসাচ্ছলে স্বামীজীকে দেখাইয়া দেখাইয়া উহা পান করিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শুনাইয়া দিয়াছে, "ওহে দেখছ, কেমন ঠাণ্ডা জল! তুমি তো সন্ন্যাসী হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করেছ, সঙ্গে একটা পয়সাও নেই যে জল কিনে খাবে। তা দেখ মজা! তার চেয়ে যদি আমার মতো রোজগারের চেষ্টা করতে তো এমন দুর্দশা ভোগ করতে হত না।" এমন ভাবে সারা রাস্তা সে স্বামীজীকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াছে, অথচ একফোঁটা জল দেয় নাই। এখানে আসিয়াও বিদ্রূপের বিরাম নাই। প্ল্যাটফরমের ছায়ায় আরামে বসিয়া সে আবার উপ-দেশ ঝাড়িতে লাগিল, "দেখ হে পয়সার কি ক্ষমতা। তুমি তো পয়সা-কড়ির ধার ধার না; তার ফলও দেখ; আর আমি পয়সা-কড়ি রোজগার করি, তার ফলও দেখ।" এই বলিয়া সে তাহার সংগৃহীত খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল এবং স্বামীজীকে উহা দেখাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "এসব পুরি, কচুরি, পেঁড়া, মিঠাই কি আর বিনা পয়সায় হয়?" স্বামীজী সবই দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সমস্ত অপমান সহ্য করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে আর একজন লোক সহসা সেখানে উপস্থিত হইল—তাহার দক্ষিণ হস্তে ছিল একটি পুঁটলি ও লোটা এবং বাম হস্তে এক কুঁজা জল ও একখানি শতরঞ্চি। সে স্টেশনের এদিক-সেদিক বার কয়েক ঘুরিয়া স্বামীজীর নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবাজী আপনি রৌদ্রে বসে আছেন কেন? ছায়ায় চলুন; আমি আপনার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছি, দয়া করে গ্রহণ করুন।" এ কি দৈব-লীলা! স্বামীজী অকস্মাৎ বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। শ্লেষকারী বেনেও তখন বিস্ময়ে অবাক! নবাগত লোকটি স্বামীজীকে আহারের জন্য বার বার অনুরোধ করিতে থাকিলে, "ভাই, আমার মনে হয় তুমি ভুল করেছ; হয়তো আর কাকে দিতে এসে আমার কাছে ভুলে এসে পড়েছ"—এই বলিয়া স্বামীজী পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন। লোকটি তবু বলিল, "না না, আপনিই তো সেই বাবাজী, যাকে আমি দেখেছি।" স্বামীজী কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তার মানে? তুমি আমায় দেখলে কখন?" তখন সে বুঝাইয়া বলিল, "আমি একজন হালুইকর এবং আমার মিষ্টান্নাদির দোকান আছে। তুপুরে আহারাদির পর ঘুমাইতেছিলাম, এমন সময় স্বপ্নে দেখি, রামজী এসে আমায় বলছেন, 'আমার সাধু স্টেশনে পড়ে অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে; কাল থেকে তার খাওয়া-দাওয়া হয়নি। তুই শীগ্‌গির গিয়ে তার সেবা কর।' আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলেও পর মুহূর্তে মনের খেয়াল ভেবে পাশ ফিরে শুয়ে রইলাম। কিন্তু শ্রীরামজী কৃপা করে আবার এলেন এবং আমাকে সত্যি সত্যি ধাক্কা মেরে তুলে যেমন বলেছেন তেমনি করতে আদেশ করলেন। আমি তখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম এবং তৎক্ষণাৎ কিছু পুরি তরকারি প্রস্তুত করলাম। ঐ সব এবং সকালের তৈরী কিছু মিঠাই, জল ও তামাক নিয়ে তাড়াতাড়ি স্টেশনে ছুটে এলাম।" স্বামীজী তবু জানিতে চাহিলেন, "আমিই যে সেই সাধু তা তুমি জানলে কি করে?" হালুইকর বলিল, "আমারও প্রথমে সে সন্দেহ হয়েছিল, তাই এখানে এসেই একবার চারিদিক ঘুরে দেখে নিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় সাধুর দর্শন না পেয়ে বুঝতে পারলাম, ঐ সাধু আপনি ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।" অতঃপর সে স্বামীজীকে ছায়ায় বসাইয়া আহার করাইল, আহারান্তে জল ঢালিয়া দিল এবং তামাক সাজিয়া দিল। স্বামীজী তাহাকে ধন্যবাদ দিতে গেলে সে বলিল, "না না স্বামীজী, আমায় ধন্যবাদ দেবেন না; সবই রামজীর লীলা।" বেনেটি এতক্ষণ অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল ও উৎকর্ণ হইয়া সব শুনিতেছিল। অবশেষে তাহার আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, স্বামীজী একজন উচ্চাবস্থাপন্ন মহাত্মা এবং ভয়ও হইল, ইঁহাকে অপমান করার ফলে তাহার সমূহ অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। তখন সে অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রণামান্তে কৃতাপরাধের জন্য স্বামীজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

আমরা দেখিয়াছি, স্বামী অভেদানন্দের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া স্বামীজী তাঁহার জন্য টাকা পাঠাইয়াছিলেন ও কাশীতে থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তদনুসারে অভেদানন্দ কাশীর সোনারপুরা অঞ্চলে শ্রীযুক্ত প্রিয় ডাক্তারের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ অসুস্থশরীরে গাজীপুর ত্যাগ করিয়া কাশীতে যান ও অভেদানন্দের সহিত মিলিত হন। স্বামীজীও অনতিবিলম্বে কাশীতে উপস্থিত হইয়া প্রমদাদাস বাবুর বাগানে তপস্যায় নিরত হইলেন। সেখানে আবার বলরামবাবুর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া দ্রুত বরাহনগরে

প্রত্যাবর্তন করিলেন। বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদে তাঁহার চক্ষে অশ্রুবিসর্জন হইতে দেখিয়া প্রমদাবাবু বলিয়াছিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী হয়েও এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত।" স্বামীজী ইহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "বলেন কি? সন্ন্যাসী হয়েছি বলে হৃদয়টা বিসর্জন দেব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। হাজার হোক, আমরা মানুষ তো বটে! আর তাছাড়া তিনি যে আমার গুরুভাই ছিলেন। যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে শিক্ষা দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।"

স্বামীজী একটি নবীন আদর্শস্থাপনের গুরুদায়িত্ব লইয়াছিলেন; কিন্তু পারি-পার্শ্বিক অবস্থা তখন অতীব প্রতিকূল। প্রাচীন চিন্তাধারার বিরোধ তো ছিলই, অর্থাভাবও তখন তাঁহাদিগকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছিল। ১৩ই এপ্রিল বলরামবাবুর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে ২৫শে মে তারিখে যখন সুরেন্দ্রবাবুও চলিয়া গেলেন, তখন মঠের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল—কে মঠের ব্যয়নির্বাহ করিবেন, আর সন্ন্যাসীরা কোথায় দাঁড়াইবেন! অথবা মঠ যদি উঠিয়াই যায় এবং সাধুরা পরিব্রাজকরূপে ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকেন, তাহাতেও হয়তো তেমন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পূত ভস্মাবশেষ কোথায় সংরক্ষিত হইবে? এই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া স্বামীজী ইতস্ততঃ সাহায্যভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশ্য কলিকাতার বন্ধুরা ক্রমে অগ্রসর হইয়া মঠের কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে গিরিশবাবু, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতির সহৃদয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইঁহারা তো ধনী ছিলেন না; আর ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থপ্রদানের সামর্থ্য ইঁহাদের মোটেই ছিল না। বিশেষতঃ সুরেন্দ্রবাবুর দেহত্যাগের পরই ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সন্দেহাকুল বোধ হওয়ায় স্বামীজী ঠাকুরের স্মৃতিরক্ষাকল্পে এক সুদীর্ঘ পত্রে প্রমদাদাসবাবুর সাহায্যভিক্ষা করিলেন। পত্রখানি অতি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ উহাতে ঠাকুরের প্রতি স্বামীজীর ঐকান্তিক ভক্তি, স্বামীজীর নিজের জীবনের ব্রত, মঠস্থাপনের প্রয়োজন, মঠের তখনকার অবস্থা ইত্যাদি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পত্রের স্থানে স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বহু বিপদ ঘটনার আবর্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি।…প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে আমি রামকৃষ্ণের

গোলাম—তাঁহাকে 'দেহ তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না।...আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব—ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজী আছি। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিক সেদিকে বেড়াইতে গেল, সে আলাহিদা কথা; কিন্তু সে বেড়ানো মাত্র, তাঁহার মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। তা যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। ...অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসিমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্বাহ এবং বাটীভাড়া দিতেন।

"ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর নানা কারণে (অর্থাৎ খৃষ্টিয়ান্ রাজার অদ্ভুত আইনের জ্বালায়) অগ্নিসমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদির এবং প্রতিকৃতির যথানিয়মে আমাদিগের মঠে প্রত্যহ পুজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পুজাদির ব্যয়ও উক্ত দুই মহাত্মা করিতেন।

"যাঁহার জন্মে আমাদিগের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্ত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে?

"পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু (সুরেন্দ্রবাবু) তজ্জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও

অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদ আপনি পূর্ব হইতেই জানেন। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই।...তাঁহারা সন্ন্যাসী; তাঁহারা এই ক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছে, এবং ভগবান রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ১০০০৲ টাকায় কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে জমি এবং মন্দির হওয়া অসম্ভব, অন্যূন পাঁচ সাত হাজার টাকার কমে জমি হয় না।

"আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার মান এবং সম্ভ্রম এবং আলাপও যথেষ্ট; আমি প্রার্থনা করিতেছি যে যদি আপনার অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধার্মিক ধনবানদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্য নির্বাহ হওয়ানো আপনার উচিত কিনা, বিবেচনা করিবেন।...আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎ-সকাশে উপস্থিত হইব এবং ঐ কার্যের জন্য, আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।" ('বাণী ও রচনা' ৬।৩২৮-৩০)

এই পত্রে তিনি ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে অর্থপ্রাপ্তির আশা নাই, কারণ "বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না।...এবং বঙ্গ-ভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ত্যাগ কাহাকে বলে, এদেশের লোক স্বপ্নেও ভাবে না—কেবল বিলাস, ইন্দ্রিয়পরতা এবং স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে।" প্রমদাবাবুকে লিখিত এই পত্র ফলপ্রসূ হয় নাই, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি, কারণ ২৬শে মে উক্ত পত্র লিখিবার পর ৪ঠা জুন প্রমদাবাবুর পত্রের উত্তরে স্বামীজী পুনর্বার লিখিতেছেন—"আপনার পরামর্শ অতি বুদ্ধিমানের পরামর্শ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—বড় ঠিক কথা। আমরাও এস্থানে ওস্থানে দুই চারিজন করিয়া ছড়াইতেছি।" (ঐ ৩৩১ পৃঃ)। শেষ কথাগুলির তাৎপর্য বড়ই মর্মান্তিক। দুই প্রধান অবলম্বনের অন্তর্ধানের পর মঠের ব্যয়সঙ্কুলান অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ায় অনেককেই মঠ ছাড়িয়া পর্যটক সাজিতে হইল। মঠের ভবিষ্যৎ তখন অনিশ্চিত।

হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ

অরূপের ঘরে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও স্বীয় ব্যক্তিত্ব অটুট রাখিয়াছিলেন—একই সময়ে তিনি ছিলেন দ্বৈত-অদ্বৈত উভয়ভূমিতে অধিরূঢ়। নর-ঋষি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অনেকটাই যেন দুই আপাতবিরোধী ধারার সংঘর্ষে পরিপূর্ণ। উচ্চ প্রকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বর-কোটিরই সমুচিতরূপে তিনি সর্বদা জগৎবিস্মৃত হইয়া থাকিতে সচেষ্ট; আবার শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাকে লোককল্যাণার্থ নিয়োগ করার গুরু-দায়িত্বও সর্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া প্রতিমুহূর্তে তাঁহার অন্তর্মুখ মনকে বহির্জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতির বাস্তবতার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছিল এবং অমনি তাঁহার করুণাবিগলিত হৃদয় প্রতিকারের উপায় আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইতেছিল। এই ধারাদ্বয়ের সমন্বয় কিভাবে সাধিত হইবে তাহার ইঙ্গিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে বহু প্রকারে প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও উহার কার্যে পরিণত পরিপূর্ণ রূপটি তখনও স্বামীজীর দৃষ্টিতে জাজ্বল্যমান হয় নাই, তখনও "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এই মহামন্ত্র তাঁহার কম্বুকণ্ঠে নিনাদিত হয় নাই এবং মানবের প্রতিটি ক্রিয়াকে ভগবদভিমুখ করিয়া সমগ্র জীবনকে এক অবিরাম ও অখণ্ড সাধনায় পরিণত করার উপায় তখনও তাঁহার বাণীতে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই। এই দ্বন্দ্বসঙ্কুলিত মুহূর্তেই বরাহনগর-মঠের আর্থিক সমস্যা জটিলরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। তবু তিনি বিশ্বাস হারান নাই যে শ্রীশ্রীভগবানের অবতারগ্রহণের নিগূঢ় অভিপ্রায় অবশ্যই অচিন্তনীয়রূপে সুসিদ্ধ হইবে। অথচ তদানীন্তন পরিস্থিতিতে মঠকে তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত করার কোন ফলপ্রসূ উত্তম উপায় অকস্মাৎ প্রতিভাত হইল না। তাঁহার জীবনের মহাব্রত পরিপালনের জন্য ভগবন্নির্দেশে হয়তো আরও বাস্তব অভিজ্ঞতাসঞ্চয়, আরও নিরালম্ব সাধনার প্রয়োজন ছিল; হয়তো দুই-চারিজন বন্ধুর সহায়তামাত্রের উপর মঠের ভিত্তি স্থাপিত না হইয়া বিরাট বিশ্বমানবের শুভেচ্ছার উপর উহার প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক ছিল। আর জাগতিক দৃষ্টিতেও বোধ হইয়াছিল, অভাবের দিনে মঠে লোকসংখ্যা না বাড়াইয়া সুদিনের অপেক্ষায় আপাততঃ অধিকাংশ মঠবাসীর পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক বাহিরে চলিয়া

যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এইসব চিন্তা স্বামীজীর মনে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। আর তিনি বুঝিয়াছিলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, কার্য-ক্ষমতা ও চরিত্রবলে এবং মুষ্টিমেয় উদারপ্রাণ গুরুভক্তিপরায়ণ ভক্তের অর্থ-সাহায্যে মঠের কাঠামো কিছুকাল অবশ্যই অব্যাহত থাকিবে—অথচ এই উপায়ে উহার সমধিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই ; তাই উপায়ান্তর অন্বেষণ অত্যা-বশ্যক। হয়তো এইজাতীয় কোন পরিকল্পনা লইয়া তিনি সুদীর্ঘ ভারতভ্রমণে নির্গত হওয়াই উচিত মনে করিলেন।

এতদ্ব্যতীত আত্মজ্ঞানলাভের জন্য নির্জন, নীরব এবং অবিরাম সাধনার আকর্ষণ তো তাঁহার জীবনে সর্বদাই ছিল। গাজীপুর ত্যাগের প্রাক্কালে (২রা এপ্রিল) তিনি স্বামী অভেদানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আমারও বড় ঐরূপ হয়—সেই ভয়েই যাইতে পারিতেছি না। তার উপর বাবাজী বারণ করেন। দুই চারিদিনের বিদায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব ; কিন্তু ভয় এই—তাহা হইলে একেবারে হৃষীকেশী টানে পাহাড়ে টেনে তুলবে—আবার ছাড়ানো বড় কঠিন হইবে, বিশেষ আমার মতো দুর্বলের পক্ষে।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩২৬)। ইহারই সমকালে হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণে অভিজ্ঞ স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত পত্রযোগে এক পরিকল্পনা রচিত হইতেছিল—স্বামীজীর জনৈক বন্ধু তখন নেপালের রাজার ও রাজার স্কুলের শিক্ষক ; সেই বন্ধুর সহায়তায় তিনি নেপালে যাইবার ও নেপাল হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করিবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিবেন, আর সে ভ্রমণের সঙ্গী হইবেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি অখণ্ডানন্দকে অবিলম্বে গাজীপুরে চলিয়া আসিতে বলিলেন। অখণ্ডানন্দ সে আহ্বানে সাড়া দিয়া গাজীপুরে পৌছিলেন ; কিন্তু স্বামীজী তখন কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। এই সুযোগে অখণ্ডানন্দ পওহারী বাবাজীকে দর্শন করিতে গেলেন এবং দর্শনান্তে প্রমদাদাস বাবুকে লিখিলেন, "বাবাজী এ দাসের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। তাঁহার 'দাস' ও 'সরকার' ভিন্ন অন্য কোন সম্ভাষণ নাই। আমাদের নরেন্দ্র-স্বামীর বহু প্রশংসা করিলেন" ('স্বামী অখণ্ডানন্দ', পৃঃ ৬১)। সেখানে আবার তাঁহার জ্বর হইল। সুস্থ হইলে তিনি বরাহনগর যাত্রা করিলেন ; কিন্তু ৯ই জুন (১৮৯০) বালি স্টেশনে পৌছিলে এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। সন্দেহ-পরায়ণ জনৈক পুলিস কর্মচারী তাঁহাকে ধরিয়া প্রথমে থানায় লইয়া ও পরে

বরাহনগর মঠে আনিয়া স্বামীজীকে বলিল, "আপনি লিখে দিন ইনি আপনাদেরই একজন গুরুভাই" ইত্যাদি। স্বামীজীর আদেশে স্বামী শিবানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিবেন বলিয়া কলম ধরিয়াছেন, এমন সময় স্বামীজী কাগজখানি ছিনাইয়া লইয়া তেজোদৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "লিখে আবার দেব কি?" তাঁহার করাল ভ্রূকুটি দেখিয়া বেগতিক বুঝিয়া কর্মচারিটি চলিয়া গেল (ঐ, ৬২)।

অখণ্ডানন্দকে কেন্দ্র করিয়া মঠে কয়েক দিন খুব আনন্দ চলিল। তিব্বতের ও হিমালয়ের রোমহর্ষকর কাহিনীগুলি শুনিয়া যেন তৃপ্তি হয় না। শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহভরে বলিলেন, "হাঁ, তোর মতন লোকই আমি চাচ্ছি যে আমার হিমালয়ভ্রমণের সাথী হবে।" স্বামীজী যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং ৬ই জুলাই আলমোড়ায় পত্র লিখিয়া স্বামী সারদানন্দকে জানাইলেন, "আমি শীঘ্রই (অর্থাৎ ভাড়ার টাকাটা যোগাড় হইলেই) আলমোড়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হইবার ইচ্ছা; গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ) আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি।···আমি এখানে যেন কতকটা ভীমরুলের চাকের মধ্যে রহিয়াছি। এক দৌড়ে আমি হিমালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এবার আর পওহারী বাবা ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে; তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। একেবারে উপরে যাইতেছি।" ('বাণী ও রচনা' ৬।৩৩৩-৩৪)। স্বামীজী পূর্বে নেপাল হইয়া যাওয়ার কথা ভাবিয়া থাকিলেও সম্ভবতঃ ঐ বিষয়ে সুযোগ না পাইয়া আলমোড়ার দিকে যাইবারই সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

স্থির হইল, জুলাই মাসের মধ্য ভাগে তীর্থদর্শনে যাইবেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তখন বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়িতে শ্মশানের ধারে এক ভাড়াবাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া যাত্রা করা আবশ্যক জানিয়া স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ সেই বাড়ীতে গেলেন। স্বামীজী ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে শ্রীমায়ের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার তুষ্টি বিধানের জন্য ভক্তিরসাপ্লুত সঙ্গীত শুনাইলেন। তারপর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন, "মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই ফিরব; নতুবা এই-ই!" শ্রীমা সচকিতে বলিলেন, "সে কি?" স্বামীজী অমনি শুধরাইয়া লইলেন, "না না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।" শ্রীমা

আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, তোমার মাকে দেখে যাবে না?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "মা, আপনিই আমার একমাত্র মা!" শ্রীমা আর কিছু বলিলেন না; প্রত্যুত তাঁহার অদম্য আগ্রহ দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিয়া দিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকেও তিনি অনুরূপ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলাম; তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জান—দেখো যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।" মঠের দিকে ফিরিবার পথে স্বামীজী অখণ্ডানন্দকে বলিলেন, "গ্যাথ্ গ্যাঞ্জেস, কোথাও আর নাবা-টাবা হবে না—একেবারে উত্তরাখণ্ডে যেতে হবে।" স্বামীজী গঙ্গাধরকে আদর করিয়া গঙ্গানদীর ইংরেজী নামে গ্যাঞ্জেস বলিয়া ডাকিতেন। যাত্রার প্রাক্‌কালে তিনি মঠের ভাইদের বলিলেন, "এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদলে ফেলতে পারার ক্ষমতালাভ না করে ফিরছি না।"

একটানা যাওয়া হইল না। শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া তাঁহারা কিছুদিন ভাগলপুরে বিশ্রাম করিলেন।[১] মধ্যাহ্নে সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা কুমার নিত্যানন্দ সিংহ নামক এক ভদ্রলোকের বাড়ীর সন্নিকটে গঙ্গাতীরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা তখন অন্যান্য সাধুর ন্যায় ছিন্ন-মলিন-বস্ত্র-পরিহিত ও দণ্ড-কমণ্ডলুধারী। সিংহ মহাশয় প্রথম দৃষ্টিতে ইঁহাদিগকে সাধারণ সাধু বলিয়া মনে করিলেও পরে বুঝিতে পারিলেন, ইঁহারা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, বিশেষতঃ ইঁহাদের একজন প্রতিভাবান। সেখানে রাত্রিযাপনান্তে পরদিবস সকালে তাঁহারা কুমার সাহেবের অভিভাবক ও গৃহশিক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন।[২] কুমার সাহেব তখন পাঠাভ্যাস করিতেন; মন্মথবাবু

১। সকল জীবনীতেই জুলাই মাসে (হয়তো মাঝামাঝি) বরাহনগরত্যাগের উল্লেখ আছে। অথচ ভাগলপুরের মন্মথবাবু বলেন, স্বামীজীরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন আগস্ট মাসে। তবে কি তাঁহারা পদব্রজে গিয়াছিলেন? হয়তো তাহাই। কিংবা পথে নদীয়া, শান্তিপুর ইত্যাদি দেখিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। অবশ্য ইহা উত্তরাখণ্ডে যাওয়ার সোজা পথ নহে। তবু কোনও কারণে তাঁহারা এই দীর্ঘপথই ধরিয়াছিলেন এবং বৈদ্যনাথেও গিয়াছিলেন।

২। ইংরেজী জীবনীর মতে তাঁহারা সিংহ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মন্মথবাবুর বিবরণ হইতে মনে হয়, কুমার সাহেবের সহিত প্রথম পরিচয় না হইয়া তাঁহারই সহিত হইয়াছিল। হয়তো কুমার সাহেব সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হইয়াছে, তাহা মন্মথবাবুরই জীবনের ঘটনা। তিনিই তখন জমিদারপুত্রের অভিভাবক।

তাঁহাকে পড়াইবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ নামক এক ভদ্রলোককে রাখিয়াছিলেন ; ইনি মন্মথবাবুর গৃহেই থাকিতেন। স্বামীজীর ভাগলপুরে আগমন ও অবস্থান সম্বন্ধে মন্মথবাবু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে স্বামীজীর জনৈক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন :

"১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের এক সকালে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ সাধারণ সাধু মনে করিয়া আমি তাঁহাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। আমরা তখন মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া একসঙ্গে বসিয়াছিলাম এবং তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত মনে করিয়া কথা বলিতেও প্রবৃত্তি হইতেছিল না ; প্রত্যুত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পড়িতেছিলাম। একটু পরে স্বামীজী আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আমি কি বই পড়িতেছি। উত্তরে আমি বইখানির নাম বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ইংরেজী জানেন কিনা। তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ একটু-আধটু।' অতঃপর আমি তাঁহার সহিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলাম এবং বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমা অপেক্ষা শতগুণ পণ্ডিত। তিনি বহু ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিতে লাগিলেন এবং দানাপুরের শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ ও আমি তাঁহার বিদ্যাবত্তায় অবাক হইয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার বাগ্‌বৈভব উপভোগ করিতে লাগিলাম।

"একদিন স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন বিশেষ সাধনপ্রণালী অনুসরণ করি কিনা। তখন আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া যোগসাধন সম্বন্ধে আলাপ করিলাম। ইহা হইতে আমার ধারণা হইল যে, ইনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন ; কারণ তিনি যোগ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন তাহা আমি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহার সহিত হুবহু মিলিয়া গেল। অধিকন্তু তিনি ঐ বিষয়ে আরও বহু অশ্রুতপূর্ব তথ্যের সন্ধান দিলেন।

"তারপর তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমার নিকট যে কয়খানি উপনিষদ্ ছিল তাহা লইয়া আসিলাম এবং ঐগুলি হইতে বাছিয়া বাছিয়া বহু কঠিন স্থানের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলাম। তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে। অধিকন্তু তিনি যেরূপ সুললিত কণ্ঠে উপনিষদবাক্যসমূহ উচ্চারণ করিলেন, তাহা

বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। এইরূপে ইংরেজী, সংস্কৃত ও যোগ বিষয়ে তাঁহার সমপ্রকার অত্যাশ্চর্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আমি তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম। যদিও তিনি আমার গৃহে মাত্র সাত দিন ছিলেন, তথাপি আমি তাঁহার এমনই অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম যে, আমি মনে মনে স্থির করিলাম, তাঁহাকে কিছুতেই অন্যত্র যাইতে দিব না। অতএব তাঁহাকে চিরকাল ভাগলপুরে থাকিয়া যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলাম।

"একদিন দেখিলাম, তিনি আপন মনে গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছেন; তাই জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি গান গাহিতে জানেন কিনা। তিনি উত্তর দিলেন, 'খুব সামান্যই।' আমাদের পীড়াপীড়িতে তিনি গান করিতে রাজী হইলেন; তখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিলাম, পাণ্ডিত্যে যেমন, সঙ্গীতেও তিনি তেমনি বিশেষ পারদর্শী। পরদিন জানিতে চাহিলাম, আমি যদি জনকয়েক গায়ক ও বাদককে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসি তবে তাঁহার আপত্তি আছে কিনা। তিনি সম্মত হইলেন এবং আমি অনেক গায়ককে ডাকিয়া আনিলাম; তাঁহাদের মধ্যে অনেক ওস্তাদও ছিলেন। ভাবিয়াছিলাম (রাত্রি) নয়টা-দশটার মধ্যেই গানের আসর ভাঙ্গিয়া যাইবে। এদিকে স্বামীজী রাত্রি দুইটা-তিনটা পর্যন্ত অবিরাম গাহিয়া চলিলেন। সকলেই গানে এত মাতিয়া গিয়াছিলেন যে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা সময়ের জ্ঞান ছিল না। কেহই আসন ত্যাগ করিলেন না বা বাড়ী ফিরিবার কথা ভাবিলেন না। কৈলাসবাবু সঙ্গত করিতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া থামিতে হইল; কারণ তাঁহার আঙ্গুল অসাড় ও অচল হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অলৌকিক শক্তি আমি আর কখনও দেখি নাই, ভবিষ্যতেও দেখার আশা রাখি না। পরদিন সন্ধ্যায় পূর্বরাত্রের সকল অতিথিই অনাহুত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নূতন অনেকেও আসিলেন। সঙ্গতকারও আসিলেন; কিন্তু স্বামীজী সেদিন গাহিলেন না; কাজেই সকলে খুব নিরাশ হইলেন।

"আর একদিন আমি প্রস্তাব করিলাম যে, আমি তাঁহাকে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করাইয়া দিব এবং তাঁহার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, এইজন্য আমি নিজেই তাঁহাকে আমার গাড়ী করিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু তিনি এই বলিয়া অস্বীকার করিলেন যে, ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়ানো সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে। তাঁহার জলন্ত বৈরাগ্য আমার মনের উপর গভীর

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আমি তাঁহার সঙ্গলাভের ফলে এমন অনেক কিছু শিখিয়াছিলাম, যাহা আমার ধর্মজীবনের চিরকালের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

"বাল্যকাল হইতেই আমার নির্জন সাধনার দিকে ঝোঁক ছিল। স্বামীজীর সাক্ষাৎলাভের পর এই আকাঙ্ক্ষা আরও বলবতী হইল। আমি স্বামীজীকে প্রায়ই বলিতাম, 'চলুন, দুজনে বৃন্দাবনে যাই; সেখানে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে প্রত্যেকের জন্য তিন শত টাকা জমা দিলেই সারা জীবন গোবিন্দজীর প্রসাদ পাইতে থাকিব। এইরূপে কাহারও নিকট ভারস্বরূপ না হইয়া আমরা যমুনা-তীরে কোন নির্জন স্থানে দিবারাত্র ভক্তিসাধনা করিতে পারিব।' ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, 'হাঁ, এক ধাতের লোকের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা উত্তম—ইহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সকলের পক্ষে নয়।' অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, যে সর্বত্যাগী তাঁহার জন্য ইহা ঠিক হইবে না। তিনি যেসকল নূতন কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইটি কথা আমার খুব মনে লাগিয়াছিল। 'প্রাচীন আর্যদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রতিভার যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা প্রায়শঃ সেসব জায়গায়ই পাওয়া যায় যাহা গঙ্গাতীরের সন্নিকটে অবস্থিত। গঙ্গা হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই সেগুলি কমিতে থাকে। এই বিষয়টা লক্ষ্য করিলেই প্রাচীন শাস্ত্রে যে গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস জন্মে।' 'নিরীহ হিন্দু—এই কথাটাকে একটা গালি হিসাবে না ধরিয়া বরং আমাদের চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমাদের গৌরবখ্যাপক বলিয়াই ধরা উচিত। কারণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানবচরিত্রের যে পাশবিক শক্তি মানুষকে তাহার ভ্রাতৃসদৃশ অপর মানুষের সর্বনাশ ও প্রাণনাশে প্রবৃত্ত করে উহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কতখানি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আবশ্যক এবং প্রেম ও করুণার কতখানি উৎকর্ষ আবশ্যক, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!'

"স্বামীজী মনে মনে ঠিক জানিতেন যে, আমি তাঁহাকে স্বেচ্ছায় বা সহজে ভাগলপুর ছাড়িয়া যাইতে দিব না। অতএব একদিন যখন আমি এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যে বাহিরে চলিয়া গিয়াছি, তখন তিনি সেই সুযোগে আমার বাড়ীর অপর লোকদের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমরা তাঁহার জন্য প্রাণপণ অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহার বিন্দুমাত্র সন্ধান পাইলাম না। অথচ কেমন করিয়াই বা আমি ভাবিতে পারিলাম যে,

এই বিষয়ে আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হওয়া উচিত ; যে স্বামীজীর কার্যক্ষেত্র সমগ্র বিশ্ব হওয়া উচিত তিনি কেন কূপমণ্ডুকের মতো এখানে পড়িয়া থাকিবেন ?

"তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বদরিকাশ্রমে যাইবার ইচ্ছা আছে। সুতরাং তিনি ভাগলপুর হইতে চলিয়া গেলে আমি তাঁহার সন্ধানে হিমালয়ে আলমোড়া পর্যন্ত গিয়াছিলাম। সেখানে লালা বদ্রী-শা আমাকে জানাইলেন যে, তিনি কিছুদিন পূর্বে আলমোড়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখিলাম, তিনি ততদিনে উত্তরাখণ্ডাভিমুখে বহুদূর চলিয়া গিয়া থাকিবেন ; তাই তাঁহার অনুসরণ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল।

"তাঁহার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহাকে একবার ভাগলপুরে লইয়া আসার আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু সম্ভবতঃ বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকায় তিনি আসিতে পারেন নাই।"

মন্মথবাবুর গৃহে এক সপ্তাহ থাকাকালে স্বামীজী একদিন বরারীর পবিত্রচেতা মহাত্মা পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে যান। আর একদিন তিনি নাথনগরের জৈনদিগের মন্দির দেখিয়া আসেন। অন্য এক সময়ে জৈন আচার্যদিগের সহিত জৈনধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার অনেক আলাপ হয় এবং তাঁহাদের ধর্মমতে স্বামীজীর অধিকার দেখিয়া আচার্যগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হন। এই আলাপের ফলে স্বামীজীও জৈনধর্ম সম্বন্ধে একটি সুযুক্তিপূর্ণ ধারণা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মে যে, ঐ ধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা মাত্র, আর বৌদ্ধধর্মের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

প্রমথবাবুর মতে ('স্বামী বিবেকানন্দ', ২০২ পৃঃ) মন্মথবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন ; কিন্তু স্বামীজীর সহিত আলাপ পরিচয়ের ফলে তিনি পুনরায় হিন্দুধর্ম মানিতে আরম্ভ করেন, এমন কি রাধাকৃষ্ণ-লীলা পর্যন্ত স্বীকার করিয়া লন। 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' (৬৬ পৃঃ) গ্রন্থের মতে স্বামীজী মন্মথবাবুর বাটীতে প্রথম দিনের গানের মজলিসে তানপুরা লইয়া গাহিয়াছিলেন,

এলো না এলো না শ্যাম, কুঞ্জে তো এলো না।
রজনী পোহায়ে যায়, তবুও সে এলো না ॥

ভাগলপুরে স্বামীজীর ও স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মথুরানাথ সিংহ মহাশয়েরও আলাপ হয়। ইনি তখন কুমার সাহেবের গৃহশিক্ষক ছিলেন, পরে পাটনায় ওকালতি ব্যপদেশে সুনাম অর্জন করেন। সিংহ মহাশয় প্রাচীন দিনের

কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তাঁহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারেই আমি তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম। আমার মনে পড়িল, আমি তাঁহাদের একজনকে কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়নকালে দেখিয়াছিলাম; তখন তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনাসঙ্গীত পরিচালিত করিতেন—ইনিই পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার সহিত আমার অনেক বিষয়ে —যথা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম, বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই বিষয়ে—অনেক চর্চা হয়। আমার মনে হইয়াছিল, বিদ্যা ও দর্শন যেন তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়া আছে। আমি বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার উপদেশের মূল কথা ছিল এক সুগভীর স্বার্থলেশশূন্য দেশপ্রেম, এবং উহারই মিশ্রণে তিনি নিজ বক্তব্যগুলি জীবন্ত করিয়া তুলিতেন। ইহা ছিল তাঁহার চরিত্রের একটা শাশ্বত রূপ। আমি যখন চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁহার সাফল্যের সংবাদ পাঠ করিলাম, তখন মনে হইল, এতদিনে ভারত তাঁহার প্রকৃত নেতাকে পাইয়াছে।"

স্বামী অখণ্ডানন্দের আগ্রহানুসারে স্বামীজী অতঃপর বৈদ্যনাথধামে গেলেন। তাঁহারা রেলপথে কিউল হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছিলেন, অথবা হাঁটিয়া মেঠোপথে গিয়াছিলেন, জানা যায় না। হাঁটাপথে তখনও বহু লোক চলাচল করিত, বিশেষতঃ তখন এবং এখনও ঐ পথে অনেকে বৈদ্যনাথের জন্য ভাদ্র-পূর্ণিমাদিতে গঙ্গাজল আনিত বা লইয়া আসে। বৈদ্যনাথে তাঁহারা একদিন প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম আচার্য শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার 'পুরাণদহ'স্থিত আবাসে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। স্বামীজী ঐকালে লোকসমাজে সাধারণ সাধু হিসাবেই আপনার পরিচয় দিতে চাহিতেন; অতএব পূর্বেই স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলিয়া দিয়াছিলেন, রাজনারায়ণবাবু যেন বুঝিতে না পারেন যে, তাঁহারা ইংরেজী জানেন। কথাপ্রসঙ্গে এমন অনেক বিষয় আসিয়া পড়িল যাহাতে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক, যেমন যোগচিহ্ন (প্লাস চিহ্ন); কিন্তু স্বামীজী তাঁহার অঙ্গুলিদ্বয় প্লাসের আকারে সন্নিবদ্ধ করিয়া উহা দেখাইলেন এবং সঙ্কট এড়াইয়া গেলেন।[৩] একবারও বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু বুঝিতে পারিলেন

৩ ইহা ইংরেজী জীবনীর মতে। বাঙ্গালা জীবনীর মতে রাজনারায়ণবাবু হঠাৎ প্লাস কথাটা ব্যবহার করিয়া উহা স্বামীজীকে বুঝাইবার জন্য ঐরূপ সংকেতের সাহায্য গ্রহণ করেন (২০৩ পৃঃ)। দ্বিতীয় মতই অধিকতর যুক্তিসম্মত।

না যে, যুবক সাধুটি স্বীয় মাতৃভাষারই ন্যায় অনর্গল ইংরেজী বলিতে অভ্যস্ত। সুদীর্ঘকাল পরে যখন স্বামীজীর নাম সারা ভারতে সুপরিচিত হইয়া পড়িল, রাজনারায়ণবাবু তখন বুঝিতে পারিলেন, উক্ত সাধুই কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন ; উক্ত সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি তখন তাঁহার স্মৃতিপটে স্পষ্ট উদিত হইল এবং তিনি আশ্চর্যের সহিত বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, তিনি ইংরেজী জানেন না।" বৈদ্যনাথে রাত্রিযাপন করিয়া সাধুদ্বয় পরদিন কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিকথা হইতে আমরা স্বামীজীর বিহার-ভ্রমণ-সম্পর্কিত একটি ঘটনা জানিতে পারি। উহা ঠিক কোন্ কালের বা কোন্ স্থানের জানা না থাকিলেও আমরা এখানেই উহার সন্নিবেশ করিলাম। ঐ সময় বিহারপ্রদেশের বহু আম গাছের গায়ে কাদা সিঁদূর ও শস্যবীজের এক-একটি তাল ঘুঁটের মতো লাগানো রহিয়াছে দেখিয়া সরকারী মহলে এক মহা চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়। ঐ প্রদেশের অনেক জেলার গাছেই এই কাণ্ড দেখা গেল। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ অমনি আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক প্রাক্‌কালে যে জাতীয় চাপাটির প্রচলন হইয়াছিল, এই সকল ঘুঁটে-সদৃশ বস্তুর সহিত উহাদের অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। ইহার ফলে অকস্মাৎ গ্রামাঞ্চলে সিপাহী সান্ত্রীর আবির্ভাব দেখিয়া গ্রাম্য লোক ভয়ে বলিতে লাগিল, ঐ সকল কাদার ঘুঁটের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই ও কে উহা লাগাইয়াছে, তাহাও তাহারা জানে না। অতএব পরিব্রাজক সাধুদের উপরই সন্দেহ পড়িল এবং দলে দলে তাহাদের ধর-পাকড় আরম্ভ হইল—যদিও পরে আবিষ্কৃত হইল যে, সাধুরা নিরপরাধ এবং আম গাছে ঐ ঘুঁটে লাগানো হইয়াছে কেবল সুফলের আশায়। পুলিস এই সত্যের সন্ধান পাইবার পূর্বে ঐ কালে স্বামীজী প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বা কোন গ্রাম্য পথ ধরিয়া চলিতে থাকিতেন, যতক্ষণ না তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন অথবা কেহ ভিক্ষাগ্রহণের জন্য আহ্বান করে। একদিন চলিতে চলিতে শুনিতে পাইলেন, কে যেন পিছন হইতে ডাকিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন অশ্বারোহী এক পুলিস কর্মচারী পুলিসবাহিনীসহ তাঁহার দিকে আসিতেছেন। কর্মচারী কর্কশস্বরে তাঁহার পরিচয় চাহিলে তিনি বলিলেন, "দেখছেনই তো খাঁ সাহেব, আমি সাধু।" পুলিসের দারোগা প্রত্যুত্তর দিলেন, "সব সাধুই বদমাস, আমার সঙ্গে চলে এসো,

তোমার শ্রীঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" "কত দিনের জন্য?" মৃদুভাবে প্রশ্ন করিলেন স্বামীজী। উত্তর আসিল, "দু'সপ্তাহ হতে পারে, একমাসও হতে পারে।" স্বামীজী আরও নিকটে গিয়া অনুনয়স্বরে বলিলেন, "শুধু একমাস খাঁ সাহেব? ছ' মাসের ব্যবস্থা করতে পারেন না, অন্ততঃ তিন-চার মাস?" অদ্ভুত আবদারে কর্মচারীর মেজাজ নরম হইল; তিনি বলিলেন, "এক মাসের বেশী জেলে থাকতে চাও কেন?" স্বামীজী পূর্বেরই ন্যায় ধীরভাবে বলিলেন, "কারাজীবন এর চেয়ে অনেক সহজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অবিরাম হাঁটার তুলনায় জেলের পরিশ্রম কিছুই নয়। ভোজনই পাই না রোজ, আর উপোস থাকতে হয় প্রায়ই। জেলে দু' বেলা পেটভরে খেতে পাব। আপনি যদি আমায় বেশ কয়েক মাস জেলে পুরে রাখেন তো সত্যি আমার উপকার হয়।" শুনিতে শুনিতে খাঁ সাহেবের মুখ নৈরাশ্য ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল; তিনি হঠাৎ স্বামীজীর প্রতি আদেশ দিলেন "ভাগো"।

নগেন্দ্রবাবু ঐ পরিব্রাজক-জীবনের আর একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একবার স্বামীজী স্থির করেন, খাদ্য ভিক্ষা করিবেন না, অযাচিতভাবে কেহ কিছু দিতে আসিলেই মাত্র লইবেন। ইহার ফলে মাঝে মাঝে উপবাসে কাটাইতে হইত। একবার দুই দিন অনাহারে আছেন, অথচ পথ চলিতেছেন, এমন সময় এক বড়লোকের অশ্বশালার পার্শ্ব দিয়া গমনকালে এক সহিস ডাকিয়া বলিল, "সাধু বাবা, কিছু ভোজন হয়েছে কি?" স্বামীজী বলিলেন, "না।" তখন সহিস তাঁহাকে অশ্বশালায় লইয়া গিয়া কিছু রুটি ও ঝাল-চাটনি খাইতে দিল। স্বামীজী লঙ্কা খাইতে খুবই অভ্যস্ত ছিলেন, এমন কি শুধু শুধু কাঁচা লঙ্কাও চিবাইয়া খাইতে পারিতেন। কিন্তু এই চাটনি এত ঝাল ছিল যে, দুই দিন উপবাসের পর উহা খাইয়াই তিনি পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন। সহিসেরও তখন বিষম মনঃকষ্ট। এমন সময় এক ব্যক্তি মাথায় একটি ঝুড়ি লইয়া ঐ দিকে যাইতেছিল। গোলমাল শুনিয়া সে থামিল। তখন স্বামীজী জানিতে চাহিলেন, তাহার ঝুড়িতে কি আছে। সে বলিল, "তেঁতুল"। স্বামীজী বলিলেন, "ঐ তো চাই।" ঐ তেঁতুলজল খাইয়া তাঁহার যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইল।

স্বামীজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দের এই কালের ভ্রমণের ক্রমিক ও সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; স্বামীজীর বিভিন্ন উক্তি, নগেন্দ্রবাবুর বিবরণ ইত্যাদি হইতে অনুমান করা চলে যে, ইঁহারা উত্তর ভারতের সমভূমিতে অনেক

পথ পদব্রজে অতিবাহিত করেন, যদিও কোন জীবনীতে বা অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথায়' ইহার উল্লেখ নাই। 'স্মৃতিকথা'য় শুধু এইটুকু পাই, "ক্রমে ভাগলপুর, বৈদ্যনাথ, গাজীপুর, কাশী, অযোধ্যা, নৈনীতাল ও আলমোড়া" (পৃঃ ৫৭)। গাজীপুরের কথা কিন্তু স্বামীজীর কোন জীবনীগ্রন্থে নাই। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বামীজী যদিও বহু চিঠি লিখিয়াছেন এবং উহার অনেকগুলিই আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই-এর পর হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত কোন লিপি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। সেইজন্য অনেক ঘটনাই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। বৈদ্যনাথের পর তাঁহাদের সঠিক খবর পাই কাশীধামে।

বারাণসী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী প্রমদাদাস বাবুর গৃহে (বা উদ্যান-বাটীতে) আশ্রয় লইলেন। প্রমদাবাবুর সঙ্গে তাঁহার নিত্যই সুদীর্ঘ শাস্ত্রালোচনা হইত ; কিন্তু এখানে অধিক দিন থাকার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তখন তিনি হিমালয়ের শান্ত ক্রোড়ে সাধনায় নিমগ্ন হইতে ব্যাকুল, আর অন্তরে একটা শক্তির অস্ফুট আলোড়ন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল—তিনি যেন অস্পষ্ট আভাস পাইতেছিলেন, তাঁহার দেহ-মন অবলম্বনে ঐ দৈবশক্তি এক অদ্ভুত কার্য করিতে উদ্‌গ্রীব। তাই কথাপ্রসঙ্গে একদিন প্রমদাবাবুকে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "আবার যখন এখানে ফিরব, তখন আমি সমাজের উপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের ন্যায় অনুসরণ করবে।" স্বামীজী হঠাৎ কেন এরূপ একটা শক্ত, অথচ ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে অতীব সত্য, কথা বলিলেন এবং প্রমদাবাবু উহা কিরূপে গ্রহণ করিলেন, জানা নাই। এতদিন পরে আমরা শুধু আন্দাজ করিতে পারি। প্রমদাবাবু ছিলেন থিয়োজফিস্টদের অনুরাগী অথচ সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল। আর স্বামীজী ছিলেন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সনাতন-পন্থী ; কিন্তু সমাজের স্তরে প্রগতিশীল। তিনি একদিকে যেমন আজগুবী জিনিস পছন্দ করিতেন না, অপর দিকে তেমনি প্রাণহীন আচার-বিচারে আস্থা রাখিতেন না। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, পত্রের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে এইসব বিষয়ে বাদ-বিচার চলিত ;[৪] বর্তমানে উহা আরও তুমুলাকার ধারণ করিয়াছিল

৪ "নানাপ্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণজন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৮৭) ; "বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহা কোথায় পাইব ?" (ঐ, ৬।৩২৭) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

নিশ্চয়। আমরা অনুমান করিতে পারি, স্বামীজী তাঁহার অপূর্ব ও মৌলিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী খুলিয়া ধরিতেছিলেন, আর প্রমদাবাবু তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস বা শ্লেষ প্রকাশ করিতেছিলেন। অতএব চিন্তাধারায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অকস্মাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে স্বামীজীর পক্ষে ঐরূপ বলিয়া ফেলা আশ্চর্য নহে। অথচ উহা কত সত্য! কাশীধামে তিনি ফিরিয়াছিলেন আমেরিকা বিজয়ের পরে—যখন সারা ভারত বিবেকানন্দের নামে মুখরিত। আরও একটি কথা দ্রষ্টব্য। এ পর্যন্ত স্বামীজী যদিও প্রমদাবাবুকে নিয়মিত পত্র লিখিতেন, এই বিদায়ের পর আর কোন পত্র লিখেন নাই বলিলেই চলে—অনেক পরে শুধু একখানি শেষ চিঠিতে উভয়ের গভীর মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইঁহাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী না হইলেও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথমাবস্থায় কাশীধামে আগত রামকৃষ্ণ-মঠের সন্ন্যাসীদের সেবার জন্য প্রমদাবাবু যাহা করিয়াছেন, তাহা কোন জীবনীকার ভুলিতে পারেন না, কিংবা অন্য কথা তুলিয়া প্রমদাবাবুর গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করাও চলে না। এই শেষবারেও তিনি স্বামীজীর প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুখ-সুবিধার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হিমালয়ে শীঘ্র পৌঁছিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীর ছিল। কিন্তু স্বামী অখণ্ডানন্দ পূর্বে অযোধ্যা দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলেন, অতএব স্বামীজীকেও সে আনন্দ সম্ভোগ করাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন, তিনি স্বামীজীর কোন কথা না শুনিয়া অযোধ্যার দুইখানি টিকিট কিনিয়া আনিলেন। নিরুপায় স্বামীজী গম্ভীরপদক্ষেপে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং অযোধ্যার স্টেশনে নামিয়া নীরবে একায় চড়িলেন—শুধু যেন অখণ্ডানন্দেরই সন্তোষবিধানের জন্য চলিয়াছেন। অখণ্ডানন্দের ইচ্ছা ছিল, স্বামীজীকে মহান্ত মহারাজ জানকীবর শরণের সহিত সাক্ষাৎ করাইবেন। ইনি ছিলেন ভগবদ্ভক্ত ও সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত। বৈষ্ণব হইলেও তাঁহার তিলকাদি বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। মঠে অর্থপ্রাচুর্য থাকিলেও তিনি খুব ত্যাগী ছিলেন এবং অতিথিদের সহিত এক পঙক্তিতে বসিয়া শালপত্রে আহার করিতেন ও সহকারীর উপর কার্যভার দিয়া সাধনভজনে কালাতিপাত করিতেন। প্রথম দিন সন্ধ্যাসমাগমে সরযূতীরে লছমন ঘাটের সন্নিকটে সীতারাম-মন্দিরে পৌঁছিয়া মহান্ত মহারাজের সহিত আলাপের সুযোগ না হওয়ায় পরদিন সকালে তাঁহারা দুইজনে পুনর্বার

সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং মহাত্মজীর সহিত ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিলেন। স্বামীজী ইহাতে খুবই আনন্দিত হইয়া অখণ্ডানন্দকে বলিয়াছিলেন, "তুই যে এখানে আমায় এনেছিলি, এতে বড় খুশী হয়েছি ; আজ প্রকৃতই একজন সাধু পুণ্যাত্মার দর্শনলাভ ঘটল।"

অতঃপর আমরা ইঁহাদের দর্শন পাই নৈনীতালে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের[৫] গৃহে। এখানে তাঁহারা ছয়দিন ছিলেন। স্থানীয় তালের ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া অখণ্ডানন্দের বুকে একটা বেদনা হইল; কিন্তু তখন বদরীনারায়ণ দর্শনের সঙ্কল্প এত প্রবল যে, ঐ-বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উভয়ে আলমোড়ায় চলিলেন।

আমাদের ধারণা নৈনীতাল হইতে আলমোড়া পর্যন্ত অধিকাংশ রাস্তায় উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ চলিয়াছিলেন, কারণ পর পর দুই দিন স্বামীজী তাঁহার সহযাত্রীকে বলিয়াছিলেন, "তুই রাস্তা দিয়ে যা, আমি একটু বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে ওধারে তোর সঙ্গে মিলব।" ('স্বামী অখণ্ডানন্দ', পৃঃ ৬৮)। কে জানে অন্য সময়েও এইরূপ হইত কিনা ? আমাদের ধারণা, এইরূপই হইত, কারণ স্বামীজীর তখন নির্জনতার দিকেই ঝোঁক ছিল এবং তাঁহার জীবনের ঐ কালের যে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বা তিনি নিজে অন্যপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত নিঃসঙ্গ ভ্রমণেরই সামঞ্জস্য অধিক। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সব ঘটনার কোন কোনটি চমকপ্রদ বা রোমহর্ষক হইলেও স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথায়' তাহাদের আভাসমাত্র নাই, কিংবা 'স্মৃতিকথা'র বিবরণ সূত্রাকারে বা তদপেক্ষাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ। যাহা হউক, এইভাবে চলিয়া তাঁহারা আলমোড়ায় পৌঁছিলেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে স্বামীজীর জীবনে কয়েকটি বিশেষ অনুভূতি ঘটিল।

একদিন স্বামীজী তাঁহার সহযাত্রীকে বলিলেন, তিনি স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবতার মন্ত্র কি এবং ঐ সকলের অর্থ কি, তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে কথিত একটি ঘটনা মনে পড়ে। উহার স্থান বা কাল জানা নাই ; হয়তো এই সময়েরও হইতে পারে। নিবেদিতা লিখিয়াছেন : "স্বামীজী আমাদিগকে তাঁহার সেই বহুদিন পূর্বের অপূর্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র সন্ন্যাসজীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি

৫ ইংরেজী জীবনীতে রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য নাম আছে।

করিবার প্রাচীন রীতি তিনি এই ঘটনা হইতেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে; আর্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদতীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার তরঙ্গের পর অন্ধকার তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর আমি সহজ অবস্থাপ্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে আমরা যে স্বর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই স্বর।" ('বাণী ও রচনা', ৯।২৮৮ পৃঃ)

আলমোড়ার পথে তৃতীয় দিবস তাঁহারা রাত্রিবাসের জন্য আলমোড়ারই অনতিদূরে এক নির্ঝরিণীর ধারে পান-চাকির কাছে আশ্রয় লইলেন। পরে স্নান সারিয়া এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষেব নিম্নে ধ্যানে বসিলেন। এক ঘণ্টা কাল এইভাবে অতীত হইলে স্বামীজী তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "ভাখ্ গঙ্গাধর, এই বৃক্ষতলে একটা মহা শুভ মুহূর্ত কেটে গেল; আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! বুঝলাম সমষ্টি ও ব্যষ্টি (বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড) একই নিয়মে পরিচালিত।" স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট রক্ষিত একখানি নোটবুকে স্বামীজী সেদিনের অনুভূতির কথা লিখিয়া রাখেন। তিনি বাঙ্গালাতেই লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত উহার ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ এই, (উহার মূল হারাইয়া গিয়াছে):

" 'সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম' ইত্যাদি।

"বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে সংগঠিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন একটি চেতন দেহের দ্বারা আবৃত, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতনাময়ী প্রকৃতির মধ্যে বা দৃশ্য জগতের মধ্যে অবস্থিত। শিবা শিবকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহা কল্পনা নয়। এই একের দ্বারা অপরের আলিঙ্গন যেন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের সদৃশ—তাহারা উভয়ে অভিন্ন এবং শুধু মানসিক বিশ্লেষণ সাহায্যেই উহাদিগকে পৃথক করা চলে। শব্দ ভিন্ন চিন্তা অসম্ভব। অতএব 'সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম' ইত্যাদি।

"বিশ্বাত্মার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত।"

ক্রমে আলমোড়ার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী ক্ষুধা ও পথশ্রমে এমন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, আর চলিতে না পারিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

নিরুপায় অখণ্ডানন্দ জলের সন্ধানে গেলেন। সম্মুখেই মুসলমানদের গোরস্থান ছিল এবং নিকটেই একজন ফকির পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। স্বামীজীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইল এবং তিনি এক ফালি শশা আনিয়া স্বামীজীকে খাইতে দিলেন। ইহা খাইয়া তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আলমোড়ায় এক বক্তৃতা-সভায় ঐ ফকিরকে উপস্থিত দেখিয়া স্বামীজী কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া সকলের সম্মুখে এই বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেন যে, ইনিই তাঁহার প্রাণরক্ষক। ফকির অবশ্য স্বামীজীকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু স্বামীজী ঠিক চিনিয়াছিলেন এবং প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে কিছু অর্থও দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকটি বাস্তবিক সেদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিল, কারণ আমি আর কখনও ক্ষুধায় অতটা কাতর হইনি।" হিমালয়ভ্রমণ স্বামীজীর পক্ষে সর্বদাই শারীরিক ক্লান্তিপ্রদ ছিল ; পথশ্রম তো ছিলই, তাহার উপর ছিল আহার-নিদ্রার সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা বা অভাব। কিন্তু অভ্রভেদী তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের গাম্ভীর্য, সৌন্দর্য ও শান্তসমাহিত ভাবদর্শনে তাঁহার মন ছিল সর্বদা প্রফুল্ল এবং অনন্তের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে গ্রথিত—যেন মায়াবরণ স্তরে স্তরে খুলিয়া গিয়া চিরবিরাজমান অসীম শান্তিতে তিনি নিমজ্জিত হইতেছিলেন। সার্থক হইয়াছিল তাঁহার সেই তিতিক্ষা ও তপস্যা।

আলমোড়া শহরে পৌঁছিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহাকে অম্বাদত্তের বাগানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া আলমোড়ার অন্যত্র তপস্যারত স্বামী সারদানন্দ ও কৃপানন্দ (বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল) নামক অপর দুই গুরুভ্রাতাকে সংবাদ দিতে গেলেন। সংবাদ পাইবামাত্র শেষোক্ত দুইজন অম্বাদত্তের বাগানে চলিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূরে গিয়া দেখেন স্বামীজী নিজেই তাঁহাদের দিকে আসিতেছেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাদের আশ্রয়দাতা লালা বদ্রী-শার গৃহে উপস্থিত হইলেন। শাজী তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই গৃহে শ্রীকৃষ্ণ যোশী নামক একজন সেরেস্তাদারের সহিত সন্ন্যাসগ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে স্বামীজীর সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক হয়। স্বামীজী স্বীয় অনুভূতিপুষ্ট অকাট্য যুক্তিদ্বারা বিষয়টি এমনভাবে বুঝাইয়া দেন যে, যোশীজী স্বীকার করিতে বাধ্য হন—ত্যাগই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

শাজীর বাড়ীতে স্বামীজী খুব আনন্দেই ছিলেন এবং তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি ও

অতিথিপরায়ণতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এমন ভক্ত জগতে বিরল। শাজীর গৃহে দিন কয়েক কাটাইয়া গুরুভ্রাতারা গাড়োয়াল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় কলিকাতা হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল, স্বামীজীর এক ভগিনী আত্মহত্যা করিয়াছেন। যথাকালে এই নিদারুণ ঘটনার সবিশেষ সংবাদসহ এক পত্রও আসিল। বলা বাহুল্য, এই মর্মান্তিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া স্বামীজীর স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ মন দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িল। আবার এই অতি বিষাদময় বিবরণের মাধ্যমে ভারতীয় নারীজীবনের বেদনাপূর্ণ দিকটার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণও তিনি পাইলেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু আপাততঃ তিনি কর্মক্ষেত্রে নামিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; হৃদয়ের অসহ্য দুঃখ তাঁহাকে এখন হিমালয়ের নির্জনতর প্রদেশে আরও সবলে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তিনি ৫ই সেপ্টেম্বর আলমোড়া ত্যাগ করিয়া বদরীনারায়ণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও কৃপানন্দ এবং মালবাহী একজন কুলি।

পথে স্বামী অখণ্ডানন্দের কফবৃদ্ধি হইলেও তিনি কাশিতে কাশিতেই চলিলেন। কর্ণপ্রয়াগে তাঁহাদিগকে তিন দিন অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হওয়ায় সরকার কেদার ও বদরিকাশ্রমের পথ যাত্রীদের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিন দিন পরেও ঐ পথ খোলার আশা নাই দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে ঐ তীর্থদ্বয় দর্শনের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক অন্য পথ ধরিলেন। কর্ণপ্রয়াগ ছাড়িয়াই স্বামীজীর জ্বর হইল; অখণ্ডানন্দের বুকের রোগও বৃদ্ধি পাইল। অতএব সলড়কাড় চটিতে আশ্রয় লইয়া তাঁহারা শয্যাগ্রহণ করিলেন এবং পুনর্বার পথচলার মতো সবল না হওয়া পর্যন্ত দিন কয়েক সেখানেই কাটাইলেন। অতঃপর তাঁহারা ক্রমে রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম। চতুর্দিক জনহীন এবং সর্বত্র নিস্তব্ধ শান্তি বিরাজিত—কেবল মাঝে মাঝে বিহঙ্গকাকলী ও ঝিল্লীরব, আর চিরপ্রবহমানা নির্ঝরিণীর কলকলধ্বনি। রজতশুভ্র চিরহিমের আলয় হিমগিরির অপূর্ব শোভাদর্শনে স্বামীজীর আবাল্য স্বপ্ন সার্থক হইল। তাঁহার মন যেন তখন প্রকৃতির সহিত সমসুরে বাঁধা হইয়া গেল। নদীর কুলুকুলুরব তাঁহার কর্ণে বিচিত্র সুরলহরীর পরিচয় দিত এবং গুরুভ্রাতাদিগকে তিনি উহা বুঝাইয়া দিতেন। অলকানন্দার কুলুধ্বনি শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "উহা

এখন কেদারা রাগে প্রবাহিত হচ্ছে।” রুদ্রপ্রয়াগে পূর্ণানন্দ নামক একজন সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়; ইনি বাঙ্গালী ছিলেন; ইঁহারই আশ্রমে সকলে প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন নিকটবর্তী ধর্মশালায় আশ্রয় লইবার পর স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ পুনর্বার জ্বরাক্রান্ত হইলেন—সে জ্বর পূর্বাপেক্ষাও প্রবল। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে গাড়োয়ালের সদর আমিন শ্রীযুক্ত বদ্রীদেব যোশীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া সন্ন্যাসীদ্বয়কে কিছু কবিরাজী ঔষধ দিলেন ও তাঁহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ডাণ্ডী করিয়া নয় মাইল দূরবর্তী শহর শ্রীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। সাধুরা তখন আলমোড়া হইতে ১২০ মাইল এবং কাঠগোদাম হইতে ১৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। ভিক্ষা, ধ্যান ও ধর্মালোচনাদি করিতে করিতে এবং অসুস্থতানিবন্ধন কিঞ্চিৎ মন্থরগতিতে চলিলেও কাঠগোদাম হইতে শ্রীনগর পৌছিতে তাঁহাদের কেবল কিঞ্চিদধিক তিন সপ্তাহ লাগিয়াছিল।

শ্রীনগরে তাঁহারা অলকানন্দার তীরে এক কুটীরে আশ্রয় পাইলেন এবং জানিতে পারিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ পূর্বে এই কুটীরেই বাস করিতেন। ভ্রমণকালে, বিশেষতঃ শ্রীনগরে, স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের সহিত উপনিষদালোচনায় দীর্ঘকাল কাটাইতেন। দিনের পর দিন প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রসমূহে নিহিত আত্মসুধা পান করিতে করিতে এবং উহার সৌন্দর্য গুরুভ্রাতাদিগের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে ধরিতে তিনি দেশ-কাল ও শারীরিক অবস্থাদির উর্ধ্বে চলিয়া যাইতেন। এইভাবে মাধুকরী মাত্র অবলম্বনে জীবনধারণপূর্বক ইঁহারা এখানে প্রায় মাসাবধি বাস করিয়াছিলেন। এখানে বৈশ্যজাতীয় একজন শিক্ষকের সহিত স্বামীজীর আলাপ হইয়াছিল। শিক্ষক সাময়িক ভ্রমবশে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর নিকট সদালাপের সুযোগ পাইয়া এবং সহৃদয় ব্যবহার লাভ করিয়া ঐ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন এবং অবশেষে সনাতন ধর্ম পুনর্গ্রহণ করেন।

স্বামীজীকে তখন ভাগীরথী দর্শনের জন্য ব্যাকুল দেখিয়া সকলে অতঃপর টিহিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ভিক্ষা মিলিল না; কারণ পথ জনমানবহীন বনাকীর্ণ। সন্ধ্যায় ক্লান্তদেহে এক গ্রামে পৌছিয়া তাঁহারা চত্বরে আসন পাতিলেন এবং স্বামীজীর ধূম্রপানের জন্য অখণ্ডানন্দ আগুন আনিতে গেলেন। কিন্তু গ্রামবাসী কেহই আগুন দিল না। সাধুরা ভাবিতে লাগিলেন,

সামান্য আগুন যেখানে মিলে না, তেমন অতিথিবিমুখ গ্রামে ভিক্ষার কি হইবে? তখন সাধুদের মধ্যে প্রচলিত ঐ অঞ্চলের একটি প্রবাদবাক্য তাঁহাদের মনে পড়িল—

গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহী ।
লাঠ্‌ঠা বগৈর দেতা নহী ॥

অমনি কৌতূহলপরবশ হইয়া গম্ভীরবাক্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ হাঁক দিতে লাগিলেন, "ইয়ে পাধান (প্রধান) রোটী লে আও, লকড়ী লে আও।" আশ্চর্য এই, তখনই গ্রামবাসীরা সশ্রদ্ধভাবে তণ্ডুলাদি লইয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু সাধুরা বলিলেন, তাঁহারা রান্না করিতে পারিবেন না; তৈরী রুটী প্রভৃতি চাই। অমনি গ্রামবাসীরা সানন্দে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া সাধুদের সহিত গ্রামাঞ্চলের রীতিনীতি ও সুখদুঃখাদির কথা আলোচনা করিল। সাধুরাও তাঁহাদের সরল ব্যবহার ও সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ হইলেন।

টিহিরি পৌঁছিয়া নির্জন গঙ্গাতীরে সাধুদের জন্য নির্মিত দুইখানি ঘর মিলিল। শ্রীনগরের ন্যায় এখানেও তাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষায় জীবনধারণ করিতেন এবং শাস্ত্রালোচনা ও ধ্যানধারণায় দিন কাটাইতেন। এখানে স্বনামধন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর আলাপ হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় টিহিরি-রাজের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানজী গঙ্গা ও ভিলাঙ্গনা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল গণেশপ্রয়াগে স্বামীজীর সাধনার স্থান ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী সে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অখণ্ডানন্দজী কিছুদিন যাবৎ সর্দি, জ্বর, কাশি ইত্যাদিতে ভুগিতেছিলেন। এখন স্থানীয় ডাক্তার বলিলেন, তাঁহার ব্রঙ্কাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা, পাহাড়ের শীতল জলবায়ুতে উহা বৃদ্ধি পাইবে; বিশেষতঃ সম্মুখেই শীত ঋতু। এইজন্য তাঁহারা যত শীঘ্র নীচে নামিয়া যাইতে পারেন ততই মঙ্গল। এই সকল শঙ্কাজনক কথা শুনিয়া ও গুরুভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা করিয়া স্বামীজী স্বীয় তপস্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক প্রায় পনর কুড়ি দিন টিহিরিতে অবস্থানের পর দেরাদুন যাওয়া স্থির করিলেন। যাত্রার পূর্বে স্বামীজী দেওয়ানজীর সহিত দেখা করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন এবং জানাইলেন যে, ভবিষ্যতে পুনর্বার অবকাশ ঘটিলে তিনি তাঁহার সুব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবেন। দেওয়ানজী সব শুনিয়া অখণ্ডানন্দের চিকিৎসার জন্য দেরাদুনের সিভিল সার্জনকে একখানি

পত্র লিখিয়া দিলেন এবং স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ স্বামীকে মুসুরী পর্যন্ত বহন করিবার জন্য দুইটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করিলেন। অধিকন্তু তাঁহাদের পাথেয়ের অন্যান্য বন্দোবস্তও করিলেন। তারপর সকলে দেরাদুন চলিলেন। এখানেও স্বামীজীর জীবনের সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই—তপস্যায় তিনি যখনই ডুবিয়া যাইতে চান, তখনই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাই এক সময়ে লিখিয়াছিলেন—"আমি স্বামীজীকে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি যে, যখনই তিনি নির্জন নীরব সাধনায় ডুবে যেতে চেষ্টা করেছেন, তখনই ঘটনাপরম্পরার চাপে পড়ে তাঁকে তা ছাড়তে হয়েছে।" তিনি জানিতেন, ঠাকুর তাঁহার উপর গুরুভ্রাতাদের যে রক্ষণভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সে দায়িত্বপালনের তুলনায় নিজের তপস্যাও তুচ্ছ!

মুসুরী হইতে নামিয়া যখন তাঁহারা রাজপুরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দূরে একজন সাধুকে দেখিয়া মনে হইল ইনি তাঁহাদেরই গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি) হইবেন। ভরসা করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং তিনি নিকটে আসিলে দেখিলেন, সত্যই তো স্বামী তুরীয়ানন্দ। ইনি তখন রাজপুরে তপস্যায় নিরত ছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং কুশল প্রশ্নাদির পর নানাবিধ আলাপে নিরত হইলেন। তখন নবরাত্রির একদিন মাত্র বাকী (সম্ভবতঃ ১৩ই অক্টোবর, ১৮৯০ খৃঃ)।

ইহার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ সহ সকলে যথাসম্ভব সত্বর দেরাদুনে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই সিভিল সার্জেন শ্রীযুক্ত ম্যাকলারেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রঘুনাথবাবুর প্রদত্ত তাঁহার নামীয় পরিচয় পত্রখানি তাঁহাকে দিলেন। ডাক্তার পত্র পড়িয়া ও স্বামীজীর সহিত ধর্মবিষয়ে আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং অতি যত্নসহকারে স্বামী অখণ্ডানন্দের বক্ষ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আর কিছুতেই উপরে উঠবেন না। দীর্ঘকাল সমতল প্রদেশে থেকে ভাল করে চিকিৎসা করান।" তখন সমস্যা দাঁড়াইল, দেরাদুনে থাকিবেন কোথায়? পরিচিত কেহ তো সেখানে নাই। স্বামীজী নিজে দ্বারে দ্বারে যাইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও স্থান মিলিল না, অথচ অনুসন্ধান হইতে বিরত হইতেও পারিলেন না। বহু চেষ্টার পর অবশেষে সাধুরা এক বণিকের নবনির্মিত এবং অসম্পূর্ণ গৃহে আশ্রয় পাইলেন, কিন্তু মাটির মেজে, শয়নের

অনুপযুক্ত এবং আহারেরও ব্যবস্থা নাই ; কাজেই তাঁহারা খাটিয়ায় শয়ন ও ভিক্ষান্নমাত্রে জীবনধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ঘরখানি এত স্যাঁতসেঁতে যে রোগীর পক্ষে সেখানে থাকা হানিকর ; অন্ততঃ তাঁহার জন্য অন্য আশ্রয় চাই। এইরূপ বিকট সমস্যার সম্মুখীন হইয়া স্বামীজী ইতস্ততঃ ঘুরিতেছেন, এমন সময় দৈবক্রমে তাঁহার জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ কলেজের সহপাঠী হৃদয়বাবু নামক এক খৃষ্টান ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়েব শিক্ষক ছিলেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দের ভার লইতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে অখণ্ডানন্দ সেখানে গেলেও, আবাল্য অন্যরূপ পরিবেশে লালিত-পালিত তাঁহার পক্ষে খৃষ্টান-গৃহের অভিনব আচারাদি অসহ্য হওয়ায় তিনি পূর্বাবাসেই ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীজী সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ করেছিস।" কিন্তু সেখানে তো রোগীকে রাখা চলে না। অতএব তিনি পুনর্বার অনুসন্ধানে নির্গত হইয়া পণ্ডিত আনন্দ নারায়ণ নামক একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও স্থানীয় উকিলের সাহায্য লাভে সমর্থ হইলেন। ইনি একখানি ক্ষুদ্র ভাড়াঘরে অখণ্ডানন্দকে থাকিতে দিলেন এবং তাঁহার জন্য গরম কাপড় ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন।

দেরাদুনে একজন জাত-বেনের সহিত স্বামীজীর দেখা হয় ; তাহার লোক-প্রসিদ্ধ নাম ছিল "নন্দ গাঁটা"—অর্থাৎ গাঁইট বন্ধনে পটু কৃপণ নন্দ। কথাবার্তায় সে ছিল খুব চতুর। সে ভাবিত, সে একজন পাকা বৈদান্তিক ; আর বলিত, "পাঁচ মিনটমে তত্ত্ব খিঁচ লিয়া হ্যায়; জগৎ তিন কালমে হ্যয়হী নহী" ইত্যাদি। স্বামীজী তাঁহার কথায় কৌতুক অনুভব করিতেন এবং মাঝে মাঝে আলাপ করিয়া সময় কাটাইতেন। ইহার পুত্রের সহিতও স্বামীজীর আলাপ হইয়াছিল এবং সে পিতার অজ্ঞাতসারে একদিন সাধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিল। নন্দ গাঁটা যখন বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল সাধুরা খাইতেছেন, তখন বিস্মিত হইলেও ছেলের বিরুদ্ধে কিছু বলিল না।

একদিন খৃষ্টান বন্ধু হৃদয়বাবুর গৃহে সমাগত খৃষ্টধর্ম-প্রচারকদিগের সহিত স্বামীজীর ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। কিন্তু স্বামীজীর সহিত তাঁহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিজ্ঞানসম্মত বিচারধারা অবলম্বনে পাশ্চাত্ত্যদেশে তখন বাইবেলের ঘটনাবলী সম্বন্ধে যেসব আপত্তি উঠিয়াছিল ও মারাত্মক ঐতিহাসিক গবেষণা চলিতেছিল (হায়ার ক্রিটিসিজ্‌ম্) সেসব তথ্য তুলিয়া স্বামীজী যখন

খৃষ্টান গোঁড়ামির মূলোচ্ছেদে উদ্যত হইলেন, তখন প্রচারকরা বুঝিলেন, ইনি তাঁহাদের নাগালের বাহিরে—কারণ তাঁহারা ঐসব কথা পূর্বে শুনেনও নাই। তাঁহারা নিরস্ত হইলে স্বামীজী হৃদয়বাবুর বাটীতে বসিয়া তাঁহারই ধর্মের সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন।

দেরাদুনে এইভাবে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেলে এবং অখণ্ডানন্দের রোগের উপশম হইলে, স্বামীজী তাঁহাকে এলাহাবাদে এক বন্ধুর গৃহে চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন এবং কৃপানন্দের উপর তাঁহার সেবার ভার দিয়া অপর দুইজন গুরুভ্রাতার (সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দের) সহিত হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে অখণ্ডানন্দও দেরাদুন ত্যাগ করিয়া প্রথমে সাহারানপুরে শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় নামক এক উকিল ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তারপর উকিল বাবুর পরামর্শে এলাহাবাদ যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ-পূর্বক উকিল বাবুরই আলাপী বন্ধু মীরাটের ডাক্তার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাটীতে চলিয়া গেলেন। এদিকে কৃপানন্দও দেরাদুন ছাড়িয়া হৃষীকেশে অপর গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন।

হৃষীকেশে চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সন্নিকটে পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইয়া, ভিক্ষান্নে উদরপালন ও গঙ্গাবারিতে তৃষ্ণানিবারণপূর্বক সাধুরা হিমালয়ের পাদদেশ-বর্তী এই সুপ্রাচীন তপস্যাভূমিতে ভগবচ্চিন্তায় নিরত হইলেন—স্বামীজীর তপস্যাবাসনা যেন তৃপ্তির পথ খুঁজিয়া পাইল। প্রকৃতির লীলাভূমি, সৌন্দর্য-নিলয়, পর্বত-পরিবেষ্টিত এই তো সেই পুণ্যক্ষেত্র যেখানে যুগযুগান্তর ধরিয়া সাধু মহাত্মারা তপস্যাবলম্বনে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে ত্যাগ-বৈরাগ্য যেন সর্বত্র আকাশে-বাতাসে অনুস্যূত রহিয়াছে, আর সর্বত্র উঠিতেছে শাস্ত্রপাঠধ্বনি। সংসার হইতে দূরে নীরব গঙ্গাতীরবর্তী এই তীর্থক্ষেত্রটি যেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই পাদপীঠ। নবীন নগর হৃষীকেশের অগ্রগতিতে প্রাচীন-তপোভূমির যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে,—স্বামীজীর সময়েও সে পরিবর্তন ধীরপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে থাকিলেও ঐ ক্ষেত্রের মূল পরিবেশ অক্ষত ছিল। সেখানে তখন শঙ্করগিরি নামক একজন প্রাচীন সাধুর সহিত স্বামীজীর আলাপ হয়। গিরি মহারাজ স্বামীজীর সহিত কথা কহিয়া বিশেষ আনন্দ পাইতেন আর বলিতেন, "পাণ্ডিত্যের কথা ছেড়ে দাও, কথা বোঝে এমন লোক কোথা—বাত সমঝে এ্যাইসা আদমী মিলে কহাঁ ?" তিনি হৃষীকেশের অনেক প্রাচীন গল্প শুনাইতেন, বলিতেন :

তখন হৃষীকেশ ছিল রীতিমত অরণ্য, আর পালে পালে হাতী আসিত। এখন কি আর সে হৃষীকেশ আছে? এখন হইয়াছে রোটি-কেশ। এখন সত্রে সহজে রোটি পাওয়া যায় এবং সাধুও থাকেন অনেক ইত্যাদি। ইনিই স্বামীজীকে এক জ্ঞানী সাধুর কথা শুনাইয়াছিলেন, যাঁহাকে ব্যাঘ্রে লইয়া যাইবার সময়ও মুখ হইতে ক্রমাগত ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, "শিবোঽহম্ শিবোঽহম্"। এখানে গুরুভ্রাতারা চিরাভ্যাসানুযায়ী ধ্যানজপ ইত্যাদির সহিত সর্বদা শাস্ত্রচর্চা করিতেন, বিশেষতঃ এই কালে 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থখানি তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

পরিবেশ সর্ববিষয়ে অনুকূল হইলেও হৃষীকেশ তখন ছিল ম্যালেরিয়াদি রোগের অবাধ বিচরণক্ষেত্র এবং নিকটে চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল না। অতএব দীর্ঘকাল সেখানে থাকিয়া তপস্যা করিবেন—স্বামীজী এইরূপ যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন তাহা অচিরে বাধাপ্রাপ্ত হইল; তিনি শীঘ্রই জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন এবং উহা বৃদ্ধি পাইয়া বিকারে পরিণত হইল। দুর্বলতা বর্ধিত হওয়ায় তিনি চলচ্ছক্তিহীনও হইলেন; এমন কি ভূমিতে বিস্তৃত একখানি কম্বলের উপর সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। উপায়হীন গুরুভ্রাতাদের মন তখন অতীব বিষাদময় ও নৈরাশ্যপূর্ণ—বহু ক্রোশের মধ্যেও কোন চিকিৎসক নাই, যাহার সাহায্য প্রার্থনা করা চলে; আর এমন রোগীকে দূরে লইয়া যাওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাই চিকিৎসার অভাবে একদিন জীবনসংশয় উপস্থিত হইল; সেদিন ক্রমাগত ঘর্ম নিঃসরণের পর শরীর হিম হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া গেল—যেন অন্তিমকাল উপস্থিত। এমন বিপদকালে যখন সকলে অনন্যমনে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতেছেন, তখন পর্ণকুটীরের দ্বারে হঠাৎ ধীর পদক্ষেপ শুনিয়া সাধুরা চকিতে চাহিয়া দেখিলেন, এক সাধু দণ্ডায়মান। সাধু তাঁহাদের সাদর আহ্বানে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অবস্থা বুঝিয়া লইলেন এবং থলি হইতে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপ্পলচূর্ণ লইয়া উহা একত্রে মাড়িয়া স্বামীজীকে ধীরে ধীরে খাওয়াইয়া দিলেন। অমনি আশ্চর্য ফল ফলিল, স্বামীজী ক্ষণকাল মধ্যে চক্ষু মেলিয়া অস্পষ্টস্বরে কি যেন বলিতে চাহিলেন। জনৈক গুরুভ্রাতা তাঁহার মুখের কাছে কান পাতিয়া তাঁহার অর্ধোচ্চারিত দুই একটি কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি ক্রমে বললাভ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গুরুভ্রাতাদের নিকট বলিয়াছিলেন, অজ্ঞান

অবস্থায় তাঁহার বোধ হইতেছিল, তাঁহাকে যেন বিধাতার নির্দেশে কোন একটা বিশেষ কার্য করিতে হইবে ; উহার সমাপ্তির পুর্বে তাঁহার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। ঐ সময় হইতেই তাঁহার গুরুভ্রাতাদের স্পষ্ট বোধ হইত, স্বামীজীর দেহ-মন অবলম্বনে যেন এক বিপুল অব্যক্ত শক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য আকুল—যেন কোন সীমার মধ্যে উহা আর আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না—উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভের জন্য অস্থির, চঞ্চল।

স্বামীজীর প্রাণরক্ষা হইলেও তখনই অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব জানিয়া গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে লইয়া আরও কিছুদিন হৃষীকেশেই থাকিয়া গেলেন। তারপর যখন মনে হইল তিনি পথশ্রম সহ্য করিতে পারিবেন, তখন তাঁহাকে হরিদ্বারে লইয়া গেলেন। সেখানে আসিয়া স্বামী সারদানন্দ যে ঝোপড়ীতে থাকিয়া পুর্বে তপস্যা করিতেন উহাতেই উঠিলেন। ইতিমধ্যে টিহিরির দেওয়ান পুর্বপরিচিত রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ঐ রাজ্যের রাজার সহিত আজমীরের 'মেও কলেজে' যাইবার পথে হরিদ্বারে আসিয়া সন্ধান পাইলেন, একজন বিদ্বান সাধু সেখানে পীড়িত আছেন। দর্শন করিতে আসিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন, ইনিই তাঁহার পুর্বদৃষ্ট স্বামীজী। তিনি ঝোপড়ীর সংস্কারের জন্য কিছু অর্থ দিলেন এবং দিল্লীতে গিয়া এক হাকিমের নিকট চিকিৎসা করাইবার জন্য পরিচয়পত্রও দিলেন। ফলে ঝোপড়ীর সংস্কার হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন কনখলে তপস্যায় নিরত ছিলেন ; তাহারও সহিত সকলের সাক্ষাৎকার হইল।

হরিদ্বার হইতে ইঁহারা সকলে সাহারানপুর গেলেন[৬] এবং সেখানে শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরামর্শ দিলেন যে, স্বামীজী মীরাটে গেলে সর্ববিষয়ে সুবিধা পাইতে পারেন। এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ দীর্ঘকাল স্বামী অখণ্ডানন্দকে দেখেন নাই বলিয়া মীরাটে গিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইলেন। তাই উভয় টানে পড়িয়া স্বামীজী অপর সকলের সহিত মীরাট যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। আমেরিকা গমনের পুর্বে স্বামীজীর হিমালয়বাস এই প্রকারে

৬। এই পরম্পরা বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে মতভেদ আছে। ইংরেজী জীবনীতে আছে—হৃষীকেশে সুস্থ হইয়া স্বামীজী হরিদ্বারে যান। বাঙ্গালা জীবনীর ও স্বামী অখণ্ডানন্দের মতে তিনি হৃষীকেশেই থাকিয়া যান ; পরে সাহারানপুর যাইবার পথে কনখলে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত মিলন ঘটে। যাহা হউক, সাহারানপুর যাইবার কালে চিকিৎসার জন্য কিছুদিন হরিদ্বারে থাকা অসম্ভব নহে।

হৃষীকেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হইল। তাঁহার হিমালয়-বাসকালের সকল ঘটনা আমরা অবগত নহি। যেসব ঘটনা পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও দুই-চারিটি কথা বিচ্ছিন্নভাবে জানা যায় ; ঐগুলির স্থান-কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাই আমরাও ঐভাবেই সময়াদি-নিরপেক্ষভাবেই বলিয়া যাইব।

স্বামীজীর সহিত হিমালয়-ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখিয়াছেন, "স্বামীজী ও আমি চলেছি। এক জায়গায় দেখি এক সাধু ধ্যান করতে বসেছে—বেশ কাপড়-চোপড় মুড়ি দিয়ে মাথা পর্যন্ত, আর সজোরে নাক ডাকছে। স্বামীজী বলে উঠলেন, 'ওরে, এখানে এসে বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে, কম নয় তো ? দে বেটার কাঁধে লাঙ্গল জুড়ে—তবে যদি ওর কোন কালে কিছু হয়।" ('স্বামী অখণ্ডানন্দ', ৭০ পৃঃ)।

আর একবারের কথা স্বামীজী স্বয়ং বক্তৃতাকালে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "আমি এক সময় হিমালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম, আর সম্মুখে প্রসারিত ছিল সুদীর্ঘ পথ। আমাদের মতো গরীব সাধুদের তো আর কোন বাহন জোটে না ; কাজেই সারাটা পথ আমাদিগকে হাঁটিয়াই চলিতে হয় ; আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ। পথটি চড়াই উতরাই করিয়া শত মাইল ধরিয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধটি এক চড়াই উঠিতে গিয়া যখন দেখিলেন, সম্মুখে তখনও অনেকখানি উঠিতে হইবে, তখন হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'মহারাজ, এত পথ যাব কি করে ? আমি তো আর চলতেই পারছি না—আমার ছাতি ফেটে যাবে।' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'নিজের পায়ের দিকে তাকান তো !' তিনি তাহাই করিলে আমি বলিলাম, 'পেছনে আপনার পায়ের তলায় যে পথ পড়ে আছে, আপনি তা মাড়িয়ে এসেছেন, আর সামনে যে পথ দেখছেন, তাও তো সেই একই পথ—ও পথটুকুও শীঘ্রই আপনার পদতলে দলিত হবে।'" স্বামীজীর কথায় বৃদ্ধের নৈরাশ্য কাটিয়া গেল এবং তিনি পুনরায় পথ বাহিয়া চলিলেন।

হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে স্বামীজী যেসব সর্বত্যাগী সাধুর দর্শন পাইয়াছিলেন, তিনি শতমুখে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেন। একজনের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "হৃষীকেশে আমি অনেক মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছিলাম ; একজনের কথা মনে আছে—তিনি উন্মাদভাবে থাকিতেন। রাস্তা দিয়া উলঙ্গ হইয়া চলিয়াছেন, আর ছোঁড়ারা পশ্চাতে দৌড়াইতেছে, ঢিল ছুঁড়িতেছে, সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া দরদর ধারায় রক্ত পড়িতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই—বরং

হাসিয়াই খুন। আমি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আহত স্থানগুলি ধোয়াইয়া দিই ও একটু ন্যাকড়া পুড়াইয়া তাহার ছাই সেই সব স্থানে লাগাইয়া দিই, তবে রক্ত থামে। তিনি কিন্তু ক্রমাগত হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, 'কিয়া মজেদার খেল হ্যাঁয়! বিলকুল বাবাকা খেল! কিয়া আনন্দ'! এই রক্তারক্তিতেও তিনি ঈশ্বরের লীলার আস্বাদ পাইয়াছিলেন।"

স্বামীজী আরও অনেক সাধু দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা লোকজনের সঙ্গ ভালবাসেন না—লুকাইয়া থাকিতে চাহেন। তাঁহাদের আত্মগোপনের কৌশলও অদ্ভুত—কেহবা গুহার চতুর্দিকে মনুষ্য-কঙ্কাল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন; তাহা দেখিয়া লোকে ভাবিবে তিনি সর্বভুক এবং ভয়ে ঐ দিক মাড়াইবে না। কেহ বা লোক দেখিলেই প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। এই রকম সব। এইসব সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, "ইঁহাদের তপস্যা, তীর্থযাত্রা বা পূজাদির কোন প্রয়োজন নাই; তবে যে ইঁহারা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান ও তপস্যাদি কঠোর অনুষ্ঠান করেন, সে শুধু নিজ নিজ পুণ্যবলে লোক-কল্যাণ সাধনের জন্য।"

হিমালয়-ভ্রমণকালে একদিন তিনি এক শীতার্ত বৃদ্ধ সাধুকে দেখিতে পান। অমনি তাঁহার মনে শ্রদ্ধা ও সেবাবৃত্তি স্বতঃই উদিত হইল। সাধুটির কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি নিজ স্কন্ধ হইতে কম্বলখানি লইয়া উক্ত সাধুর গায়ে জড়াইয়া দিলেন। বৃদ্ধ সাধু এই সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া মৃদুহাস্য সহকারে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।"

আর এক সাধুর তিনি দর্শন পাইয়াছিলেন, যাঁহার সৌম্যমূর্তি ও পবিত্র আচার-ব্যবহার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইনি অনুভূতি-ক্ষেত্রে সত্যই অতি ঊর্ধ্বে উন্নীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কথাবার্তায় অগ্রসর হইয়া তিনি যে তথ্যের সন্ধান পাইলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি জানিলেন, এই ব্যক্তিই এক সময়ে পওহারী বাবার জিনিসপত্র চুরি করিয়া পলাইবার কালে পওহারীজী জাগিয়া উঠেন এবং চোর জিনিস ফেলিয়া ভয়ে পলাইতে থাকে। তখন পওহারী বাবা ঐ জিনিসগুলি লইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং অনেক দূরে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার হস্তে জিনিসগুলি অর্পণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামীজী পূর্বেই গাজীপুরে ঘটনাটি শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে সম্মুখস্থ সাধুর স্বমুখে ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং মহাপুরুষের সংস্পর্শে মানবমন কিরূপ পরিবর্তিত হয়, চোর কেমন করিয়া মহাপুরুষে পরিণত

হয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার চিত্ত একই কালে মহাপুরুষের মাহাত্ম্যের প্রতি ও মানব-মনের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইল। সাধু বলিলেন, "তিনি (বাবাজী) যখন আমায় নারায়ণ-জ্ঞানে অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্বস্ব অর্পণ করিলেন, তখন আমি আমার নিজের ভ্রম ও হীনতা বুঝিতে পারিলাম এবং তদবধি ঐহিক অর্থ ত্যাগ করিয়া পারমার্থিক অর্থের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম।" বহু রাত্রি পর্যন্ত এই সাধুর সহিত স্বামীজীর আলাপ হইল এবং তিনি স্থির বুঝিলেন যে, এই ব্যক্তির সত্যলাভ হইয়াছে। তারপরও কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার মনে এই আশ্চর্য ঘটনা বারংবার উদিত হইয়াছিল; বস্তুতঃ আজীবন তিনি ইহা মনে রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন বলিতেন, "পাপীদিগের মধ্যেও সাধুত্বের বীজ লুক্কায়িত আছে", তখন তিনি কেবল বাগ্মিতার আশ্রয় না লইয়া এই প্রত্যক্ষ ঘটনা স্মরণ করিয়াই এইরূপ বলিতেন—ইহা সুনিশ্চিত।

হিমালয়-ভ্রমণের কোন এককালে স্বামীজী এক তিব্বতী পরিবারে বাস করিয়াছিলেন। দেশের নিয়মানুসারে তাহাদের নারীরা একই সময়ে অনেক স্বামীর পত্নী হইতে পারে। সেই প্রথানুযায়ী উক্ত পরিবারের ছয়জন ভ্রাতার মাত্র একজন স্ত্রী ছিল। স্বামীজী স্বভাবতঃই এই বীভৎস আচারের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং ইহার বিরুদ্ধে যুক্তিও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু যে ভ্রাতার সহিত আলাপ হইতেছিল, সে বিরক্ত হইয়া প্রতিপ্রশ্ন করিল, "স্বামীজী, আপনি সাধু হইয়াও অপরকে কি করিয়া এমন স্বার্থপর হইতে বলিতে পারেন? 'এমন জিনিসটি শুধু আমিই ভোগ করিব, অপর কেহ নয়'—এই রকম মতলব কি নিন্দনীয় নয়? আমরা কেন এমন স্বার্থপর হইতে যাইব যে প্রত্যেকেই একজন করিয়া স্ত্রী রাখিব? ভ্রাতারা সব জিনিস সমভাবে পাইবে—এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত।" এইরূপ যুক্তি অতি অসার জানিয়াও স্বামীজী এই সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তিনি বুঝিলেন যে, প্রত্যেক ব্যাপারেরই ভালমন্দ দুইটি দিক আছে। সরল পাহাড়ীর কথার ফলে তিনি অতঃপর প্রত্যেকটি সামাজিক আচার-ব্যবহারকে বহু দিক হইতে যাচাই করিয়া দেখার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

হিমালয় পরিত্যাগান্তে সাধুবৃন্দ হরিদ্বার ও সাহারানপুর হইয়া মীরাটে উপস্থিত হইলেন এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে স্বামী অখণ্ডানন্দকে দেখিতে গেলেন। স্বামীজী তখন অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছেন।

তাই অখণ্ডানন্দ যদিও তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, তথাপি তাঁহার রোগজীর্ণ দেহ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামীজীকে এত রুগ্ন আমি কখনও দেখিনি, ঠিক যেন একখানি ছায়ামূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। মনে হয়েছিল তিনি যেন তখনও হৃষীকেশের সাংঘাতিক পীড়া থেকে উদ্ধার পাননি।" ঠিক হইল, স্বামীজীও ডাক্তারবাবুর বাড়ীতেই থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন এবং তদনুসারে তিনি পনর দিন সেখানেই রহিলেন। অপর সকলে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাটীতে আশ্রয় পাইলেন। ইনি পরে সন্ন্যাস অবলম্বনপুর্বক স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে এবং ভারতধর্ম-মহামণ্ডলের অন্যতম নেতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহারও পরে সকল গুরুভ্রাতা মিলিয়া শেঠজীর বাগান নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞেশ্বরবাবুরই এক বন্ধুর বাগানে বাস করেন। জ্বরের প্রতিক্রিয়া ও পুনরাবির্ভাব প্রতিরোধের জন্য স্বামীজী তখনও ঔষধ সেবন করিতেন। যত্র তত্র বাস এবং অযত্নলব্ধ অন্নে যেন তেন প্রকারে উদরপুরণ ইত্যাদির ফলে স্বামীজীর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অতএব মীরাটে একটু দীর্ঘকাল থাকার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল।

এই সময় তীর্থদর্শননিরত স্বামী অদ্বৈতানন্দও (গোপালদা) সেখানে আসিয়া পড়ায়, সাতজন গুরুভ্রাতার মিলনে শেঠজীর বাগান যেন দ্বিতীয় বরাহনগর-মঠে পরিণত হইল। সাধুরা এখানে নিয়মিত ধ্যান-ধারণা ও জপাদি করিতেন; সঙ্গীতাদিও প্রচুর হইত। প্রতিদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর স্বামীজী সকলকে লইয়া সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে একে একে 'মৃচ্ছকটিকম্', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', 'কুমার-সম্ভবম্', 'মেঘদূত' এবং 'বিষ্ণু পুরাণ' পড়া হইয়া গেল। অপরাহ্নে তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং স্থানীয় প্যারেড গ্রাউণ্ডে সৈন্যদের নানাপ্রকার ক্রীড়া দর্শনে আমোদ পাইতেন। স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিদিন স্থানীয় পুস্তকাগার হইতে স্যার জন্ লাবকের গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড লইয়া আসিতেন; এবং পরদিবসই ফেরত দিয়া বলিতেন যে, ঐ গ্রন্থ স্বামীজীর পড়া হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগারিক ইহা বিশ্বাস করিতেন না এবং ভাবিতেন ইহা লোক-দেখানো পড়ার ভানমাত্র। ইহা জানিতে পারিয়া স্বামীজী স্বয়ং একদিন পুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়া গ্রন্থাগারিককে বলিলেন, "মহাশয়, আমি সব কয়খানি বইই আয়ত্ত

করেছি। আপনার সন্দেহ হলে আপনি যে কোন বই থেকে যে কোন প্রশ্ন করে দেখতে পারেন।" তখন কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া এবং সমুচিত উত্তর পাইয়া গ্রন্থাগারিক বুঝিলেন, তিনি ভুল করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আশ্চর্যের সীমা রহিল না—ইহাও কি সম্ভব? পরে অখণ্ডানন্দজী এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, এ আপনি কি করে করলেন?" তাহাতে স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কখনও কোন বই প্রতিটি শব্দ ধরে পড়ি না, আমি গোটা এক একটা বাক্য ধরে পড়ি, এমন কি, এক একটা প্যারা ধরেও পড়ে যাই —যেমন নাকি ছবির কলের সামনে একসঙ্গে একখানি বহু বর্ণের চিত্র ভেসে ওঠে।"

ঐ কালে অখণ্ডানন্দ স্বামী তাঁহার একজন পূর্বপরিচিত আফগান ভদ্রলোককে স্বামীজীর নিকট লইয়া আসেন। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের আমির আব্দার রহমানের আত্মীয় এবং সরদার শ্রেণীর একজন অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তিনি শরণার্থী রূপে ভারতে বাস করিতেছিলেন। সাধুদর্শনে আসিবার পূর্বে তিনি হিন্দুদিগের ন্যায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতেন এবং হিন্দু বাহকের সাহায্যে ফল-মিষ্টান্নাদি সাধুদের জন্য লইয়া আসিতেন। স্বামীজী তাঁহার সহিত খাতের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির আমুদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক ব্যতীত আরও অনেক হিন্দু বাঙ্গালী ও অন্যান্য প্রদেশীয় ভদ্রলোক স্বামীজীর সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে শেঠজীর বাগানে সমবেত হইতেন। এইরূপে মীরাটের দিনগুলি খুবই আনন্দে কাটিয়াছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দের ১৯।১২।১৫ তারিখের একখানি পত্রে, স্বামীজীর মীরাটে অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে: "স্বামীজী আমাদের জুতা সেলাই হতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষা সেই সময় দিতেন। এদিকে বেদান্ত, উপনিষদ, সংস্কৃত নাটকসকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন, ওদিকে…রান্না শিখাইতেন। আরও কত কি যে করিতেন তাহা তুমি অনুমানই করিতে পারিতেছ। এই সময়ের একদিনের ঘটনা চিরদিনের মতো হৃদয়ে অঙ্কিত আছে।…একদিন পোলাও প্রভৃতি রান্না করিয়াছেন।…সে যে কি উপাদেয় হল তা আর কি বলব? আমরা ভাল হয়েছে বলায় সব আমাদের খাইয়ে দিলেন, নিজে দাঁতে কাটিলেন না। আমরা বলায় বলিলেন, 'আমি ওসব ঢের খেয়েছি—তোমাদের খাইয়ে আমার

বড় স্থখ হচ্ছে, সব খেয়ে ফেল।' বোঝো! ঘটনা সামান্য; কিন্তু চিরতরে হৃদয়ে গাঁথা আছে।…কত যে যত্ন, কত যে ভালবাসা, কত গল্প, কত বেড়ান—সব স্মৃতিপটে জ্বল জ্বল করছে।"

হৃষীকেশে স্বামীজীর কঠিন পীড়া ও জীবন সংশয়কালে গুরুভ্রাতারা আরও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের কতখানি প্রিয়পাত্র। তখন তাঁহাদের প্রতি মুহূর্তেই বোধ হইতেছিল, গুরুদেবের অদর্শনের পর যিনি তাঁহারই নির্দেশে এবং স্বীয় প্রতিভাবলে ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি-প্রভাবে তাঁহাদের নেতা ও পথিকৃৎ রূপে সকলকে ভবিষ্যৎ পরিপূর্তির অভিমুখে পরিচালিত করিতেছিলেন, তখনই তাঁহারও শরীরবিয়োগ হইলে তাঁহারা দ্বিতীয়বার কর্ণধারহীন হইবেন। তারপর মীরাটের এই আনন্দ-প্রাচুর্যময়, ভগবদ্ভাবপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ দিনগুলি তাঁহাদের প্রীতির সম্বন্ধকে আরও প্রীতিময়, সজীব ও নিবিড় করিয়া তুলিতেছিল—যেন তাঁহাদের পক্ষে পরস্পরকে ছাড়িয়া বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন অতঃপর একেবারে অসম্ভব। তাঁহারা যখন এই প্রকারে স্বামীজীর উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছেন, তখনই কিন্তু স্বামীজীর মনে বিপরীত চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন ইঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে, ইঁহারা প্রতিক্ষেত্রে তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য সম্পূর্ণ সমাধা হইবে না। অধিকন্তু তাঁহার অন্তর্যামী তাঁহাকে বলিয়া দিতেছিলেন—তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে আপাততঃ তাঁহাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে হইবে—যাহাতে তিনি ভাবী মহৎ কার্যের উপযুক্ত ভূয়োদর্শনাদির অধিকারী হইতে পারেন এবং বিবিধরূপে আপনাকে ঐ জন্য প্রস্তুত করিতে পারেন। হয়তো তিনি নিজ ইষ্টদেবতার কোনরূপ আদেশও পাইয়াছিলেন। অতএব অকস্মাৎ একদিন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার জীবনব্রত স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে আমি একাকী অবস্থান করিব; তোমরা আমায় ত্যাগ কর।" স্বামী অখণ্ডানন্দ অনেক অনুনয়-সহকারে তাঁহার সহিত থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু অটল স্বামীজী দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "গুরুভাইদের মায়াও মায়া বরং আরও প্রবল। এ মায়ার পাকে পড়িলে কার্যসাধনে বহু বিঘ্ন ঘটিবে। আমি আর কোন মায়ার বেড়ি রাখিতে চাহি না।" এই সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্যে পরিণত হইল—১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষ ভাগে একদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী একাকী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা

করিলেন।[৭] গঙ্গাধর অভিযোগ করিয়াছিলেন, "তোমারই অনুরোধে আমি মধ্য-এশিয়া দেখা বন্ধ রাখিয়া বরাহনগরে ফিরিয়া গিয়াছিলাম; এখন তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?" স্বামীজী তবু বলিলেন, "যখনই তপস্যা করব মনে করি, তখনই ঠাকুর একটা বাগড়া দেন। আমি এবার একলা বেরুব। কোথায় থাকব, কাউকে সন্ধান দেব না।" অখণ্ডানন্দও বলিয়া রাখিলেন, "তুমি যদি পাতালেও যাও, সেখান থেকে যদি খুঁজে তোমায় বার করতে না পারি, আমার নাম গঙ্গাধর নয়।"

৭। মীরাটে ইঁহারা কতদিন ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইংরেজী জীবনীর মতে প্রায় পাঁচ মাস (২০৩ পৃঃ)। বাঙ্গলা জীবনীর মতে "তিন মাসেরও অধিক কাল" (২২০ পৃঃ)। স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'র মতে "সকলে চার-পাঁচ মাস তথায় অবস্থান করেন" (৬২ পৃঃ)। কিন্তু 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' গ্রন্থের মতে ইঁহাদের অবস্থান আরম্ভ হয় ডিসেম্বরে (৭২ পৃঃ)। বাঙ্গলা জীবনীর মতে "সে সময়টা কালীপূজার পর, শরতের শেষ" (২২৮ পৃঃ)। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, স্বামীজীরা অক্টোবরের মাঝামাঝি দেরাদুনে পৌঁছেন। ঐ বৎসর ৺কালীপূজা সম্ভবতঃ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হয়। এদিকে স্বামীজী মীরাট ছাড়েন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষে (ইংরেজী জীবনী, ২০৪ পৃঃ)। বাঙ্গলা জীবনীর মতও প্রায় অনুরূপ (২২১ পৃঃ)। মোটের উপর অনুমান হয়, দুই মাসের খুব বেশী মীরাটে থাকা হয় নাই।

রাজপুতানায়

মীরাটের পর সামান্য বস্ত্রাদিতে সাধারণভাবে ভূষিত স্বামীজী স্বামী বিবিদিষানন্দ এই ছদ্মনামে[১] আত্মপরিচয় দিয়া হিন্দু-মুসলমান-যুগের বহু স্মৃতি-জড়িত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহানগরী দিল্লীতে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু পরিচয়-গোপনে অতিমাত্র তৎপর হইলেও স্বামীজীর প্রতিভাদীপ্ত তরুণ মুখমণ্ডল, আয়ত নয়নযুগল, সুগঠিত লাবণ্যময় শরীর, রাজোচিত চলনভঙ্গী এবং অতি ভদ্রোচিত অমায়িক ব্যবহারের প্রভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আগত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার সহিত নিকট-আত্মীয়তা বোধ করিতেন ও তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারিতেন না। এইভাবেই তিনি শেঠ শ্রীযুক্ত শ্যামল দাসের গৃহে সাদরে গৃহীত হইলেন। তারপর ঐ গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তিনি অতীত যুগের রাজ-প্রাসাদ, দুর্গ, সমাধিস্থান পরিত্যক্ত রাজধানীর ভগ্নস্তূপাবৃত ও গুল্মাচ্ছাদিত অবস্থিতিস্থল ও অন্যান্য প্রাচীন গৌরবের নিশ্চিহ্নপ্রায় নিদর্শন ইত্যাদি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মানুভূতিপুষ্ট ঐতিহাসিক চেতনা তাঁহাকে জানাইয়া দিল, ভারতীয় সভ্যতা কত পুরাতন, ভারতের সংস্কৃতি কিরূপ অবিনশ্বর ও বিভিন্ন ধারার মিলনে কত বিচিত্র অথচ ক্রমবর্ধমান। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর এই অপূর্ব লীলাক্ষেত্র কতশত লুপ্ত মহিমার সাক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার বৈরাগ্যপ্রবণ মনকে সহজেই বুঝাইয়া দিল—জাগতিক ঐশ্বর্য ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহারই মধ্য দিয়া আত্মার মহিমা কেমন চির-উজ্জ্বল দীপ্তিতে ও বিবিধ ভঙ্গীতে আপনাকে বিকাশ করিয়া চলিয়াছে। মন ছিল তখন তাঁহার বেশ সতেজ এবং দিল্লীর শীতকালের পরিষ্কার জলবায়ুর গুণে তাঁহার শরীর ছিল সুস্থ ও সবল।

এদিকে মীরাটে অবস্থিত গুরুভ্রাতারা দিন দশেক পরে দিল্লীতে আসিয়া স্বমহিমায় ভাস্বর স্বামীজীকে সহজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে পাইয়া অন্তরে আনন্দিত হইলেও স্বাভিলাষপূর্তির পথ বিঘ্নায়িত হইবে ভাবিয়া কৃত্রিমকোপভরে দৃঢ়স্বরে তাঁহাদিগকে

১। স্বামী অভেদানন্দের মতে ইহা ছদ্মনামে নহে, প্রত্যুত ইহাই তাঁহার ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গৃহীত সন্ন্যাস-নাম। ইহার পরের ছদ্মনাম সচ্চিদানন্দ।

বলিলেন, "দেখ ভাই, আমি তোমাদের আগেই বলিয়াছি, আমি নিঃসঙ্গ থাকিতে চাই, আমি তোমাদের বলিয়াই রাখিয়াছি, আমার অনুসরণ করিও না। সেই কথাই আবার বলি—আমি চাই না যে, কেহ আমার সঙ্গে থাকে। আমি এখনই দিল্লী ছাড়িয়া যাইতেছি। কেহ যেন আমার অনুসরণে উদ্যত না হয়, কেহ যেন আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রয়াসী না হয়। আমি চাই যে, তোমরা আমার কথা রাখ। আমি সমস্ত অতীত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চাই। আমি আপন-মনে ঘুরিয়া বেড়াইব—পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি অথবা নগর—যাহাই হউক না কেন, যায় আসে না। আমি চলিলাম। প্রত্যেকে নিজের নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী সাধনে রত হউক, ইহাই আমি চাই।" গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে এখানে আছ আমরা তাহা জানিতামই না; আমরা আসিয়াছিলাম শুধু দিল্লী শহর দেখিতে। এখানে আসিয়া স্বামী বিবিদিষানন্দ নামক একজন ইংরেজী-জানা সাধুর খবর পাইলাম, তখন তাঁহাকে দেখিতে আসিলাম। কাজেই তোমার সঙ্গে যে দেখা হইয়া গেল, ইহা এক আকস্মিক ঘটনামাত্র।"

যেমন করিয়াই হউক, স্বামীজী তখনকার মত শান্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দিল্লী ত্যাগ না করিয়া আরও কিছুদিন পূর্বাবাসেই থাকিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতারা অবশ্য অন্যত্র আশ্রয় লইলেন, কিন্তু সকলের আহার স্বামীজীর সঙ্গে শেঠজীর গৃহেই হইতে লাগিল। ক্রমে গুরুভ্রাতারা বিভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি কৃপানন্দের সহিত এটোয়ায় গেলেন, আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাকী রহিলেন স্বামীজী, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ। এই কালের একটি ঘটনা এই: স্বামীজী একবার স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনকে গলা দেখাইতে গিয়াছিলেন—তাঁহার গলায় তখন টন্‌সিল ছিল। ঐ দিনের সাক্ষাতের ফলে ডাক্তার বাবু স্বামীজীর গুণাবলীর কোন পরিচয় পান নাই—সাধারণ রোগীর দৃষ্টিতেই পরীক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। কথাপ্রসঙ্গে তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে জানান যে, তিনি স্বামীজীর সম্বন্ধে কোন উচ্চ ধারণা পোষণের কারণ দেখেন নাই, তবু তিনি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপের জন্য উৎসুক। তদনুসারে ডাক্তারবাবু একদিন স্বগৃহে মহাবিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপককে ডাকিয়া আনিলেন এবং স্বামীজীও গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সেই

আসরে উপস্থিত হইলেন। বৈঠকে অবিরাম বিচার চলিতে লাগিল এবং স্বামীজীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ইহার পরে ডাক্তারবাবু একদিন সাধুদিগকে স্বগৃহে আমন্ত্রণপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। অচিরেই স্বামীজী দিল্লী ছাড়িয়া চলিলেন, অপর দুইজন গুরুভ্রাতাও বৃন্দাবনে গেলেন। স্বামীজীর রাজস্থানভ্রমণ আরম্ভ হইল।

স্বামীজী তখন জীবনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল, হয়তো তিনি জানিতেন, তাঁহার জীবনের শুভ বিজয়মুহূর্ত অতি সন্নিকটে, আর তাই তাঁহার প্রস্তুতির জন্য সময় আছে খুবই অল্প। সে বিরাট অজানা কার্যের জন্য তাঁহার হৃদয়দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ এখন তাঁহাকে সহায়-সম্বলহীন একক-জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করিলেন ; আর স্বামীজীও সে আহ্বানে সাড়া দিলেন ও স্বীয় প্রিয় গুরুভ্রাতাদের—একমাত্র শেষ বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এখন তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী, স্বাধীন, মুক্ত। তাঁহার মনে পড়িল ধর্মপদের বাক্য—

নো চ লভেত নিপকং সহায়ং
সদ্ধিং চরং সাধুবিহারি ধীরং,
রাজাব রাট্‌ঠং বিজিতং পহায়
একো চরে মাতঙ্গহরঞ্‌ঞেব নাগো।
একস্‌স চরিতং সেয্যো
নত্থি বালে সহায়িতা
একো চরে ন পাপানি কয়িরা
অপ্পোসুস্‌কো মাতঙ্গহরঞ্‌ঞেব নাগো।[২]

২। 'ধর্মপদ, নাগবগ্‌গো', ১০-১১।

"যেমন রাজা বিজিত রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া (প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্বক) অরণ্যে বাস করেন, কিংবা যেমন মাতঙ্গহস্তী বনমধ্যে একাকী বিচরণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য যদি প্রজ্ঞাবান্, সদাচারী এবং পণ্ডিত সঙ্গী না পায়, তাহা হইলে তাহার একাকী বাস করা উচিত।

"একাকী বাস করা শ্রেয়স্কর, কেননা মূর্খের সহিত বাসে সহায়তা লাভ হয় না। একাকী বাস করিবে ও কোন প্রকারে পাপ আচরণ করিবে না। যেমন মাতঙ্গ হস্তী বনে একাকী বিচরণ করে, তদ্রূপ অল্প উৎসুক (অর্থাৎ ঔৎসুক্যহীন বা নিরাসক্ত) হইয়া বাস করিবে।"

—চারুচন্দ্র বসুর অনুবাদ

ত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামীজী একাকী বিচরণের প্রয়োজনবোধে নিখিল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, সমস্ত সসীমতা অস্বীকার করিয়া, অখিল ভয় অপসারিত করিয়া দিল্লী ও উত্তর ভারত পশ্চাতে ফেলিয়া ইতিহাসের ক্রীড়াভূমি, সৌন্দর্যলীলাক্ষেত্র রাণা প্রতাপের স্বদেশ, সতীর রক্তে সমুজ্জ্বল, বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে এক সকালে ট্রেন হইতে আলোয়ার নগরে অবতীর্ণ হইলেন। উভয় পার্শ্বে উদ্যান ও শ্যামল ক্ষেত্রে সুশোভিত রাজপথ বাহিয়া ক্রমে মনোরম হর্ম্যশ্রেণী অতিক্রমপূর্বক তিনি অবশেষে একটি রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও সেখানে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিয়া বঙ্গভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধু-সন্ন্যাসীদের থাকার কোন স্থান এদিকে আছে কি ?" ভদ্রলোকের নাম শ্রীগুরুচরণ লস্কর এবং তিনিই ঐ ঔষধালয়ের চিকিৎসক। ডাক্তারবাবু দীর্ঘকাল বাঙ্গলার বাহিরে আছেন, তাই কমনীয়বদন তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে মাতৃভাষা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ও সসম্মানে অভিবাদনপূর্বক সাগ্রহে বলিলেন, "নিশ্চয়, আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন", এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চিকিৎসালয়ের অনতিদূরে বাজারের একখানি দ্বিতল গৃহ দেখাইয়া বলিলেন, "এ ঘরখানি সাধুদের জন্য, এখানে থাকতে কষ্ট হবে কি ?" স্বামীজী সস্মিতবদনে বলিলেন, "কিছু না।" ডাক্তার-বাবু তখনই তাঁহার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনাইয়া দিলেন, কারণ স্বামীজীর সঙ্গে তখন একখানি গেরুয়া বস্ত্র, দণ্ড, কমণ্ডলু ও কম্বলে-জড়ানো দুই-চারিখানি পুস্তক ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। প্রাথমিক ব্যবস্থা হইয়া গেলে গুরুচরণ বাবু তাঁহার একজন মুসলমান বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মৌলবী সাহেব, এইমাত্র একজন বাঙ্গালী দরবেশ এখানে এসেছেন, দেখবেন তো এখনি চলুন। এমন মহাত্মা আমি আগে আর কখনও দেখিনি। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন, আমি ততক্ষণে আমার কাজ সেরে এসে আপনার সঙ্গে যোগ দেব।" মৌলবী সাহেব স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের উর্দু ও ফারসীর শিক্ষক ছিলেন। তিনি বন্ধুর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নগ্নপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া সেলাম করিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে সযত্নে আপন সকাশে উপবেশন করাইয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "কোরানের সম্বন্ধে এই একটা আশ্চর্য বিশেষত্ব দেখা যায় যে, এগার শত বৎসর পূর্বে উহা যেমন ছিল,

এখনও ঠিক তাই আছে, এর সুপ্রাচীন বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়েছে, এবং কেউ এর উপর কলম চালাতে পারেনি।"

এদিকে গুরুচরণ বাবু চিকিৎসালয়ে ফিরিয়া সমাগত সকলকে স্বামীজীর আগমনবার্তা জানাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিতেও ভুলিলেন না। ডাক্তারবাবুর উৎসাহ-উদ্দীপনা শ্রোতাদেরও মনে গভীর অনুসন্ধিৎসা জাগাইল ও তাঁহারা স্বামীজীকে দেখিতে চলিল। স্বামীজীর সুমিষ্ট ভাষণে মুগ্ধ মৌলবী সাহেবও তাঁহার মুসলমান বন্ধুদিগকে এই শুভ বার্তা জানাইলেন। ইহার ফলে স্বামীজীর গৃহে ক্রমে এত লোকসমাগম হইতে লাগিল যে, গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া বারান্দাতেও স্থানসঙ্কুলান হইত না। স্বামীজী তাঁহাদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উর্দু ও হিন্দী গান এমন কি বাঙ্গলা কীর্তনও গাহিতেন ; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, সুরদাস ইত্যাদি অনেকের গানই তাঁহার মুখে শুনিয়া শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনও কখনও বা তিনি বেদ, উপনিষদ্, বাইবেল ও পুরাণের বাণী উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় বক্তব্য প্রমাণ করিতেন অথবা বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, গুরু নানক, কবীর, চৈতন্য, তুলসীদাস, শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদির জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া শ্রোতাদের মনে ধর্মপ্রেরণা জাগাইতেন। এইভাবেই তাঁহার আলোয়ারের দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

দিন কয়েকের মধ্যে স্বামীজীর অনুরাগীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, আলোয়ারবাসী জন কয়েক গণ্যমান্য ব্যক্তি স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে অতঃপর আলোয়ার রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর গৃহে রাখা হইবে। এখানে স্বামীজী নিয়মিত জীবনযাপনের ও সাধনার অধিক সুযোগ পাইলেন। এখানে আসার পর তিনি সকাল নয়টা পর্যন্ত ধ্যানধারণাদিতে কাটাইয়া বৈঠকখানায় সমাগত ব্যক্তিদের সহিত আলাপের জন্য বাহির হইতেন। ততক্ষণে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বিশ-ত্রিশ জন ভক্ত সেখানে আসিয়া পড়িতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হয়তো শিয়া ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের মুসলমান এবং অপরেরা শৈব-বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের হিন্দু। ধনী ও দরিদ্র সেখানে মিশিয়া এক হইয়া যাইতেন। স্বামীজী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া সকলের সহিত সমভাবে সদালাপ করিতেন এবং ধর্মসম্বন্ধীয় বিবিধ সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন। সকলেই নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতেন। ইহার ফলে স্বামীজীর

ইচ্ছা না থাকিলেও অবান্তর বিষয় মাঝে মাঝে আসিয়া পড়িত। স্বামীজী তবু বিরক্ত না হইয়া সমুচিত উত্তরদানে প্রশ্নকর্তাদের ঔৎসুক্য মিটাইতেন। এমন হইত যে, কোন আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ চলিতেছে, ইহারই মধ্যে অবিবেচক কেহ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "মহারাজ, আপনার কোন্ শরীর?" এরূপ ক্ষেত্রে উত্যক্ত হওয়া স্বাভাবিক, অথবা অপর কেহ হয়তো সোজা উত্তর না দিয়া এমনভাবে প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইতেন যাহাতে সত্য প্রকাশিত না হইয়া শ্রোতার মনে মিথ্যা ধারণা জন্মিবার অবকাশ ঘটিতে পারিত যে, "ইনি সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ।" স্বামীজীর মনে কিন্তু জাত্যভিমান ছিল না, আপনাকে খাটো করিয়া ফেলার ভয়ও ছিল না, অতএব তিনি উক্ত প্রশ্নকর্তাকে অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "কায়স্থ"। অপর এক সময় হয়তো কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি গেরুয়া পরেন কেন?" স্বামীজী অমনি উত্তর দিলেন, "কারণ এটি ভিখারীর বেশ। সাদা কাপড় পরে থাকলে গরীবরা ভিক্ষা চাইবে, কিন্তু আমি নিজে ভিখারী, প্রায়শঃ কপর্দকশূন্য থাকি; অথচ চাইলে যদি দিতে না পারি, তবে বেজায় কষ্ট হয়। গেরুয়া-পরা দেখলে তারা বুঝতে পারে যে, আমি তাদেরই মতো গরীব, কাজেই ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চাইবার কথাই মনে আসে না।" গেরুয়া সম্বন্ধে ইহা ছিল স্বামীজীর নিজস্ব অভিনব মত। কখনও বা আলোচনার বিষয় হইত শক্তিপূজার অপূর্ব মহিমা। তখন জগজ্জননীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে ক্রমে ভাববিহ্বল হইয়া তিনি কেবল "মা", "মা" ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। প্রথমে তিনি উচ্চৈঃস্বরে মাতৃনামকীর্তন আরম্ভ করিয়া পরে অস্ফুটস্বরে ভাব-গম্ভীরকণ্ঠে ধীরে ধীরে মাকে ডাকিতে ডাকিতে পরিশেষে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ডুবিয়া যাইতেন এবং কণ্ঠস্বরও ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হইয়া একেবারে মিলাইয়া যাইত। তখন নীরব স্বামীজীর গণ্ডদ্বয় বাহিয়া পুলকাশ্রু বিগলিত হইত এবং দর্শকগণের স্পষ্ট মনে হইত, তিনি জগজ্জননীর পাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। সে ভাবগাম্ভীর্য তাঁহাদেরও মধ্যে সংক্রামিত হইয়া ক্ষণিকের জন্য তাঁহাদের মনে অভূতপূর্ব অধ্যাত্মানুভূতি জন্মাইত।

অপরাহ্ণে স্বামীজী ভ্রমণে নির্গত হইলে, অনেকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন। দিবাশেষে কর্মসমাপনান্তে আরও অনেকে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিবার জন্য তাঁহার আবাসস্থলে সমবেত হইতেন। তখন আবার সেই প্রার্থনা, ধ্যান ও ভাব-ভক্তির স্রোত চলিত, আবার সকলে অধ্যাত্মরস আস্বাদন করিতেন। কখনও বা স্বামীজী

মধুরকণ্ঠে ভগবদ্‌গুণগান করিতেন এবং কেহ কেহ তাঁহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া কীর্তনে মত্ত হইতেন। কতদিনই না এইভাবে দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইত—কাহারও হুঁশই থাকিত না। কোন দিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত এইরূপ চলিত, হয়তো রাত্রি চারিটা বাজিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে নৃত্যও হইত—স্বামীজী পূর্ণোদ্যমে উহাতে যোগ দিতেন। বস্তুতঃ তিনি তখন এক অপূর্ব ভগবদ্ভাবে মাতোয়ারা।

স্বামীজী মাঝে মাঝে বাঙ্গলা গানও গাহিতেন, তখন গাহিবার পূর্বে হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া উহার অর্থ সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। অনেকে আবার শিখিয়া লইয়া স্বামীজীর সহিত সুর মিলাইয়া এই সকল বাঙ্গলা গানও গাহিতেন। ভুলিয়া যাইবার ভয়ে কেহ কেহ গানগুলি লিখিয়াও রাখিতেন। রাজপুতানা বৈষ্ণব-প্রধান স্থান বলিয়া স্বামীজী প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত গাহিতেন। একদিন তিনি গাহিলেন—

(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেইদেশে যেথায় নিঠুর হরি॥
(আমি) মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হয়ে,
যদি কোন ঘরে মিলে প্রাণবঁধু
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে।
আমি আপন বঁধুয়া আপনি বাঁধিব,
রাখিতে নারিবে কেউরে।
যদি রাখে কেউ ত্যজিব এ জীউ,
নারীবধ দিব তারে॥

ভাবে গদগদ কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে স্বামীজীর চক্ষে অশ্রুধারা দেখা দিল, সেই মহাপুরুষের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি সমপ্রাণ ভক্তদেরও গণ্ড বাহিয়া নয়নবারি প্রবাহিত হইতে থাকিল। কেহ কেহ ভাবিতে লাগিলেন, "বাবাজী নিশ্চয় বৃন্দাবন-চন্দ্রের দর্শন পেয়েছেন, তাই এত প্রেমবিভোর, নতুবা আমরাও তো তাঁকে ডাকি, কিন্তু কই, আমাদের তো এরূপ তন্ময়তা আসে না।" কেহবা ভাবিলেন, "এ তো সব ঈশ্বরেরই বিভূতি! ইনি নিশ্চয় ঈশ্বরলাভ করেছেন।" সেদিন গাহিতে গাহিতে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ক্রমে করুণ হইতে করুণতর হইয়া

অবশেষে হৃদয়ের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ ও দেহ প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া গেল এবং মুখশ্রী প্রাণবঁধুর স্পর্শে বিহ্বলা ও উৎফুল্লমুখী গোপিকার ন্যায় প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়া দৈবশ্রী ধারণ করিল।

এইভাবে কতদিন কাটিয়া গেল। বহু রাত্রি পর্যন্ত স্বামীজীকে ছাড়িয়া যাইতে কাহারও প্রাণ চাহিত না। রাত্রে স্বগৃহে ফিরিয়াও স্বামীজীরই আলোচনা চলিত। সকলেই ভাবিতেন আবার কতক্ষণে ফিরিবেন। কেহ কেহ বলিতেন, "বাবাজীর হৃদয় আনন্দে ভরপুর, মুখে হাসি লেগেই আছে।" অপরেরা বলিতেন "মশায়, এমন সুন্দর শ্লোকপাঠ কখনও শুনিনি, কণ্ঠে যেন রূপার তার বাজে।" কেহ আবার বলিতেন, "হাঁ, তাঁর কণ্ঠে নাদ আছে।" অমনি আর একজন সংশোধন করিয়া দিতেন, "শুধু তাই নয়, এমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে যে, শুনলেই মুগ্ধ হতে হয়।" অমনি আর একজন যোগ দিয়া বলিতেন, "আর দেখেছেন প্রকৃতিটি কি মধুর। এত লোক এত বিরক্ত করে, আহাম্মকের মতো যা-তা জিজ্ঞাসা করে, তা রাগ নেই, সব কথায় উত্তর দিচ্ছেন।" অপরে সায় দিয়া বলিতেন, "রাগ-টাগ নেই, সিদ্ধ মহাপুরুষ, নইলে দেখুন না—কেবল মনে হয় কতক্ষণে তাঁর কাছে যাব, ইচ্ছা হয় দিনরাত তাঁর কাছে বসে থাকি!"

স্বামীজীর অনুরক্ত বন্ধুদের মধ্যে পূর্বোক্ত মৌলবী সাহেব ছিলেন অন্যতম। তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে স্বামীজীকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করাইবেন। তিনি ভাবিতেন স্বামীজীতো দরবেশ, তিনি জাতিভেদের অতীত; কিন্তু যে পণ্ডিতজীর গৃহে তিনি আছেন, তাঁহার তো আপত্তি থাকিতে পারে। যাহা হউক, তিনি একদিন সকলের সম্মুখে করজোড়ে পণ্ডিতজীকে বলিলেন, "দয়া করে অনুমতি দিন যাতে বাবাজী কাল আমার বাড়ীতে ভিক্ষা পেতে পারেন। আপনাদের সকলের মনস্তুষ্টির জন্য আমি ব্রাহ্মণ দিয়ে আমার বৈঠকখানার সব জিনিসপত্র ধুইয়ে দেব, এবং স্বামীজী যা খাবেন তা ব্রাহ্মণেরা বাজার থেকে তাঁদেরই পাত্রে নিয়ে আসবেন কিংবা তাঁদেরই পাত্রে রাঁধবেন। আর এ যবন যদি শুধু দূর থেকে দেখবার সৌভাগ্য পায় যে, স্বামীজী তার ভিক্ষা গ্রহণ করছেন, তাহলেই সে কৃতার্থ হবে।" মৌলবী সাহেব এরূপ বিনয় ও সারল্যের সহিত এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন যে, উপস্থিত সকলেই ইহাতে মুগ্ধ হইলেন এবং পণ্ডিতজী বন্ধুভাবে তাঁহার হস্তদ্বয় ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, স্বামীজী তো দরবেশ, তাঁর কাছে জাতিভেদের মূল্য কি? অতটা কষ্ট করতে

হবে না। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। আপনি যেমন ব্যবস্থা করবেন আমরা তাতেই সন্তুষ্ট হব। আর আপনি যেরূপ ব্যবস্থার কথা বলছেন, ওরূপ হলে তো আপনার বাড়ীতে খেতে আমারও বিবেকে বাধবে না; স্বামীজীর আর কথা কি? তিনি তো মুক্ত পুরুষ!" কাজেই মৌলবী সাহেব স্বামীজীকে স্বগৃহে আহার করাইয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলেন। মৌলবী সাহেবের অনুকরণে আরও অনেক মুসলমান ভদ্রলোক স্বামীজীকে সাগ্রহে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইয়াছিলেন।

এইভাবে কত ব্যক্তিই না স্বামীজীর দর্শন, সান্নিধ্য, উপদেশ ও ভাবসঞ্চারে কৃতার্থ হইলেন—কত পণ্ডিত, কত অজ্ঞ, কত বৃদ্ধ, যুবক, বালক, কত বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন রুচির, ধনী, দরিদ্র,—সকলে আসিলেন, সকলে নবজীবনের আস্বাদ পাইলেন। এই সময়ে স্বামীজী বিশেষ ভাগ্যবান কাহাকে কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষাও দিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে আলোয়ারের মহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজীর কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিল যে, নগরে একজন বিশিষ্ট মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রবণমাত্র তিনি সাদরে স্বামীজীকে নিজালয়ে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন এবং অচিরে বুঝিতে পারিলেন, এই সুবিদ্বান, মেধাবী ও অনুভূতিসম্পন্ন মহাযোগীর কৃপাদৃষ্টি পড়িলে ইংরেজী ভাবাপন্ন আলোয়ার-মহারাজের মতিগতির পরিবর্তন হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—"একজন সাধু আসিয়াছেন, তিনি ইংরাজীতে মহা-পণ্ডিত।" মহারাজ তখন দুই-তিন মাইল দূরে এক নিভৃত প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। দেওয়ানজীর পত্র পাইয়া তিনি পরদিনই আলোয়ারে ফিরিলেন এবং সোজা দেওয়ানজীর বাটীতে গিয়া স্বামীজীকে শ্রদ্ধাসহকারে দর্শন করিলেন ও প্রণামান্তে তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত সমাগত সভাসদবৃন্দও সেখানে যথাযথ স্থানে উপবেশন করিলেন। মহারাজ প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী মহারাজ, শুনছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত; তা আপনি তো সহজেই অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারেন, তা না করে ভিক্ষা করে বেড়ান কেন?" কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া স্বামীজীর সপ্রতিভ প্রতিপ্রশ্ন আসিল, "মহারাজ, আপনি বলতে পারেন, আপনি রাজকার্য অবহেলা করে দিনরাত সাহেবদের সঙ্গে খানা খেয়ে শিকার করে বেড়ান কেন?"

সভাসদগণ স্বামীজীর কথার ভঙ্গীতে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—"এ কি দুঃসাহস! হয়তো আজ এঁর কপালে কি আছে!" কিন্তু স্বামীজীর কথা মহারাজ ধীর ভাবেই শুনিলেন, শুনিয়া একটু চিন্তা করিলেন এবং পরে বলিলেন, "কেন আমি ওরূপ করি বলতে পারি না; তবে হ্যাঁ, ওতে আমার ভাল লাগে।" স্বামীজীও অমনি সহর্ষে বলিলেন, "বেশ, আমারও তেমনি ফকিরি করে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে।" এ যেন সমানে সমানে প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর, বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই!

মহারাজ মঙ্গল সিংহ আবার জানিতে চাহিলেন, "আচ্ছা বাবাজী মহারাজ, এই যে সকলে মূর্তিপূজা করে, আমার ওতে মোটে বিশ্বাস নেই; তা আমার দশা কি হবে?" কথাটা একটু ব্যঙ্গস্বরেই উচ্চারিত হইল এবং বলিয়া ফেলিয়া মহারাজ একটু মৃদুহাস্য করিতেও ভুলিলেন না। স্বামীজী তবু প্রথমেই এ কথাটা অত তাচ্ছিল্যার্থে লইতে পারিলেন না - হিন্দু হইয়া এভাবে কি কেহ কথা বলিতে পারে? তাই তিনি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতেই বলিলেন, "মহারাজ বোধ হয় রহস্য করছেন?" মহারাজ তখন সাধারণ ভাবেই উত্তর দিলেন, "না, স্বামীজী, মোটেই নয়। দেখুন বাস্তবিকই আমি অন্য লোকের মতো কাঠ, মাটি, পাথর, ধাতু—এ সকলের পূজা করতে পারি না। এতে কি পর জন্মে আমার অধোগতি হবে?" প্রথমে স্বামীজী যেন কতকটা উদাসভাবেই বলিলেন, "যার যেমন বিশ্বাস।" তখন ভক্তরা ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতেছেন, "এ আবার কি হল?" মহারাজের কথায় স্বামীজী শেষটা এমনি উত্তর দিলেন! এতে তো তাঁর শ্রদ্ধাহীনতার প্রশ্রয় দেওয়া হল। আর এমন মন রাখার মতো উত্তরই বা তিনি কি করে দিলেন? এ তো স্বামীজীর নিজের ভাব নয়!" সকলেই স্বামীজীর কৃষ্ণভক্তির কথা জানিতেন; কৃষ্ণ-কথা বলিতে বলিতে বা গাহিতে গাহিতে তাঁহাকে তাঁহারা গদগদ হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে, এমন কি ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। অতএব স্বামীজীর এই ব্যবহারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল।

সেই মুহূর্তে স্বামীজী অকস্মাৎ এমন কিছু করিয়া বসিলেন, যাহাতে সকলেই প্রমাদ গণিলেন। এদিক-সেদিক তাকাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গানো আলোয়ার-মহারাজের একখানি ছবির উপর স্বামীজীর দৃষ্টি পড়িলে তিনি একজনকে বলিয়া উহা নামাইয়া আনিলেন এবং উহা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানি কার ছবি?" দেওয়ানজী উত্তর দিলেন, "এ আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি।"

ছবির পরিচয় লইয়া স্বামীজী যখন দেওয়ানজীকে বলিলেন, "এর উপর থুথ্ ফেলুন," তখন সকলে ভয়সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী কিন্তু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আপনাদের যে কেউ এখানির উপর থুথ্ ফেলতে পারেন; কাগজ ছাড়া তো এটা আর কিছু নয়? এ করতে আপনাদের আপত্তিটা কি?" তখন দেওয়ানজীর নয়ন ভয় ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত; তিনি একবার করিয়া মহারাজের দিকে এবং একবার করিয়া স্বামীজীর দিকে তাকাইতেছেন। এদিকে কেহ অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া স্বামীজী বারংবার বলিতে লাগিলেন, "ফেলুন এতে থুথু, ফেলুন!" পরিশেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেওয়ানজী বলিলেন, "কি বলছেন, স্বামীজী! এ যে আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি! এমন কাজ আমি কেমন করে করতে পারি?" স্বামীজী তবু বলিলেন, "হলোই বা তাই; কিন্তু মহারাজ তো আর সশরীরে এ ছবির ভেতর নেই! এর ভেতর তো আর মহারাজের হাড়-মাস বা রক্ত নেই। মহারাজের মতো এ নড়ে-চড়ে না, কথাও কয় না। তবু আপনারা কেউ এতে থুথ্ ফেলতে রাজী নন এই জন্য যে, আপনারা এর মধ্যে মহারাজের কায়ার ছায়া দেখতে পান। সত্যি কথা বলতে কি, এর উপর থুথ্ ফেলিতে গেলে আপনাদের মনে হয়, আপনাদের প্রভুকে, স্বয়ং মহারাজকেই অপমান করা হচ্ছে।" অতঃপর মহারাজ মঙ্গল সিংহজীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন মহারাজ, একদিক থেকে যদিও আপনি এ ছবি নন, আর এক দিক থেকে কিন্তু আপনি তাই। তাই আমি যখন ওতে থুথ্ ফেলতে বলেছিলাম, তখন আপনার একান্ত অনুরাগী কর্মচারীরা হতভম্ব হয়ে গেছিলেন। এতে আপনার প্রতিবিম্ব আছে, এখানি তাঁদের কাছে আপনাকে মনে করিয়ে দেয়। এর দিকে তাকালেই তাঁরা স্বয়ং আপনাকে দেখতে পান। তাই আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যতটা সম্মান করেন, এই ছবিকেও ঠিক তেমনি সম্মান করেন। যেসব ভক্তেরা পাথর বা ধাতুতে নির্মিত প্রতিমাতে দেবদেবীর পূজা করেন, তাঁদের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটে —ভক্তেরা এই জন্য ভগবানকে প্রতিমাতে পুজো করেন যে, ঐ প্রতিমা তাঁদিগকে তাঁদের ইষ্টের কথা বা ইষ্টের ঐশ্বর্যমহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁদের ধ্যান ধারণার সহায় হয়। তারা তো আর ঐ পাথর বা ধাতুকেই পুজো করে না। আমি কত জায়গায় বেড়িয়েছি; কিন্তু কোথাও তো কাউকে এই বলে প্রতিমাপুজো করতে দেখিনি যে 'হে পাথর, আমি তোমার

পুজো করছি! হে ধাতু, তুমি আমায় কৃপা কর।' সকলে শুধু সেই এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মারই পুজো করে থাকে ; এবং ভগবানকে যে যে-ভাবে বুঝে বা যেরূপে চিন্তা করে, তিনিও তাঁর কাছে সেভাবেই দেখা দেন। মহারাজ, আমি আমার নিজের ভাবের কথা বলছি ; আপনার ভাব আমি জানি না।" মঙ্গল সিংহজী এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে সব দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন; এখন করজোড়ে বলিলেন, "স্বামীজী, আপনি এই মাত্র যেভাবে মূর্তিপুজার ব্যাখ্যা করলেন, সে অর্থে আমি এ যাবৎ কাউকে পাথর, কাঠ বা ধাতু পুজো করতে দেখিনি। আমি এ তত্ত্ব জানতুম না ; আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন। কিন্তু আমার কি হবে ? আপনি আমায় কৃপা করুন।" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, কৃপা করতে পারেন একমাত্র ভগবান, আর কেউ নয়। আর তিনি তো সদাই কৃপাময়! তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি অবশ্য আপনাকে কৃপা করবেন।"

স্বামীজী বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে মহারাজ অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া ভাবিলেন এবং পরে দেওয়ানজীকে বলিলেন, "এরূপ মহাত্মা আমি আর কখনও দেখিনি ; আপনি এঁকে কিছু দিন আপনাদের এখানে ধরে রাখুন না।" দেওয়ানজী সম্মতি জানাইলেন, পরন্তু ইহাও বলিলেন, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তবে সফল হব কিনা জানি না। ইনি বড়ই তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি।" অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর স্বামীজী দেওয়ানজীর গৃহে এই সর্তে বাস করিতে সম্মত হইলেন যে, যেসকল গরীব ও সাধারণ ব্যক্তিরা তাঁহার দর্শনের জন্য আসিয়া থাকে, তাহাদের জন্যও ধনী ও মানী ব্যক্তিদেরই ন্যায় ঐ গৃহের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকিবে। দেওয়ানজী সহজেই সম্মত হইলেন, এবং তদবধি স্বামীজী তাঁহার গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর দৃষ্টান্ত, উপদেশ ও উদ্দীপনায় আলোয়ারবাসী অনেকেই ধর্ম-জীবনের এক অপূর্ব আস্বাদ পাইয়া উহাতে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এক বৃদ্ধও স্বামীজীর নিকট নিত্য আসিতেন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেন এবং স্বামীজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেন। স্বামীজীও তাঁহাকে কিছু কিছু সাধন প্রণালী শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাহা অভ্যাস করিতেন না। অবশেষে স্বামীজীর ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হইলে তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে নিষ্কৃতিলাভের জন্য একদিন তাহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়াই মৌন অবলম্বন করিলেন। তিনি ঐ বৃদ্ধের কোন প্রশ্নের উত্তর তো দিলেনই না ; অপর বন্ধুবান্ধবের অভি-

বাদনাদিতেও কোন সাড়া দিলেন না। কেহই বুঝিতে পারিলেন না ব্যাপারটা কি। এইভাবে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়া গেলেও স্বামীজী যখন দারুমূর্তিবৎ বসিয়া রহিলেন, তখন ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধটি আপনমনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। অমনি স্বামীজী বালকবৎ হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন এবং অপর সকলেও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। অবশেষে একজন যুবক প্রশ্ন করিল, "স্বামীজী, আপনি ঐ বৃদ্ধের উপর এত বিরূপ হলেন কেন?" তখন স্বামীজী অতি সরল ও মৃদুভাবে বলিলেন, "দেখ বাবারা, আমি তোমাদের জন্য জীবন-পাত করতেও রাজী আছি, কেননা তোমরা আমার উপদেশ পালন করতে চাও, এবং করারও সামর্থ্য আছে। কিন্তু দেখ না, এই বুড়ো জীবনের দশভাগের নয়ভাগ ইন্দ্রিয়ভোগে কাটিয়ে এখন ঐহিক ও পারমাথিক উভয়পথভ্রষ্ট হয়ে ভাবছে, চাওয়া মাত্র ভগবান পেয়ে যাবে। সত্যলাভের জন্য চাই পুরুষকার। যে খাটতে পারে না, তার উপর ভগবানের দয়া হবে কেমন করে? যার পুরুষকার নেই সে তো তমসাচ্ছন্ন। অর্জুন নিজের পুরুষকার বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন বলেই তো ভগবান তাঁকে স্বধর্মপালনের আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি নিষ্কামভাবে স্বীয় কর্তব্য পালনের দ্বারা সত্ত্বগুণ, চিত্তশুদ্ধি, কর্মত্যাগ এবং আত্মসমর্পণের যোগ্য হতে পারেন। শক্তিমান হও, বীর্য অবলম্বন কর। মানুষ যদি বীর্যবান ও শক্তিমান হয়, তবে সে দুষ্কর্ম করলেও আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কেননা তার সাহস ও বীরত্বই একদিন তাকে কুপথত্যাগের প্রেরণা দেবে; এবং সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর কখনও কর্ম করবে না এবং এই ভাবে ক্রমে সত্যলাভে সক্ষম হবে।"

স্বামীজীর উপদেশানুসারে আলোয়ারের অনেক যুবক সংস্কৃত-শিক্ষায় মনোযোগী হয়। সময়ে সময়ে স্বামীজীই তাহাদিগকে শিখাইতেন। তিনি বলিতেন, "সংস্কৃত পড় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের চর্চা কর; আর সব জিনিসটা যথাযথ ভাবে দেখতে ও বলতে শিখ। পড় আর খাট, যাতে করে আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে নূতন করে গড়তে পার। এখন তো আমাদের ইতিহাসের কোন মাথা-মুণ্ডু নেই; এতে কোন ঘটনা-পারম্পর্যও সুবিন্যস্ত হয় নাই। ইংরেজেরা আমাদের দেশের যে ইতিহাস লিখেছে, তাতে আমাদের মনে দুর্বলতা না এসে যায় না; কেন না তারা শুধু আমাদের অবনতির কথাই বলে। যে সব বিদেশীরা আমাদের রীতিনীতির,

আমাদের ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে অতি অল্পই পরিচিত, তারা কেমন করে বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষভাবে ভারতের ইতিহাস লিখবে? কাজেই স্বভাবতঃই বহু ভ্রান্ত ধারণা ও অপসিদ্ধান্ত এসে পড়েছে। তবে একথাও মানতে হবে যে, বিদেশীরাই দেখিয়েছে, কেমন করে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করতে হবে। এখন বেদ, পুরাণ এবং ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অধ্যয়নের জন্য কি করে ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণাক্ষেত্রে আমাদের একটা নিজস্ব স্বাধীন পথ গড়ে তুলতে হবে, এবং সেগুলিকে অবলম্বন করে সহানুভূতিসম্পন্ন অথচ উদ্দীপনাময় ভাষায় এই ভূমির ইতিহাস-সঙ্কলনকে নিজ জীবনের সাধনা-রূপে গ্রহণ করতে হবে—সেসব হচ্ছে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব। ভারতের ইতিহাস ভারতীয়গণকেই রচনা করতে হবে। অতএব বিস্মৃতি-সাগর থেকে আমাদের লুপ্ত ও গুপ্ত রত্নরাজি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হও। কারো ছেলে হারিয়ে গেলে সে যেমন তাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারে না, তেমনি যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত না করতে পাচ্ছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না। তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে।" স্বামীজী দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই চাহিতেন—তিনি জানিতেন, সর্বাঙ্গীন উন্নতি ব্যতীত ধর্মকে রক্ষা করা সুকঠিন ও ধর্মভাবের জাগরণে ইতিহাসের অবদান প্রচুর।

স্বামীজী আলোয়ারবাসীদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। একটি ব্রাহ্মণ বালক তাঁহার নিকট আসিত, এবং শিষ্য যেমন গুরুকে ভালবাসে তেমনি ভালবাসিত। তাহার উপনয়নের সময় সমাগত হইলেও অর্থাভাবে উপনয়ন হয় নাই। স্বামীজী ইহা জানিতে পারিয়া ইহার প্রতিকারকল্পে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এবং তাঁহার বিত্তশালী ভক্তদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে : এই ব্রাহ্মণ-বালকটির উপনয়ন-সংস্কারের উপযুক্ত অর্থ নাই ; গৃহস্থ হিসাবে একে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য ; অতএব তার জন্য চাঁদা তোল। এর বয়সের ব্রাহ্মণ ছেলে স্ববর্ণোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ জানবে না, এটা বড় অশোভন। তার উপর যদি তোমরা এর লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পার তো বড় উত্তম হয়।" ভক্তেরা অমনি এই কার্যে অগ্রসর হইলেন এবং স্বামীজী এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন। আলোয়ার-ত্যাগের পরও বালকটির কথা তিনি ভুলেন নাই, সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনও

বিস্মৃত হন নাই ; তাই আলোয়ার ত্যাগের এক মাস পরে তিনি স্বীয় ভক্ত গোবিন্দ সহায়কে আবু পাহাড় হইতে ৩০শে এপ্রিলের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "তুমি কি সেই ব্রাহ্মণ বালকটির উপনয়ন সম্পন্ন করিয়াছ? তুমি সংস্কৃত পড়িতেছ কি? কতদূর অগ্রসর হইলে?" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৩৫)।

একদিন স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকটে কোন সাধু আছেন কি?" উত্তরে একজন জানাইলেন, "কিছু দূরে এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী বাস করেন।" স্বামীজী অমনি ঐ ব্যক্তির সহিত ব্রহ্মচারিদর্শনে চলিলেন। ব্রহ্মচারী ছিলেন সম্ভবতঃ বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসবিরোধী। দূর হইতে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে গেরুয়ার নিন্দা ও সন্ন্যাসীদের উপর গালিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী ঐ সবে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মচারী অভদ্রভাবে বলিলেন, "তুই গেরুয়া পরেছিস কেন? আমি গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীকে দুচক্ষে দেখতে পারি না।" স্বামীজী তবু বাদপ্রতিবাদ না করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট ঈশ্বর ও ধর্মবিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মচারী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা যাক, তোর উপর আমার আর রাগ নেই। তুই কিছু খাবি?" স্বামীজী জানাইলেন যে, তিনি পূর্বেই ভিক্ষা পাইয়াছেন, অতএব আর ভিক্ষার প্রয়োজন নাই ; তিনি তত্ত্বকথার ভিখারী। অমনি ব্রহ্মচারীর ক্রোধানল পুনরায় উদ্দীপিত হইল ; তিনি রূঢ়স্বরে বলিলেন, "তবে যা, দূর হ ; তুই খাবি না তো দূর হ।" অগত্যা প্রণাম করিয়া স্বামীজী বিদায় লইলেন। সঙ্গী তখন ভাবিতেছেন, স্বামীজী এইরূপ অপমানিত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচারীর রকম দেখিয়া তিনি মনে মনে খুব আমোদ পাইতেছিলেন এবং কষ্টে হাসি চাপিয়া ছিলেন। রাস্তায় আসিয়া তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, "আচ্ছা সাধু দেখালে বাবা, কি তিরিক্ষে মেজাজ আর কি গালাগালির চোট রে বাপ!" বলিয়া তিনি ব্রহ্মচারীর কথা ও ভঙ্গীর নকল করিয়া আবার হাসিতে এবং সঙ্গীকেও হাসাইতে লাগিলেন।

এইপ্রকারে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহও কাটিয়া যখন সাত সপ্তাহ পূর্ণ হইয়া গেল, তখন স্বামীজী বলিলেন, "আর এখানে থাকা যায় না, সন্ন্যাসীর পক্ষে স্থির হয়ে না থাকাই ভাল। ইহা শুনিয়া জনৈক মন্ত্রশিষ্য তাঁহাকে নিজালয়ে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী যখন শিষ্যগৃহে উপস্থিত হইলেন,

শিষ্য তখন তৈলমর্দন করিতেছিলেন। শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, তেল মাখার কি কোন উপকার আছে?" স্বামীজী বলিলেন, "আছে বই কি? এক ছটাক তেল ভাল করে মাখলে এক পোয়া ঘি খাওয়ার কাজ করে।"

আহারাদির পর কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য জানাইলেন যে, স্বামীজী যদিও সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা, সাহস, উদ্যম, নিষ্কামকর্ম, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেন, কিন্তু চাকরি করা তো দাসত্ব। তাতে এসব ভাব বজায় থাকে না; আর ব্যবসাতে সত্য ও সরলতা বিসর্জন দিতে হয়। শিষ্য তাই বলিলেন, "তা মহারাজ, কোন্ কাজ করলে সবদিক বজায় থাকে?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "দেখ, এ বিষয়ে আমিও অনেক ভেবেছি; কিন্তু দেখতে পাই, চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জন করতে কেউ বড় চায় না। এ বিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারুর মনে সমস্যাও ওঠে না। আমাদের শিক্ষার দোষেই এমনটি দাঁড়িয়েছে। যা হোক, আমি তো ভেবে চিন্তে চাষবাস করাটাই ভাল মনে করছি। চাষবাসের কথা বললেই এখন মনে হয়, তবে লেখাপড়া কেন শিখলাম? চাষবাসের কথা বললেই প্রথমে মনে হয়, দেশসুদ্ধ লোককে কি আবার চাষা হয়ে দাঁড়াতে হবে? দেশসুদ্ধ লোক তো চাষা আছেই, তাই না আমাদের এত দুর্গতি! তা নয়, শাস্ত্র পড়ে দেখ, জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন, আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন। আমাদের দেশের ঋষিরা সকলেই ঐ কাজ করেছেন; আবার আজকাল দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে! নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষ নয়, বিদ্বান বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। পল্লীগ্রামের ছেলেরা দুপাতা ইংরেজী পড়ে শহরে পালিয়ে আসে, গ্রামে হয়তো অনেক জায়গা জমি আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না—মনের তৃপ্তি হয় না; শহরে হতে হবে, চাকরি করতে হবে। অন্যান্য জাতের মতো আমাদের হিন্দু জাতটা তাই বেড়ে উঠতে পারছে না। আমাদের মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী যে, যদি এরকম ভাবে জন্ম মৃত্যু চলতে থাকে, তাহলে তো আমরা মরতে বসেছি। এর একটা কারণ, উৎপাদন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। শহরে বাস করার ঝোঁক বেশী, আর একটু পড়াশুনো করলেই চাষার ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামি করতে দৌড়ায়। পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ তো প্রায় হয় না; ছোট-খাটো খারাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে ওঠে, লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে

বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশী হয়—চাষাদের চোখ খুলে যায়; তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখা-পড়া করতে ইচ্ছা হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক তাও হয়।"

শিষ্য সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "সেটা কি স্বামীজী!" স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, "এই ছোট জাত আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেশামেশি হয়। যদি তোমাদের মতো লোকেরা কিছু লেখা-পড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষবাস করে, আর চাষাদের সঙ্গে আপনার মতো ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, তাহলে দেখবে, তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক—জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, ছোট জাতের মধ্যে ধর্মের উচ্চ উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা, উপকার করতে শেখানো—তাও অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত হবে।"

শিষ্য আবার প্রশ্ন করিলেন, "সে কেমন করে হবে?" স্বামীজী বলিলেন, "জ্ঞানপিপাসা সকল মানুষের ভেতরই রয়েছে। তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁকে ঘিরে বসে, আর তাঁর কথা গিলতে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়ীতে ঐ রকম তাদের সব জড় করে সন্ধ্যার সময় গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে যা না করতে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশী ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।"

পরদিন ২৮শে মার্চ স্বামীজী আলোয়ারের ভক্তমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আলোয়ারে আমরা স্বামীজীকে পূর্ণ আচার্যরূপে পাই। ভাব, ভক্তি, জ্ঞান, তিনি তখন অকাতরে দুই হস্তে বিতরণ করিতেছেন, কখনও ভাবে ভাসিতেছেন, গাহিতেছেন, কখনও কর্মের রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন; আবার কখনও গম্ভীর আলোচনার আলোকে সকলের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিতেছেন। সবটাই যেন প্রাচীনপন্থী সাধুদের হুবহু অনুরূপ। কিন্তু ইহারই মধ্যে আমরা একটা নবীন স্বরও শুনিতে পাই। দেশের, দশের, সমাজের মঙ্গলচিন্তায় তিনি অতিমাত্র ব্যস্ত। ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার প্রকৃত মিলনভূমি তিনি যেন তখনই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, যদিও উহার স্পষ্ট রূপায়ণের দিন তখনও আসে নাই।

তাঁহার সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারাও তখনই প্রায় পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়াছে এবং গণজাগরণের বাণী ও "ছোট লোক ও বড় লোককে" মিলানোর আকূতি তখনই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গোবিন্দ সহায়কে লিখিত পত্রে এই ভাবগুলির সংক্ষিপ্ত অথচ উল্লেখযোগ্য পূর্বাভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "তুমি শিবপূজা সযত্নে করিতেছ তো?…ভগবানকে অনুসরণ করিলেই তুমি যাহা কিছু চাও পাইবে।…বৎসগণ, ধর্মের রহস্য শুধু মতবাদে নহে, পরন্তু সাধনার মধ্যে নিহিত। 'যে শুধু প্রভু প্রভু বলিয়া চীৎকার করে সে নহে, কিন্তু যে সেই পরমপিতার ইচ্ছানুসারে কার্য করে, সেই ধার্মিক।' তোমরা আলোয়ারবাসী যে কয়জন যুবক আছ, তোমরা সকলেই চমৎকার লোক, এবং আশা করি যে, অচিরেই তোমাদের অনেকেই সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জন্মভূমির কল্যাণের হেতুভূত হইয়া উঠিবে। পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিও, উহাতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত।" (ঐ)। বস্তুতঃ স্বামীজীর জীবনে গুরু-ভাবের বিকাশ আমরা পূর্বেও দেখিয়াছি ; কিন্তু আলোয়ারে উহাকে যেরূপ পূর্ণতররূপে লাভ করি, পূর্বে আর কখনও সেরূপ পাই নাই। অধিকন্তু জীবনের যে সকল অসমঞ্জস সমস্যার সমাধান করিয়া এবং বাগ্মিতা ও চরিত্রগত উৎকর্ষ দেখাইয়া তিনি জগদ্বরেণ্য হইয়াছিলেন, তাহারও উজ্জ্বল ঊষারাগ আমরা আলোয়ারে লাভ করি। আলোয়ারবাসী সত্যই ধন্য!

আলোয়ার হইতে তিনি আঠার মাইল দূরবর্তী পাণ্ডুপোল অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল পদব্রজে যাইবেন ; কিন্তু সূর্যের উত্তাপ ও নিঃসঙ্গতা এড়াইবার জন্য যখন বন্ধুগণ অনুরোধ করিলেন যে, 'রথ' নামক একপ্রকার আবৃত গোযানে চড়িয়া যাওয়া উচিত, তখন তিনি তাঁহাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কেবল তাহাই নহে, আলোয়ারের ঐসকল অনুরাগী ভক্তবৃন্দ অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট মাইল রাস্তা তাঁহারই সহিত যাইবার অনুমতি চাহিলেন। তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই স্বামীজী সুখী হইতেন ; কিন্তু সকলের আগ্রহ দেখিয়া এবং 'না' বলিলে ক্ষোভ হইবে জানিয়া তিনি সম্মত হইলেন। পাণ্ডুপোলে পৌঁছিয়া তাঁহারা সে রাত্রিটা স্থানীয় হনুমানজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাপন করিলেন। পরদিন 'রথ' ত্যাগ করিয়া তাঁহারা পদব্রজে ষোল মাইল দূরবর্তী টাহলা গ্রামে চলিলেন। এ পার্বত্য পথটি অরণ্যাবৃত এবং শ্বাপদ-সঙ্কুল হইলেও স্বামীজীর কখনও গম্ভীর এবং কখনও রসিকতাপূর্ণ সুমিষ্ট আলাপ এবং সুমধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ

হইয়া সকলে সানন্দে পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। টাহলায় নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রাচীন-মন্দির-পার্শ্বে তাঁহারা সে রাত্রির মতো আশ্রয় লইলেন। বিশ্রামাবসরে স্বামীজী তাঁহাদিগকে সমুদ্রমন্থন, দেবাসুর-সংগ্রাম, বিষোৎপত্তি, মহাদেবের বিষপাণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় আখ্যালাভ—ইত্যাদি বিষয়ে এক নবীন ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বলিলেন, "সমুদ্রটা হচ্ছে মায়াসমুদ্র—এই রূপ-রস-গন্ধাদিময় মায়ারচিত বিচিত্র সংসার। এখানে ইন্দ্রিয়ভোগপ্রদ নানারূপ ভোগ্যবস্তু আছে। সে সকল যত ভোগ করা যায়, পরিণামে তা থেকে ততই বিষ উদ্গীর্ণ হয়। সে বিষ আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী; অথচ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে তা ব্যর্থ, নিস্তেজ। ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সন্ন্যাসী মায়ার কুহকে পতিত না হইয়া বরং দেবাদিদেব মহাদেবের মতো ইন্দ্রিয়ভোগপরায়ণ জীবকুলকে মরণাদি ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে সাহায্য করেন, এমন কি তাহাদের উদ্ধারকল্পে স্বীয় প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মায়াকে বিনাশ করে মৃত্যুর কবল হতে জগৎকে রক্ষা করেন, সকলকে দেখিয়ে দেন—মায়াজয়ী পুরুষ মৃত্যুকেও জয় করেন।"—এই বলিয়া স্বামীজী মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন হইলেন। পরদিন প্রভাতে আবার যাত্রা আরম্ভ হইয়া আঠার মাইল দূরবর্তী নারায়ণী নামক এক দেবীস্থানে সমাপ্ত হইল। নারায়ণীতে প্রতি-বৎসর এক বিশেষ দিনে সুবৃহৎ মেলা হয় এবং রাজপুতানার বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ হয়। এখানে রাত্রি-যাপন করিয়া স্বামীজী পরদিন প্রাতে বন্ধুদের নিকট বিদায় লইলেন এবং একাকী ষোল মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বসওয়া নামক রেল স্টেশনে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তিনি জয়পুর যাত্রা করিলেন। কিছু দূরে বান্দীকুন্দই নামক স্টেশনে আলোয়ারের পূর্বপরিচিত এক ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন; তিনিও স্বামীজীর সহিত জয়পুরে যাইবেন বলিয়া ঐ ট্রেনে উঠিলেন। জয়পুরে পৌছিয়া ঐ ভদ্রলোক স্বামীজীর একখানি ফটো উঠাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। ইহাই স্বামীজীর পরিব্রাজকবেশে প্রথম চিত্র। চিত্রখানি সত্যই গভীর ভাবব্যঞ্জক।

জয়পুরে স্বামীজী দুই সপ্তাহ ছিলেন। ঐ সময় একজন সুপণ্ডিত বৈয়াকরণের সহিত পরিচয় হইলে তিনি তাঁহার নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর ঐ শাস্ত্রে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি থাকিলেও অধ্যাপন-প্রণালী তেমন সরল ছিল না। ইহার ফলে তিনি ক্রমান্বয়ে তিন দিন ধরিয়া

পাতঞ্জলভাষ্যসহ প্রথম সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়া যাইলেও উহার তাৎপর্য স্বামীজীর বোধগম্য হইল না দেখিয়া চতুর্থ দিবসে তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "স্বামীজী, আমার বোধ হইতেছে, আমি যখন তিন দিনেও আপনাকে প্রথম সূত্রেরই অর্থ বুঝাতে পারলাম না, তখন আমা দ্বারা আপনার বিশেষ কোন উপকার হবে না।" এরূপ কথাতে স্বামীজী স্বভাবতঃই বিশেষ লজ্জিত হইয়া দৃঢ় পণ করিলেন, যেমন করিয়াই হউক নিজের চেষ্টায় ভাষ্যের মর্ম উপলব্ধি করিবেন এবং তাহা যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ অন্য কোন দিকে মন দিবেন না। সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি নির্জনে উহা আরম্ভ করিতে বসিলেন এবং ঐকান্তিক মনঃ-সংযোগের প্রভাবে পণ্ডিতজীর সাহায্যে যাহা তিন দিনেও হয় নাই, তাঁহার স্বীয় উদ্যমে তাহা তিন ঘণ্টায় অধিগত হইয়া গেল। কিছু পরেই তিনি পণ্ডিতজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভাষ্যটি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার সুচিন্তিত, সরল এবং গূঢ় লক্ষ্যার্থসম্পন্ন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া পণ্ডিতজী স্তম্ভিত হইলেন। ইহার পর স্বামীজী অনায়াসেই সূত্রের পর সূত্র এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি পরে বলিতেন, "মনে যদি আকুল আগ্রহ আসে তবে সবই সম্ভব হয়—পাহাড় গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেওয়া চলে।"

জয়পুরে অবস্থানকালে উক্ত রাজ্যের প্রধান সেনাপতি সরদার হরিসিংহ লাডকানীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি বহুদিন সরদারজীর গৃহে ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রাদির আলোচনায় কাটাইয়াছিলেন। একদিনের বিচার্য বিষয় ছিল প্রতিমাপূজা। সরদারজী ছিলেন ঘোর নিরাকারবাদী বেদান্তী ; তিনি প্রতিমা-দিতে বিশ্বাস করিতেন না। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিচার চলিতে থাকিলেও তিনি স্বমত পরিত্যাগ করিলেন না। সন্ধ্যায় যখন তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইয়া ফুটপাথ ধরিয়া চলিয়াছেন, তখন দেখিলেন একদল ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা লইয়া কীর্তন গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় স্বামীজী অকস্মাৎ হরিসিংকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "দেখুন, দেখুন, কেমন চেতন বিগ্রহ!" সেই কথায় আকৃষ্ট হরিসিংহ যেমনি বিগ্রহের দিকে তাকাইলেন, অমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে থাকিলেন। সাধারণ চেতন ভূমিতে নামিয়া আসিয়া তিনি আশ্চর্যসহকারে বলিলেন, "স্বামীজী, আজ আমার চোখ খুলে গেল। যা আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেও বুঝতে

পারিনি, তা আপনার স্পর্শমাত্র হয়ে গেল! আমি বিগ্রহমধ্যে স্বয়ং ভগবানের দর্শন পেয়েছি।"

আর একদিন ভক্তদিগের মধ্যে উপবিষ্ট স্বামীজী তাঁহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে পণ্ডিত সূরজনারায়ণ নামে ঐ অঞ্চলের পণ্ডিত সমাজে প্রখ্যাত ও সর্বজন-সম্মানিত জনৈক সরদার তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। স্বামীজী যে প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, তাহারই সূত্র ধরিয়া সরদারজী বলিলেন, "স্বামীজী, আমি বেদান্তী, আমি অবতারপুরুষের বিশেষ ভগবদৈশ্বর্যে বিশ্বাস করি না। আমরা তো সকলেই ব্রহ্ম। অবতারে আর আমাতে তফাত কি?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "ঠিক কথা, কিন্তু অবতারদের মধ্যে মৎস্য কূর্ম এবং বরাহও আছেন, আর আপনি বলছেন যে আপনিও অবতার। কিন্তু এঁদের মধ্যে আপনি কার সঙ্গে নিজেকে এক মনে করেন?" উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং সরদারজীও নীরব হইলেন।

কিন্তু স্বামীজীর পক্ষে এক স্থানে নিশ্চল হইয়া থাকা সম্ভব ছিল না; আবার যেন তিনি দূরদূরান্তরের আহ্বান শুনিয়া জয়পুর ত্যাগ করিলেন এবং আজমীঢ়ে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি হিন্দু ও মুসলমানদের বহু কীর্তিকলাপের জন্য প্রসিদ্ধ। স্বামীজী আকবর শাহের প্রাসাদ দেখিলেন এবং প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাভাজন মুসলমান ফকির চিস্তি সাহেবের দরগা নামে প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রও দেখিয়া আসিলেন। আজমীঢ়ের পুষ্করতীর্থ, সাবিত্রী-মন্দির এবং ব্রহ্মার মন্দিরও সুপ্রসিদ্ধ। তীর্থ ও মন্দিরাদি দর্শনান্তে তিনি আবু-পর্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গ্রীষ্মসমাগমে ১৪ই এপ্রিল (১৮৯১) তিনি আবু পর্বতে উপস্থিত হইলেন। এই পর্বতের রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আছেই, তদুপরি রহিয়াছে নয়নাভিরাম অতুলনীয় দিলওয়ারা জৈন-মন্দির, যাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয়ে শ্বেত মর্মরের দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছিল। দুইজন বণিক ভ্রাতা উহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন এবং উহা সমাপ্ত করিতে চৌদ্দ বৎসর লাগিয়াছিল। মন্দিরের কারুকার্যদর্শনে যেমন চিত্ত প্রফুল্ল হয়, তেমনি ভারত-গৌরবস্মরণে প্রাণ উল্লসিত হয়। মন্দির দর্শন করিয়া স্বামীজী পর্বতবক্ষে শোভিত বিশাল হ্রদের তীরে ভ্রমণ করিলেন।[৩]

৩। বাঙ্গলা জীবনীর মতে (পৃঃ ২৪৭-৪৮) স্বামীজী আবু হইতে আজমীঢে ফিরিয়া আসেন এবং সেখান হইতে আবার আবুতে যান; অর্থাৎ দুইবার আজমীঢ় ও দুইবার আবু দর্শন করেন।

অন্যান্য স্থানে যাহা হইয়াছিল, আবুতেও তাহাই হইল—স্বামীজীর গুণে বহু ভক্ত আকৃষ্ট হইলেন। তিনি ইঁহাদের সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেন। একদিন তাঁহারা 'বেইলিজ ওয়াক' নামক সড়ক ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ শৈলনিবাসের বিশেষ বিশেষ মনোরম স্থানগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেছিলেন। নীচেই আবুর হ্রদটি বিস্তৃত ছিল। স্বামীজী বন্ধুগণসহ পথ ছাড়িয়া একটু উপরে প্রস্তরখণ্ডগুলির মধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং গান ধরিলেন। সে সঙ্গীত অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতে লাগিল। এদিকে কয়েকজন ইউরোপবাসীও ঐ সময়ে ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলেন এবং সঙ্গীতের মিষ্টতায় আকৃষ্ট হইয়া গায়কের দর্শনের জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে গায়ক নামিয়া আসিলে তাঁহারা তাঁহার সুমিষ্ট স্বর ও ভাবগাম্ভীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

স্বামীজী তখন এক নির্জন গুহাতে আশ্রয় লইয়া তপস্যাদিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল মাত্র দুইখানি কম্বল, একটি কমণ্ডলু ও খান কয়েক পুস্তক। একদিন জনৈক দেশীয় রাজার উকিল এক মুসলমান ভদ্রলোক ঐ পথে যাইবার কালে স্বামীজীকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। দুই-চারি মিনিটের আলাপেই উকিল সাহেব বুঝিতে পারিলেন সাধুর পাণ্ডিত্য অগাধ। এই আকর্ষণে তিনি প্রায়ই স্বামীজীর দর্শন জন্য সেখানে আসিতেন। একদিন তিনি জানিতে চাহিলেন, তাঁহার দ্বারা স্বামীজীর কোন সেবা হইতে পারে কিনা। স্বামীজী বলিলেন, "দেখুন উকিল সাহেব, বর্ষা তো এসে পড়ল, কিন্তু এ গুহার দরজা নেই ; আপনি ইচ্ছা করলে এক জোড়া কপাট করে দিতে পারেন।" ইহাতে সম্মতি থাকিলেও উকিল সাহেব বলিলেন, "এ গুহাটা বড় খারাপ, আপনি অনুমতি করেন তো একটা কথা বলি। আমি এখানে একা একটা সুন্দর বাঙ্গলোতে থাকি। আপনি যদি দয়া করে সেখানে থাকতে রাজী হন তো আমি কৃতার্থ হব।" স্বামীজী সম্মত হইলে তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমি যে মুসলমান। আমি অবশ্য আপনার জন্য আলাদা আহারের ব্যবস্থা করে দেব।" স্বামীজী সেসব কথায় কান না দিয়া বাঙ্গলোতে চলিয়া আসিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, স্বামীজী কত উদারস্বভাব ছিলেন এবং লোকনিন্দা প্রভৃতি ভয়ের উর্ধ্বে বিচরণ করিতেন। এই মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে অবস্থানকে অবলম্বন করিয়াই স্বামীজীর জীবনে আর একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধের সূত্রপাত হইল—এই সূত্রেই তিনি খেতড়ীরাজের সহিত পরিচিত হইলেন।

উকিল সাহেব এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে লইয়া আবু পাহাড়ে স্বামীজীর একটি বেশ সুন্দর অনুগামীর দল গড়িয়া উঠিল। এইরকমে কোটার উকিল শ্রীযুক্ত মহারাও এবং ঐ রাজ্যেরই মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিংহের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। কিছুদিন পরেই খেতড়ী-রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলাল নিমন্ত্রিত হইয়া উকিল সাহেবের গৃহে আসিলেন। ঘটনাক্রমে স্বামীজী তখন শয্যায় শায়িত—তাঁহার পরিধানে শুধু কৌপীন এবং একখণ্ড গেরুয়া বহির্বাস। নিদ্রিত সাধুকে দেখিয়া জগমোহন ভাবিলেন, "যেসব সাধারণ সাধু চোর ছেঁচড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়, এও তাদেরই একজন হবে।" শীঘ্রই স্বামীজীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে জগমোহন প্রায় প্রথম কথায়ই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, আপনি তো হিন্দু সাধু ; আপনি মুসলমানের বাড়ীতে আছেন কি করে ? আপনার খাদ্য হয়তো কখন-সখন অপরে ছুঁয়েই ফেলে।" ইহাতে জ্বলিয়া উঠিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আপনি বলছেন কি ? আমি তো সন্ন্যাসী, আমি আপনাদের সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধের উর্ধ্বে। আমি ভঙ্গীর (মেথরের) সঙ্গে পর্যন্ত খেতে পারি। ভগবান অপরাধ নেবেন, সে ভয় আমার নেই ; কেননা এটা ভগবানের অনুমোদিত। শাস্ত্রের দিক থেকেও আমার ভয় নেই, কেননা শাস্ত্রে এটা অনুমোদিত। তবে আপনাদের এবং আপনাদের সমাজের ভয় আছে বটে। আপনারা তো আর ভগবান বা শাস্ত্রের ধার ধারেন না। আমি দেখি বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্বত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। আমার দৃষ্টিতে উচ্চনীচ নেই। শিব, শিব!" স্বামীজীর কথায় ও ভঙ্গীতে যেন বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। জগমোহন নীরব রহিলেন ; তাঁহার মনে কেবল এই চিন্তা জাগিতে লাগিল—খেতড়ী-রাজের সহিত এই সাধুর পরিচয় হওয়া আবশ্যক। তিনি বলিলেন, "দয়া করে রাজার সঙ্গে দেখা করতে রাজগৃহে আসবেন কি ?" স্বামীজী বলিলেন, "ভাল কথা, পরশু যাব।"

স্বস্থানে প্রত্যাগত জগমোহন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সবই খেতড়ী-রাজ অজিত সিংহকে বলিলেন। ইহাতে রাজা স্বামীজীকে দেখিবার জন্য এত আকুল হইলেন যে, তিনি বলিলেন, "আমি নিজেই তাঁকে দর্শন করতে যাব।" এই সংবাদ স্বামীজীর কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রাজা অজিত সিংহের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন (৪ঠা জুন, ১৮৯১)। প্রাথমিক অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদির পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"স্বামীজী, জীবন মানে কি?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি চেষ্টা করছে জীবকে দাবিয়ে রাখতে, আর তাদের গ্রাহ্য না করে অন্তঃশক্তি স্বীয় আবরণোন্মোচন বা ক্রমবিকাশ করে চলেছে—তাকেই বলে জীবন।" কথাগুলি উচ্চারণের সময় স্বামীজীর স্বীয় জীবনের দুঃখকষ্ট ও বৈরাগ্য ঐ কথাগুলিতে অপরূপ শক্তিসঞ্চার করায় রাজার নিকট উহা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি উৎফুল্লমনে আবার প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী, তাহলে শিক্ষার মানে কি?" স্বামীজীর উত্তর আসিল, "আমার মতে শিক্ষার মানে হল কতকগুলি ভাবকে অস্থিমজ্জাগত করা।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কথাগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ না কোন চিন্তা বা ভাব মনের মধ্যে এরূপ দৃঢ় সংস্কারের আকার পায় এবং প্রতি স্নায়ু বা শিরায় তার প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে, ততক্ষণ সেই চিন্তা বা ভাবকে প্রকৃতপক্ষে স্বীয় মনের নিজস্ব সম্পত্তি বলে ধরা চলে না।" তারপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের ঘটনাবলী উদাহরণস্বরূপে উপস্থিত করিয়া স্বীয় বক্তব্য এমন মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিলেন যে অজিত সিংহ প্রতিটি কথা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্ত যেন তখন কোন ঊর্ধ্বলোকে বিচরণমান, যেখানে শুধু সত্য, শিব ও সুন্দর চির-প্রতিষ্ঠিত। দিনের পর দিন এমনি করিয়া রাজা তাঁহার অমৃতবাণী শুনিলেন। পরে একদিন বলিলেন, "স্বামীজী, আপনি আমার সঙ্গে আমার রাজ্যে চলুন।" স্বামীজী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে।"

স্বামীজী খেতড়ীতে তিনবার গিয়াছিলেন—আমেরিকা যাইবার পূর্বে দুইবার ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া একবার। স্বামীজীর সহিত খেতড়ীরাজের মেলামেশা সম্বন্ধে পণ্ডিত বেণীশঙ্কর শর্মা সম্প্রতি (১৯৬৩) একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন (Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter)। গ্রন্থকারের মতামতের সহিত আমরা সর্বক্ষেত্রে সহমত না হইলেও গ্রন্থে প্রকাশিত বিষয়বস্তু হইতে স্বামীজীর আবু পর্বতে ও খেতড়ীতে অবস্থানকালের অনেক কথা জানিতে পারি। পরবর্তী গ্রন্থের অনেক স্থলে এই সময়ের ঘটনার বিবৃতিকালে আমরা প্রধানতঃ স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর উপর নির্ভর করিলেও স্থলবিশেষে বেণীশঙ্করজীর এই গ্রন্থখানিরও সাহায্য লইব। প্রতিপদে ইহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আপাততঃ আমরা প্রথমবারের খেতড়ী-ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিতেছি।

উক্ত গ্রন্থে যে দিনপঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার সারাংশ এই : ৪ঠা জুন আবু পাহাড়ে স্বামীজীর সহিত খেতড়ী-রাজগৃহে রাজা অজিত সিংহের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। স্বামীজী সকালে সেখানে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। ঐ সময়ে যোধপুরের হরদয়াল সিংহজীও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী সেদিন সেখানেই ভোজন করিলেন। ৬ই জুন সকাল দশটায় স্বামীজী আবার ঐ গৃহে গেলেন। এই দিবসও ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা হইল। ১১ই জুন সকালে স্বামীজী তৃতীয়বার ঐ বাটীতে আসিলে রাজার সহিত শাস্ত্রীয় বিষয়ে কথাবার্তা হইল এবং সাড়ে দশটায় উভয়ে আহার করিলেন। স্বামীজী কয়েকটি গান গাহিলেন এবং শিক্ষা ও দর্শন সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া বিকালে দুইটার সময় বিদায় লইলেন। ১৫ই জুন তারিখেও স্বামীজী সকালে দশটায় সেখানে আসিয়া বিবিধ প্রসঙ্গান্তে আহার করিলেন এবং পুনরায় তিনটা পর্যন্ত বসিয়া আলাপ করিলেন। ২২শে জুন ঐ গৃহে পৌছিয়া স্বামীজী বাহিরের একটি কক্ষে বসিলেন। পরে অজিত সিংহ ঐ কক্ষে আসিয়া তাঁহার সহিত শিক্ষা ও শাস্ত্র বিষয়ে কথাবার্তা বলিলেন। পৌনে বারটায় উভয়ে আহার করিলেন। ইহার পর একটু বিশ্রামান্তে রাজা পুনর্বার পাঁচটা পর্যন্ত স্বামীজীর সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ করিলেন। ২৩শে জুনও অনুরূপ ভোজন ও প্রসঙ্গাদি হইল। ২৪শে জুনের বিবরণটি একটু অনুধাবনযোগ্য। স্বামীজী সকালে উপস্থিত হইয়া পূর্ব পূর্ব দিনের ন্যায় বার্তালাপের পর রাজার সহিত ভোজন করিলেন। অতঃপর বৈঠকখানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় অপরাহ্নে পূর্বব্যবস্থানুযায়ী জলেশ্বরবাসী ঠাকুর মুকুন্দ সিংহজী আজমীঢ়ের আর্যসমাজের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত হরবিলাস বি. এ. মহোদয়ের সহিত সেখানে উপস্থিত হইলেন। অজিত সিংহও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলে বসিয়া অর্ধঘণ্টা যাবৎ আলোচনা করিলেন। উক্ত দিনপঞ্জীতে জুলাই মাসের ৪, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৪, ১৭, ১৮ তারিখেও ঐ গৃহে গমন এবং ভোজন ও আলাপাদির উল্লেখ আছে।

২৪শে জুলাই স্বামীজী অজিত সিংহের সহিত খেতড়ী অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা আজমীঢ় হইয়া ২৫শে জুলাই জয়পুরে পৌছিয়া তথাকার খেতড়ী-হাউসে উঠেন। জয়পুর হইতে তাঁহারা ৩রা আগস্ট আবার যাত্রা করিয়া অপরাহ্নে ট্রেনে খৈরথলে পৌছিয়া সেখানে রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন খৈরথল ত্যাগ করিয়া কোটে পৌছিলেন এবং ৫ই আগস্ট কোট ত্যাগ করিয়া ৭ই আগস্ট সকালে সাড়ে সাতটায় খেতড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পথের শেষ অংশটুকু তাঁহারা 'রথে'[৫] চড়িয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

খেতড়ীতে আগমনের স্বল্পদিন পরেই রাজা স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণপূর্বক তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ এবং মধুর ছিল; অজিত সিংহ স্বামীজীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন—স্বামীজীর সম্মুখে তিনি করজোড়ে জানুপাতিয়া অভিবাদন করিতেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। স্বামীজীও আশা রাখিতেন—এই শিষ্যের দ্বারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে; তাই তিনি শুধু তাঁহার ধর্মজীবনের ভার গ্রহণ করেন নাই, লৌকিক জ্ঞানার্জনেও বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বামীজীর খেতড়ীতে প্রায় তিন মাস (৭ই আগস্ট হইতে ২৭শে অক্টোবর) অবস্থানের সুযোগে রাজা তাঁহার নিকট পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা এবং নক্ষত্র-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চ গৃহে স্বামীজী একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়াছিলেন—উহাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য সংগৃহীত ছিল। একটি দূরবীক্ষণও ঐ উচ্চ গৃহের ছাদে স্থাপিত হইয়াছিল এবং গ্রহ-নক্ষত্রাবলোকনে গুরুশিষ্য এমনই মাতিয়া যাইতেন যে, সময়ের জ্ঞান থাকিত না। ইহা ছাড়া গীতিবাদ্যের চর্চা তো ছিলই। এইসকল চর্চা সব সময় রাজপ্রাসাদেই হইত না, অনেক সময় নিকটবর্তী বিশাল পুষ্করিণীর (তলাব) তীরবর্তী গৃহে বসিয়াও হইত। ৪ঠা অক্টোবর স্বামীজী রাজার সহিত অশ্বারোহণে নবরাত্রি উপলক্ষে রাজস্থানের প্রসিদ্ধ জিন-মাতার মন্দির দর্শনে চলিলেন। উহা সীকর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পথে সিগনোরে পৌছিয়া তাঁহারা সেখানে রাত্রিযাপন করিলেন এবং ৫ই অক্টোবর সিগনোর পরিত্যাগ করিয়া বাজোরের পথে ৬ই অক্টোবর সীকরে উপনীত হইয়া স্থানীয় রাজা মাধোসিংহজীর সহিত জিন-মাতার মন্দির দর্শন করিয়া আসিলেন। অতঃপর ১০ই অক্টোবর পুনর্যাত্রা করিয়া তাঁহারা ১১ই অক্টোবর খেতড়ীতে ফিরিলেন। ১২ই অক্টোবর মহাসমারোহে খেতড়ীতে "দশেরা" উৎসব উদ্‌যাপিত হইল এবং ঐ উপলক্ষে ভোজেরও ব্যবস্থা হইল।

খেতড়ীতে থাকার সুযোগে স্বামীজী নিজের জ্ঞানভাণ্ডারও কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ

৫। ইংরেজী জীবনীর মতে 'স্টেট ক্যারেজ-'-এ।

করিতে যত্নপর হইয়াছিলেন। তখন রাজস্থানের বৈয়াকরণদের অন্যতম অগ্রণী পণ্ডিত নারায়ণদাসজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে তিনি তাঁহার অসমাপ্ত পাণিনি-ব্যাকরণের অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের এইরূপ একজন প্রতিভাবান ছাত্র পাইয়া পণ্ডিতজীও বিশেষ আনন্দিত হইলেন। একদিন পূর্বদিনে পঠিত এক সুদীর্ঘ বিষয়ে পণ্ডিতজী ছাত্রকে প্রশ্ন করিলে তিনি সমস্ত পাঠটির হুবহু পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মন্তব্যও যোগ করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে পণ্ডিতজী যখন বুঝিলেন যে, স্বামীজীই তাঁহার সমস্যা-গুলির সমাধানকর্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন, "স্বামীজী আর তো আপনাকে শিখাবার কিছু নেই; আমি যা কিছু জানি আপনাকে সব শিখিয়েছি, আর আপনিও তা সুপরিজ্ঞাত হয়েছেন।" তখন স্বামীজী সসম্মানে পণ্ডিতজীকে অভিবাদন করিলেন এবং কৃপাপ্রকাশপূর্বক শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন।

একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, (প্রাকৃতিক) নিয়ম মানে কি?" বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া স্বামীজী ঝটিতি উত্তর দিলেন, "নিয়ম জিনিসটা সম্পূর্ণ মানসিক; বাইরে এর কোন সত্তা নেই, এটা হচ্ছে বুদ্ধি এবং ভূয়োদর্শনের ফল। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে সাজিয়ে বুদ্ধিই এগুলিকে নিয়মের আকারে গড়ে। প্রত্যক্ষ-পরম্পরা কিভাবে ঘটবে তা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে বহির্বিষয়ের যে ছাপ আসে এবং ঐগুলির সম্বন্ধে বুদ্ধিতে যে প্রণালীবদ্ধ ক্রমিক প্রতিক্রিয়া ঘটে তা ছাড়া নিয়ম বলে আলাদা কিছু নেই। বিজ্ঞানবাদীদের মতে বহির্বিষয় বলতে তো শুধু সমপ্রকারের বস্তু বা সমপ্রকারের স্পন্দনকে বুঝায়। এদের অনুভূতি এবং শ্রেণীবিভাগ হল মানসিক ব্যাপার। অতএব নিয়ম বলতে বৌদ্ধিক জ্ঞানকে বুঝায় এবং বুদ্ধিতেই এর উৎপত্তি।" এই বলিয়া স্বামীজী সাংখ্যদর্শনের কথা পাড়িলেন এবং দেখাইয়া দিলেন, জড়বিজ্ঞান কিরূপে এই দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির সমর্থন করে।

দিন যেমন যাইতে লাগিল, অজিত সিংহের গুরুভক্তি ততই বৃদ্ধি পাইয়া এমন হইল যে, গভীর রজনীতে তিনি শয্যাত্যাগপূর্বক গুরুর পদসেবা করিতেন। প্রথম রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিয়া স্বামীজীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি রাজাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না; রাজা সবিনয়ে বলিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার দাসানুদাস, আপনি আমায় এ সৌভাগ্য

থেকে বঞ্চিত করবেন না।" দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজসভাতেও রাজা ঐরূপ সম্মান দেখাইতে চাহিতেন ; কিন্তু স্বামীজী সেরূপ সেবা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "উহাতে প্রজার চক্ষে রাজার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।"

স্বামীজী যখন কোনও পুস্তক পড়িতেন, তখন পুস্তকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া দ্রুত পৃষ্ঠা উলটাইয়া যাইতেন। ইহা দেখিয়া কুতূহলী রাজা জানিতে চাহিলেন, "স্বামীজী, আপনি এত দ্রুত পড়েন কি করে?" স্বামীজী উত্তর দিতে গিয়া বুঝাইলেন, "বালক যখন প্রথম পড়তে শিখে তখন এক একটি অক্ষর দুবার তিনবার উচ্চারণ করে তবে শব্দটি পড়তে পারে। তখন তার দৃষ্টি থাকে এক একটি অক্ষরের উপর। আরও শিক্ষার পর তার নজর অক্ষরের উপর না পড়ে এক একটা শব্দের উপর পড়ে—তখন অক্ষরের উপলব্ধি না হয়ে শব্দের উপলব্ধি হয়। ক্রমে অভ্যাসের ফলে এক একটা বাক্যের উপর নজর পড়ে, আর তারই উপলব্ধি হয়। এই ধারায় ভাবগ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে গেলে একনজরে পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা উপলব্ধি হয়। এ শুধু অভ্যাস, ব্রহ্মচর্য আর একাগ্রতার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়—যে কেহ চেষ্টা করলেই করতে পারে। তুমি চেষ্টা কর, তোমারও হবে।"

খেতড়ী-রাজ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, গুরুজী আশীর্বাদ করিলে অবশ্য পুত্রলাভ হইবে ; তাই একদিন ধরিয়া বসিলেন, "স্বামীজী, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমার যেন একটি পুত্রলাভ হয়। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনার মুখে শুধু ঐ কথা উচ্চারিত হলেই আমার অভীষ্টপূর্ণ হবে।" রাজার ঐকান্তিক অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ও তাঁহার অটুট বিশ্বাস দেখিয়া স্বামীজী প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আমরা দ্বিতীয় বার খেতড়ীতে ফিরিয়া দেখিব, এ আশীর্বাদ পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আরও দেড় বৎসরের পরের কথা।

পূর্বের বিবরণ পড়িয়া যদি কাহারও ধারণা হয় যে, খেতড়ীর দিনগুলি স্বামীজী রাজার সঙ্গে রাজভবনেই কাটাইয়াছিলেন, তবে একান্তই ভুল হইবে। তিনি দীন-দরিদ্র ভক্ত প্রজাদের গৃহেও প্রায়ই দর্শন দিতেন। খেতড়ীর ভক্তদের মধ্যে অন্যতম অনুরাগী ভক্ত ছিলেন পণ্ডিত শঙ্করলাল। ইনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও স্বামীজী বহুবার তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে রাজাপ্রজা সকলেই সমান স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি সকলকে সানন্দে ধর্মকথা শুনাইতেন

এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও জীবনের ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া ঐ সকল কথা প্রাঞ্জল ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার সরল ও সরস ব্যবহার এবং সর্বদা ভগবদ্ভাব লক্ষ্য করিয়া ও তাঁহার সহিত তাঁহারই কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের তুলনা করিয়া তাঁহাদের অনুভব হইত, শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখিয়া থাকিলেও তাঁহার হাতে-গড়া স্বামীজীকে দর্শন করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন।

খেতড়ীতে স্বামীজী আনন্দেই ছিলেন, এবং খেতড়ীবাসীও তাঁহাকে ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না; কিন্তু স্বামীজীর অন্তরাত্মা কখনও তাঁহাকে স্থির হইয়া থাকিতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; অতএব তিনি ২৭শে অক্টোবর কিংবা তাহার পরদিন খেতড়ী হইতে বিদায় লইলেন।[৬] খেতড়ী হইতে প্রথমে তিনি আজমীঢ়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে দুই-একদিন কাটাইয়া ক্রমে আহমেদাবাদে যান। তাঁহার গুজরাট ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার পূর্বে আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এখানেই শেষ করিতে চাই। এইগুলির স্থান ও কাল সঠিক জানা নাই।

রাজস্থানের মধ্যে একবার ট্রেনে যাইবার কালে তাঁহার কামরাতে দুইজন ইংরেজ সহযাত্রী ছিলেন। ইঁহারা ভাবিলেন স্বামীজী একজন সাধারণ ফকির মাত্র; অতএব ইংরাজীতে আলাপ করিতে করিতে তাঁহার প্রসঙ্গ তুলিয়া হাসিঠাট্টায় মাতিয়া গেলেন। স্বামীজী যেন কিছুই বুঝিতেছেন না এমনি ভাবে নীরবে অম্লানবদনে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে ট্রেনটি একটি স্টেশনে থামিলে স্বামীজী স্টেশন মাস্টারের নিকট ইংরাজীতে এক গ্লাস জল চাহিলেন। সহযাত্রী দুইজন যখন দেখিলেন যে, স্বামীজী তাঁহাদের ভাষা জানেন, তখন বিশেষ বিব্রত ও লজ্জিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সব বুঝিয়াও কেমন করিয়া বিন্দুমাত্র ক্রোধ না দেখাইয়া বসিয়া ছিলেন। উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "দেখুন বন্ধুগণ, আহাম্মকদের সংস্পর্শে আসা তো আমার জীবনে এই নতুন নয়।" ইহাতে সহযাত্রীদ্বয়ের ক্রোধ হইল নিশ্চয়, কিন্তু স্বামীজীর তেজঃপুর্ণ সুগঠিত চেহারা দর্শনে তাঁহারা ঐ ক্রোধ চাপিয়া বরং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ঐ প্রদেশেই একবার দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের সময় এমন এক থিওসফিষ্ট সহযাত্রী জুটিলেন যিনি অলৌকিকতায় অতিমাত্র বিশ্বাসী। তিনি বিদ্বান হইলেও ধর্ম-

৬। খেতড়ীর অজিত সিংহের কর্মচারীরা যে দিনলিপি লিখিতেন, উহাতে ২৭শে অক্টোবর অপরাহ্ণ পর্যন্ত স্বামীজীর খেতড়ীতে উপস্থিতি উল্লিখিত আছে, তাহার পর আর কোন উল্লেখ নাই।

বিষয়ে বড়ই অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া স্বামীজীকে নানা মূখোচিত প্রশ্নে উত্যক্ত করিতেছিলেন। স্বামীজী হিমালয়ে গিয়াছিলেন কিনা, সেখানে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাত্মাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের আর বিরাম ছিল না। স্বামীজী স্থির করিলেন, এই পণ্ডিতমূর্খকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক ; কাজেই অন্তরের হাস্য অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়া তিনি মহাত্মাদের অত্যাশ্চর্য সিদ্ধাই ও সেই সকলের প্রয়োগ সম্বন্ধে এমন চমকপ্রদ সব কাহিনী বলিতে লাগিলেন যে, ঐ ভদ্রলোক বিস্ফারিতনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া এবং ওষ্ঠদ্বয় খুলিয়া যেন তাঁহার কথাগুলি গিলিতে লাগিলেন। স্বামীজী একটু থামিলেই আবার ভদ্রলোকের প্রশ্ন আসিল, মহাত্মারা বর্তমান যুগের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কিনা। স্বামীজী নির্বিকারচিত্তে বলিয়া যাইতে লাগিলেন : মহাত্মাদের সহিত এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল , মহাত্মারা পরিষ্কার জানাইয়াছেন কবে কিভাবে মহাপ্রলয় আসিবে, এবং প্রলয়ান্তে নবীন সত্যযুগের প্রবর্তনের জন্য তাঁহারা কেমন করিয়া নূতন মানুষের সৃষ্টি করিবেন। ভদ্রলোকটি স্বামীজীর সব কথাই নির্বিবাদে বিশ্বাস করিলেন এবং এত সহজে, এতটা দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহার প্রতিদানস্বরূপ স্বামীজীকে তাঁহার সহিত আহারের আমন্ত্রণ করিলে স্বামীজী সহজেই সম্মত হইলেন, কেননা তখন পর্যন্ত তাঁহার কিছুই খাওয়া হয় নাই। তাঁহার অনুরাগীরা তাঁহাকে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন তিনি সঞ্চয়ের বিরোধী ছিলেন, অতএব তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করেন নাই। আহারের পর স্বামীজী উক্ত ব্যক্তিকে আরও একটু ভাল করিয়া দেখিলেন ; বুঝিলেন, ইনি হৃদয়বান্, সরল ও অলৌকিক ব্যাপারে এত সহজে বিশ্বাসবান যে, বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন ; অতএব মস্তিষ্কের এই দুর্বলতা দূর করিবার জন্য তখন তিনি দৃঢ়স্বরে আসল কথা খুলিয়া বলিলেন, "আপনি নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধি জাহির করতে এতটা উৎসুক হয়েও কি করে এসব অসম্ভব উদ্ভট কথাগুলি মেনে নিলেন ?" ভদ্রলোক লজ্জায় অধোবদন হইলেন, আর একটি কথাও বলিলেন না। তখন ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যাকল্পে এবং সমস্ত আজগুবী ধারণা অপসারিত করার উদ্দেশ্যে, স্বামীজী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "বন্ধু, আপনাকে দেখে তো বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। আপনার মতো লোকের পক্ষে একটু বুদ্ধিবিবেচনা করে চলা উচিত। সিদ্ধাই-এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্বন্ধ নেই, কেননা বিচার করে দেখলে

এই পাওয়া যায়—যে ব্যক্তি সিদ্ধাই দেখায়, সে নিজ বাসনার দাস এবং অতিশয় আত্মম্ভরী। আধ্যাত্মিকতার অর্থ হচ্ছে চরিত্রবলরূপ যথার্থশক্তি অর্জন করা, এর অর্থ হচ্ছে রিপুজয় এবং বাসনা নির্মূল করা। এই সকল ভোজবাজী, যাতে মনুষ্যজীবনের কোন সমস্যারই প্রকৃত সমাধান হয় না, এর পেছনে দৌড়ানো মানে শক্তির অযথা অপব্যয়; এটা একটা হীন স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এর ফলে মস্তিষ্কবিকার উৎপন্ন হয়। এই সব আহাম্মকই তো আমাদের জাতের সর্বনাশ করছে। এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে বেশ শক্ত ও সবল সাধারণ বুদ্ধি, সর্বসাধারণের সহিত সহানুভূতি এবং মানুষ-গড়ার মতো দর্শন ও ধর্ম।" সব শুনিয়া ভদ্রলোক স্বামীজীর উদ্দেশ্য, ধর্মনিষ্ঠা ও মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অতঃপর স্বামীজীর উপদেশ অনুসরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে একদিন গল্পচ্ছলে স্বামীজী আর একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন। তিনি একবার কোনও স্থানে যাইবার জন্য রাজস্থানের এক রেল স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু কোন কারণে ট্রেনে উঠিতে না পারিয়া তিন দিন সেখানেই থাকিতে হইয়াছিল। সেসময় বহু লোক তাঁহার নিকটে আসিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করিত। দিনরাত্রিই লোক আসিত এবং আলাপ করিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু তাঁহার খাওয়া হইয়াছে কিনা, কেহই জিজ্ঞাসা করিত না, আর তিনিও বলিতেন না। তৃতীয় রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে এক দীনহীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপনি তিন দিন তো অনবরত কথাই বলিয়াছেন, জলপান পর্যন্ত করেন নাই, এতে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লেগেছে।" স্বামীজীর তখন মনে হইল, স্বয়ং নারায়ণ বুঝি দীনবেশে তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমায় কিছু খেতে দেবে?" সে অতি বিনীত ভাবে বলিল, "আমার প্রাণতো তাই চায়; কিন্তু আমার তৈরী রুটি আপনাকে দেব কি করে? আজ্ঞা হয় তো আমি আটা ডাল এনে দিই, আপনি ডাল-রুটি বানিয়ে নিন।" স্বামীজী তখন নিয়ম করিয়াছেন, অগ্নিস্পর্শ করিবেন না; তাই তাহাকে বলিলেন, "তোমার তৈরী রুটি আমায় দাও; আমি তাই খাব।" শুনিয়া সে ভয়ে জড়-সড় হইয়া গেল। সে খেতড়ী-রাজের প্রজা—রাজা যদি জানিতে পারেন যে, সে চামার হইয়াও সন্ন্যাসীকে রুটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে তাহার গুরুতর শাস্তি হইবে, চাই কি, সে রাজ্য হইতে বিতাড়িতও

হইতে পারে। স্বামীজী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, রাজা তোমাকে শাস্তি দেবেন না।" ইহাতে সে ভরসা পাইল কিনা জানি না ; তবে বলবতী সাধুসেবার আগ্রহে রুটি প্রস্তুত করিয়া আনিল। স্বামীজী বলেন, "সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রে সুধা এনে দিলেও তেমন তৃপ্তিকর হত কিনা সন্দেহ।" তাহার দয়া দেখিয়া স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল এবং তিনি ভাবিলেন এরূপ কত শত উচ্চচেতা ব্যক্তি পর্ণকুটীরে বাস করে, কিন্তু আমাদের চক্ষে তারা চিরদিন ঘৃণ্য, হীন। তাঁহাকে চামারের খাদ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়া স্টেশনের জন কয়েক ভদ্রশ্রেণীর লোক বলিলেন, "আপনি যে নীচ ব্যক্তির ছোঁয়া খাবার খেলেন, এটা কি ভাল হল ?" তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা তো এতগুলি লোক আমাকে তিন দিন ধরে বকালে, কিন্তু আমি কিছু খেলাম কিনা, তার কি খোঁজ নিয়েছিলে ? অথচ নিজেরা ভদ্র আর এ ব্যক্তি ছোটলোক বলে বড়াই করছ ? ও যে মনুষ্যত্ব দেখিয়েছে, তাতে ও নীচ হলো কি করে ?" খেতড়ী-রাজের সহিত পরিচয়ের পর স্বামীজী এই ঘটনাটি রাজাকে শুনাইলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে তো ভীত-কম্পিত-কলেবরে রাজসকাশে উপস্থিত হইল—মনে আশঙ্কা জাগিল, না জানি আজ কপালে কি শাস্তি আছে। কিন্তু রাজা তাহার সাধুবাদ করিলেন এবং রাজকৃপায় সেদিন হইতে তাহার দারিদ্র্য দূর হইল।[৭]

পরিব্রাজক জীবনের কথা তিনি বড় একটা কিছু বলিতেন না, কেবল কথাপ্রসঙ্গে দুই-একটি ঘটনা বাহির হইয়া পড়িত। একবার তিনি এক শিষ্যের সাক্ষাতে অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন, "ওঃ কি কষ্টের মধ্য দিয়েই না দিন গিয়েছে! একবার উপর্যুপরি তিন দিন খেতে না পেয়ে রাস্তার উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম ; যখন জ্ঞান হল, দেখলাম, সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে। জলে ভিজে শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হয়েছিল। তখন উঠে আস্তে আস্তে আবার পথ হাঁটি ও এক আশ্রমে পৌঁছে কিছু মুখে দিই, তবে প্রাণ বাঁচে।

৭। বাঙ্গলা জীবনীর মতে (পৃঃ ৩৪৫) ঘটনাটি রেলস্টেশনে এবং ইংরেজী জীবনীর মতে (পৃঃ ২৬০) খেতড়ীতে ঘটে। খেতড়ী শহরে ঘটা কিন্তু অসম্ভব, কারণ স্বামীজী সেখানে সুপরিচিত ছিলেন এবং রাজবাটীতে থাকিতেন। খেতড়ী রাজ্যে কোন রেলস্টেশন ছিল না ; অতএব রাজ্যমধ্যে ঘটাও কঠিন। ইংরেজী জীবনীতে অবশ্য রেলস্টেশনের উল্লেখ নাই—শুধু বলা হইয়াছে "খেতড়ী"। আমাদের মনে হয়, আবু যাইবার পথে, অর্থাৎ খেতড়ীর রাজার সহিত সাক্ষাতের পূর্বে পথে কোথাও ঐরূপ ঘটিয়াছিল, আর ঐ মুচি খেতড়ীর প্রজা হইলেও কর্মব্যপদেশে দূরে কোন স্টেশনের কাছে বাস করিতেছিল।

পশ্চিম ভারতে

স্বামীজীর পর্যটনস্পৃহা তখনও পূর্ণবলবতী—তিনি পুণ্যভূমি ভারতকে নিবিড়তররূপে চিনিবেন, মহামায়ার কায়ারূপ জন্মভূমির বৈচিত্র্যময় বিপুলতার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে মিশাইয়া দিবেন সমস্ত দাবি-দাওয়া নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া—তবে যদি তাঁহার উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি প্রসারিত হয়, তবে যদি পথের সন্ধান মিলে। ক্রমে তিনি গুজরাটের প্রধান নগর আহমেদাবাদে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দিন কয়েক যদৃচ্ছাবস্থান ও আকাশবৃত্তি অবলম্বনে উদরপালনের পর তিনি শ্রীযুক্ত লালশঙ্কর উমীয়াশঙ্কর নামক একজন সাব-জজের গৃহে আশ্রয় পাইলেন। আহমেদাবাদ ইতিহাসবিশ্রুত স্থান। অতীতে উহার নাম ছিল কর্ণাবতী; পরে উহা গুজরাটের মুসলমান সুলতানদের রাজধানীর মর্যাদা পায়। একসময়ে ইহা ভারতের অন্যতম সুরম্য বৃহৎ মহানগর ছিল। টমাস রো ইহাকে লণ্ডনের ন্যায় বিশাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। জৈনদিগের অভ্যুদয়কালে ইহা কয়েকটি সুন্দর জৈনমন্দির এবং মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কয়েকটি মনোহর মসজিদ ও সমাধিসৌধে সুশোভিত হয়। স্বামীজী নগরের মধ্যবর্তী ও পার্শ্ববর্তী স্থানে ঐ কীর্তিনিদর্শনগুলি দর্শন করিলেন। এখানে জৈনপণ্ডিতদিগের সহিত আলোচনার সুযোগ পাইয়া তিনি ঐ বিষয়ে স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করিলেন। এই প্রকারে দিনকয়েক আনন্দে কাটাইয়া অতঃপর কাটিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত ওয়াডোয়ান নামক স্থানে উপনীত হইলেন। সেখানে রণিক-দেবীর মন্দির দর্শনান্তে লিমড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

লিমড়ী-রাজ্য তুলার জন্য প্রসিদ্ধ। রাজ্যের রাজধানীরও নাম লিমড়ী, এবং তখনকার দিনের রাজার নাম ছিল ঠাকুরসাহেব বেহেমিয়াচাঁদ লিমড়ী। নগর পর্যন্ত পথ তিনি পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছিলেন। দিবসে পথ চলিয়া তিনি অযাচিত ভিক্ষান্নে উদরপূরণ করিতেন এবং সন্ধ্যাসমাগমে যত্রতত্র আশ্রয় লইতেন। লিমড়ী শহরে পৌছিয়া অনুসন্ধানক্রমে জানিতে পারিলেন, নিকটেই সাধুদের এক আশ্রম আছে, সেখানে আশ্রয় ও আহার দুইই সুপ্রাপ্য। সাধুদিগের নিকট আসিবামাত্র তাঁহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণপূর্বক তাঁহার বাসের জন্য একটি নির্জন আলয় দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তিনি যতদিন খুশি সেখানে

থাকিতে পারেন। স্বামীজী তখন পথশ্রান্ত এবং ক্ষুধাপ্রপীড়িত; সুতরাং স্থানটি যে কিরূপ তাহা বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিলেন না, আর সাধুদের আশ্রম সম্বন্ধে সহসা কাহারও মনে সন্দেহ জাগিবেই বা কেন? অতএব তিনি উপস্থিত সমস্যার সমাধানকল্পে সেখানেই আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দুই-একদিন পরেই ঐ সাধুদের যে পরিচয় পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন, ঐ ধর্ম-ধ্বজীরা অতি জঘন্য সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করে—ধর্মের নামে কুৎসিত কার্যানুষ্ঠানই তাহাদের নিত্যক্রিয়া। পার্শ্বের গৃহে তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ ও বামাকণ্ঠের শব্দ শুনিয়া সহজেই বুঝিলেন, ইহারা ইন্দ্রিয়পূজক। দেখিয়া-শুনিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আশু সে স্থান পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু কি বিপদ! পলায়নের জন্য দ্বার খুলিতে গিয়া দেখেন দ্বার বাহির হইতে অর্গল-বদ্ধ এবং সেই আড্ডাধারী ভণ্ড সাধুরা তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিতেছে। ফল কথা, তিনি তখন তাহাদের হস্তে বন্দী। অজ্ঞাত পরিবেশমধ্যে এইরূপ হীন ব্যক্তিদের কবলিত হইয়া তিনি যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য, অধিকন্তু তিনি যখন তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেন তখন তাঁহার ন্যায় নির্ভীক বীরের হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিল। ঐ ব্যভিচারী দুর্বৃত্তদের নেতা তাঁহাকে জানাইল, "তুমি একজন অতি উঁচুদরের সাধু বলে মনে হচ্ছে; আর তোমার তেজোময় শরীর দেখে বোধ হয় তুমি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালন করেছ। তুমি এখন তোমার এই তপস্যার ফল আমাদের দান কর। আমরা একটা বিশেষ সাধনার অনুষ্ঠান করছি; তাতে সিদ্ধিলাভ করার জন্য তোমার মতো একজনের ব্রহ্মচর্যব্রত ভঙ্গ করা আবশ্যক। অতএব তুমি প্রস্তুত হও।" শুনিয়া স্বামীজী শিহরিয়া উঠিলেও, বুদ্ধি হারাইলেন না। তিনি শুনিয়াছিলেন বটে, এমন অনেক গুপ্তাচারী তথাকথিত সাধু আছে, যাহারা ধর্মের নামে পাপানুষ্ঠান করে, এমনকি নরহত্যা পর্যন্ত করে; কিন্তু সে অভিজ্ঞতা এমন নির্মমভাবে তাঁহারই জীবনে তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া উপলব্ধ হইবে, ইহা তো তিনি কল্পনাই করিতে পারেন নাই। তথাপি বিপদকালে বিমূঢ় হইলে চলিবে না, পরিত্রাণের উপায় অবশ্যই বাহির করিতে হইবে। তাই বাহিরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া তিনি তাহাদেরই পরিচালনায় পুনঃ সেই বন্দীশালায় প্রবেশ করিলেন এবং একান্তমনে ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে লাগিলেন।

এখানে আসিয়া অবধি একটি বালকের সহিত স্বামীজীর খুব ভাব জন্মিয়াছিল।

সে নিত্য তাঁহার নিকট আসিত এবং গল্পগুজব করিত। আড্ডার লোকেরা বালকটিকে সন্দেহ করিত না এবং এরূপ যাতায়াতে বাধাও দিত না। পরদিন যথাকালে বালকটি সেখানে আসিলে স্বামীজী যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। তিনি বন্ধুভাবে বালকটিকে নিজের উপস্থিত বিপদের একটা বালকবুদ্ধিগম্য মোটামুটি ধারণা দিলে, সে অতি মৃদুস্বরে জানিতে চাহিল, সে কিছু করিতে পারে কিনা। স্বামীজী বলিলেন, "হাঁ হাঁ, তোমার দ্বারাই আমার উদ্ধার হবে।" তিনি একখানি খোলামকুচিতে কাঠের কয়লাদ্বারা ইংরেজীতে নিজের সমূহ বিপদের পরিচয়দানকল্পে দুই-চারি কথা লিখিয়া উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাহিলেন এবং উহা বালকটিকে দিয়া লিমড়ী-রাজের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন। বালকটি উহা কাপড়ে ঢাকিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিতে ছুটিতে লিমড়ী-রাজ ঠাকুরসাহেব যেহেমিয়াচাঁদের নিকট উপস্থিত হইল এবং খোলামকুচি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে যতটুকু শুনিয়াছিল তাহাও বলিল। ঠাকুরসাহেব কালবিলম্ব না করিয়া কয়েকজন দেহরক্ষীকে স্বামীজীর উদ্ধারের জন্য পাঠাইলেন এবং আড্ডার চারিদিকে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এই উপায়ে স্বামীজী অচিরে রাজপ্রাসাদে আসিয়া স্বীয় দুঃখকাহিনী ঠাকুরসাহেবের কর্ণগোচর করিলেন। তখন রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া এই ভণ্ডদের সমূহ শাস্তিবিধান করিলেন। অতঃপর রাজার অনুরোধে স্বামীজী রাজগৃহেই থাকিয়া গেলেন, এবং রাজা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, ভবিষ্যতে বাসস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে তিনি যেন আরও সতর্ক হইয়া চলেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজী নিজেও এই প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন।

লিমড়ীতে অবস্থানকালে তিনি বহু পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতভাষায় আলোচনা করিয়াছিলেন। পুরীর গোবর্ধন মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করাচার্য এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

লিমড়ীতে দিনকয়েক কাটাইয়া স্বামীজী লিমড়ী হইতে নাগড় যাত্রা করিলেন, এবং ঠাকুরসাহেব তাঁহার বিভিন্ন স্থানের বন্ধুদের নামে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন। এই সকল পরিচয়পত্রের সাহায্যে তিনি জুনাগড়ের পথে ভাবনগর ও সিহোর দেখিয়া লইলেন। জুনাগড়ে উপস্থিত হইয়া তিনি ঐ রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস মহাশয়ের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। স্বামীজীর আলাপ-ব্যবহারে দেওয়ানজী এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রত্যহ

অপরাহ্ণে রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত স্বামীজীর সঙ্গে বসিয়া দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। স্বামীজীও ইঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে এইপ্রকারে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল তাহা জীবনব্যাপী অব্যাহত ছিল। আমেরিকা হইতেও স্বামীজী তাঁহাকে নিয়মিতভাবে নানা তথ্যপূর্ণ পত্র লিখিতেন। জুনাগড়ের এই সকল আলোচনাসভায় কথাপ্রসঙ্গে ধর্মের সহিত নানা সাংস্কৃতিক বিষয়ও আসিয়া পড়িত। একদিন তিনি যীশুখৃষ্টের কাহিনী বলিতে বলিতে বহির্জগতে ভারতের অবদানের কথায় আসিয়া পড়িলেন। দেশপ্রেমসম্ভূত জলন্ত ভাষায় তিনি ইতিহাসস্বীকৃত তথ্য অবলম্বনে প্রমাণ করিতে লাগিলেন, ভারতীয় চিন্তাধারা কিরূপে পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রসারিত হইয়া উহার ধর্মকে রূপায়িত করিয়াছে। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াই ছিল এই আদানপ্রদানের প্রধান ক্ষেত্র। তিনি দেখাইয়া দিলেন, সনাতন ধর্ম কত প্রাচীন, কত উদার এবং কত শক্তিশালী। কত বিচিত্র সভ্যতাই না এই ভাবধারানুসরণে বিভিন্ন ভূভাগে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে! যীশুখৃষ্ট ও প্রাচীন খৃষ্টান সাধুদিগের প্রশংসা করিলেও তিনি আধুনিক পাদ্রীদিগের উপর তীব্র কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। ইহারা সন্ন্যাসী-ঈশার ত্যাগমন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছে, এদেশে আগমনান্তে ঈশার উচ্চাদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন না করিয়া ইহারা ভারতীয় কৃষ্টির নিন্দাবাদে শতমুখ হইয়া উঠে। তিনি দেখাইয়া দিলেন, ভারতীয় অধ্যাত্মধারা এতই প্রবল যে, এই যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হয়। স্বীয় গুরুদেবের অত্যাশ্চর্য অনুভূতির কথা শুনাইয়া এবং তাঁহার বচনামৃতের সহিত তাঁহার স্বীয় জীবনের ও হিন্দু-চিন্তাধারার কিরূপ সামঞ্জস্য ছিল তাহা দেখাইয়া দিয়া তিনি সকলকে স্বধর্মে পূর্ণ শ্রদ্ধাবান হইতে বলিলেন। ভারতের সুদূর পশ্চিমভাগে এইরূপে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম বার্তাবহ হইয়াছিলেন। দেওয়ান অফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সি. এইচ. পাণ্ড্য মহাশয় এইকালের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "জুনাগড়ে আমরা সকলেই স্বামীজীর অকপটভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, বিবিধ শিল্প-বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান, উদার মতসমূহ, ধর্মপ্রাণতা, প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতা এবং অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সকল গুণ ব্যতীত তাঁহার সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা, এবং বহুবিধ ভারতীয় কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল। এমনকি তিনি রন্ধনাদি কার্যেও সুপটু ছিলেন এবং অতি উত্তম

রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। আমরা সকলেই তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

বস্তুতঃ জুনাগড়ে তখন স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের এমন এক অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, যাহা মনে হয় আদর্শের দিক হইতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ। অবশ্য তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ইহা অপেক্ষাও বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। তবু আমাদের বোধ হয় জুনাগড়ে যেন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা কার্যকরী পূর্ণ বিকাশের পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিল। বরাহনগরে তাঁহাকে পাইয়াছিলাম অধ্যয়নাদিনিরত এবং তপস্যাপরায়ণ নেতারূপে। হিমালয়ে তাঁহাকে দেখিয়াছি আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে। আলোয়াড়ে তাঁহার গুরুভাব সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। খেতড়ীতে তিনি ধর্মজীবনের সহিত পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনে তৎপর। জুনাগড়ে সেই সমস্ত তো আছেই, তদুপরি তাঁহাকে আমরা পাই ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের অগ্রদূতরূপে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের আদান-প্রদানের ইতিহাস উদঘাটিত করিয়া কৃষ্টির বিজয়াভিযানের কাহিনী শুনাইয়া তিনি এখন শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন, গুরুদেবের জাজ্বল্যমান জীবনকাহিনী শুনাইয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিদ্যার চিরনবীনত্ব ও অমরত্ব প্রমাণ করেন, স্বয়ং অশেষগুণে ভূষিত থাকিয়াও স্বীয় নিষ্কিঞ্চনতা প্রদর্শনে ভারতীয় ত্যাগমন্ত্রের মহিমা খ্যাপন করেন এবং সর্বদা সকলকে উচ্চাদর্শে প্রণোদিত করিয়াও প্রতিদানে কিছুরই আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সেবাধর্মের আদর্শ স্থাপন করেন। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, অন্যান্য স্থলের ন্যায় জুনাগড়েও তাঁহার গুণগ্রাহীর সংখ্যা ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল এবং এখানে প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত এবং নবীনপন্থী শিক্ষিত সমাজের সকলেই তাঁহার উদার ধর্মভাব, গভীর দেশপ্রেম, অগাধ পাণ্ডিত্য, তেজোময় ভাবপ্রকাশ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়া জীবনে একটা নূতন অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাফল্য সহজেই করতলগত হইলেও তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—সুদূরের আহ্বান আবার তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া চলিল।[১]

সুবিখ্যাত গীর্ণার পর্বত জুনাগড় শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন—সর্বসম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্মৃতি,

১। স্বামী অভেদানন্দের মতে জুনাগড়ে স্বামীজী সচ্চিদানন্দ নামে আত্মপরিচয় দিতেন। সেখানে এককালে তিনি নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর গৃহে বাস করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের সহিত সেখানেই তাঁহার মিলন হয় (এই অধ্যায়ের ৭ম পাদটীকা দ্রঃ)।

ও কীর্তি বা ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া সকলেরই নিকট আকর্ষণীয় হইয়া আছে। এখানে স্থানে স্থানে অনেকগুলি সুন্দর মন্দির, মসজিদ ও সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুকীর্তির স্মারকরূপে "খাপড়া-খোদিয়া" নামে কতকগুলি গুহা এখনও বিদ্যমান। সাম্প্রদায়িক উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি বিভিন্ন যুগে বিবিধ সম্প্রদায়ের মঠরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বামীজী এই সবই সাগ্রহে দর্শন করিলেন। তিনি পর্বতশৃঙ্গেও আরোহণ করিলেন। ঐ পথের আশে পাশে বহু মন্দির দেখা যায়; যে শিলাখণ্ডে সম্রাট অশোক তাঁহার চতুর্দশটি অনুশাসন ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়। ভবনাথ নামে খ্যাত শিবের মন্দিরে সর্বদা বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। পথটি উপরে উঠিয়া খুবই সঙ্কীর্ণ হইয়াছে এবং কখনও কখনও বা দূরতিক্রমণীয় দণ্ডায়মান শিলাখণ্ডের পার্শ্বভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। ১৫০০ ফুট উপরে "ভৈরো ঝাম্পা" (বা ভীষণ লম্ফ) নামে এমন একটি স্থান আছে, যেখান হইতে লম্ফপ্রদানপূর্বক অনেকে সহস্র ফুট নিম্নে পতিত হইয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। আরও উর্ধ্বে, ২৩৭০ ফুট উপরে একটি দুর্গপ্রায় প্রাচীরবেষ্টিত দুর্ভেদ্য স্থানে ১৬টি জৈন মন্দির দেখা যায়। এখানে আসিয়া স্বামীজী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন এবং মন্দির-গুলির অপূর্ব ভাস্কর্য ও তীর্থঙ্করদের মণিরত্নবিভূষিত মূর্তিগুলি নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর আরও উর্ধ্বে, ৩৩৩০ ফুট উচ্চে পর্বতশীর্ষে আরোহণ করিয়া ঐ অঞ্চলের দূর দূরান্তরের মন্দিরাদি-সুশোভিত পুণ্যক্ষেত্রগুলি দেখিয়া তৃপ্তিবোধ করিলেন। তিনি এই শিখর হইতে অবতরণপূর্বক শিখরান্তরে আরোহণ করিয়া অবধূত দত্তাত্রেয়ের পদচিহ্ন দর্শন করিলেন। ঐ শিখর হইতে নিম্নে বহুদূরবিস্তৃত শৈলমালা দেখিতে পাওয়া যায়। অদূরে ৪ অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট অথবা লোকবিশ্বাসানুযায়ী ব্রহ্মার কমণ্ডলুর আকারযুক্ত একটি হ্রদও দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর গীর্ণার স্বামীজীর নিকট তপস্যার উপযুক্ত মনোরম স্থান বলিয়াই প্রতীত হইল। তিনি ঐজন্য একটি নির্জন গুহাও আবিষ্কার করিলেন এবং কিয়দ্দিবস তথায় ধ্যানধারণাদিতে অতিবাহিত করিয়া পুনর্বার জুনাগড়ের বন্ধুবর্গসমীপে উপস্থিত হইলেন। শীঘ্রই তাঁহাদের নিকট আবার বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং ভুজরাজ্যের উচ্চ কর্মচারীদের নামে জুনাগড়ের দেওয়ানজীর প্রদত্ত পরিচয়পত্র লইয়া তিনি ভুজরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্বামীজীর জীবনীকারগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, সন্ন্যাসজীবনের যে সর্বজনবিদিত

ধারণা আছে, তাহার সহিত এই পরিচয়পত্র ব্যবহারের সামঞ্জস্য পাওয়া কঠিন। সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পদ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন, ঈশ্বরমুখাপেক্ষী সন্ন্যাসীর আবার পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয় কেন? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? স্বামীজী বলিয়াছিলেন, তাঁহার মতো আর একজন থাকিলে তাঁহাকে বুঝিতে পারিত। আমরা তো কোন ছার! শাস্ত্রেও এই জাতীয় ব্যবহারের কূলকিনারা না করিতে পারিয়া বলা হইয়াছে, "নানারূপধরকৌলা বিচরন্তি মহীতলে", বলা হইয়াছে, যাঁহারা অত্যাশ্রমী তাঁহারা কোন বাঁধাধরা নিয়মের অধীন নহেন, তাঁহারা দিব্যভাবে আরূঢ় থাকিয়া ভগবদিচ্ছায় পরিচালিত হন, ইত্যাদি। মানবীয় বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, জুনাগড় ত্যাগের প্রাক্‌কালেও স্বামীজী নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, এমনকি জীবন সম্বন্ধে চিন্তাবিহীন ছিলেন। নতুবা দেওয়ানজীর বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল, অরণ্যপরিবৃত গীর্ণার পর্বতের নির্জন গুহায় একাধিক দিন ব্যয়িত হইবে কেন? তাঁহার পরিব্রাজকজীবনের প্রায় সবটাই কি এইরূপ চিন্তাভাবনাহীন ও বিপদসমাকুল নহে? আমরা আরও লক্ষ্য করিয়াছি যে, লিমড়ীর সেই ভয়াবহ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার পর লিমড়ী-রাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরিচয়পত্র প্রদানপূর্বক ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কে জানে জুনাগড়ের দেওয়ানজীও সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া অযাচিত ভাবেই পরিচয়পত্র লিখিয়াছিলেন কিনা? আর স্বামীজীর পরবর্তী জীবনের আলোকে যদি পূর্ববর্তী জীবন অধ্যয়নের সার্থকতা থাকে—আর সার্থকতা নাই, একথাও বলা চলে না, কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি, ইতিমধ্যে স্বামীজীর জীবনধারা ভাবী কার্যের অনুরূপে গড়িয়া উঠিতেছিল—যদি তাহা সত্য হয়, তবে ভারতের অভিজাত ও ধনীসমাজের সহিত পরিচিত হওয়াও তাঁহার জীবনে আবশ্যক ছিল, কেন না তাঁহার জীবন ছিল সকলেরই জন্য। সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে নূতন সংঘর্ষ রচনা না করিয়া পুরাতন বিবাদগুলির ভঞ্জন করাই ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত। ধনীদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের মনে উচ্চভাব ও সেবার আগ্রহ জাগাইতে পারিলে তাহা যে একটা খুবই মূল্যবান কার্য হয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? পরবর্তী কালে স্বামীজী স্বয়ং বলিয়াছিলেন, ঐকালে ঐ উদ্দেশ্যও তাঁহার মনোরাজ্যে সক্রিয় ছিল। তিনি পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলেন কিনা, সে ভিন্ন কথা। তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহাদের হস্তে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য এবং সহস্রব্যক্তির

শাসনদণ্ড রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে আমি যদি নিজভাবে ভাবিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবনব্রত আরও দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হইবে। একজন মাত্র মহারাজকে স্বমতে আনিতে পারিলে আমি সহস্র ব্যক্তির উপকার করিতে পারি।”

ভুজে পৌঁছিয়া স্বামীজী রাজ্যের দেওয়ানজীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। দেওয়ানজী তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতি দুরূহ বিষয়গুলি সাধারণের অধিগম্যরূপে সহজ ভাষায় ব্যক্ত করার ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। দীর্ঘকাল পরেও এই সকল কথা দেওয়ানজীর স্মরণ ছিল এবং তিনি স্বামীজীর জনৈক শিষ্যকে আবেগভরে এইসব শুনাইয়াছিলেন। জুনাগড়ে যেমন, এখানেও তেমনি দেওয়ানজীর গৃহে স্বামীজীকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা-সভা বসিত ; ধর্মপ্রসঙ্গের সহিত শিল্প, কৃষি, আর্থনীতিক সমস্যা প্রভৃতির কথাও আসিয়া পড়িত এবং স্বামীজী সকলকে বুঝাইয়া দিতেন, এইসব দিকেও ভারতের উন্নতির প্রয়োজন আছে এবং উহার উপায়ও ভারতের ক্ষমতাতীত নহে। গুণগ্রাহী দেওয়ানজী কচ্ছের মহারাজের সহিত স্বামীজীর আলাপ করাইয়া দিলেন এবং মহারাজও দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার ফলে বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

কচ্ছের রাজধানী ভুজ হইতে ফিরিয়া স্বামীজী পুনর্বার জুনাগড়ে উপস্থিত হইলেন। উহাই যেন তখন তাঁহার কাথিয়াওয়ার ভ্রমণের প্রধান কেন্দ্র। এই-বারে জুনাগড়ে ফিরিয়া তিনি কিছুদিন সেখানেই কাটাইলেন এবং পরে বিলা-ওয়াল (**Verawal**) এবং সোমনাথপত্তন বা পাটন সোমনাথে গমন করিলেন। পাটন সোমনাথই পুরাণপ্রথিত প্রভাস-তীর্থ। সোমনাথ-মন্দির তিন বার বিধর্মীর হস্তে বিধ্বস্ত এবং ভক্তদের দ্বারা পুনর্নির্মিত হয়। এককালে মন্দিরের বিপুল ঐশ্বর্য ছিল ; কথিত আছে, দশসহস্র গ্রাম দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে মন্দিরের ব্যয়নির্বাহার্থ নির্দিষ্ট ছিল, এবং তিনশত গায়ক উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এই প্রভাসেই গৃহযুদ্ধের ফলে যদুবংশ ধ্বংস হয় ও দৈবনির্দেশানুযায়ী এই ভাগ্য-পরিবর্তনের পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যাধের তীরবিদ্ধ হইয়া যোগমার্গে দেহত্যাগ করেন। স্বামীজী সোমনাথ-মন্দির দর্শনান্তে সূর্যমন্দির ও রাণী অহল্যাবাঈ-এর নির্মিত নূতন সোমনাথ-মন্দিরও দর্শন করিলেন এবং ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিলেন। প্রভাসে কচ্ছের মহারাজের সহিত তাঁহার আবার সাক্ষাৎ ও

আলাপাদি হইলে স্বামীজীর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিবিধ বিষয়ে নবীন ও সবল দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিলেন, "স্বামীজী, একসঙ্গে অনেক পুস্তক পড়িতে গেলে যেমন মস্তিষ্ক দিশেহারা হয়ে পড়ে, তেমনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার মস্তিষ্ক কূল-কিনারা হারিয়ে ফেলে। এত প্রতিভার প্রয়োগ কোথায় কি ভাবে হবে? একটা কিছু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার না ঘটিয়ে আপনি থামবেন না!"

প্রভাস হইতে অল্প কিছু দিন পরেই তিনি জুনাগড়ে ফিরিলেন এবং সেখানে দিন কয়েক বিশ্রামের পর পোরবন্দরে উপস্থিত হইলেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ এই সুদামা-পুরীতে আসিয়া তিনি সুদামা-মন্দির দর্শন করিলেন। রাজ্যের রাজা তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, কাজেই দেওয়ান শ্রীযুক্ত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয় রাজ্যপরিচালনা করিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'র মতে (পৃঃ ৮১) "স্বামীজী এখানে শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। তিনি পোরবন্দরের (সুদামাপুরীর) শাসনকর্তা ছিলেন। স্বামীজী বলিতেন, তাঁহার ন্যায় বেদের পণ্ডিত ভারতে দেখেন নাই। অথর্ববেদের ভাষ্য সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় ইনি নিজে ভাষ্য প্রকাশিত করেন। স্বামীজী ইঁহার সহিত সংস্কৃতে কথা কহিতে অভ্যাস করিয়া অল্পদিনেই পরিপক্ক হন।" দেওয়ানজী তখন বেদের অনুবাদে নিযুক্ত। তিনি স্বামীজীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া ঐ কার্যে তাঁহার সাহায্য লইতে লাগিলেন এবং এই কার্যেরই সহায়তাকল্পে বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে কয়েক মাস[২] স্বগৃহে ধরিয়া রাখিলেন। স্বামীজীও বেদের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হেতু স্বতঃই ঐ কার্যে আকৃষ্ট হইলেন। এতদ্ব্যতীত এখানে পাণিনির পাতঞ্জল-ভাষ্য সমাপ্ত করার বিশেষ সুযোগও তিনি পাইলেন। অধিকন্তু পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয়ের পরামর্শে তিনি ফরাসী-ভাষাও অনেকটা আয়ত্ত করিলেন। স্বামীজীর মেধা, উদারতা ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাইয়া পাণ্ডুরঙ্গজী বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয়, আপনি এদেশে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। আপনার বরং পশ্চিম দেশে যাওয়া উচিত, সেখানকার লোকেরা

২। ইংরেজী জীবনীর মতে এগার মাস (২২৬ পৃঃ)। কিন্তু স্বামীজী খেতড়ী ছাড়েন ২৮শে অক্টোবর, ১৮৯১। তিনি বরোদায় ছিলেন ২৬শে এপ্রিল, ১৮৯২, পুনাতে ছিলেন ১৫ই জুন, ১৮৯২। অতএব এগার মাসের হিসাব মিলানো কঠিন। এগার সপ্তাহ হওয়া বরং অধিকতর সম্ভব। তবে স্বামীজী পোরবন্দরে একাধিক বার আসিয়াছিলেন। প্রথম আগমন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত কালগণনা করিলে ঐ সময়টি এগার সপ্তাহ অপেক্ষা দীর্ঘতর হইতে পারে।

আপনার ভাবরাশির ও আপনার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে পারবে। সনাতন ধর্ম প্রচার করে আপনি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির যাত্রাপথে প্রচুর আলোক সম্পাত করতে পারবেন।" কথাগুলি শুনিয়া স্বামীজী আহ্লাদিত হইলেন, কারণ তাঁহার নিজের মনেও ঐরূপ পরিকল্পনার ফুট উঠিতেছিল এবং এই অস্ফুট ইচ্ছার আভাস তিনি ইতিপুর্বে জুনাগড়ের পাণ্ড্য মহোদয়ের নিকটও দিয়াছিলেন।

এইকালে তিনি এক অদ্ভুত রকমের অন্তশ্চাঞ্চল্য অনুভব করিতেন—মনে হইত, শ্রীরামকৃষ্ণ একদা যে কথা বলিয়াছিলেন, নরেনের ভিতর এমন শক্তি আছে, যাহার বলে সে জগৎটাকে উলট পালট করিয়া দিতে পারে, তাহা প্রকৃতই সত্য। তিনি ভারতের যত জায়গায় ভ্রমণ করিয়াছেন, যত রাজ-দরবারে বা বিদগ্ধসমাজে আপনার বক্তব্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন, সর্বত্রই লোকের মধ্যে এরূপ অনুভূতি জাগিয়াছে যে, এই মহাশক্তিধর মহাপ্রাণ পুরুষ স্বদেশের মঙ্গলার্থ কোনও একস্থানে কোনও এক বিশেষ কর্মসম্পাদনের জন্য ভগবানের দ্বারা মনোনীত হইয়াছেন। আধ্যাত্মিক পুনরভ্যুত্থানের কথাই তখন তাঁহার চিন্তায় প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করিত। তিনি গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণতা ও সংস্কারপ্রবণতার ভ্রমপ্রমাদ উভয়ই দেখিয়াছিলেন; আর দেখিয়া-ছিলেন এক সর্বসাধারণ নীচ ঈর্ষাপরায়ণতা, বিবাদ-বিচ্ছেদ এবং উদ্দেশ্যের একতানতার অভাব যাহা পরাধীন জাতির জীবনে প্রবলাকার ধারণ করে। ভারত স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তিবলে এবং সনাতন ধর্ম ও আর্যসংস্কৃতির প্রভাবে অভূতপুর্ব মান ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারে; অথচ যে সকল তথাকথিত নেতা ও মুষ্টিমেয় ভ্রান্ত সমাজ-সংস্কারক—নিজজীবনে নিজেরই উপদেশাবলী প্রতিপালনে বিমুখ হইয়া বৃথা বাগাড়ম্বরে দিনাতিপাত করেন ও পাশ্চাত্ত্যের গৌরবরশ্মিতে চক্ষু ঝলসিত হওয়ায় হিতাহিত বিবেচনাশূন্যচিত্তে স্বদেশের উত্তম রীতিনীতি কৃষ্টি ধর্ম প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ পরানুকরণ, পরানুবাদ ও পরমুখাপেক্ষায় জীবনযাপন করেন, তাঁহাদের কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য পরিচালনাধীনে সর্বস্ব হারাইয়া সেই ভারত আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া স্বামীজীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি তাঁহাদের স্পষ্টই বলিতেন, অবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। রাজা, মহারাজা ও বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকর্তাকে তিনি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত শুনাইতেন এবং তাঁহার মেধা ধর্মানুভূতি, ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের

পরিচয় পাইয়া তাঁহারাও শ্রদ্ধাসহকারে তাহা শুনিতেন। কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন, এই নববাণীকে রূপপ্রদানের জন্য তখনও কেহ অগ্রসর হইতেছে না—কোথায় যেন কি একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইতেছে না। ইহাই ছিল স্বামীজীর ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তার কারণ। ইহার পর পথ কোন দিকে ? স্বামীজীর চিন্তা এই সমস্যার সমাধানেই ব্যাপৃত রহিল।

স্বামীজী যখন পোরবন্দরে ছিলেন, তখন একটি মজার ঘটনা ঘটিল। স্বামী ত্রিগুণাতীত (সারদা) তখন পদব্রজে তীর্থদর্শন করিতে করিতে পোরবন্দরে আসিয়া অপর কয়েকজন সহযাত্রীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। সহযাত্রী সাধুদের ইচ্ছা ছিল, তাঁহারা মরুতীর্থ হিংলাজ যাইবেন। স্থানটি বহু দূরে ; পদব্রজে পথাতিক্রম অসম্ভব না হইলেও সময়সাপেক্ষ ও অতীব কষ্টসাধ্য। অতএব করাচী পর্যন্ত জাহাজে যাইয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরুভূমি অতিক্রম বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এত অর্থ কোথায় ? সকলে চিন্তামগ্ন আছেন, এমন সময় একজন সাধু বলিলেন, "দেওয়ানজীর ভবনে এক বিদ্বান পরমহংস আছেন ; তিনি অনর্গল ইংরেজী বলেন আর পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদৃত। সেই মহাত্মা হয়তো আমাদের জন্য দেওয়ানজীকে বলে অর্থের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।" তদনুযায়ী ক্ষুদ্র এক সাধুমণ্ডলীর পুরোভাগে স্বামী ত্রিগুণাতীত রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বামীজী তখন প্রাসাদের উপরের বারান্দায় পাদচারণ করিতেছিলেন ; তাই দূর হইতেই সাধুমণ্ডলীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ দলমধ্যে তিনি গুরুভ্রাতা ত্রিগুণাতীতকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেও অত্যন্ত উদাসীনের ন্যায় নিম্নে অবতরণপূর্বক স্বকক্ষে বসিয়া সাধুদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বারদেশে নিযুক্ত প্রহরীরা তাঁহাদিগকে প্রথমে ঢুকিতে দেয় নাই। অবশেষে পরমহংসের দর্শনে যাইবেন ইত্যাদি বলিয়া ত্রিগুণাতীত অপর এক সাধুর সহিত প্রবেশাধিকার পাইলেন। তারপর স্বামীজীর কক্ষমধ্যে আসিয়াই গুরুভ্রাতাকে অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত স্থলে দেখিতে পাইয়া অতীব আহ্লাদিত ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এদিকে স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে জানাইলেন, এভাবে অপরে তাঁহার অনুসরণ করে ইহা তিনি পছন্দ করেন না। ত্রিগুণাতীত তখন বুঝাইয়া দিলেন, স্বামীজীর পোরবন্দরে অবস্থানের কথা তিনি বিন্দুমাত্র জানিতেন না ; হিংলাজ দর্শনার্থ সঙ্গীসাধুদের

অনুরোধে অর্থভিক্ষা করিতে আসিয়া দৈবক্রমে মিলন ঘটিয়াছে মাত্র। অতঃপর স্বামীজী তাঁহাদের প্রার্থনাপুরণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতকে সাবধান করিয়া দিলেন, তিনি যেন আর কখনও তাঁহার পশ্চাতে না ফিরেন।

স্বামীজী স্বকার্যসাধনের জন্য গুরুভ্রাতাদের প্রতি সময়বিশেষে বাহ্যিক রূঢ়তা দেখাইলেও তাঁহাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সর্বদা প্রবল ছিল। তাই প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা ও অর্থব্যবস্থার পর তিনি ত্রিগুণাতীতের সঙ্গী সাধুটিকে বিদায় দিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত ত্রিগুণাতীতের সহিত বহু আলাপ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ঠাকুর যে বলতেন, এর ভেতর সব শক্তি আছে ; ইচ্ছা করলে এ জগৎ মাতাতে পারে, একথা এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।" ত্রিগুণাতীতকে তিনি আরও বুঝাইয়া দিলেন, ভিক্ষা না করিয়া তাঁহার মতো অপরিগ্রহ হওয়া উচিত। স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া ত্রিগুণাতীত স্বীয় আশ্রয়স্থল হাটকেশ্বর-মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে তিনি অন্যত্র গমনার্থ পুঁটলি-পাঁটলা বাঁধিতেছেন, এমন সময় স্বামীজী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে স্বীয় বাসস্থানে লইয়া গেলেন ; ত্রিগুণাতীতের পুঁটলিটি তিনি নিজেই বহন করিয়া চলিলেন। তথায় তাঁহাকে দুই দিন রাখিয়া বিদায়কালে বলিয়া দিলেন, "আমি যে এখানে রয়েছি, তা মঠে, বিশেষতঃ অখণ্ডানন্দকে কিছুতেই জানাবি না।"

পোরবন্দরে আরও কিছুদিন কাটাইয়া স্বামীজী অবশেষে বন্ধুবৃন্দের নিকট বিদায় লইলেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকায় উপনীত হইলেন। প্রাচীন কীর্তির কিছুই বর্তমান দ্বারকাক্ষেত্রে দেখা যায় না—ভগবানের প্রাসাদাদি-বিমণ্ডিত সে পৌরাণিক পবিত্র নগরের সেই অংশ আজ অতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট স্বামীজীর নয়নদ্বয় সেই গৌরবরাশির উপর ক্রীড়মান গর্জনশীল তরঙ্গোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, আর মন ভাবিতে লাগিল, ভারতের লুপ্ত অত্যুজ্জ্বল গৌরব কি পুনরুজ্জীবিত হইবে না? পরিশেষে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আসন পরিত্যাগপূর্বক তিনি শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সারদা-মঠের দিকে মন্থরপাদবিক্ষেপে চিন্তাকুলচিত্তে চলিলেন। মঠের মোহান্ত তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তথায় প্রাচীন যাদবদিগের অধ্যুষিত মহানগরীর অবশিষ্ট একাংশে অবস্থিত এই মঠের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া স্বামীজী একান্ত-

মনে ভাবী ভারতের পুনরভ্যুত্থান ও উহার সমুজ্জ্বল চিত্রের কথাই ভাবিতে লাগিলেন এবং মানসনেত্রে তাহাই দেখিতে থাকিলেন।

স্বামীজীর গুজরাট ও কচ্ছে ভ্রমণের পূর্ণ বিবরণ আমরা অবগত নহি ; উহা ভবিষ্যতে কখনও আবিষ্কৃত হইবে কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তবে বর্তমানে ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় রচিত তাঁহার প্রামাণিক দুইখানি জীবন-চরিতে যেসকল কথা লিপিবদ্ধ আছে, স্বামী অখণ্ডানন্দ-প্রদত্ত বিবরণে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দুই-চারিটি ঘটনা জানিতে পারা যায়। এই 'স্মৃতি কথা'য় প্রদত্ত ভ্রমণ-পঞ্জিকার সহিত পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সকলস্থলে মিল নাই।[৩] স্বামী অখণ্ডানন্দের মতে গুজরাটে আগমনের পথে স্বামীজী বিয়াওয়ারে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে আজমীঢ়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন (৬৬ পৃঃ)। স্বামীজীর অন্বেষণে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণান্তে স্বামী অখণ্ডানন্দ ওয়াডোয়ানে আসিয়া জানিতে পারিলেন, স্বামীজী সেখানে ছিলেন বটে, কিন্তু তখন জুনাগড়ে বাস করিতেছেন। আবার জুনাগড়ে পৌঁছিয়া তিনি খবর পাইলেন, স্বামীজী সেখান হইতে পোরবন্দর হইয়া দ্বারকাধামে গিয়াছেন ; দ্বারকা হইতে তিনি বেটদ্বারকায় যাইবেন। এই পথে বেটদ্বারকায় আসিয়া অখণ্ডানন্দ শুনিলেন, স্বামীজী পূর্বেই বিলাওয়ালে (Verawal) কচ্ছভুজের রাজার আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন ; তদনুসারে মাণ্ডবী চলিয়া গিয়াছেন। মাণ্ডবী হইতে স্বামীজী রাজকীয় গাড়ীতে রাজারই লোকজনসহ নারায়ণ সরোবরে যান ; সেখান হইতে তিনি আশাপুরী গমন করেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ এতদিন তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকিলেও সফলকাম হন নাই ; মাণ্ডবীতে আসিয়া স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হউক তাঁহার নিকট পৌঁছিতেই হইবে। অতএব সকল প্রকার কষ্ট বরণ করিয়া তিনি স্বামীজীর অন্বেষণে অতি দ্রুত

৩। স্বামী অখণ্ডানন্দের মতে কাথিয়াওয়ার-কচ্ছ-ভ্রমণের পরম্পরা এই :—জুনাগড়, বিলাওয়াল, পোরবন্দর, দ্বারকা, বেটদ্বারকা, কচ্ছভুজ, পোরবন্দর। ইংরেজী-জীবনীর মতে ক্রম এই—জুনাগড়, কচ্ছভুজ, জুনাগড়, বিলাওয়াল, প্রভাস, জুনাগড় পোরবন্দর, দ্বারকা, কচ্ছভুজ, মাণ্ডবী, পলিটানা, বরোদা। এই মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করা কঠিন। তবে স্বামীজী সত্যই দুইবার কচ্ছভুজে গিয়া থাকিলে, অখণ্ডানন্দ শুধু দ্বিতীয়বারের কথা লিখিয়াছেন, বলিতে হইবে। প্রথম মতে ভুজরাজের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয় বিলাওয়ালে, দ্বিতীয় মতে প্রভাসে। আবার কচ্ছ-ভুজের পর পোরবন্দরে আসার সহিত কচ্ছভুজ হইতে পলিটানা হইয়া বরোদায় যাওয়া ঠিক খাপ খায় না।

আশাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া কিন্তু জানিতে পারিলেন, স্বামীজী তৎপূর্বেই একশত মাইল দূরবর্তী মাণ্ডবী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। তখন কালবিলম্ব না করিয়া তিনিও সেই পথ ধরিলেন এবং অবশেষে মাণ্ডবীতে পৌঁছিয়া সংবাদ পাইলেন, স্বামীজী এক ভাটিয়া শেঠের বাটীতে আছেন। তিনি অবিলম্বে তথায় যাইয়া স্বামীজীকে দেখিতে পাইলেন। অখণ্ডানন্দ দেখিলেন স্বামীজী যেন তখন এক অপরূপ নবকলেবর প্রাপ্ত হইয়াছেন, "তিনি রূপলাবণ্যে ঘর আলো করে বসে আছেন।" স্বামীজী তাঁহাকে সানন্দে গ্রহণপূর্বক বলিলেন, "কিরে গঙ্গা, তুই এখানে কি করে এলি ?" অখণ্ডানন্দ এ যাবৎ জয়পুর হইতে মাণ্ডবী পর্যন্ত স্বামীজীর পশ্চাতে কিরূপে ধাওয়া করিয়াছেন, সবই বলিলেন। শুনিয়া স্বামীজীর খুবই আনন্দ হইল। দুইজন একত্রে ঐ বাটীতেই কিছুদিন কাটাইলেন। তবে স্বামীজীর ভয় ছিল, তিনি যদিও একাকী ভ্রমণের পক্ষপাতী, তথাপি অখণ্ডানন্দের হস্তে ত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। অখণ্ডানন্দেরও স্বামীজীর মনোভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না ; তাই কিছুদিন পরে যখন স্বামীজী স্পষ্টই তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে গঙ্গা, আমি একটা মতলব করেছি ; তোরা কেউ সঙ্গে থাকলে সেটা কার্যে পরিণত করতে পারব না", এবং নিজ কথায় জোর দিবার জন্য বলিয়া বসিলেন, "দেখ্, আমি অসৎ হয়ে গেছি ; আমার সঙ্গ ত্যাগ কর।" তখন অখণ্ডানন্দ প্রত্যুত্তর দিলেন, "হলেই বা তুমি অসৎ ! আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ? কিন্তু তোমার কাজের বিঘ্ন আমি করব না। তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম ; সে আকাঙ্ক্ষা মিটেছে। এখন তুমি একলা যেতে পার।" স্বামীজী পরদিনই মাণ্ডবী ছাড়িয়া ভুজে চলিয়া গেলেন। এদিকে অখণ্ডানন্দ নিজ প্রতিজ্ঞাপালনার্থ আরও একদিন মাণ্ডবীতে থাকিয়া সেখানে গেলেন। ইহাতে স্বামীজীর প্রত্যয় জন্মিল যে, অখণ্ডানন্দ তাঁহার স্বাধীনতায় বিঘ্ন ঘটাইবেন না। তাই দুইজনে ভুজে দুইদিন একত্রে কাটাইয়া মাণ্ডবীতে ফিরিলেন এবং এখানে একপক্ষ কাল একসঙ্গে কাটাইলেন।[৪] যথাকালে স্বামীজী পোরবন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার পাঁচ-সাত দিন পরে অখণ্ডানন্দও সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এখানেও কয়েক দিন একসঙ্গে পরমানন্দে কাটিল।

৪। বাঙ্গলা জীবনীর মতে ইঁহারা সাত-আটদিন মাণ্ডবীতে এক বৃদ্ধা শেঠীর গৃহে ছিলেন, এবং মাণ্ডবীতে আসার পথে কোটিবর নামক স্থান দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্বমুখ-কথিত বিবরণাবলম্বনে রচিত তাঁহার জীবনীগ্রন্থ 'অখণ্ডানন্দ'-এ বলা হইয়াছে (৮৩ পৃঃ), "নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীগুরুর মহাবাণী 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা' শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভগবান যদি কখনও দিন দেন, তবে আজ যাহা শুনিলাম, পণ্ডিত-মূর্খ-ধনী-দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে তাহা শুনাইব।' এই মাণ্ডবীতে স্বামীজীকে দর্শন করিয়া অখণ্ডানন্দ অনুভব করিলেন যে, সেই শুভদিন আজ সমাগত। স্বামীজীর মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক মহাশক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া অখণ্ডানন্দের মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। মাণ্ডবীতে, ভুজে ও পোরবন্দরে এইকালে স্বামীজীর সহিত তাঁহার দেশের বর্তমান দুরবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। নব-যুগধর্ম সেবাব্রতে যে বিধিনির্দিষ্ট ভূমিকা অখণ্ডানন্দকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার আভাস কি তিনি এইখানেই পাইয়াছিলেন?" এই সেবাব্রতের আভাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও আর একটা কথা পরিষ্কার প্রকাশ পায়। জুনা-গড়ে স্বামীজীর চিন্তাধারার যে পরিচয়লাভ ঘটে তাহা যেন তখনও ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের পুনরভ্যুত্থানের আকুল আগ্রহ ব্যতীত কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনার আকার ধারণ করে নাই—অধ্যাত্ম-বিকাশ ও ভাববিস্তার প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলিরই সেখানে প্রাধান্য। এই দ্বিতীয় স্তরে পোরবন্দরে কিন্তু সে চিন্তারাশি বাস্তবরূপ ধারণ করিতেছিল। এখানে শিল্পোন্নয়ন, কৃষিসমৃদ্ধি, শিক্ষাবিস্তার, দারিদ্র্যমোচন ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকরী চিন্তা ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। যাহা হউক, আমরা এখানেই স্বামী অখণ্ডানন্দের বিবৃতি শেষ করিয়া বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হইব।

কচ্ছদেশ-পরিভ্রমণকালের একটি কাহিনী স্বামীজী বলিয়াছিলেন, একসময় তিনি মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতেছেন—সূর্যদেব অনল বর্ষণ করিতেছেন, আর পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অথচ কোথাও জল বা মনুষ্যবসতির চিহ্নমাত্র নাই। এইভাবে কষ্টে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ দেখেন পুরোভাগে বৃক্ষ-গুল্ম-শস্পাচ্ছাদিত একখানি সুন্দর গ্রাম, আর তন্মধ্যে নির্মলবারি-পরিপূর্ণ জলাশয়! দুই-চারি পা যাইলেই তৃষ্ণা নিবারিত হইবে—এই আশায় যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সে মরূদ্যানও যেন ততই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, ব্যবধান আর যেন কিছুতেই হ্রাস পায় না! সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—এ যে মরু-মরীচিকা। অমনি তাঁহার মনে পড়িল বেদান্তের সিদ্ধান্ত—সমস্ত জীবনটাই তো

এইরকম প্রহেলিকার পশ্চাদ্ধাবন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কি অপূর্ব মায়ার কুহক! ইহার পরও তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে সেই কুহেলিকার পুনঃপুনঃ আবির্ভাব ঘটিয়াছিল; কিন্তু আর তিনি বিভ্রান্ত হন নাই—তখন তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি সত্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন।

কচ্ছের পর স্বামীজীর পরবর্তী দর্শনীয় স্থান ছিল পলিটানা। এখানেই জৈনদের পবিত্র স্থান শত্রুঞ্জয় পর্বত অবস্থিত। পর্বতোপরি হনুমানজীর একটি মন্দিরও বিরাজমান। এতদ্ব্যতীত হেঙ্গার নামক এক মুসলমান সাধুর সমাধিস্থানও দেখিতে পাওয়া যায়। পর্বতচূড়া হইতে চতুর্দিকের দৃশ্যাবলী বড়ই মনোরম। নিম্নে বহুদূর-প্রসারী সমতলভূমি, পূর্ববিভাগে কাম্বে উপসাগর ও উত্তরে চামর্দী-শিখর-শোভিত সিহোরের শৈলমালা। অদূরে পশ্চিম-ভারতের প্রাচীন কালের রাজধানী বল্লভীপুর, যাহার ঐশ্বর্যের তুলনায় সমসাময়িক বহু মহানগর তুচ্ছ প্রতীয়মান হইত, কিন্তু যাহার গৌরব অধুনা অতীতের স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। শত্রুঞ্জয় পর্বত হইতে এইসব চিত্তাকর্ষক চিত্র দর্শন করিয়া এবং পুরাতন ভারতের বিস্ময়কর গৌরব স্মরণ করিয়া স্বামীজীর হৃদয় এককালে আনন্দ ও গভীর চিন্তায় ভরিয়া উঠিল—এই লুপ্ত গৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপায় কি? চিন্তাক্লিষ্ট-হৃদয়ে পর্বতশিখর হইতে অবতরণপূর্বক তিনি পলিটানার অন্তর্গত মন্দিরাদি দর্শন করিতে করিতে গন্তব্যপথে চলিলেন এবং ক্রমে কখনও পদব্রজে, কখনও ট্রেনে চলিয়া নাড়িয়াদ স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নামিয়া তিনি জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করিলেন ও দেওয়ানজীর সহোদরগণকর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

নাড়িয়াদ পরিত্যাগান্তে তিনি বরোদায় উপস্থিত হইলেন ও গাইকোয়াড়ের রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত মণিভাই-এর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। বরোদা হইতে স্বামীজী ২৬শে এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাসকে লিখিয়াছিলেন, "আপনার বন্ধু শ্রীযুক্ত মণিভাই আমার সব রকম সুবিধা করে দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে মেলা-মেশার এইটুকু সুযোগ হয়েছে যে, আমি তাঁকে মাত্র দুবার দেখেছি—একবার এক মিনিটের জন্য, আর একবার খুব বেশী হয়তো দশ মিনিটের জন্য। দ্বিতীয় বারে তিনি এই অঞ্চলের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করেছিলেন। তবে আমি পুস্তকালয় ও রবিবর্মার ছবি দেখেছি; আর এখানে দেখবার মতো এই তো আছে! সুতরাং আজ বিকালে বোম্বে চলে যাচ্ছি।"

প্রাচীন জীবনীকারদের মতে বরোদার পরে স্বামীজীর গন্তব্যস্থল ছিল খাণ্ডোয়া। হয়তো ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে পূর্বোদ্ধৃত পত্রখানি প্রকাশিত হয় নাই, অথবা কোনও কারণে স্বামীজীর পত্রোল্লিখিত বোম্বে-গমনের উপর তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ইঁহাদের মতে স্বামীজী খাণ্ডোয়া হইতে বোম্বেতে আসেন জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে। এখন প্রশ্ন এই—দীর্ঘ তিন মাস তো তিনি খাণ্ডোয়ায় ছিলেন না। পূর্বসূরিদেরই মতে তিনি সেখানে ছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহ। অতএব এই দীর্ঘকালের পূর্তি হইবে কেমন করিয়া? আরও দ্রষ্টব্য এই: স্বামীজী পদব্রজে নর্মদাতীরের তীর্থগুলি দর্শন করিতে করিতে খাণ্ডোয়ায় গিয়াছিলেন এইরূপ কল্পনা না করিলে, অথবা সুরাট হইয়া ট্রেনে গিয়াছিলেন এইরূপ না ধরিলে, বোম্বে হইয়া যাওয়াই সমীচীন। ফলতঃ প্রাচীন জীবনীকারদের প্রদত্ত এই কালের ভ্রমণবৃত্তান্তের পারম্পর্য সম্বন্ধে নূতন চিন্তার আবশ্যক হইয়াছে এবং অধুনা যেসব নূতন পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ আর একটি ধারা উপস্থিত করা অসম্ভব নহে। পুনা হইতে লিখিত ঐরূপ একখানি পত্রের তারিখ ১৫ই জুন। উহাতে মহাবালেশ্বরগমনের উল্লেখ পাই।[৪ক] অতঃপর বোম্বে হইতে লিখিত দুইখানি পত্রের তারিখ ২২শে আগস্ট ও ২০শে সেপ্টেম্বর। প্রথম পত্রে ও তৎপূর্বেই মহাবালেশ্বরগমনের পুনরুল্লেখ আছে। এতএব আমরা ধরিয়া লইলাম যে, স্বামীজীর নিজের মতে যখন তিনি বরোদা হইতে বোম্বেতে আসেন এবং প্রাচীন জীবনীকারদের মতে তিনি খাণ্ডোয়া হইতে জুলাইর শেষে বোম্বেতে আসেন, তখন ইহাই অধিকতর যুক্তিসম্মত যে, তিনি ঐ কাল মধ্যে বোম্বে হইয়া পুনা ও মহাবালেশ্বর ঘুরিয়া আসেন। পুনা হইতে তিনি পুনঃ বোম্বে আসিয়া সেখান হইতে খাণ্ডোয়ায় যান এবং খাণ্ডোয়া হইতে পুনর্বার বোম্বে ফিরিয়া সেখানে মাস দুই কাটাইবার পর পুনা হইয়া বেলগাঁওয়ের দিকে যান।

২৬শে এপ্রিল বরোদা ত্যাগের পর বোম্বে পৌঁছিয়া সম্ভবতঃ তিনি সেখানে অধিক দিন থাকেন নাই। আমাদের বিশ্বাস লিমড়ী-রাজ তখন মহাবালেশ্বরে

৪ক। স্বামী অভেদানন্দের মতে মহাবালেশ্বরে নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাস মহাশয়ের গৃহে স্বামীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং দুইজনে একত্র সেখানে তিন দিন থাকেন। স্বামীজী তখনও সচ্চিদানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন ('আমার জীবন কথা' ২০২-৩ পৃঃ)। চতুর্থ দিন অভেদানন্দ অন্যত্র চলিয়া যান। পুনাতে অবস্থান সম্বন্ধে স্বামীজীর ১৭।২।১৯০১এর পত্রও দ্রষ্টব্য।

ছিলেন এবং স্বামীজী তাঁহারই আমন্ত্রণে সেখানে গিয়াছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে, আর স্বামীজী গরম সহ্য করিতে পারিতেন না। পূর্বের গ্রীষ্ম ঋতু তিনি আবু পাহাড়ে কাটাইয়াছিলেন। এবারেও বোম্বেতে না থামিয়া সোজা পুনা হইয়া মহাবালেশ্বরে গিয়াছিলেন।

পুনা যাইবার পথে ট্রেনে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহার সহিত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের নাম বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। তিলক মহাশয় একবার স্বামীজীর সহিত ট্রেনে বোম্বে হইতে পুণা গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ ভ্রমণের বৃত্তান্ত তিনি স্বমুখে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে এই ঘটনার মিল নাই। বস্তুতঃ আলোচ্য ঘটনাটি ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ ইহাও আর একটি অধিক কারণ যেজন্য আমাদের অনুমান হয়, স্বামীজী অন্ততঃ দুইবার বোম্বে হইতে পুনা গিয়াছিলেন। এইরূপ না মানিলে ঘটনাদ্বয়ের সঙ্গতি পাওয়া যায় না। ঘটনাটি এই : স্বামীজী ট্রেনের যে কামরাতে ছিলেন, উহাতেই উপস্থিত আরও কয়েকজন ভদ্রলোক স্বামীজীকে অশিক্ষিত ভাবিয়া সন্ন্যাসীদের দ্বারা ভারতের কত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয়ে ইংরেজী-ভাষায় আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং উহাতে খুব মাতিয়া গেলেন। স্বামীজী অনেকক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, পরে যখন তিনিও ইংরেজী ভাষাবলম্বনেই আলোচনায় যোগ দিলেন এবং ইতিহাসের নজির দেখাইয়া ও সমাজবিজ্ঞানের যুক্তি অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য ও সন্ন্যাসীদের অবদানের মূল্য বুঝাইয়া দিলেন, তখন ঐ ভদ্রলোকগণ শুধু যে অপ্রতিভ হইলেন তাহাই নহে, স্বামীজীর বিদ্যাবত্তা ও ক্ষমাগুণ দর্শনেও মুগ্ধ হইলেন। তিলক মহাশয়ের বিবরণ আমরা পরে দিব। আপাততঃ পুনা ও মহাবালেশ্বরের বাকী কথা শেষ করি।

পুনা হইতে জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখিত ১৫ই জুনের পত্রে আছে : "আমি ঠাকুর সাহেবের সহিত মহাবালেশ্বর হতে এখানে নেমে এসেছি এবং তাঁহারই বাড়ীতে আছি। এখানে আরও দুই-এক সপ্তাহ থাকবার ইচ্ছা আছে, তারপর হায়দরাবাদ হয়ে রামেশ্বরে যাব।" উল্লেখ থাকে যে, তিনি ঐ সময়ে রামেশ্বরাভিমুখে না যাইয়া আরও কয়েক মাস পরে গিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার পত্রাবলী হইতেই প্রমাণিত হয়। স্বামীজীর ২২শে আগস্টের পত্র হইতে আমরা আরও অবগত হই যে, তিনি মহাবালেশ্বরে লিমড়ীর ঠাকুর সাহেবের সহিত মিলিত হন, ঠাকুর সাহেব তখন সেখানেই ছিলেন। ইংরেজী জীবনীতে

যদিও উল্লেখ আছে যে, স্বামীজী মহাবালেশ্বরে এক সপ্তাহ ছিলেন, তবু সপ্তাহাধিক থাকাও অসম্ভব নহে। ঠাকুর সাহেবের সহিত পূর্বে কাথিয়াওয়ার ভ্রমণকালেই আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার সহিত স্বামীজীর বেশ হৃদ্যতা ছিল, আর তিনি ছিলেন স্বামীজীর দীক্ষিত শিষ্য। ঠাকুর সাহেব স্বামীজীকে স্বরাজ্যে লইয়া গিয়া সেখানেই চিরদিন রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী এই বলিয়া অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, "না, ঠাকুরসাহেব, এখন নয়, কারণ আমাকে একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। এখন আমার বিশ্রাম অসম্ভব, তবে যদি কখনও কর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে বিশ্রামলাভের অবকাশ ঘটে তো আপনার ওখানে যাব।" স্বামীজীর জীবনে সে অবকাশ আর ঘটে নাই।

অতঃপর আমরা স্বামীজীর দর্শন পাই খাণ্ডোয়াতে। সেখানে পরিচিত কেহ না থাকায় ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি যখন শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক উকিল মহাশয়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, ঠিক সেই সময়ই উকিলবাবুও কাছারী হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে দেখিলেন দ্বারদেশে একজন সাধু সমাগত। প্রথম দর্শনে অন্যান্য দশজনেরই মতো চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও স্থির করিলেন, ইনি পথচারী সন্ন্যাসীদেরই একজন। কিন্তু দুই-চারিটি কথার পরই তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান পণ্ডিত। অতএব তিনি ইঁহাকে নিজ আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং স্বামীজী সম্মত হইলে তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া আত্মীয়বর্গসহ তাঁহার সেবায় নিরত হইলেন। খাণ্ডোয়ায় স্বামীজী প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন এবং এই সময় মধ্যে একবার ইন্দোর প্রভৃতি স্থান দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কোনও জীবনীতে উল্লেখ না থাকিলেও আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, স্বামীজী শুধু খাণ্ডোয়া ও ইন্দোর দেখিতে ঐ অঞ্চলে আসেন নাই, সম্ভবতঃ শিপ্রাতীরবর্তী উজ্জয়িনী এবং নর্মদাতীরবর্তী তীর্থস্থানসমূহের আকর্ষণেই তিনি সেখানে আসিয়াছিলেন এবং ঐসকল দর্শন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা জীবনীর মতে তিনি একবার ইলোরা দেখিতেও গিয়াছিলেন।

খাণ্ডোয়া নিবাসী বাঙ্গালী-সম্প্রদায় স্বামীজীর শাস্ত্রজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার চরিত্রমাধুর্যও তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিল। তাঁহার আমন্ত্রণ-কর্তা গৃহস্বামী হরিদাসবাবু এই সর্বগুণসমন্বিত সন্ন্যাসীকে শহরবাসীদের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার জন্য

বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। সকলেরই পক্ষে স্বামীজীর ধর্মানুভূতির স্পর্শলাভের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য তিনি স্বামীজীকে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাপ্রদানার্থ অনুরোধ করিলে, স্বামীজী এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, তিনি গুরু-শিষ্যের ন্যায় পরস্পরের সান্নিধ্য অবলম্বনে ব্যক্তিগত আলোচনারই পক্ষপাতী ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি জানাইলেন যে, বাগ্মিজনসুলভ স্বরের উচ্চাবচতা-সম্পাদন প্রভৃতি কৌশলে তিনি অভ্যস্ত নহেন। ইহা সত্ত্বেও হরিদাসবাবু আগ্রহ দেখাইতে থাকিলে তিনি এই সর্তে রাজী হইলেন যে, উপযুক্ত সংখ্যক শ্রোতৃ-সমাগম হইলে তিনি চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু হরিদাস বাবুর পক্ষে ঐ ক্ষুদ্র শহরে শ্রোতার সমাবেশ করা সম্ভব না হওয়ায় বক্তৃতাও হইল না।

এই সময় দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন স্বামীজীর সম্মানার্থ স্থানীয় বাঙ্গালীদিগকে নিজগৃহে এক ভোজে আপ্যায়িত করিলেন। ভোজনের পুর্বে ও পরে সৎপ্রসঙ্গে কাটাইবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী একখণ্ড উপনিষদ্ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত সকলে সমবেত হইলে তিনি কয়েকটি দুরূহ স্থান অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। ইঁহাদের ভিতর বাবু পিয়ারীলাল গাঙ্গুলী নামক একজন উকিল সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কাজেই তিনি প্রশ্নকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। স্বামীজী তাঁহার প্রত্যেকটি প্রশ্নের এমন সরল ও সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন যে, উকিলবাবু সন্তুষ্ট হইয়া আর প্রশ্ন করিলেন না এবং পাঠ শেষ হইয়া গেলে হরিদাসবাবুর কানে কানে বলিলেন, "স্বামীজীকে দেখেই মনে হয়, ইনি কালে একজন বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি হবেন।" এই কথা যখন স্বামীজীকে জানানো হইল, তখন তাঁহার মুখ-মণ্ডলে এক দিব্য জ্যোতি খেলিয়া গেল এবং তিনি কহিলেন, "আমি নিজে ইহার কিছুই জানি না, তবে আমার গুরুদেব ঠিক এই কথাই বলতেন, যদিও আরও জোরালো ভাষায়।"

চিকাগো-ধর্মসভায় যোগদানের যে অভিপ্রায় স্বামীজীর অন্তঃকরণে জুনাগড় ও পোরবন্দরে অঙ্কুরাকারে উদ্গত হইয়াছিল, এখানে তাহা আরও বর্ধিতা-কারে আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, পরবৎসর (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) ঐ সভার অধিবেশন হইবে এবং বিশ্বের বিবিধ ধর্মের প্রতিনিধি উহাতে সমবেত হইবেন, তাই ঐ বিষয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি হরিদাসবাবুকে একদিন

বলিলেন, "কেউ যদি আমার যাতায়াতের খরচ দেয় তো সব ঠিক হয়ে যাবে এবং আমি যেতে প্রস্তুত।"

স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের দুঃখকষ্ট ও বিপদের কথা আমরা পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহাও বলিয়া আসিয়াছি যে, ঐরূপ অনেক-গুলি ঘটনার সময় ও পরিবেশ সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি ঘটনা আছে, যাহা মধ্যপ্রদেশে ঘটিত বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। বাঙ্গলা জীবনীতেও এইরূপ সম্ভাবনা অংশতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। উহাতে আছে (৩৫০ পৃঃ): "মধ্যভারতে সম্ভবতঃ খাণ্ডোয়া ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে যাইবার সময়ে তাঁহাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন—যাহারা নিতান্ত অসভ্য ও অতিথি-সৎকার-বিমুখ, এক মুষ্টি ভিক্ষা চাইলে দেয় নাই, আশ্রয় মাগিলে তাড়াইয়া দিয়েছে। অনেক দিন এমন ঘটিয়াছে যে, কয়েক দিবস নিরম্বু উপবাসের পর কোনরূপে জীবনধারণোপযোগী দুটি সামান্য কিছু আহার করিয়া শরীরটা রাখিতে হইয়াছে। এই সময়েই তিনি এক মেথর-পরিবারের মধ্যে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং এই অবহেলিত নীচজাতীয়দিগের হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ও এইরূপ অন্যান্য কয়েকটি ঘটনায় তিনি উপেক্ষিত জাতিসমূহের মধ্যে মহত্ত্বের অঙ্কুর লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উন্নতিবিধানের জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।"

উপরের বর্ণনাটি পড়িলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কেন আমরা পরবর্তী ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশেই স্থাপন করিতেছি। পরিব্রাজক-জীবনের এক সময়ে স্বামীজীর মনে হইল, যে সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাযাজ্ঞা ও স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ মাত্রের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। তাঁহার গুরুভ্রাতাকে লিখিত একখানি পত্রে এই ভাবটিই প্রকাশ পাইয়াছে; তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি নির্লজ্জভাবে ঘুরে ঘুরে অপরের বাড়ীতে আহার করছি, আর এতে বিবেকের দংশনও হচ্ছে না—ঠিক যেন একটি কাক!...আর ভিক্ষা করব না। আমাকে খাইয়ে গরিবদের লাভ কি? তারা এক মুঠো চাল পেলে বরং নিজের ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে পারে। বিশেষতঃ ভগবানলাভই যদি না হল তো এ শরীর রেখে লাভ?" একটা গভীর আধ্যাত্মিক অসন্তোষ এবং দুরতিক্রমণীয় আত্মবিসর্জনের ভাব তাঁহাকে

পাইয়া বসিল। ধর্মকে যাঁহারা সত্য সত্যই জীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অনেকের জীবনেই এরূপ মুহূর্ত আসিয়া থাকে এবং এই সঙ্কট-কালেই অত্যাশ্চর্য অনুভূতির আগমন হয়। স্বামীজীও একদিন দিগন্ত-প্রসারিত এক নিবিড় অরণ্যপথ অতিক্রমকালে ভাবিতেছেন, অনাহার এবং তপস্যায় দেহত্যাগ হইলেই বা ক্ষতি কি? এমনি চিন্তা লইয়া সারাদিন হাঁটিয়া চলিয়াছেন, পথিমধ্যে একমুষ্টি অন্নও জুটিল না।[৫] সন্ধ্যা-সমাগমে তিনি ক্লান্তদেহে এক বৃক্ষ-তলে শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মন রহিল ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট ও চক্ষুদ্বয় লক্ষ্যহীনরূপে সুদূরে প্রসারিত।

একটু পরে তিনি দেখিলেন, একটি ব্যাঘ্র তাঁহারই দিকে আসিতেছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে অনতিদূরে বসিয়া পড়িল, যেন লম্ফপ্রদানের জন্য প্রস্তুতির পূর্বপ্রক্রিয়া। স্বামীজী তখন ভাবিতেছেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে! আমরা দুজনেই তো ক্ষুধিত। এদিকে আমার এদেহে তো জ্ঞান লাভ হল না এবং এর দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হওয়ারও তো সম্ভাবনা দেখছি না; অতএব এর দ্বারা যদি অন্ততঃ এই ক্ষুধিত পশুটির খিদে মিটে তো মন্দ কি?" তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া তেমনি ভাবে শুইয়া রহিলেন এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কখন ঐ হিংস্র শার্দূল লম্ফপ্রদানপূর্বক তাঁহার উপর পতিত হয়। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ ব্যাঘ্রটি অন্য দিকে ফিরিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। স্বামীজী তখনও ভাবিতে লাগিলেন, হয়তো সে ফিরিবে। তাই তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে ফিরিল না। সে রাত্রি তিনি ভগবচ্চিন্তায় ঐ বৃক্ষতলেই কাটাইলেন। প্রত্যূষে ভগবদ্বিধানের অপর একটা দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল; তিনি তাঁহার অশেষ করুণার কথা ভাবিতে ভাবিতে কৃতজ্ঞহৃদয়ে গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরবর্তী কালে কথা-প্রসঙ্গে ঘটনাটির উল্লেখ করিলেও ঐ কালের অধ্যাত্মানুভূতির সম্পূর্ণ মর্ম, স্বরূপ বা গাম্ভীর্য তাঁহার মুখে কখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

আর একবার শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইলেও শূন্য উদর লইয়া দীর্ঘপথে চলিয়াছেন। নিদাঘের সূর্য অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, এবং পথচলা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। তবু শেষ চেষ্টা করিয়া তিনি দূরবর্তী একটা বৃক্ষতলে উপস্থিত

৫। সম্ভবতঃ ঐ অঞ্চলের আদিবাসিয়া দরিদ্র ও অনেকেই খৃষ্টধর্মাবলম্বী বলিয়া সাধুর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল না। 'রেমিনিসেন্স'-এর মতে (৩৬৮ পৃঃ) ইহা হিমালয়ের ঘটনা!

হইলেন এবং সেখানেই শুইয়া পড়িলেন—শরীর তখন অসাড়, আর চলিতেই পারে না। অমনি অন্ধকারে অকস্মাৎ আলোকসম্পাতের ন্যায় তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, "এ তো অতি সত্য কথা যে, আত্মার মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত! দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁর উপর আধিপত্য করবে এ আবার কেমন কথা? আমি বলহীন হতে পারি কি করে?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহে নববলের আবির্ভাব হইল, তাঁহার মনের আচ্ছন্নতা দূরীভূত হইল, ইন্দ্রিয়গণও তখন সাড়া দিল এবং তিনি পুনর্বার পথ চলিতে লাগিলেন এই সঙ্কল্প লইয়া যে, এ ভাবে দুর্বলতার হস্তে আত্মসমর্পণ করা চলিবে না। তাঁহার পরিব্রাজকজীবনে এইরূপ ঘটনা আরও ঘটিয়াছিল এবং ঐ গুলির উল্লেখ করিয়া তিনি ক্যালিফর্নিয়ায় এক বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, "কতবার আমি অনাহারে, বিক্ষতচরণে, ক্লান্তদেহে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি। কতবার দিনের পর দিন একমুষ্টি অন্ন না পেয়ে আর পথচলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তখন অবসন্ন শরীর বৃক্ষচ্ছায়ায় লুটিয়ে পড়ত, আর মনে হত প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে পারতাম না, চিন্তাও অসম্ভব হয়ে পড়ত; আর অমনি মনে এই ভাব উঠত, 'আমার কোন ভয় নেই, মৃত্যুও নেই; আমার জন্ম কখন হয়নি। মৃত্যুও হবে না, আমার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। সোঽহম্, সোঽহম্। সারা প্রকৃতির ক্ষমতা নেই যে আমায় পিষে মারে। প্রকৃতি তো আমার দাসী! হে দেবাদিদেব, হে পরমেশ্বর, নিজ মহিমা প্রকাশ কর, স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হও! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! বিরত হয়ো না।' অমনি আমি পুনর্বল লাভ করে উঠে দাঁড়াতাম; তাই আমি আজও বেঁচে আছি এবং এখানে উপস্থিত হয়েছি।" (C. W. II., P 402)।

নিরালম্ব সন্ন্যাসী একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় জীবন-যাত্রার ও মানবসভ্যতার যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাবী চিন্তাধারায় ও কার্যপ্রণালীতে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দারিদ্র্যের প্রকৃত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; ভারত-পর্যটনকালে বুঝিয়াছিলেন, বিরাট জনরাশির ভাগ্য প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই অনুরূপ বটে। আর তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের জনগণ শ্রীহীন হইলেও ধর্মবিমুখ নহে। তবে সে ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহীন আচারমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে এবং ধনী ও দরিদ্রের, উচ্চ ও নিম্নজাতির মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার দূরীকরণে ধর্ম

কৃতোদ্যম হয় নাই, বরং ধর্মের নামে প্রচারিত রীতিনীতি পুরোহিতকুলের হস্তে পড়িয়া ঐ বিভেদ বিচ্ছেদের পরিপোষক হইয়াছে ও উহার স্থায়িত্ব-সম্পাদনের যুক্তি যোগাইয়াছে। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণকালের অনেকখানি সময় তিনি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসীর বেশেই কাটাইয়াছিলেন ; আর তাঁহার সঙ্গী ছিল শুধু হয়তো একখানি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি এবং একখানি গীতা, আর চিরসাথী ছিল বুভুক্ষা ও অনিশ্চয়তা ; তবু সর্বদা চিত্তে ছিল অদম্য ঈশ্বরবিশ্বাস এবং স্বীয় জন্মভূমির প্রতি অসীম ভালবাসা।

খাণ্ডোয়া ছাড়িবার পূর্বে হরিদাসবাবু স্বামীজীকে আরও কিছুদিন থাকিয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী বলিলেন, "তোমরা সবাই আমার এত যত্ন করছ যে তোমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না ; কিন্তু আমার থাকবার জো নাই। আমি তীর্থপর্যটনে বেরিয়েছি—রামেশ্বর পর্যন্ত যেতেই হবে। আমি যদি এভাবে দীর্ঘকাল সব জায়গাতে কাটাই, তবে আর আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে না।" হরিদাসবাবু যখন বুঝিলেন, স্বামীজী কিছুতেই থাকিবেন না, তখন তাঁহার বোম্বাই-প্রবাসী এক ভ্রাতার নামে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, "আমার ভাই আপনাকে মিঃ ছবিলদাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। বোধ হয়, তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। বাস্তবিক স্বামীজী, আপনার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।"[৬] স্বামীজী শুধু কহিলেন, "বলতে পারি না ; তবে গুরুজী তো আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতেন।" এইভাবে স্বামীজী খাণ্ডোয়াবাসী বন্ধু-বান্ধবদের নিকট বিদায় লইয়া বোম্বে-গমনে উদ্যত হইলে হরিদাসবাবু বলিলেন, তাঁহার ট্রেনে যাওয়াই উচিত এবং তদনুসারে একখানি টিকেট কিনিয়া দিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরণপূর্বক নিজ গন্তব্যস্থলে চলিলেন।

বোম্বে পৌছিয়া স্বামীজী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত রামদাস ছবিলদাস মহাশয়ের গৃহে উঠিলেন ও অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও অচিরে বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হইলেন। একদিন তিনি জনৈক রাজনীতিবিদ নেতার গৃহে বেড়াইতে গেলে ঐ ভদ্রলোক তাঁহাকে খবরের কাগজের অংশবিশেষ পড়িতে দিলেন। উহাতে

৬। ইহা বাঙ্গলা জীবনীর মত। ইংরেজী জীবনীর মতে খাণ্ডোয়া ত্যাগের পূর্বেই তিনি হরিদাস বাবুর ভ্রাতার নিকট হইতে ব্যারিষ্টার রামদাস ছবিলদাসের নামীয় ঐ পত্রখানি পাইয়াছিলেন।

প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বালিকাদের সহমতির বয়স নির্ধারণার্থ একটি নূতন আইন (Age of Consent Bill) প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছেন। এই সংবাদে স্বামীজী লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং তীব্র ও স্পষ্ট ভাষায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তিপরিপুষ্ট স্বমত প্রকাশ করিলেন। বোম্বে শহরে থাকা-কালে বন্ধু-বান্ধবের গৃহে গমন ও স্বীয় আবাসস্থলে আলাপ-আলোচনাদির অবসরকালে তিনি সংস্কৃত চর্চা করিতেন। বাঙ্গলা জীবনীর মতে স্বামীজী তখন অধিক কাল বেদাধ্যয়নে কাটাইতেন। বোম্বে হইতে লিখিত তাঁহার ২২শে অগস্টের পত্রে আছে : "আমি এখানে কিছু সংস্কৃত বই পেয়েছি এবং অধ্যয়নের সাহায্যও জুটেছে। অন্যত্র এরূপ পাবার আশা নাই ; সুতরাং শেষ ক'রে যাবার আগ্রহ হয়েছে। হয়তো এই সংস্কৃত-বিদ্যার আকর্ষণেই তিনি বোম্বেতে দুই মাস (জুলাইর শেষ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত) কাটাইয়াছিলেন।

বাঙ্গলা জীবনীর মতে বোম্বে নগরে দৈবক্রমে স্বামী অভেদানন্দের (কালীর) সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়।[৭] স্বামী অভেদানন্দ বলেন, "এসময় স্বামীজীর হৃদয়টা যেন অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় হয়েছিল—আর কোন চিন্তা নেই, কেবল কি করে ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, অহর্নিশ এই ভাবতেন। তখন স্বামীজীকে দেখলেই একটা প্রকাণ্ড ঝঞ্ঝাবাত বলে মনে হত।" তাঁহার চিত্তের উৎকণ্ঠা দেখিয়া অভেদানন্দও বিচলিত হইয়াছিলেন, আর স্বামীজী নিজেও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কালী, আমার ভেতর এতটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।"

যাঁহারা এইকালে এবং আমেরিকাগমনের প্রাক্কালে স্বামীজীর চিন্তা-বিকাশের গতি লক্ষ্য করিতে চাহেন, তাঁহাদের কাছে তাঁহার ২২শে অগস্ট ও ২০শে সেপ্টেম্বরের পত্রদ্বয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম পত্রের অংশবিশেষে আছে : "একটি বিষয় অতি দুঃখের সহিত উল্লেখ করছি—এ অঞ্চলে সংস্কৃত এবং

৭। 'আমার জীবন কথা'র মতে স্বামীজীর বা স্বামী 'সচ্চিদানন্দের' সহিত স্বামী অভেদানন্দের দেখা হয় জুনাগড়ে, সেখানকার নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মনঃসুখারাম সূর্যরাম ত্রিপাটীর বাড়ীতে। ঐ গৃহে স্বামীজীর সহিত অভেদানন্দ তিন-চারিদিন বাস করেন। ত্রিপাটীজী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং স্বামীজীর আদেশে অভেদানন্দ তাঁহার সহিত বেদান্তবিচার করিয়াছিলেন। অভেদানন্দের তখন সঙ্কল্প ছিল, আর বরাহনগরে ফিরিবেন না ; কিন্তু স্বামীজীর অনুরোধে ও চক্ষের জল দেখিয়া বরাহনগরে ফিরিয়া যান (১৯৯-২০১ পৃঃ)।

অন্যান্য শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। এতদঞ্চলের লোকদের মধ্যে ধর্মের নামে পানাহার ও শৌচাদি বিষয়ে একরাশ কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার আছে—আর এগুলিই যেন তাদের কাছে ধর্মের শেষ কথা! হায় বেচারারা! দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা যতসব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে তাদের শেখায়।…কলির ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান তাদের বাঁচান।" এই পত্রখানি জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখিত। খেতড়ী-নিবাসী পণ্ডিত শঙ্কর লালকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রে আছে—"আমাদের দেশে পর্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই।…সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে।…আমরা এখন কি হাস্যকর অবস্থাতেই না উপনীত হইয়াছি! ভাঙ্গীরূপে যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সংক্রামক রোগের ন্যায় সকলে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে; কিন্তু যখনই পাদ্রী সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া, তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা জামা (যতই ছিন্ন ও জর্জরিত হউক) পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেও প্রবেশাধিকার পায়।…এখন এই পাদ্রীরা দক্ষিণে কি করিতেছে, দেখিবেন—আসুন দেখি। উহারা লাখ লাখ নীচ জাতকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে,…তথাকার সিকিভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে।…হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইয়ের ন্যায় দেখিবে?"

বোম্বে হইতে ২২শে অগস্ট তিনি যদিও লিখিয়াছিলেন, "এখানে পনর-কুড়ি দিন থেকে রামেশ্বর যাবার বাসনা আছে," তথাপি ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি বোম্বেতেই ছিলেন, ইহা তাঁহার ঐ তারিখের পত্র দেখিলেই জানা যায়। অতঃপর সেপ্টেম্বরের শেষে কোনও একদিন তিনি লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের সহিত পুনা যাত্রা করেন। পুনা হইতে তিনি ক্রমে বেলগাঁও-এ উপস্থিত হন। পুনাগমনের ঘটনাদি আমরা অনুবাদের মাধ্যমে তিলক মহাশয়ের নিজের বিবৃতি অনুযায়ী উপস্থিত করিলাম। তিনি বলিয়াছেন:

"১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বা ঐরূপ কোন একসময়ে, অর্থাৎ বিখ্যাত চিকাগোর বিশ্ব-মেলার অন্তর্গত ধর্মমহাসভার পূর্বে আমি একদিন বোম্বে হইতে পুনাতে ফিরিতেছিলাম; ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে একজন সন্ন্যাসী আমি যে কামরায় ছিলাম, তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জনকয়েক গুজরাটী ভদ্রলোক তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা আমার সহিত তাঁহাকে যথারীতি পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তিনি যেন পুনায় অবস্থানকালে আমার বাড়ীতেই থাকেন। আমরা পুনা পৌঁছিলে সন্ন্যাসী আমার সহিত আট-দশ দিন বাস করিলেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি এক-জন সন্ন্যাসী মাত্র। তিনি এখানে কোন বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। গৃহে তিনি অদ্বৈত-দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিতেন; সর্বসাধারণের সহিত মিশিতে চাহিতেন না। তাঁহার নিকট পয়সা-কড়ি মোটেই ছিল না; সম্পত্তির মধ্যে ছিল একখানি মৃগচর্ম, একটি কমণ্ডলু ও দুই-একখানি গেরুয়া-বস্ত্র। তাঁহার ভ্রমণকালে কেহ না কেহ গন্তব্য স্টেশন পর্যন্ত টিকেট কিনিয়া দিত।

"স্বামীজী আশা পোষণ করিতেন যে, মহারাষ্ট্রের নারীরা পরদা-মুক্ত থাকায় তাঁহাদের মধ্য হইতে উচ্চবর্ণের কোন কোন বিধবা নারী হয়তো প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের যোগীদের মতো শুধু ধর্ম ও আত্মতত্ত্ব প্রচারেই নিরত হইতে পারিবেন। স্বামীজী আমার সহিত এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সন্ন্যাস প্রচারিত হয় নাই, প্রত্যুত উহাতে সকলকে কর্মফল ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[৮]

"আমি তখন হীরাবাগে অবস্থিত ডেকান ক্লাবের সভ্য ছিলাম; প্রতি সপ্তাহে উহার অধিবেশন হইত। স্বামীজী একবার ঐরূপ এক সভায় আমার সহিত উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ৺পণ্ডিত কাশীনাথ গোবিন্দনাথ একটি দার্শনিক বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা দেন। ঐ বিষয়ে আর কাহারও কোন বক্তব্য ছিল না। কিন্তু স্বামীজী উঠিয়া প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় পরিষ্কারভাবে উক্ত বিষয়ের অপর দিকটা দেখাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার উচ্চ প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার অল্প পরেই স্বামীজী পুনা ত্যাগ করিয়া যান।

৮। তিলক মহাশয় স্বামীজীকে ভুল বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ ইহা স্বামীজীর মত নহে। তাঁহার মতে গীতায় সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয় বিষয়েরই উপদেশ আছে।

"ইহার দুই বা তিন বৎসর পরে স্বামীজী চিকাগোর সাফল্যে অর্জিত এবং পরে আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে লব্ধ তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি লইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি যেখানে গেলেন সেখানেই অভিনন্দনপত্র লাভ করিলেন ও প্রত্যেক স্থলেই মর্মস্পর্শী ভাষায় উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিলেন। আমি কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার ছবি দেখিলাম এবং আকৃতির সৌসাদৃশ্য-দর্শনে অনুমান করিলাম, যে স্বামীজী আমার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, ইনি নিশ্চয়ই তিনি। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলাম যে, আমার অনুমান সত্য কিনা, এবং তাঁহাকে কলিকাতার পথে পুনা হইয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম। আমি একখানি অতি প্রীতিপূর্ণ উত্তর পাইলাম, উহাতে স্বামীজী খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনিই সেই সাধু এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, ঐ সময়ে তাঁহার পক্ষে পুনায় আসা সম্ভব হইবে না। ঐ পত্রখানি এখন আর পাওয়া যায় না ; ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'কেশরী' মামলার অবসান হইলে যখন ব্যক্তিগত ও সাধারণ বিষয়ক পত্রগুলি পোড়াইয়া ফেলা হয়, তখন উহাও পুড়িয়া গিয়া থাকিবে।

"ইহার পরে একবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে আমি জন কয়েক বন্ধুর সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠ দর্শন করিতে যাই। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। আমরা একসঙ্গে চা পান করি। কথাবার্তার কালে স্বামীজী কতকটা রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি সংসার ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা দেশে তাঁহার প্রবর্তিত কার্যভার গ্রহণ করি এবং তিনি মহারাষ্ট্রে গিয়া অনুরূপ কার্য গ্রহণ করেন, তবে আরও উত্তম হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, 'দূর দেশে মানুষ যতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, স্বদেশে তা পারে না।'" (রেমিনিসেন্সেস্ অব্ স্বামী বিবেকানন্দ, ২১-২২ পৃষ্ঠা)।

ইহার পর আমরা জানিতে পারি যে, স্বামীজী ভাবনগরের মহারাজার এক পরিচয়পত্র সহ কোলহাপুরে গিয়াছিলেন। কোলহাপুরের রাণী তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন এবং স্বামীজী তাঁহার প্রদত্ত একখানি গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করিলে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন। কোলহাপুরের 'খাঙ্গী করভারী'র উচ্চপদে অধিষ্ঠিত জনৈক রাজকর্মচারী স্বামীজীকে বেলগাঁও-এর একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের নামে একখানি পরিচয়পত্র দিলেন। উহা লইয়া স্বামীজী

একদিন প্রাতঃকালে ছয়টার সময় ঐ ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। আমরা নিম্নে উক্ত মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জি. এস. ভাটে, এম. এ. মহাশয়ের লিখিত বিবরণটি অনুবাদ করিয়া দিলাম :

"স্বামীজীর আকৃতি অনেকটা অনন্যসাধারণ ছিল, এবং প্রথম দর্শনেই মনে হইত ইনি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা একটু অন্য ধরনের লোক। কিন্তু পরে আমাদের অতিথিকে আমরা যে প্রকার বরেণ্য পুরুষরূপে চিনিতে পারিলাম, তাঁহাকে ততটা বড় ভাবিবার জন্য প্রথমাবস্থায় আমার পিতা বা আমাদের পরিবারের কেহ, এমন কি আমাদের ক্ষুদ্র নগরের অধিবাসী কোন ব্যক্তিই প্রস্তুত ছিলেন না। স্বামীজীর অবস্থানের প্রথম দিন হইতেই এমন সব ঘটনা ঘটিতে লাগিল, যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলাইতে হইল। প্রথমতঃ দেখা গেল, তাঁহার বস্ত্রের বর্ণ অপর সন্ন্যাসীদের বস্ত্রের সদৃশ হইলেও তাঁহার পোশাক বেশ যেন একটু ভিন্ন রকমের। তিনি একটি বানিয়ান পরিতেন। সন্ন্যাসীর দণ্ডের স্থলে তাঁহার হাতে ছিল একটা লম্বা লাঠি, যাহা অনেকটা বেড়াইবার লাঠির মতো। তাঁহার আসবাবের মধ্যে ছিল অপর সাধুরই মতো একটি কমণ্ডলু, একখানি গীতা এবং আরও দুই-একখানি পুস্তক।...কথাবার্তার জন্য ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন, দেহ উন্মুক্ত না রাখিয়া গেঞ্জি পরেন, এবং প্রতিভার এরূপ বৈচিত্র্য ও জ্ঞানের এরূপ বহুব্যাপিত্ব প্রকাশ করেন, যাহার ফলে অতি সুশিক্ষিত সংসারীও খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন—এমন ধরনের সন্ন্যাসী তো আর পূর্বে কখনও দেখি নাই।...প্রথমদিন আহারের পর স্বামীজী পান ও সুপারি চাহিয়া বসিলেন। তারপর সেই দিন বা তারই পরের দিন দোক্তা চাহিলেন। যে সন্ন্যাসীর এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈহিক ভোগের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাওয়া উচিত, তাঁহার মুখে এই জাতীয় চাহিদা শুনিলে অপরের মনে কি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার নিজমুখ হইতেই আমরা শুনিলাম যে, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। অথচ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন! আবার সন্ন্যাসী হইয়া এমন সব জিনিসের জন্য লালায়িত যাহা শুধু গৃহস্থদের শোভা পায়! এই সমস্তই আমাদের পূর্বধারণার ঘোর বিরোধী ছিল, অথচ তিনি আমাদিগকে এই পরিস্থিতিটি মানাইয়া লইলেন এবং আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইল যে, সাধুর পক্ষে পান-সুপারি বা তামাক ব্যবহার এমন একটা কিছু খারাপ নয়। তিনি নিজের এই ব্যসনের এমন এক ব্যাখ্যা দিলেন যে, আমাদের আর বলিবার

কিছু রহিল না। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি পূর্বে ছিলেন কলিকাতার একটি আমোদপ্রিয় ছেলে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাস করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পুতসঙ্গ লাভের পূর্বে ঘোর বিষয়ী ছিলেন। গুরুর শিক্ষাগুণে তাঁহার জীবন সম্বন্ধীয় ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি অভ্যাস ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হওয়ায়, তিনি সেগুলিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে মনে করিয়া ঐ বিষয়ে আর মাথা ঘামান নাই। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি আমিষাশী কিংবা নিরামিষাশী, তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন, পরন্তু পরমহংসশ্রেণীর সন্ন্যাসী, অতএব ঐ বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই। পরমহংসদের নিয়মই এই যে, তাঁহাদিগকে অপরে যাহা দেয় তাহাই খাইতে হয়, আবার কেহ কিছু না দিলে উপবাসও করিতে হয়। অধিকন্তু ধর্মনির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির নিকট পরমহংস ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাকে যখন প্রশ্ন করা হইল, তিনি অহিন্দুর অন্ন গ্রহণ করিবেন কিনা, তখন তিনি উত্তর দিলেন, তিনি বহুবার মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন।

"আমার মনে হইয়াছিল, স্বামীজী প্রাচীন রীতিতে সংস্কৃত অধ্যয়নে বেশ অভ্যস্ত। তিনি যখন প্রথম আসেন তখন আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী মুখস্থ করিতে ব্যস্ত। আমি দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলাম যে, অষ্টাধ্যায়ীর যে সকল অংশ মুখস্থ করার জন্য আমি অশেষ শ্রম করিয়াছি, সে-সকল সম্বন্ধেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি আমার তুলনায় অনেক বেশী। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার বাবা যখন আমাকে আমার অধীত বিষয় বলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তখন বলিতে গিয়া আমার ভুল হইতে লাগিল, আর স্বামীজী ঐগুলির সংশোধন করিয়া আমায় লজ্জা দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি আমার ধারণা অতি উচ্চস্তরের শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল।

"স্বামীজীর আগমনের পর দুই-তিন দিন ধরিয়া আমার পিতা যেন তাঁহাকে সব দিক হইতে পরিমাপ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। শীঘ্রই তাঁহার ধারণা জন্মিল যে, অতিথি শুধু অনন্যসাধারণ নহেন, তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী। ইহার সম্বন্ধে তাঁহার ঘনিষ্ট বন্ধুদের মতও জানিবার জন্য তিনি একদিন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, স্বামীজীর সহিত মিলিত হইবার জন্য এবং তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তি-

দের একটা সম্মেলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বামীজীর উপস্থিতি শহরে সুবিদিত হইবার পর প্রত্যহ তাঁহার নিকট যে প্রচুর লোকসমাগম হইত, তাহাতে এই একটা জিনিস আমাদের কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হইত যে, তুমুল বিচারকালেও স্বামীজীর প্রসন্নতা সর্বদা অবিচলিত থাকিত—তিনি কখনও ক্রুদ্ধ হইতেন না। পাল্টা জবাবে তিনি খুবই পটু হইলেও প্রতিপক্ষকে কখনও আঘাত করিতেন না। একদিন বিচারকালে স্বামীজীর যে ধীরতা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের বেশ আমোদ হইয়াছিল। ঐ সময় বেলগাঁওয়ে একজন একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ; সর্ববিষয়ে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তখনকার দিনের অনেক হিন্দুর জীবনে যেমন ঘটিয়াছিল, তেমনি ইনিও বাহ্যতঃ খুবই গোঁড়া হইলেও অন্তরে ছিলেন সংশয়বাদী ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের বিশেষ ভক্ত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস একটা সামাজিক রীতি মাত্র, এবং কেবল বহু যুগের অভ্যাসের ফলেই উহা প্রমাণরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে। এই সকল ধারণা মনে থাকায় স্বামীজী তাঁহার দৃষ্টিতে এক অতি প্রবল পূর্বপক্ষরূপে উপস্থিত হইলেন ; কারণ অভিজ্ঞতা, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার যেটুকু সম্বল ছিল, স্বামীজীর তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল ; ইহার ফলে তিনি বিচারকালে স্বভাবতই মেজাজ খারাপ করিয়া অভদ্রতা দেখাইতে লাগিলেন। এমন কি অনেক সময় স্বামীজীর প্রতি অশিষ্টাচার করিতে লাগিলেন। আমার পিতা আপত্তি জানাইলেন, কিন্তু স্বামীজী মৃদুহাস্যে বাধা দিয়া বলিলেন, তিনি ইহাতে কিছুই মনে করেন না।…বিচারকালে যদিও স্বামীজীর পক্ষেই যুক্তি অধিক দেখা যাইত, তথাপি জয়লাভই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি বরং চাহিতেন, সকলে বুঝুক যে, এখন এমন সময় আসিয়াছে, যখন ভারতবাসীদের নিকট এবং বিদেশীয়দিগের নিকট দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে, হিন্দুধর্ম মরণোন্মুখ নহে ; এতদ্ব্যতীত জগতের সম্মুখে বেদান্তের সত্যসকলও উদ্‌ঘোষিত হওয়া আবশ্যক।…তাঁহার ক্ষোভ ছিল এই যে, বেদান্তের পক্ষে যেমন হওয়া উচিত ছিল, ঠিক সে ভাবে উহা সকলের শাশ্বত অনুপ্রেরণার উৎস না হইয়া উহা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইতেছে।"

বেলগাঁওয়ে স্বামীজী শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র মহাশয়ের গৃহেও নয় দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। হরিপদবাবু বনবিভাগের সাবডিভিশন্যাল অফিসার ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ('বাণী ও রচনা', ৯।৩৬০), "১৮৯২ খৃঃ, ১৮ই অক্টোবর,

মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি বলিলেন, 'ইনি একজন বিদ্বান্ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।' ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশান্তমূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতেব আলো বাহির হইতেছে, গোঁফদাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্র দেশীয় বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি। সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় কি তামাক খান ? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।' তিনি বলিলেন, 'তামাক, চুরুট—যখন যাহা পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।' তামাক সাজাইয়া দিলাম।

"তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কি-না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আর বাঙ্গালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে ; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।' সেরাত্রে বড় বেশী কথাবার্তা হইল না ; কিন্তু দুই-চারি কথা যাহা বলিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজারগুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না, এবং সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী। আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, 'যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।' তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম ; মনে হইল, এমন নিঃস্পৃহ, চির-সুখী, সদা-সন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখন দেখি নাই।

"পরদিন ১৯শে অক্টোবর। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে ৮টা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা

নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী যেখানে ছিলেন সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি এক মহাসভা ; স্বামীজী বসিয়া আছেন এবং নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকীল ও বিদ্বান লোকের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্স্লের ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম এবং অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মানুষ না দেবতা ?

"কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকীল প্রশ্ন করিলেন, 'স্বামীজী, সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃতভাষায় রচিত ; আমরা সেগুলি বুঝি না। আমাদের ঐ-সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি ?' স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'অবশ্যই উত্তম ফল আছে ; ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি তো ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পার, তথাপি লও না। ইহা কাহার দোষ ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পার, যখন সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বসো, তখন ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে কর, না-কিছু পাপ করিতেছ মনে কর ? যদি ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে করিয়া বসো, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।'

"অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, 'ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন ম্লেচ্ছ-ভাষায় করা উচিত নহে, অমুক পুরাণে এইরূপ লেখা আছে।' স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'যে-কোন ভাষাতেই হউক, ধর্মচর্চা করা যায়' এবং এই বাক্যের সমর্থন শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়া বলিলেন, 'হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালতের দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না।'

"এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন, কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চা খাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, 'বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুন্ন করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।' পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, 'আমি যাঁহার অতিথি, তাঁহার মত করিতে পারিলে

আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।' উকিলটিকে বিশেষ বুঝাইয়া স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামীজী তখন ফ্রান্স-দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে-সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সে-সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতেই বুঝিয়া লইলেন।

"ইতঃপূর্বে 'টাইম্‌স্' সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, কোন ধর্ম সত্য, প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন। সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ায় আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম; তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, 'লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।' আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। 'ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্—এককালে দুইই হইতে পারেন না'—খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্যাপূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন না। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'তুমি তো বিজ্ঞান অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি বিপরীত শক্তি—কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ কি কার্য করে না? যদি দুইটি বিপরীত শক্তি জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় বিপরীত হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয়? আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা আছে, তাহা অতি নিম্নস্তরের।"

এইরূপে হরিপদবাবুর গৃহে ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত দুইদিন (বা ঐ নগরে চারিদিন) কাটিয়া গেল। এই সুযোগে হরিপদবাবুর মনে দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যত সন্দেহ ছিল, স্বামীজীকে তিনি একে একে সবই নিরসন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বামীজীও সানন্দে তাহা করিলেন। এতদ্ব্যতীত নগরের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি প্রতিদিন সেখানে সমবেত হইয়া নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন এবং স্বামীজীও সর্ববিষয়ে যথাযথ সমাধানের উপায় দেখাইয়া দিতেন ও নূতন আলোকসম্পাত করিতেন। শহরে অবস্থিতির পঞ্চম দিনে (২১শে) তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশী এবং গ্রামে

একদিনের বেশী থাকিতে নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।" হরিপদবাবু কিন্তু কিছুতেই রাজী হইলেন না; একথা ওকথা বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তখন স্বামীজী বলিলেন, "একস্থানে অনেক দিন থাকিলে মায়া-মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয়বন্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।" পরিশেষে হরিপদবাবুর আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই-চারি দিন থাকিতে সম্মত হইলেন।

হরিপদবাবুর ইচ্ছা জাগিয়াছিল, স্বামীজীর জন্য একটি বক্তৃতা-সভার আয়োজন করিবেন; কিন্তু স্বামীজীর অনুমতি না পাওয়ায় তাহা হয় নাই।

স্বামীজী একদিন হাস্যরসময় 'পিকউইক পেপার্স' হইতে অনর্গল কয়েক পৃষ্ঠা মুখস্থ বলিয়া গেলে হরিপদবাবু ভাবিলেন, সন্ন্যাসী হইয়াও ইনি এই সামাজিক গ্রন্থ এত কষ্ট করিয়া বার বার পড়িয়া মুখস্থ করিতে গেলেন কেন? জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, "দুইবার পড়িয়াছি—একবার স্কুলে পড়িবার সময়, ও আজ পাঁচ-ছয়মাস হইল আর একবার।" পুনর্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, একাগ্রতা ও ব্রহ্মচর্যের ফলে এইরূপ স্মৃতিশক্তি সম্ভব হয়। আর একদিন মধ্যাহ্নে বিছানায় শুইয়া একখানি গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। হঠাৎ এইরূপ হওয়ার কারণ নির্দেশের জন্য হরিপদবাবু ঐ কক্ষের দরজায় আসিয়া দেখিলেন, স্বামীজী নিবিষ্টমনে পড়িতেছেন, অন্য কোনদিকে দৃষ্টি নাই। এই ভাবে প্রায় পনর মিনিট কাটিয়া গেলে তিনি হরিপদবাবুকে দেখিতে পাইয়া ভিতরে ডাকিলেন এবং হরিপদবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন শুনিয়া বলিলেন, "যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে, একপ্রাণে—সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজীপুরের পওহারী বাবা ধ্যানজপ, পূজাপাঠ, যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটিটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমন মাজিতেন যে, সোনার মতো দেখাইত।"

স্বামীজী তখন সাধারণ ব্যক্তিরই ন্যায় হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব করিলেও উহারই মাধ্যমে বহু জটিল সমস্যার সমাধান করিতেন। সেই সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টিও ছিল সুতীক্ষ্ণ, প্রত্যেকের মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেন। এই সময় একটি ধনীর ছেলে স্বামীজীর নিকট ঘন ঘন আসিতে থাকে এবং সাধু হইবার ইচ্ছা

প্রকাশ করে। উৎসুক হইয়া হরিপদবাবু জানিতে চাহিলেন, স্বামীজী ঐ ছেলেটিকে সাধু হইতে উপদেশ দিবেন কিনা। স্বামীজী কিন্তু বলিলেন, "উহার পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এম. এ. পাস করিয়া সাধু হইতে আসিও। বরং এম. এ. পাস করা সহজ, কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।"

হরিপদবাবুর স্ত্রী পুর্বেই মন্ত্রদীক্ষা লইতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এমন লোককে গুরু করিও যাঁহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি।" এখন স্বামীজীকে নিকটে পাইয়া তিনি সহধর্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সন্ন্যাসী যদি গুরু হন, তবে তুমি শিষ্যা হইতে প্রস্তুত আছ কি?" তিনিও সাগ্রহে বলিলেন, "উনি কি গুরু হইবেন? হইলে তো আমরা কৃতার্থ হই।" স্বামীজীর নিকট এই অনুরোধ করা হইলে তিনি প্রথমে, গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরু হওয়াই উচিত, গুরু হওয়া বড় কঠিন, শিষ্যের সমস্ত দায়িত্ব লইতে হয়, দীক্ষার পুর্বে গুরুশিষ্যের অন্ততঃ তিনবার মিলন হওয়া আবশ্যক ইত্যাদি বলিয়া ঐ দম্পতীকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে ২৫শে অক্টোবর তাঁহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। ইহার পর ২৬শে অক্টোবর তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরিপদবাবু তাঁহার ফটো তুলাইলেন।

একদিন স্বামীজী বলিলেন, "তোমার সহিত জঙ্গলে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। কিন্তু চিকাগোয় ধর্মসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাইব।" হরিপদবাবু অমনি চাঁদা তুলিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু স্বামীজী একটু ভাবিয়া অসম্মতি জানাইলেন।

হরিপদবাবু তখন স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ঔষধপত্র ব্যবহার করিতেন। সে-কথা জানিতে পারিয়া স্বামীজী একদিন বলিলেন, "যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে, শয্যাশায়ী করিয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি রোগের শতকরা নব্বইটা কাল্পনিক।...যতদিন বাঁচ আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মতো একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না, বা জগতের কোন বিষয়ের কোন ব্যাঘাত হইবে না।" ঐ সময় উপর-ওয়ালা সাহেবদের সহিত হরিপদ-

বাবুর প্রায়ই বনি-বনাও হইত না। স্বামীজীকে উহা জানাইলে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, "আপ ভালা তো জগৎ ভালা—একথা যে কতদূর সত্য কেহই জানে না। আজ হইতে মন্দটি দেখা একেবারে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর। দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্যও পরিবর্তিত হইয়াছে।" ঔষধ ও লোকব্যবহার এই উভয় বিষয়ক উপদেশই কার্যে পরিণত করিয়া হরিপদবাবু বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, "সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক দূর হইল এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।"

"আর একদিনের কথা—কলিকাতায় একটা লোক অনাহারে মারা গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়িয়া স্বামীজী এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়! কেন—জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন: "দেখিতেছ না, অন্যান্য দেশে কত 'দরিদ্র নিবাস', 'সাহায্য তহবিল' প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টি-ভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরিতে কখন শোনা যায় নাই। আমি এই প্রথম কাগজে এ কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে কলিকাতায় অনাহারে লোক মরে।" হরিপদবাবু পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে ভারতেও ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা বন্ধ করার সপক্ষে মত প্রকাশ করিলে স্বামীজী অতি উদার দৃষ্টি লইয়া বলিয়াছিলেন, "দেবে তো দুই-একটি পয়সা; সে জন্য সে কিসে খরচ করিবে, সদ্ব্যয় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এই সব লইয়া এত মাথা ঘামাইবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা খাইয়া উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বই লোকসান নাই। কেন না, তোমার মতো লোকেরা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে সে উহা তোমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে।"

বস্তুতঃ স্বামীজীর জীবনে এই যে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—তিনি কখনও পাশ্চাত্ত্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের প্রথামাত্রকে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, পরন্তু প্রত্যেক আচার-বিচারেরই উদ্দেশ্য ও ভাল-মন্দ সবটা দেখিয়া তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন—এইগুণটি এই কালমধ্যে সম্পূর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল

বলিয়া মনে হয়। তবে স্বদেশের এবং স্বজাতির গুণগ্রাহী এবং অযথা নিন্দাবাদে পরাঙ্মুখ হইলেও তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অতি সুস্পষ্ট মত পোষণ করিতেন এবং বেলগাঁওয়েও উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, "প্রথম হইতেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারী চটা দেখিয়াছি। সর্বদাই সকল লোককে, বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে ফিরিবার পর যাঁহারা স্বামীজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না, সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া, কাঞ্চনমাত্র স্পর্শ না করিয়া কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মতো শক্তিমান পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই—কোন লোক একবার এই কথা বলায়, তিনি বলেন, 'দেখ, মন বেটা বড় পাগল—ঘোর মাতাল' চুপ করে কখনই থাকে না, একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেই জন্যই সকলের বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলিতে হয়।...মনকে বিশ্বাস করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিও না।"

স্বামীজীর সহিত ইতিপূর্বে বহু দেশীয় রাজা-মহারাজের আলাপ হইয়াছিল। কেহ কেহ বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী কেন এত রাজা-রাজড়ার সহিত মেলা-মেশা করিবেন, এই বিষয়ে একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'গরীব প্রজার ইচ্ছা থাকিলেও সৎকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোন রূপে তাঁহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে!' অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসী; কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধনী ও শক্তিমানের সহিত আত্মীয়তাস্থাপন তাঁহার দিক হইতে সম্পূর্ণ নিরর্থক হইলেও দরিদ্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত এবং তাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি শাসক-সম্প্রদায়ের চিত্তে প্রজারঞ্জনের বীজ উপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখিব, অভিজ্ঞতার ফলে স্বামীজী এই পথ ছাড়িয়া জনশিক্ষা ও গণজাগরণের

পথকেই অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, আর ভারতীয় প্রথিত-নামা নেতাদের মধ্যে তিনিই ইহার প্রয়োজন এবং অবশ্যম্ভাবিতা ওজস্বিনী ভাষায় সর্বপ্রথম বিঘোষিত করিয়াছিলেন।

স্বদেশের কল্যাণসাধন তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে সন্ন্যাস ও স্বদেশপ্রেমের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া বড় সহজ ছিল না। অতএব স্বামীজীর ভাবধারা অকস্মাৎ গ্রহণ করিতে অনেকেরই বাধা ঠেকিত এবং অপরোক্ষভাবে তাঁহারা ঐ চিন্তাধারার সমালোচনায়ও অগ্রসর হইতেন। হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্যকর্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সম-দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, 'যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?' আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজী এ কথা স্বীকার করিতেন, বলিতেন, 'সে-সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদ-পত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মতো গর্দভ আর কে আছে?' খ্রীষ্টান মিশনারীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশে কত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কিন্তু অপকারও বড় কম করে নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দিবার বিলক্ষণ যোগাড় করিয়াছেন। শ্রদ্ধানাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়, এ কথা কেহ কি বোঝে'?"

হরিপদবাবু নিজে নিজে ভগবদ্গীতা পড়িতেন; কিন্তু উহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না। অতএব উহা পাঠের কোন সার্থকতা নাই মনে করিয়া তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু স্বামীজী যখন গ্রন্থখানি হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, গীতা কি অপূর্ব গ্রন্থ; তিনি উহার নিজস্ব মূল্য এবং প্রতি ব্যক্তির জীবনের সহিত উহার

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া উহার পুনরধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং খুবই উপকৃত হইলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে শুধু গীতার গাম্ভীর্য আস্বাদন করাইয়াই তৃপ্ত হন নাই, তিনি টমাস কার্লাইল-এর গ্রন্থাবলী এবং জুল্‌স্ ভার্নের উপন্যাসরাজির সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও চিন্তার বিস্তারের প্রতিও তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

হরিপদবাবুর গৃহে দেখিতে দেখিতে আট দিন কাটিয়া গেল। নবম দিনে (২৭শে অক্টোবর) স্বামীজী বলিলেন, "আর থাকিব না; রামেশ্বরে যাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। যদি এইভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর পৌঁছানো হইবে না।" হরিপদবাবু অবশ্য দেরি করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সফলকাম হইলেন না। স্বামীজী মেলট্রেনে মার্মাগোয়া যাত্রা করিবেন স্থির হইল, এবং হরিপদবাবু টিকেট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া দিলেন। অতঃপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই; আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ায় স্বামীজী কোন কোন স্থানে গিয়াছিলেন এবং কি কি দেখিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই; তবে দ্রষ্টব্য সবই দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মাডগাঁও হইতে হরিপদবাবুকে লিখিত একখানি পত্রে আছে, "আপনার এক পত্র এই মাত্র পাইলাম। আমি এ স্থানে নিরাপদে পৌঁছি এবং তদনন্তর পঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করিতে যাই। অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছি। গোকর্ণ, মহাবালেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিবার ইচ্ছা এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম। কল্য প্রাতঃকালের ট্রেনে ধারবাড় যাত্রা করিব।... এখানকার খৃষ্টানরা অনেকেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে; হিন্দুরা প্রায় সকলেই মূর্খ", ('বাণী ও রচনা', পৃঃ ৬।৩৪৩)।

দক্ষিণ ভারতে

ভারতের পশ্চিম-সমুদ্রতীরবর্তী গোয়া অঞ্চল পরিভ্রমণান্তে স্বামীজী ক্রমে মহীশূরের অন্তর্বর্তী ব্যাঙ্গালোরে উপনীত হইলেন। প্রথম কিছুদিন তিনি এখানে অজ্ঞাতরূপেই কাটাইলেন ; কিন্তু অগ্নি যেমন চিরকাল ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না, ইন্ধন পাইলেই পূর্ণশক্তিতে জ্বলিয়া উঠে, স্বামীজীর প্রতিভাও তেমনি কোথাও দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে পারিত না, সর্বসাধারণের সহিত আলাপ-পরিচয় জমিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে উহা স্ব-মহিমায় প্রকটিত হইত। অতএব ভারতের অন্যত্র যেরূপ দেখা গিয়াছিল, ব্যাঙ্গালোরেও সেইরূপই হইল ; শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হইয়া রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত কে. শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। যথাসময়ে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎকারের কয়েক মিনিটের মধ্যেই লব্ধকীর্তি আয়ার মহোদয়ের চিত্তে এই অজ্ঞাতপরিচয় সন্ন্যাসীর অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র ভাসিয়া উঠিল, আর তিনি ভাবিলেন, "এ সন্ন্যাসীর মধ্যে এমন এক অতীব চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা স্বদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিহ্ন রাখিয়া যাইবে।" আয়ার মহাশয় তাঁহাকে সাদরে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন এবং স্বামীজী সে-গৃহে তিন-চারি সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই সূত্রে মহীশূর রাজ্যের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং রাজদরবারের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই ধর্মনির্বিশেষে হিন্দু অহিন্দু সকলের গৃহে সাগ্রহে অভ্যর্থিত হইতেন। তাঁহার ধর্মানুভূতি ও সরল ধর্ম-ব্যাখ্যা শ্রবণে আয়ার মহোদয় একদিন সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, "আমরা অনেকেই ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাতে উপকৃত হইয়াছি কতটুকু ? আমাদের সম্মুখে এই যে একজন যুবক উপস্থিত আছেন, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আমার এ-যাবৎ পরিচিত সকল ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক ; এ তো এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার ! তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম-সাক্ষাৎকার লইয়াই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নতুবা আমাদের দৃষ্টিতে এরূপ অপরিণতপ্রায় বয়সেই কোথা হইতে তাঁহার এতাদৃশ জ্ঞানরাশির ও অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইল ?" মহীশূর-মহারাজ হয়তো এই আচার্যকে পাইলে প্রীত ও উপকৃত হইবেন, এই মনে করিয়া স্যার শেষাদ্রি আয়ার তাঁহাকে

মহীশূরে লইয়া গিয়া মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে চাহিলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর পরিধানে ভিক্ষুকোচিত গেরুয়া বসন থাকিলেও তাঁহার আকৃতি ও চলনভঙ্গীতে এমন একটা রাজোচিত গাম্ভীর্য ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাব সুস্পষ্ট ছিল এবং মুখে এমন এক সারল্য ও প্রতিভার জ্যোতি বিরাজিত ছিল যে, তিনি দেওয়ানজীর পরামর্শে রাজদর্শন জন্য মহারাজ শ্রীচামরাজেন্দ্র উদীয়ারের সভাগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাজের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। আবার "স্বামীজীর চিন্তারাশির তাদৃশ অভিনবত্ব, ব্যক্তিত্বের তাদৃশ অপূর্ব আকর্ষণ, বিদ্যার তাদৃশ বিপুলতা এবং ধর্মবিষয়ে তাদৃশ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি" মহারাজের চিত্ত জয় করিল। স্বামীজী তখন হইতে রাজকীয় অতিথির মর্যাদা পাইলেন। মহারাজের সহিত অতঃপর তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত এবং দীর্ঘ আলোচনা চলিত। মহারাজ বহু বিষয়েই তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন।

একদিন সভাসদগণেরই সম্মুখে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, আমার সভাসদগণকে আপনার কিরূপ মনে হয়?" নির্ভীক স্বামীজী স্পষ্টভাষায় উত্তর দিলেন, "আমার মনে হয়, মহারাজ, আপনার হৃদয়টি অতি সুন্দর, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, আপনি সভাসদ্-পরিবৃত হয়ে থাকেন; আর সভাসদদের প্রকৃতি সর্বত্রই সমান।" মহারাজ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না না, স্বামীজী, আমার দেওয়ান অন্ততঃ তেমন প্রকৃতির লোক নন।" স্বামীজী তবু বলিলেন, "কিন্তু মহারাজ, দেওয়ানের কাজই হইল রাজার ধন সরিয়ে নিয়ে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিকে (এজেন্টকে) দেওয়া।" মহারাজ কথার ধারা পাল্টাইয়া দিলেন ও কিছুকাল পরে স্বামীজীকে স্বীয় গোপনকক্ষে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখুন স্বামীজী, অত্যধিক স্পষ্টবাদিতা অনেক ক্ষেত্রেই তেমন নিরাপদ নয়। আপনি আমার সভাসদদের সম্মুখে যেভাবে কথা বলছিলেন, এমনিভাবে ভবিষ্যতেও বলতে থাকলে, আমার ভয় হয়, কে কখন আপনার উপর বিষ-প্রয়োগ করে বসে।" স্বামীজী ঝটিতি বলিয়া উঠিলেন, "কি বলছেন আপনি? আপনি কি মনে করেন, ঠিক ঠিক যে সন্ন্যাসী সে সত্য বলতে ভয় পায়? তাতে জীবনের ভয় থাকলেও কিছু যায় আসে না। এই ধরুন মহারাজ, কাল যদি আপনার ছেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'স্বামীজী, আপনি আমার বাবার সম্বন্ধে কি মনে করেন?' আমাকে কি তখন আপনার উপর এমন সব গুণাবলী আরোপ করতে হবে, যা আমি ঠিক জানি, আপনার কোন কালে নাই?

আমাকে কি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে? কখনও না।” এইরূপ স্পষ্টবক্তা হইলেও কিন্তু স্বামীজী মহীশূর-মহারাজের অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে কত প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষাই না প্রয়োগ করিতেন! স্বামীজীর রীতিই এই ছিল যে, কাহারও দোষ দেখিলে, তাহার সম্মুখেই সেজন্য ভর্ৎসনা করিতেন, কিন্তু অসাক্ষাতে তাহার প্রশংসায় শতমুখ হইতেন, দোষের কথা তখন তাঁহার মনেই উদিত হইত না।

মহীশূর রাজ্যের রাজসভায় একদিন অষ্ট্রিয়া-দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীত বিষয়ে এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয় যে, ঐ সম্বন্ধে স্বামীজীর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হন। আর একদিন রাজপ্রাসাদে বিদ্যুৎ-শক্তিপ্রবাহের ব্যবস্থাকার্যে নিযুক্ত একজন বিদ্যুৎশিল্পীর সহিত ঘটনাবশে সাক্ষাৎ হইলে আলোচনাপ্রসঙ্গে বিদ্যুতের কথা উঠিল। তখন দেখা গেল, স্বামীজী যেন ঐ বিদ্যায়ও পারঙ্গম। মহীশূরে অবস্থানেরই এককালে স্বামীজীর উদার সার্বভৌমিক ধর্মভাব ও ধর্মানুভূতির গভীরতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত আব্দুল রহমান সাহেব নামক রাজসভার জনৈক সভাসদ কোরানের কয়েকটি কথা স্বামীজীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে এবং স্বীয় সংশয়ের নিরসন করিতে অগ্রসর হইলেন। স্বামীজী পুর্বেই কোরানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন; অতএব ঐ ভদ্রলোকের সমস্যার এমন সুন্দর সমাধান করিয়া দিলেন যে, তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

ঐ সময়ে রাজপ্রাসাদে পণ্ডিতবর্গের এক মহতী সভা আহূত হয়, এবং স্বামীজীও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। প্রধান অমাত্য উহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও বিচার্য বিষয় হয় বেদান্ত। পণ্ডিত মহাশয়গণের বক্তব্য শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় স্বামীজীকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে স্বামীজী দণ্ডায়মান হইয়া সুললিত সংস্কৃত ভাষায় কখনও সংক্ষেপে এবং কখনও বিস্তারিতভাবে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রন্থাদির সাহায্য তিনি লইলেন না, কিন্তু তাঁহার সহায় ছিল বাগ্মিতা, ভূয়োদর্শন, সারল্য, স্বানুভব ইত্যাদি এবং তিনি বেদান্তকে শুধু পণ্ডিতদিগের চিন্তারাজ্যের ব্যসনরূপে গ্রহণ না করিয়া মানবজীবনে উহার কার্যকারিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বেদান্তমতাবলম্বনে কেমন করিয়া ধর্মরাজ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে

পারে তাহাও বলিতে ভুলিলেন না। সভাস্থ সকলে তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও দৃষ্টির প্রসার দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং অজস্র সাধুবাদ বর্ষণ করিলেন।

স্বামীজীর প্রতি অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া প্রধান অমাত্য একদিন তাঁহাকে কোন একটি উপহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন, এবং একজন সেক্রেটারীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, তিনি যেন স্বামীজীকে লইয়া বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট দোকানে যান ও স্বামীজী যাহা চাহেন তাহাই কিনিয়া দেন। অমাত্যের মানরক্ষার জন্য স্বামীজী ঐ সেক্রেটারীর সহিত চলিলেন এবং সেক্রেটারী সঙ্গে একখানি চেক বই লইলেন যাহাতে দ্রব্যমূল্য হিসাবে যে কোনও পরিমাণ অর্থ অনায়াসে দেওয়া চলিতে পারে। শিশুস্বভাব স্বামীজী সানন্দে এদিক-সেদিক দেখিয়া বেড়াইলেন, বহু উত্তম উত্তম দ্রব্যের প্রশংসাও করিলেন; কিন্তু কিছুই লইলেন না। অবশেষে ক্লান্তপ্রায় হইয়া বিদায়কালে সেক্রেটারীকে বলিলেন, "বন্ধু, যদি আমার পছন্দমত কোন জিনিস লইলেই দেওয়ানজী তুষ্ট হন, তবে এক কাজ করুন, এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট চুরুট আমায় কিনে এনে দিন।" সেক্রেটারী তো অবাক্! কিন্তু তিনি আজ্ঞা পালন করিলেন ও স্বামীজী নির্বিকারচিত্তে বাহিরে আসিয়া প্রায় বার আনা মূল্যের ঐ একটি সিগার জ্বালাইয়া মুখে দিলেন এবং উহা টানিতে টানিতে গাড়ীতে চড়িয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন—যেন এমন অমূল্য সম্পদ আর কাহারও ভাগ্যে জোটে না। দেওয়ানজী সব শুনিয়া প্রথমে হাসিয়া উঠিলেন এবং পরে নিঃস্পৃহ সাধুর বৈরাগ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

একদিন মহারাজ তাঁহাকে স্বকক্ষে আহ্বান করিলেন এবং দেওয়ানজীও সঙ্গে চলিলেন। মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?" স্বামীজী সাক্ষাৎভাবে কোন উত্তর না দিয়া জলন্ত ভাষায় স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি ভারতের তৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, যদিও ভারতের বিশেষত্ব বলিতে দর্শন ও ধর্মকেই বুঝায়, তথাপি যুগপ্রয়োজনে তাহাকে পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান-অর্জনে ও সামূহিক সমাজ-সংস্কারে আশু তৎপর হইতে হইবে। ভারতকে আজ ইহার বিনিময়ে নিজ বিশেষ সম্পত্তিটি বিশ্বমানবের কল্যাণে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তিনি স্বয়ং আমেরিকায় যাইয়া বেদান্তপ্রচার করিতে পারেন। মহারাজ তখনই জানাইলেন যে, তিনি সমুচিত সাহায্য করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কি একটা ভাবিয়া স্বামীজী তখনই অর্থগ্রহণে সম্মত হইলেন

না। হয়তো তিনি তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী রামেশ্বরদর্শনের পূর্বে কোন পাকা কথা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, অথবা তিনি সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব করিবার আশা পোষণ করিতেন বলিয়া ব্যক্তিবিশেষের উপর একান্ত নির্ভর করিতে চাহেন নাই।

স্বামীজী যত অধিক দিন মহীশূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, মহারাজ ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন। অতঃপর যেদিন স্বামীজী বিদায় চাহিলেন, সেদিন তিনি সত্য সত্যই অতীব দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আরও কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "স্বামীজী, আপনার ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচিহ্নরূপে আমার কাছে একটা কিছু থাকা আবশ্যক। অতএব আপনার অনুমতি হলে ফনোগ্রামে আপনার কিছু কথা ধরে রাখতে চাই।" ইহাতে স্বামীজী সম্মত হইলেন এবং সেদিন স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের যে রেকর্ড প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা বর্তমানে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট হইয়া গেলেও আজও রাজপ্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত আছে। সত্য কথা বলিতে কি, স্বামীজীর প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধা এতই বর্ধিত হইয়াছিল যে, এককালে তিনি গুরুজ্ঞানে স্বামীজীর পাদপূজা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেন নাই।

আরও দিন কয়েক পরেই স্বামীজী বলিলেন, তিনি আর কিছুতেই থাকিবেন না। মহারাজ তখন তাঁহাকে কিছু মূল্যবান উপহার দিতে চাহিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে তেমন জিনিস গ্রহণীয় নহে বলিয়া স্বামীজী অস্বীকার করিলেন। মহারাজ তথাপি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে থাকিলে তিনি অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা মহারাজ, আমাকে যদি একান্তই একটা কিছু নিতে হয়, তবে ধাতু-সম্পর্ক-হীন একটি হুঁকা দিন। ওটা আমার কিছু কাজে লাগবে।" মহারাজ তখন কারুকার্যখচিত রোজ-উড্[১] নির্মিত একটি মনোহর হুঁকা প্রদান করিলেন। স্বামীজীর বিদায়কালে মহারাজ তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এদিকে দেওয়ানজী গোপনে তাঁহার পকেটে একতাড়া টাকার নোট গুঁজিয়া দিতে বারংবার প্রয়াস পাইলেন। স্বামীজী উহা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না; তবে বলিলেন, "দেখুন, যদি আমার জন্য সত্যি কিছু করতে চান তো ত্রিচুর পর্যন্ত

১। কাহারও মতে চন্দনকাষ্ঠ-নির্মিত।

আমার জন্য একখানি রেল-টিকিট কিনে দিন। আমি যাচ্ছি অবশ্য রামেশ্বর; কিন্তু পথে দু-চার দিনের জন্য কোচিন-রাজ্যে থামব।" প্রধান অমাত্য যখন বুঝিলেন যে, স্বামীজী বেশী কিছু করিতে দিবেন না, তখন অগত্যা একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন এবং কোচিন রাজ্যের অস্থায়ী দেওয়ান শ্রীযুক্ত শঙ্করিয়ার নামে একখানি পরিচয়পত্রও দিলেন। ত্রিচুরে অল্প কিছুদিন কাটাইয়া স্বামীজী মালাবারের মধ্য দিয়া ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হইলেন। সমুদ্রকূলে অবস্থিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নদী-পর্বত-শোভিত ও শ্যামল বৃক্ষলতা-গুল্মাদি-সমাচ্ছাদিত ভূ-ভাগ বড়ই মনোরম; এবং ইহারই মধ্যে মধ্যে অবস্থিত শস্যক্ষেত্র ও চিত্রসদৃশ গ্রামগুলি বড়ই নয়নাভিরাম। ক্রমে তিনি রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে উপস্থিত হইলেন।

ত্রিবান্দ্রমে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ারের গৃহে অতিথি হইলেন। ইনি তখন ত্রিবাঙ্কুর-মহারাজের ভাগিনেয় ও রাজ্যের প্রথম (বা সর্বজ্যেষ্ঠ) রাজকুমার[২] শ্রীযুক্ত মার্তণ্ড বর্মার গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজকুমার তখন আয়ার মহোদয়ের শিক্ষাধীনে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের 'মহারাজ মহাবিদ্যালয়ে' তখন মাদ্রাজের খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারিয়ার রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের শ্রীযুক্ত এস. কে. নায়ার এই উভয় বিদ্বানের সহিত স্বামীজীর মিলনের চিত্রটি এইরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, "এই ভদ্রমহোদয়দ্বয় নিজেরা সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে কৃতবিদ্য হইলেও স্বামীজীর সহিত সর্বদা আলাপ করিতে বিশেষ প্রীতি অনুভব করিতেন এবং উপকৃতও হইতেন। বস্তুতঃ যে কেহ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইলেই তাঁহার তেজোময় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, তিনি একই কালে একই সঙ্গে বহু ব্যক্তির বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। হয়তো কথা উঠিল স্পেন্সারের

২। ইংরেজী জীবনীর মতে ইনি ছিলেন ফার্স্ট প্রিন্স। ত্রিবাঙ্কুরে তখন সম্পত্তির অধিকারী হইতেন ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন দাবি ছিল না। সুতরাং বাঙ্গলা জীবনীতে ভ্রাতুষ্পুত্রের উল্লেখ থাকিলেও আমরা ভাগিনেয় ধরিয়া লইলাম।

দর্শন, কালিদাস কিংবা শেক্‌স্‌পিয়ারের কোন ভাব, ডারউইনের মতবাদ, ইহুদিদিগের ইতিবৃত্ত, আর্যসভ্যতার বিকাশ, বেদরাশি, মুসলমান ধর্ম অথবা খৃষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে—স্বামীজীর নিকট সর্ব বিষয়েই সমুচিত উত্তর প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার আকৃতিতে গাম্ভীর্য ও সারল্যের রেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত ছিল। তাঁহার হৃদয় ছিল পবিত্র, জীবন নিষ্পাপ ও সুসংযত, মন সর্বদা উন্মুক্ত, চিত্ত সর্ববিষয়ে অসঙ্কীর্ণ, দৃষ্টি উদার এবং সহানুভূতি সার্বভৌমিক।" ত্রিবাঙ্কুরে অবস্থানের সুযোগে ব্যক্তিগত আলাপকালে তিনি সর্বভারতীয় দৃষ্টি অবলম্বনেই কথা বলিতেন এবং বিশাল ভারতের সর্বক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কার ও গণ-অভ্যুদয়ের প্রয়োজন দেখাইতেন।

ত্রিবান্দ্রমে স্বগৃহে স্বামীজীর নবরাত্রি যাপনের কথা শ্রীযুক্তসুন্দররাম আয়ার এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ত্রিবান্দ্রমে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে; ঐ সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিছু দেখিবার এবং জানিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। ...তিনি তাঁহার মুসলমান পথপ্রদর্শকের সহিত আমার সকাশে আসিয়াছিলেন। আমার দ্বাদশ-বর্ষীয় ক্ষুদ্র বালক তাঁহাকেও মুসলমান বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল এবং ঐভাবেই তাঁহার আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়াছিল, আর স্বামীজী যেভাবে আলখাল্লাদি পরিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ বালকের পক্ষে ঐরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ দক্ষিণ দেশে হিন্দু সন্ন্যাসীর ঐ প্রকার বেশ অপরিচিত ছিল। ...স্বামীজী আমার সহিত আলাপ করিতে গিয়া প্রায় প্রথম কথাতেই অনুরোধ করিলেন, যাহাতে তাঁহার মুসলমান সঙ্গীটির আহারের ব্যবস্থা হয়। সঙ্গীটি ছিল কোচিন-রাজ্যের কার্যে নিযুক্ত একটি পিয়ন। দেওয়ানের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ডব্লিউ. রামাইয়া তাহাকে স্বামীজীর সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। বিগত দুই দিন স্বামীজী কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ব্যতীত কিছুই আহার করেন নাই; কিন্তু যতক্ষণ না ঐ মুসলমান ভৃত্যটির আহারের ব্যবস্থা হয় এবং উহা গ্রহণ করিয়া সে চলিয়া যায়, ততক্ষণ তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছুই ভাবিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েক মিনিট বার্তালাপ করিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম, স্বামীজী এক শক্তিশালী পুরুষ। ...আমি যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কিরূপ খাদ্য পছন্দ করেন?' তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'আপনার যা কিছু ভাল মনে হয়। আমাদের সন্ন্যাসীদের পছন্দ-অপছন্দের বালাই নাই।'

"স্বামীজী বাঙ্গালী, ইহা জানিতে পারিয়া আমি মন্তব্য করিলাম, 'বাঙ্গালী

জাতি অনেক কীর্তিমান পুরুষের জন্ম দিয়েছে—আর তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন শ্রেষ্ঠতম।' সেই উপলক্ষেই তিনি আমার নিকট তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলেন এবং তাঁহার অতুলনীয় আধ্যাত্মিক গুণরাশির সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় কেশব তো শিশুমাত্র; শুধু আমি নই, আমাদের সমসাময়িক বহু খ্যাতিমান বাঙ্গালী তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শেষ বয়সে কেশবচন্দ্রেরও তাঁর আওতায় এসে পড়ার সৌভাগ্য ঘটেছিল, এবং তার ফলে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে বহু শুভ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। অনেক ইউরোপিয়ানও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের জন্য লালায়িত ছিলেন এবং তাঁকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। এমন কি বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত সি. এইচ. টনি সাহেব উক্ত মহাপুরুষের চরিত্র, প্রতিভা, উদারতা ও অনুপ্রেরণাশক্তির উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।' এইসব কথা শুনিয়া আমি তো স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।···

"ঐ সময়ে ত্রিবাঙ্কুরের প্রথম রাজকুমার স্বর্গত মার্তণ্ড বর্মা আমার অধীনে পাঠাভ্যাস করিয়া এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু সেদিন স্বামীজীর উপস্থিতি, কণ্ঠস্বর, চক্ষুর দিব্যজ্যোতিঃ এবং বাক্য ও ভাবের প্রবাহের মধ্যে এমন একটা উন্মাদন-শক্তি ছিল যে, আমি ইচ্ছা করিয়াই রাজকুমারের প্রাসাদে গেলাম না। ···সন্ধ্যায় আমরা অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়ার গৃহে গেলাম, ·· তিনি ত্রিবান্দ্রম্ মহাবিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং তখনও সমগ্র দক্ষিণ দেশে পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তির জন্য কীর্তির উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি গৃহে অনুপস্থিত থাকায় আমরা গাড়ী করিয়া ত্রিবান্দ্রম্ ক্লাবে চলিলাম। সেখানে যে-সকল ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, আমি স্বামীজীকে তাঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলাম, এবং একটু পরে রঙ্গাচারিয়ার আসিলে তাঁহারও সহিত আলাপ করাইলাম। ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক সুন্দরম্ পিল্লাইও ছিলেন; আমার স্পষ্ট মনে আছে, একজন স্বর্গত ব্রাহ্মণ দেওয়ান-পেশকার ও আমার বন্ধু নারায়ণ মেননও ছিলেন। কারণ এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তুচ্ছ হইলেও স্বামীজীর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছিল; তাহাতে বুঝা গিয়াছিল, স্বামীজী চারিদিকের ঘটনাবলীর প্রতি কেমন দৃষ্টি রাখিতেন, আর তাঁহার অতুলনীয় নম্রতা ও মিষ্ট ব্যবহারের সহিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ঝটিতি প্রত্যুত্তরদানে প্রতিপক্ষকে

নিরস্ত করার ক্ষমতা কিরূপ মিলিয়া মিশিয়া থাকিত। কিছুকাল আগে ক্লাব হইতে বিদায় লইবার সময় নারায়ণ মেনন ঐ ব্রাহ্মণ পেশকারকে অভিবাদন করিলে শূদ্রের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরচ্ছলে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণগণ যেমন করিয়া থাকেন, পেশকার মহাশয়ও তেমনি দক্ষিণ হস্তাপেক্ষা বাম হস্তখানি কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উঠাইয়া মেনন মহাশয়কে প্রত্যভিবাদন জানাইয়াছিলেন। ···আমাদের যখন বিদায়ের সময় আসিল, তখন দেওয়ান-পেশকার স্বামীজীকে প্রণাম করিলে স্বামীজী সন্ন্যাসীদের প্রাচীন প্রথানুসারে শুধু 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে পেশকার মহাশয়ের ক্রোধ উদ্দীপিত হইল, এবং তিনি দাবি জানাইলেন তিনি যেভাবে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়াছেন, স্বামীজীকেও ঠিক সেইভাবে প্রতিপ্রণাম করিতে হইবে। স্বামীজী তখন পেশকারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আপনি যদি নারায়ণ মেননকে আপনার ব্রাহ্মণোচিত প্রাচীন রীতিতে প্রত্যভিবাদন করতে পারেন তো আমি আমার সন্ন্যাসিসুলভ প্রাচীন রীতিতে আপনার অভিবাদন স্বীকার করলে আপনারই বা চটবার কারণ কি?' প্রত্যুত্তরটি ফলপ্রদ হইল এবং পরদিন পেশকারের ভ্রাতা আমাদের নিকট আসিয়া পূর্ব-রাত্রের অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিলেন। ক্লাবে স্বামীজীর অবস্থিতি স্বল্পকালব্যাপী হইলেও সকলের উপর তাঁহার প্রভাব খুবই গভীর হইয়াছিল।

"স্বামীজী পরদিবস রাজকুমার মাতণ্ড বর্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; কারণ রাজকুমার আমার নিকট স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য মেধা ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিগত গুণগ্রামের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য আমিও স্বামীজীর সঙ্গে গিয়াছিলাম এবং কথাবার্তার সময় উপস্থিত ছিলাম। স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, দেশীয় অনেক রাজার সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং তিনি অনেক রাজদরবারেও উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে আগ্রহান্বিত হইয়া রাজকুমার তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা জানিতে চাহিলে স্বামীজী বলিলেন, তিনি যত হিন্দু-রাজ্যে গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড়ের রাজ্যশাসন-ক্ষমতা, দেশপ্রীতি, উৎসাহ এবং ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে, এবং ক্ষুদ্র রাজ্য খেতড়ীর রাজার সহিতও তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছে ও রাজার অতি মহান গুণাবলী দর্শনে তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। তারপর তিনি যতই

দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, ততই যেন ভারতীয় রাজা ও সামন্ত রাজাদের গুণাবলীর ও ক্ষমতার অধিকাধিক অবনতি প্রকাশ পাইয়াছে। রাজকুমার অতঃপর জানিতে চাহিলেন, তাঁহার মাতুল ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে কিনা। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা স্বামীজীর পক্ষে তখনও সম্ভব হয় নাই। এখানে উল্লেখ করিতে পারি যে, দেওয়ান শ্রীযুক্ত শঙ্কর সুব্বায়ারের সৌজন্যে দুই দিবস পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহারাজ স্বামীজীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার কুশল জানিতে চাহিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, ত্রিবান্দ্রমে ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্যত্র অবস্থানকালে দেওয়ান তাঁহার সমস্ত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই সাক্ষাৎকার মাত্র দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই সমাপ্ত হওয়ায় স্বামীজী কতকটা নিরাশ হইয়াই ফিরিয়াছিলেন।

"আমরা আবার রাজকুমারের সহিত স্বামীজীর বার্তালাপ-প্রসঙ্গেই ফিরিয়া আসি। স্বামীজী অতঃপর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজকুমারের পাঠাদি কিরূপ চলিতেছে এবং তিনি ভবিষ্যতে কি করিতে চাহেন। রাজকুমার বলিলেন, মহারাজের অন্যতম প্রধান ও রাজভক্ত প্রজা এবং শাসক-পরিবারের অন্যতম ব্যক্তিরূপে তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের লোকদিগের জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে সমুৎসুক এবং তাহাদের কল্যাণসাধনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। স্বামীজীর সংস্পর্শে যাঁহারাই আসিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই ন্যায় রাজকুমারও তাঁহার চিত্তাকর্ষক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনোহর আকৃতিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে সখের ফটোগ্রাফার ছিলেন ; অতএব ফটো তোলার জন্য স্বামীজীকে বসিতে বলিলেন।···

"স্বামীজী দেখিয়াছিলেন, আমার হিন্দুজনোচিত জীবনপ্রণালী ও চিন্তাধারায় অনেকখানি গোঁড়ামি আছে। হয়তো এইজন্যই তিনি সাধারণতঃ এমনভাবে বেশীর ভাগ কথা বলিতেন যাহা আমারই রুচি ও বিশ্বাসের অনুরূপ ; কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি কেবল দেশাচার ও লোকাচার মানিয়া চলার বিরুদ্ধে তুমুল সমালোচনার অবতারণা করিতেন।······

"বিজ্ঞান যে অদ্ভুতভাবে মানুষের নির্বিচার বিশ্বাসের দাবি করে তাহার বিরুদ্ধে তিনি একদিন ঘোর আপত্তি জানাইলেন। তিনি বলিলেন, 'ধর্মরাজ্যে যদি কুসংস্কার থাকে, তবে বিজ্ঞানের রাজ্যেও যথেষ্ট আছে। জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে

যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বা ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সে দুটিই যথাযথ বা সন্তোষজনক নয় বলে দেখা গেছে ; অথচ এমন বহুলোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, বিশ্বের সব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। অজ্ঞেয়বাদও মানুষের চিন্তাধারার অনেকখানি আত্মসাৎ করেছে ; কিন্তু ভারতে চিন্তার নিয়ন্ত্রণবিষয়ে যে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে অবহেলা করে সে শুধু নিজের অজ্ঞতা ও দম্ভেরই পরিচয় দিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান মানবপ্রকৃতির অতীন্দ্রিয় দিকগুলির ও তাদের রীতিনীতির সম্বন্ধে একটুও কূলকিনারা করে উঠতে পারে-নি। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যেখানে থেমে গেছে, সেখানে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান এগিয়ে এসে বুঝিয়ে দেয়, দেখিয়ে দেয় এবং শিখিয়ে দেয়, মানবসত্তার উচ্চতর অবস্থা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে যে-সকল রীতিনীতি সক্রিয় রয়েছে তাদের কেমন করে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে হয়। ধর্ম এবং বিশেষতঃ ভারতীয় ধর্মই মানবমনের সুগুপ্ত ও সুসূক্ষ্ম ক্রিয়াকলাপের তত্ত্ব বুঝতে পারে এবং তার অসৎ বাসনাগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করে সার্বভৌম অদ্বিতীয় সত্যের অনুভব জাগাতে পারে এবং অপর সকল বিষয় মায়ারাজ্যের মধ্যেই অবস্থিত ও উহারই সসীম প্রকাশ বলে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়।' অপর যে বিষয় সম্বন্ধে স্বামীজী আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে লৌকিক ও অলৌকিকের মধ্যে পার্থক্য। স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন, এই উভয় জিনিসই মানুষকে ইন্দ্রিয়রাজ্যে আবদ্ধ রাখার কারণ হয়, আর যিনি এই দুইটিকে অতিক্রম করিতে পারেন, কেবল তিনিই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য মুক্তির অধিকারী হন এবং তিনিই মানবীয় ও দৈব সর্বপ্রকার জাগতিক তুচ্ছ বিষয়ের উর্ধ্বে উত্থিত হন। স্বামীজী জাতিভেদ সম্বন্ধেও আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ততদিন পর্যন্তই ব্রাহ্মণরা বাঁচিয়া থাকিবেন, যতদিন তাঁহারা নিঃস্বার্থ কাজ করিতে থাকিবেন এবং নিজের জ্ঞান এবং আর সব কিছু মুক্তহস্তে দেশের অপর সকলের মধ্যে বণ্টন করিতে থাকিবেন। স্বামীজীর স্বমুখের কথাগুলি এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে, 'ব্রাহ্মণেরা ভারতের জন্য বহু মহৎ কার্য করিয়াছেন ; ভবিষ্যতে তাঁহারা ভারতের জন্য আরও মহত্তর কার্যের জন্য বিধাতাকর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছেন।' নারীদের বিবাহ ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে-সকল আচার ও বিধি লিপিবদ্ধ আছে, স্বামীজী স্পষ্টতঃ বলিতেন যে, তিনি ঐ সকলের পরিবর্তনসাধনের বিরোধী। নিম্নজাতীয় ও নিম্নশ্রেণীয়দেরই ন্যায় নারীদিগকেও সংস্কৃত শিখিতে হইবে, প্রাচীন

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি স্বায়ত্ত করিতে হইবে, এবং ঋষিদের সমস্ত আধ্যাত্মিক আদর্শকে জীবনে রূপ দিতে হইবে ; এইরূপ হইলে তাহারা তাহাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধীয় সমস্ত সমস্যার সমাধানভার স্বহস্তে লইতে পারিবে এবং তখন আধ্যাত্মিক সত্যের স্বানুভবজনিত আলোকসহায়ে এবং স্বীয় প্রয়োজন ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেরাই ঐসকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে।······

"আমার গৃহে স্বামীজীর তৃতীয় এবং চতুর্থদিন অবস্থানকালে আমি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেশীয় ভাষায় পরিচালিত শিক্ষার অধিনায়ক (ডিরেক্টর) শ্রীযুক্ত এস. রাম রাওকে সংবাদ পাঠাইলাম।···আমার পরিষ্কার মনে আছে, রাম রাও একবার স্বামীজীকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বুঝাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় কৃষ্ণকর্ণামৃতের রচয়িতা লীলাশুকের জীবনের অনুরূপ আর একটি জীবনকাহিনী শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ কাহিনীর শেষাংশে আসিয়া যখন তিনি বলিলেন ঐ গল্পের নায়ককে (বিল্ব-মঙ্গলকে) বৃন্দাবনে লইয়া আসিলে তৎপূর্বে জনৈক শেঠদুহিতাকে কামপ্রবৃত্তি লইয়া অনুসরণ করারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি কিরূপে নিজ চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমিতে তপস্যায় দেহপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তখন আমার সম্মুখে যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিল, উহা আমার মনে আজ একবিংশতি বৎসর পরেও ঠিক তেমনি সুস্পষ্টাকারে বর্তমান আছে, যেমন নাকি সেই কুম্ভকোনমের দৈবশক্তিসম্পন্ন বংশীবাদক শ্রীযুক্ত শরভ শাস্ত্রিয়ারের তীব্র মর্মস্পর্শী ও অমর স্বরলহরী চিরকালের মতো হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়। স্বামীজীর শেষ কথাগুলি ছিল এই, 'চঞ্চল এবং অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়গুলির সংযমের পূর্বে এবং ঐ সংযমসহায়ে মনকে ভগবানের দিকে ফিরাবার উদ্দেশ্যে যদি প্রয়োজন হয় তো (চক্ষু উৎপাটন করার মতো) এমন চরম প্রতীকারও অবলম্বনীয়।'

"তৃতীয় বা চতুর্থ দিনের অবস্থানকালে আমি স্বামীজীর অনুরোধে মাদ্রাজের সহকারী একাউন্টেণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলাম।···তখন হইতে স্বামীজী সকালবেলাটা ভট্টাচার্যের গৃহেই কাটাইতেন এবং সেখানেই আহার করিতেন। একদিন আমি যখন অনুযোগ করিলাম যে, তিনি সব সময়টা ভট্টাচার্যেরই জন্য ব্যয় করিতেছেন, তখন তিনি এমন একটি উত্তর দিলেন, যাহা কেবল স্বামীজীরই মুখে শোভা পায়। তিনি বলিলেন,

'দেখুন, আমরা বাঙ্গালীরা নিজেদের মধ্যে দলবেঁধে থাকতেই অভ্যস্ত।' তিনি আরও কহিলেন যে, ভট্টাচার্য তাঁহার বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের সহপাঠী ছিলেন, এবং তিনি কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র বলিয়া স্বামীজীর উপর তাঁহার অধিকতর দাবি আছে। অধিকন্তু তিনি দীর্ঘকাল মৎস্যাহার করেন নাই, কারণ দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে তাঁহাকে দক্ষিণী ব্রাহ্মণদেরই আতিথ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং ইঁহারা মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করেন না। কাজেই তাঁহার চিরাভ্যস্ত খাদ্যগ্রহণের এই সুযোগ তিনি ছাড়িতে চাহেন না। আমি তখনই মৎস্য-মাংসভক্ষণ বিষয়ে আমার ঘৃণা প্রকাশ করিলাম। স্বামীজী বলিলেন, ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা মাংসাশী, এমন কি গোমাংসাশী ছিলেন ; এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগকে যজ্ঞার্থ বা অতিথির জন্য মধুপর্করচনার্থ গোবধ ও অন্যান্য পশুবধ করিতে হইত। তাঁহার মতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে ক্রমে মৎস্যাহার ও মাংসাহার বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্য মতবাদ হিসাবে হিন্দুশাস্ত্রে নিরামিষাশীদের অধিক সম্মান দেওয়া হইত। হিন্দুদের উত্তরোত্তর শক্তিহ্রাস এবং অবশেষে সমগ্র হিন্দুজাতির এবং বিভিন্ন হিন্দুরাজ্যের স্বাধীনতাহীনতার একটা অন্যতম প্রধান কারণ এই মাংসাহারের প্রতি অবজ্ঞা। স্বামীজীর মতে (অন্ততঃ তিনি যেভাবে আমাকে বুঝাইয়াছিলেন তদনুসারে) বর্তমান জগতে শক্তিলাভ ও প্রাধান্যস্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে কিংবা তাহার বাহিরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, তাহাতে নিজেদের স্থান অপ্রতিহত রাখিতে হইলে হিন্দুদের পক্ষে নির্বিবাদে মাংসাহার অবশ্যকর্তব্য।...

"একবার শ্রীপিরাবী পেরুমল পিল্লাই নামক ত্রিবান্দ্রমের হুজুর অফিসের জনৈক সহকারী দেওয়ান বা পেশকার স্বামীজীকে কথাবার্তায় অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়া তাঁহার বাঙ্গালী বন্ধুর বাটীতে যথারীতি যাইতে দেন নাই। তিনি যাচাই করিতে আসিয়াছিলেন স্বামীজী ভারতীয় উপাসনা পদ্ধতি ও ধর্ম সম্বন্ধে কতটা কি অবগত আছেন। তিনি অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ-পক্ষাবলম্বনে কথা পাড়িলেন; কিন্তু অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামীজী একজন আচার্য; অতএব তাঁহার মেধাশক্তি কতদূর বিস্তৃত বা কত গভীর, ইহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টায় বৃথা সময় না কাটাইয়া বরং স্বীয় ধর্মোদ্দীপনার কাজে লাগাইবার জন্য যে যতখানি পারে ততখানি তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে আহরণ করিলে ভাল হয়।

আমি এই সুযোগে স্বামীজীর এমন একটি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম যাহার বলে তিনি একমুহূর্তে আত্মশ্লাঘী আগন্তুকের বুদ্ধির দৌড় ধরিতে পারিতেন এবং তাহাকে অজ্ঞাতসারে এমন এক উপযুক্ত চিন্তান্তরে লইয়া আসিতেন যাহাতে তিনি স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে চলিয়া এবং তাঁহার নিকট প্রেরণালাভ করিয়া জীবনে উপকৃত হইতে পারেন। বর্তমান ক্ষেত্রে স্বামীজী 'ললিত বিস্তর' হইতে বুদ্ধের বৈরাগ্য সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক এমন চিত্তাকর্ষক স্বরে আবৃত্তি করিলেন যে আগন্তুকের হৃদয় বিগলিত হইল। স্বামীজী তখন তাঁহার তৎকালীন মনোভাবের সুযোগ লইয়া সুকৌশলে বুদ্ধের বৈরাগ্য, অদম্য সত্যানুসন্ধিৎসা, পরিশেষে সত্যলাভ এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া জাতিবর্ণ নির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষের ভেদ ভুলিয়া ঐ সত্যের প্রচার বিষয়ে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে একটি স্থায়ী ছাপ রাখিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। প্রসঙ্গশেষে আগন্তুক ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং স্বীকার করিলেন যে, তিনি অন্ততঃ সেই কালের মতো জাগতিক তুচ্ছ ও মিথ্যা বিষয়গুলির উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছেন। বিদায়কালে তিনি বারংবার ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং বলিয়া গেলেন, তিনি তাঁহার মতো ব্যক্তি জীবনে আর কখনও দেখেন নাই, এবং এই উপদেশের কথা কখনও ভুলিবেন না।...

"একবার আমি তাঁহাকে প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদানের কথা বলি। তাহাতে তিনি বলেন, তিনি পুর্বে কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন নাই, এবং ঐরূপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই শোচনীয়রূপে বিফল ও হাস্যাস্পদ হইবেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাই যদি হয় তবে তিনি কিরূপে চিকাগোর ধর্মমহাসভার গণ্যমান্য বুধমণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন? ইতিপুর্বে আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়া রাখিয়াছিলাম যে, মহীশূরের মহারাজ তাঁহাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে তথায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। স্বামীজী আমার প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিলেন যে, অন্ততঃ তখনকার মতো আমার মনে হইয়াছিল, ইহা এড়াইয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি কহিলেন, "পরমেশ্বরের যদি এই অভিপ্রায় হয় যে তাঁকে তাঁর মুখপাত্ররূপে খাড়া করা হবে এবং তাঁকে দিয়েই সত্যের ও পবিত্র জীবনযাপনের সমর্থনে কোন গুরুত্বপুর্ণ কাজ করিয়ে নেওয়া হবে, তবে পরমেশ্বরই তাঁকে তদুপযুক্ত শক্তি ও গুণাবলীতে বিভূষিত করবেন।" আমি তখনই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, আমি এই জাতীয় দৈব সাহায্যের

সম্ভাবনায় বিশ্বাসী নহি।...অমনি তিনি যেন মুদ্গরাঘাত করারই মতো তীব্র ভাষায় আমার নিন্দাচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন যে, আমি যদিও বাহ্যতঃ আচার-নিষ্ঠায় ও কথাবার্তায় গোঁড়া হিন্দু, তথাপি আমি অন্তরে সন্দেহবাদী, কারণ ......ভগবান কৃপাপরবশ হইয়া জগতের কল্যাণসাধনে কতদূর পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিবেন এ বিষয়ে আমি একটা সীমা টানিয়া দিতে চাই।

"আরও একবার ভারতীয় নৃতত্ত্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। স্বামীজীর মতে যেখানেই কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ দেখা যাইবে সেখানেই বুঝিতে হইবে, অধঃপতন হইয়াছে এবং দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, দেহের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া থাকে এবং এইজন্য দেশের শীতাতপ, খাদ্য, জীবিকানির্বাহক কার্যের জন্য গৃহাভ্যন্তরে থাকা কিংবা বাহিরে সময় কাটানো ইত্যাদিই প্রধানতঃ দায়ী। স্বামীজী আমার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বলিলেন, জগতের অপরাপর মনুষ্য-সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মণরাও মিশ্রবর্ণ এবং তাঁহাদের ক্ষেত্রে জাতিসঙ্কর ঘটে নাই, ইহা নিছক কল্পনা মাত্র। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে সি. এল. ব্রাইস প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতদের মত তুলিয়া দেখাইলাম, ভারতীয় জাতিগুলির ক্ষেত্রে বর্ণ-সঙ্কর ঘটে নাই ; কিন্তু স্বামীজী একটুও পশ্চাৎপদ না হইয়া নিজমতেই অবিচলিত রহিলেন।

"তিনি যতক্ষণ আমাদের গৃহে ছিলেন, সবসময়ই আমাদের সকলের হৃদয় আপনার করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁহার ব্যবহার ছিল অতি মিষ্ট, হৃদ্যতাপূর্ণ ও সৌজন্যময়। আমার ছেলেরা প্রায়ই তাঁহার কাছে কাছে ঘুরিত ; একটি তো এখনও কথায় কথায় তাঁহার মত উদ্ধৃত করে এবং আমাদের গৃহে তাঁহার আগমন ও তাঁহার আকর্ষণীয় হাবভাব চলন-বলনের স্মৃতি তাহার নিকট অতীব সুস্পষ্ট। স্বামীজী অনেকগুলি তামিল শব্দ শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং আমাদের পাচকের সহিত তামিলে কথা বলিতে আনন্দ পাইতেন।...তিনি চলিয়া গেলে আমাদের দীর্ঘকাল মনে হইত, আমাদের ঘরের আলো যেন নিভিয়া গিয়াছে।

"স্বামীজী তাঁহার বাঙ্গালী সাথী শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সহিত ২২শে ডিসেম্বর (১৮৯২) আমার গৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ের একটি ঘটনা বলা আবশ্যক। (সংস্কৃত ভাষায় রচিত সর্বাপেক্ষা দুরূহ শাস্ত্র ব্যাকরণে) লব্ধ-

বিত্ত এবং জনসমাজে ধার্মিক পণ্ডিত ও বিনয়ী বলিয়া সম্মানিত শ্রীযুক্ত বল্কীশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় ত্রিবাঙ্কুরের প্রথম রাজকুমারের বৃত্তিভোগী ছিলেন এবং আমার অনুরোধে রাজকুমার তাঁহাকে আমার পুত্রের সংস্কৃতাধ্যাপক করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজী যে এতদিন আমার গৃহে রহিলেন, ইহার মধ্যে একদিনও শাস্ত্রী মহাশয় সেখানে আসেন নাই। এখন ঠিক যাত্রাকালে আমার নিকট আসিয়া ধরিয়া বসিলেন, স্বামীজীর সহিত অল্পকালের জন্য হইলেও, এমন কি দুই-চারি মিনিটের জন্যও আলাপ করাইয়া দিতে হইবে। তিনি যদিও সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, উত্তর ভারত হইতে একজন সুবিদ্বান সাধু আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তবু অসুস্থতানিবন্ধন দেখা করিতে আসিতে পারেন নাই।...স্বামীজী ও ভট্টাচার্য তখন সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন ঘোড়া-গাড়ীতে উঠিবার জন্য।...স্বামীজীকে পণ্ডিতের অনুরোধ জানাইবামাত্র তিনি তাঁহার সহিত সাত-আট মিনিট ধরিয়া সংস্কৃতে আলাপ করিলেন। ঐ সময় আমার সংস্কৃত জ্ঞান ছিল না; অতএব তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় ধরিতে পারি নাই। পরে পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন, আলোচ্য বিষয় ছিল, ব্যাকরণের এক জটিল ও তর্কবহুল সমস্যা, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেও স্বামীজী তাঁহার ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃতভাষায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।"

প্রচলিত জীবনীগুলির মতে স্বামীজী ত্রিবান্দ্রম্ হইতে রামেশ্বরে যান এবং রামেশ্বর দর্শনান্তে কন্যাকুমারীতে আসেন। কিন্তু এই মতের পরিবর্তন আবশ্যক। শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ারের পুত্র শ্রীযুক্ত কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী 'প্রবুদ্ধভারত' পত্রিকার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩, ৩৮৫ পৃঃ): "১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ ত্রিবান্দ্রম্ হইতে কেইপ্ কোমরিন (কন্যাকুমারী) যান।...সমুদ্র হাঙ্গরে পূর্ণ ছিল; নৌকা করিয়া রকে (বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে) লইয়া যাইবার জন্য মাঝি এক আনা চাহিল; কিন্তু স্বামীজী কপর্দকশূন্য ছিলেন। অতএব সাহসভরে সাঁতার কাটিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক রকে উপস্থিত হইলেন[১] ও সেখানে জগন্মাতা কন্যাকুমারীর আনন্দময় মূর্তির ধ্যানে ও জন্মভূমি ভারতমাতার গভীর চিন্তায় রাত্রিযাপন করিলেন। সূর্যোদয়ের পরে

১। ২২শে ডিসেম্বর তিনি ত্রিবান্দ্রম্ ত্যাগ করেন। হয়তো ২৪শে ডিসেম্বর এই রকে উপস্থিত হন ও সেখানে রাত্রিযাপন করেন—সেটি যীশুর জন্মরজনী। স্বামীজীর ত্রিবান্দ্রম-ত্যাগ-কালে শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি তীরভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। কেইপ্ কোমরিন হইতে স্বামীজী পদব্রজে রামনাদে যান এবং সেখান হইতে পণ্ডিচেরীতে ও পরিশেষে মাদ্রাজে উপস্থিত হন।" সৌভাগ্যক্রমে শাস্ত্রী মহাশয় এখনও (এপ্রিল, ১৯৬৫) জীবিত আছেন; তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানা গিয়াছে যে, স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া যখন মাদ্রাজে নয় দিন ছিলেন, তখন স্বামীজীরই মুখে তিনি কন্যাকুমারীর এই বিবরণ শুনিয়াছিলেন।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই পর্যটনধারা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। শ্রীযুক্ত সুন্দর রাম আয়ারের বিবৃতি হইতে আমরা অবগত আছি, স্বামীজী মন্মথ ভট্টাচার্যের সহিত ঘোড়ার গাড়ীতে (ক্যারেজে) তাঁহার বাড়ী হইতে যাত্রা করেন। কন্যাকুমারীর দূরত্ব খুব বেশী নয়। তখন মোটরগাড়ী প্রচলিত না হইলেও মনে হয় গরুর গাড়ীতে তিন দিনে এবং ঘোড়ার গাড়ীতে দুই দিনে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল। এত কাছের জায়গা পেছনে ফেলিয়া স্বামীজী কেন হঠাৎ রামেশ্বর চলিয়া গেলেন ও আবার উলটা পথে ফিরিয়া কন্যাকুমারী দর্শন করিলেন, ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না। এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা ভাল। হয়তো মন্মথবাবু ও স্বামীজী একই সঙ্গে কন্যাকুমারীতে গিয়াছিলেন, পরে স্বামীজী একা সেখানে ছিলেন ও পণ্ডিচেরী পর্যন্ত একা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ত্রিবান্দ্রম্ হইতে ইহারা একসঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা জীবনীকার প্রমথবাবুর মতে তখন এইরূপ জনশ্রুতি ছিল যে, কন্যাকুমারীতে স্বামীজী মন্মথবাবুর অল্পবয়স্কা কন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করিয়াছিলেন। আবার পণ্ডিচেরী হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত স্বামীজী মন্মথবাবুর সঙ্গেই গিয়াছিলেন, ইহাও জীবনীগ্রন্থে লিখিত আছে। আমরা উপরের সিদ্ধান্তানুযায়ী এইকালের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতেছি।

কন্যাকুমারীর মন্দির ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত; তাহার পরই তিন দিকে উত্তাল সমুদ্র—পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। সমুদ্র মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কয়েকটি প্রস্তরময় দ্বীপ (রক)। মন্দিরে মা কুমারী শিবের চিন্তায় নিমগ্না—অতি সুন্দর সে মূর্তি, দর্শনমাত্র হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। স্বামীজী মাতৃদর্শনার্থ বালকবৎ ব্যাকুলচিত্তে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন এবং দেবী কুমারীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। দর্শন ও পূজা শেষ হইয়া গেলে তিনি সেখানে বসিয়া মাতৃভূমির কল্যাণচিন্তা করিলেন। অতঃপর সমুদ্র-তীরে গেলেন ও অন্য উপায় না দেখিয়া সন্তরণপূর্বক কিঞ্চিৎ দূরে

সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিলেন। সেখানে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন এবং এইভাবেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাঁহার চিন্তার বস্তু ছিল, বহুধর্মের জন্মস্থান ও মিলনক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ—ভারতের গৌরবময় অধ্যাত্ম মহিমোজ্জ্বল অতীত, দুঃখ-দারিদ্র্যনিমগ্ন, হৃতবীর্য, হৃতগৌরব, হৃতাধ্যাত্মসম্পদ বর্তমান, এবং তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ভারতের এই লুপ্ত গৌরব কি পুনর্বার সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে কি সে উপায়? পুর্ব হইতে পশ্চিম এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি তিনি পর্যটন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঋষির সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, গৌরবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় ভারত কেমন করিয়া অবনতির নিম্নতম স্তরে নামিয়া আসিল। অতীতের সেই বিশ্লেষণপুর্ণ স্মৃতির সঙ্গে সমুদিত হইল বর্তমান ভারতের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাস্তব রূপ; আর মন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল ভবিষ্যতের পথ। সেই নির্জন দ্বীপে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিল একটি মাত্র চিন্তা—ভারত ও ভারতের ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায়। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ হেন পরিস্থিতিতে কিরূপ ব্রত তাঁহার পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে এবং সে ব্রত কেমন করিয়া উদ্‌যাপিত হইবে। সে চিন্তা পরার্থে উৎসর্গিতপ্রাণ সন্ন্যাসীকে এক আমূল-সংস্কারক, সুমহান সংগঠক ও শক্তিমান আত্মানুভবসম্পন্ন দেশনায়কে রূপান্তরিত করিল। তিনি তখন বঙ্গদেশ আর্যাবর্ত অথবা দাক্ষিণাত্যের কথা না ভাবিয়া অখণ্ড ভারতেরই ভাবনায় মগ্ন রহিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভারতেতিহাসের সব পৃষ্ঠাই যেন সমকালে খুলিয়া গেল, আর অন্তরে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতে উহা পাঠ করিতে গিয়া তিনি পাইলেন ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার একখানি পুর্ণ ও অত্যুজ্জ্বল চিত্র। সুদক্ষ তক্ষকের সম্মুখে যেমন কোন সুপরিকল্পিত বিরাট প্রাসাদের চিত্র স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ এক সুবিন্যস্ত অখণ্ডাকারে ভাসিয়া উঠে, স্বামীজীও তেমনি ভাবী ভারতকে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব লইয়া বিরাজিত অখণ্ড সত্তারূপেই দর্শন করিলেন। তিনি বুঝিলেন, ধর্মই অগণিত ভারতসন্তানের মেরুদণ্ড। তাঁহার শান্ত সমাহিত বিশুদ্ধ চিত্তে এই বাণীই ধ্বনিত হইল, "যে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভাবে ভারতবর্ষ একদিন বিভিন্ন সংস্কৃতির ও বিভিন্ন ধর্মের জন্মভূমি ও মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, একমাত্র সেই অনুভূতিবলেই পুনর-

ভ্যুত্থান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর।" তিনি উন্নতি ও অবনতির উভয় চিত্র মিলাইয়া বুঝিলেন, ভারতের দুর্গতির কারণ এই যে, যথার্থ ধর্ম কোথাও সর্বজনীনরূপে ও সক্রিয়ভাবে অনুসৃত হয় নাই। ধর্মকে যথাযথ অনুসরণ করিয়া ও জীবনে তাহাকে রূপায়িত করিয়া কোন জাতি কখনও অধঃপতিত হয় নাই, প্রত্যুত ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, জাতীয় জীবনে যত শক্তি সাফল্য আনয়নে সমর্থ হয়, সক্রিয় ধর্ম তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

গভীর বিষাদ ও সমবেদনা লইয়া তাঁহার চিত্ত ভারতের সর্বসাধারণের উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের কথাই ভাবিতে লাগিল—জনগণের অভ্যুদয়ের ব্যবস্থা যে ধর্মে স্থান পায় না, সে ধর্মে প্রয়োজন কি ? ইতিহাস বলিয়া দেয়, ভাগ্যপরিবর্তনের ফলে ভারতে যখন যে কোন রাজশক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে উহাই তখন দরিদ্র-দিগকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত করিয়াছে সাত শত বর্ষ ধরিয়া। পুরোহিত-প্রভাবিত ধর্মের আশ্রয় লইয়াও দরিদ্রগণ এই উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পায় নাই। প্রত্যুত সহস্রযুগব্যাপী পুরোহিতকুলের একাধিপত্য জাতিবিভাগোত্থ উৎপীড়ন এবং এই সকল সমাজবিধান অবলম্বনে সমাজদেহের অতিভয়ঙ্কর বিখণ্ডীকরণ প্রভৃতির ফলে ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদের অধিকাংশ শূদ্র, অস্পৃশ্য ও বেদবহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সব বিঘ্ন স্বামীজীর দৃষ্টিতে জাতীয় উন্নতির পক্ষে অবশ্য-অপসরণীয় বলিয়াই প্রতিভাত হইল। দরিদ্র জনগণের দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সমস্বরে বাঁধা তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী তাহাদেরই ক্রন্দনে কাঁদিয়া উঠিল। এক সুগভীর মনোবেদনা লইয়া তিনি ভারতের অবহেলিত নিম্ন-জাতির সহিত এক হইয়া গেলেন। তাহাদের ব্যথা তখন তাঁহারই ব্যথা, তাহাদের অপমানে তাঁহারই অপমান, তাহাদের ভাগ্যের সহিত তাঁহারও ভাগ্য অবিচ্ছেদ্য-সূত্রে গ্রথিত। যাঁহারা আপনাদিগকে ধর্মের সংরক্ষক ভাবিয়া গর্বানুভব করেন তাঁহারাই আবার যুগযুগান্তর ধরিয়া অসংখ্য জনরাশিকে পদানত করিয়া রাখিতে চাহেন, একথা ভাবিতেও তিনি মর্মাহত হইলেন। ঐ কালের চিন্তা কত ঐকান্তিক ও সুগভীর ছিল তাহার ক্ষীণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার পরবর্তী কালের একখানি পত্রে। তিনি লিখিয়াছেন : "এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না ; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—কুমারিকা অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে —এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে দর্শন-শিক্ষা

দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী (পুরোহিত) বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।...আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্য ভারতের এত দুঃখ কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচ জাতিকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে শক্তি তাও আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে আনতে হবে—গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের ধর্মের দোষ নয়, ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুনই এইসব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ। এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি দশ-পনর জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে !!...তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব, আর আমার বাকী জীবন এই এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করব।" ('বাণী ও রচনা' —৬।৪১২-১৩)।

এই উদ্ধৃতির প্রথমাংশেই স্বামীজীর একটি মহতী বাণী সুস্পষ্ট হইয়াছে—ভারতের কার্যপন্থা রচিত হইয়া গিয়াছে—ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে। স্বামীজীর সমকালে ভারতীয় সন্ন্যাসিবৃন্দ ত্যাগের মহিমাই বিঘোষিত করিতেন; স্বামীজী এই প্রচারের সঙ্গে সেবাকেও সংযোজিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্মকে নিন্দা না করিয়া তিনি উহাকে জাতির মর্মস্থলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন, আর চাহিয়াছিলেন শিক্ষার বিস্তার, নীচজাতির অভ্যুত্থান ও দারিদ্র্যবিমোচন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, কন্যাকুমারিকায় উপস্থিত হইবার পূর্বেই স্বামীজীর এই জাতীয় চিন্তাধারা কথাপ্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং ইহাকে কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনি রাজদরবারাদিতে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। সেই অভিজ্ঞতার ফলই পূর্বোক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, "ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে !! মূর্খ, ভীমরতিগ্রস্ত, ও স্বার্থপরতার মূর্তি—তারা দেবে!" অতএব তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল তাঁহাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে সন্ন্যাসীর পক্ষে

নিষিদ্ধ অর্থোপার্জনেও তৎপর হইতে হইবে। পরদুঃখে কাতর মহাপ্রাণ মহা-পুরুষের কী অদ্ভুত আত্মত্যাগ! তিনি পরে যে বহুবার বলিতেন—আত্মমুক্তির চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক পরহিতে একান্তভাবে নিযুক্ত হইলে যদি পাপস্পর্শ হয় এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে তিনি সেজন্য প্রস্তুত—উহা শুধু কথার কথা নহে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত উক্ত পত্রখানির যে অংশটি এখানে প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত হইল, উহা কন্যাকুমারিকাতে স্বামীজীর চিত্তে উদ্ভাসিত বা উপলব্ধ সমস্ত বিষয়ের সামূহিক বর্ণনা হিসাবে তাঁহার লেখনীমুখে লিপিবদ্ধ হয় নাই; আবার যে কয়টি কথা তিনি অন্য প্রসঙ্গব্যপদেশে তুলিয়াছেন, তাহাও পরিপূর্ণরূপে লিখিয়া গিয়াছেন, এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের জন্য উৎসুক ছিলেন। কন্যা-কুমারীতে সে চিন্তার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল কিনা কে জানে? তবে অর্থো-পার্জনের উল্লেখ মধ্যে উহার আভাস হয়তো নিহিত রহিয়াছে। স্বামীজী ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ পাশ্চাত্ত্যের সর্বত্র বিতরণ করিয়া উহারই বিনিময়ে অর্থলাভের আশা পোষণ করিতেন। কারণ তাঁহার মতে প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন ঘটিবে এইরূপ সশ্রদ্ধ আদান-প্রদানেরই মাধ্যমে। ইহা ছিল তাঁহার অন্যতম পরিকল্পনা। তিনি ইহাও চাহিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের কর্মোদ্যমের সঙ্গে প্রাচ্যের ভগবদ্ধ্যানের মিলন ঘটাইতে হইবে। সেদিন সমুদ্রগর্ভে প্রস্তর-দ্বীপোপরি সমাসীন চিন্তাকুল সন্ন্যাসীর সম্মুখে যখন উত্তাল তরঙ্গ প্রবলগর্জনে তটোপরি আঘাত করিয়া যেন ভূভাগ বিদারণে উদ্যত ছিল, অথচ এই উর্মি-মালার চাঞ্চল্যের পশ্চাতে কোন মহদুদ্দেশ্যের আভাসমাত্রও ছিল না, আর সেই সন্ন্যাসিপ্রবরের পশ্চাতে পড়িয়া ছিল বিশাল ভারতভূমি, যাহার জনগণের মুখে বিষাদকালিমা, অন্তরে সাহসহীনতা, ঈশ্বরধ্যানের সহিত জীবনের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, —যেন সমস্ত ভারতভূমি গাঢ় তমসাচ্ছন্ন—তখন কে বলিবে, স্বামীজীর মনে ধর্মকে গতিশীল কর্মে পরিণত করিবার এবং কর্মকে ভগবল্লাভের উপায়ে রূপান্তরিত করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়াছিল কিনা? আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল—নতুবা সন্ন্যাসীদিগকে কার্যে ব্রতী করিবার বাসনা কেন তখন তাঁহার মনে জাগিল?

যাহা হউক, সেদিন তাঁহার সঙ্কল্প স্থির লইয়া গেল—তিনি সাগর অতিক্রম

করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে আমেরিকায় যাইবেন, তাঁহারই নির্দেশে পরিচালিত হইবেন এবং সাফল্যমণ্ডিত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে ব্রতী হইবেন। ভগবান তখন তাঁহার নিকট সুদূর স্বর্গে অবস্থিত পিতা, মাতা, ন্যায়াধীশ বা অন্য কোনরূপে অনুভূত না হইয়া সর্বতোব্যাপী নারায়ণরূপেই প্রতিভাত হইলেন—"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥" তাঁহারই পূজায় আত্মোৎসর্গ করিতে তিনি এখন সমুৎসুক। এ পূজার তুলনায় আপনার মুক্তিচেষ্টাও অকিঞ্চিৎকর, নির্বিকল্প সমাধিও তুচ্ছ।

ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসী অতঃপর পদব্রজে দণ্ডকমণ্ডলু-হস্তে রামনাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।[২] সেখানে উপনীত হইলে রামনাদের রাজা শ্রীযুক্ত ভাস্কর সেতুপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। স্বামীজী তাঁহার নামে একখানি পরিচয় পত্র আনিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ইনি অতীব বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং ধার্মিক ছিলেন। স্বামীজীর গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী এ যাবৎ অনেক রাজা মহারাজার নিকটই জনসাধারণের শিক্ষা, কৃষির উন্নতি, ভারতীয় জীবনের তদানীন্তন সমস্যা ও তাহার সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। সেতুপতির নিকটও সেই সকল প্রসঙ্গ তুলিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় ধর্মজীবন, ভারতীয় ধর্মের মহিমা এবং পাশ্চাত্ত্যদেশে উহার প্রচারের সম্ভাবনা প্রভৃতির কথাও বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া সেতুপতি তাঁহাকে চিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, তিনি যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি স্বামীজীকে ইহাও বুঝাইতে চাহিলেন যে, চিকাগো ধর্মসভায় তাঁহার উপস্থিতির ফলে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে তাঁহার ভারতীয় কার্যেরও পথ সুগম হইবে। এমন সুযোগ সহজে আসে না এবং ইহা গ্রহণ করা সর্বতোভাবে অত্যাবশ্যক। কিন্তু স্বামীজী তখন রামেশ্বর দর্শনে উদ্‌গ্রীব; সুতরাং রাজার নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন।[৩]

২। রামস্বামী শাস্ত্রীর মতে স্বামীজী কন্যাকুমারীতে তিন রাত্রি কাটাইয়াছিলেন।

৩। প্রচলিত জীবনীগুলির মতে স্বামীজী ত্রিবান্দ্রম হইতে মাদুরায় গমন করেন এবং মাদুরাতেই রামনাদ-রাজের সহিত মিলন হয়। তারপর তিনি রামেশ্বরে যান। কিন্তু রামস্বামী শাস্ত্রীর মতে

রামনাদ হইতে স্বামীজী দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া রামেশ্বরে উপনীত হইলেন। রামেশ্বর দক্ষিণের বারাণসী—শ্রীরামচন্দ্রের শুভাগমনের ফলে এবং ৺রামেশ্বর শিবের অবস্থিতিপ্রভাবে পুণ্যাতিপুণ্য তীর্থক্ষেত্র। মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি একশত ফুট উচ্চ। চতুর্ভুজাকার মন্দিরপ্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত সুদীর্ঘ বারান্দাগুলি কারুকার্যপরিপূর্ণ। ইহার সর্বত্র যে বিশালত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে উহা বিস্ময়োৎপাদক। লঙ্কাবিজয়ের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীরামচন্দ্র এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবদর্শন ও পূজাদি করিয়া স্বামীজীর এক অতিদীর্ঘকালের বাসনা পরিপূর্ণ হইল। অতঃপর তিনি মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী কন্যাকুমারীতে ছিলেন। অতএব দক্ষিণের তীর্থদর্শনান্তে মাদ্রাজের অভিমুখে যাত্রাকালে নববর্ষ (১৮৯৩) আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। উহাই স্বামীজীর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৎসর; জগৎপিতা ও জগজ্জননীর আশীর্বাদরূপ রক্ষাকবচে আবৃত হইয়াই তিনি এই নববর্ষে পদার্পণ করিলেন। প্রায় এই সময়েই তিনি ত্রিংশ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিয়া একত্রিংশ বর্ষে প্রবেশ করিতেছেন। ক্রমে পথক্লান্ত পর্যটক রামনাদে আসিলেন এবং ঐ স্থান এবং আরও উত্তরে মাদুরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনান্তে ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইলেন। এই পণ্ডিচেরীতেই স্বামীজীর সহিত এক অতি গোঁড়া পণ্ডিতের হিন্দুধর্ম, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে ঘোর তর্ক বাধিয়া যায়। ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৬৪) প্রাচীনপন্থী সঙ্কীর্ণমনা পণ্ডিতের প্রতিটি কথা স্বামীজীর কর্ণে শূলবৎ কষ্টদায়ক বোধ হইতেছিল। পাণ্ডিত্য যে তাঁহার খুব অধিক ছিল তাহা নহে, কিন্তু কথায় তিনি বিষোদ্গার করিতেছিলেন এবং স্বামীজীর উদার ও শান্ত বচনরাশি যেন তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কার্য করিতেছিল। ক্রমে সমুদ্রযাত্রার কথা আসিয়া পড়িল। পণ্ডিত যখন স্বামীজীর সহিত আর তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না তখন বিকট মুখভঙ্গী করিয়া স্বামীজীর প্রতিকথায় সজোরে সংস্কৃতভাষায় আপত্তি জানাইতে লাগিলেন, "কদাপি ন, কদাপি ন"—(কখনও হতে পারে না, কখনও না)।

তিনি কন্যাকুমারী হইতে হাঁটিয়া রামনাদে যান। ইংরেজী জীবনীরও মতে রামেশ্বর দর্শনান্তে তিনি কন্যাকুমারী যান ও কন্যাকুমারী হইতে পদব্রজে রামনাদে উপস্থিত হন। বস্তুতঃ পদব্রজে আসিলে মাদুরার রাস্তা দীর্ঘতর। অধিকন্তু আমরা ধরিয়া লইলাম, রামনাদের রাজার সহিত রামনাদে সাক্ষাৎ হওয়াই অধিকতর যুক্তিসম্মত।

অবশেষে স্বামীজী বলিলেন, "বন্ধুবর, আপনি বলছেন কি? প্রত্যেক ভারতবাসীরই তো এটা অবশ্যকর্তব্য যে, ধর্মের তত্ত্বকে পরীক্ষা করে দেখবেন। তা করতে হলে আমাদের অতীতের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, এবং জগৎ কিভাবে বর্তমান সময়ে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে তা দেখতে হবে। আর তাতে করে যদি আমরা দেখি যে, এমন কতকগুলি যুক্তিহীন পরম্পরাগত আচার আছে যা আমাদের সামাজিক জীবনের উন্নতির বা দার্শনিক চিন্তার পরিপন্থী, তাহলে নিশ্চয় সময় এসেছে যখন এগুলিকে বর্জন করবার জন্য পা বাড়াতে হবে।" জনগণের উন্নতির কথাও স্বামীজী আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, এমন দিন আসিতেছে যখন শূদ্ররা জাগিবে এবং নিজেদের ন্যায্য ভোগাধিকার ও বিশেষাধিকারেরও দাবি তুলিবে। তিনি বারবার এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, পদদলিত জনসমাজকে শিক্ষাদান করিয়া, সামাজিক সাম্যের বার্তা প্রচার করিয়া, পৌরোহিত্যের নিষ্পেষণ দূরীভূত করিয়া এবং জাতিপ্রথার কদর্যের ফলে ও ধর্মের উচ্চ তত্ত্বসমূহের বিকৃত প্রয়োগের ফলে জাতীয় জীবনে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপসরণ করিয়া নিম্নজাতিসমূহের উন্নতি বিষয়ে তৎপর হওয়া উচ্চবর্ণের অবশ্য কর্তব্য।

পণ্ডিচেরীতে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটিলে ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাকে একই সঙ্গে ভ্রমণ করিতে এবং মাদ্রাজে তাঁহারই গৃহে অতিথি হইতে আহ্বান করিলে স্বামীজী সম্মত হইলেন এবং একই সঙ্গে মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া দেখিলেন, নগরের উচ্চশিক্ষাসম্পন্ন দ্বাদশ বা ততোধিক যুবক তাঁহার দর্শনের জন্য সমাগত। ক্রমে ইঁহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রথম দিন হইতেই বহু ব্যক্তি তাঁহার দর্শনের জন্য নিত্য ভট্টাচার্যগৃহে আসিতে লাগিলেন। এইসব দেখিয়া মনে হইত, স্বামীজী যেন দৈবনির্দেশে জনসমাজে সুপরিচিত হইবার পথে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারে মাদ্রাজের অবদান অমূল্য। স্বামীজীর অশেষ গুণাবলী প্রথম প্রকাশ্যস্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এই নগরে। মাদ্রাজের ভক্তবৃন্দই স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যগমনের পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে অগ্রণী হইয়াছিলেন। বঙ্গের বাহিরে এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ভক্তগণ মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সাময়িক পত্রিকাদি অবলম্বনে জনসাধারণে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। মাদ্রাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীকে ভিত্তি করিয়া অন্যতম প্রধান মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আলোয়ারের ন্যায় মাদ্রাজেও স্বামীজীর গুরুশক্তি সমধিক অভিব্যক্ত হইয়াছিল ; বিশেষ এই যে, আলোয়ারে প্রধানতঃ ধর্ম-বিষয়েই আলোচনা হইত, এবং ধর্মক্ষেত্রেও ভক্তিই সমধিক স্থান পাইত। মাদ্রাজে স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্ররূপে বিকাশ পাইয়াছিল—মনে হইত তিনি তখন শুধু ধর্মরাজ্যেই নহে, প্রত্যুত সামূহিক অভ্যুদয়েরও অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সমাগত সমুৎসুক বিদগ্ধ সমাজের সহিত তখন তিনি ধর্ম, মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে নিত্য নূতন তথ্যের ও দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিতেন। অবশ্য আলোচ্য বিষয় নির্ভর করিত প্রায়শঃ জিজ্ঞাসুদের উপর। একদিন স্বামীজী অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন এমন সময় এক সমুৎসুক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী, হিন্দুরা বেদান্তবাদী হয়েও কি করে মূর্তিপূজা করে?" স্বামীজী তাঁহার বিদ্যুদ্বর্ষী নয়নদ্বয় প্রশ্নকর্তার প্রতি ফিরাইয়া বলিলেন, "যেহেতু আমাদের দেশে হিমালয় আছে।" তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশ এমন উদ্দীপনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ যে, ঈশ্বরের সে সব আশ্চর্য সৃষ্টিদর্শনে মুগ্ধ দেশবাসীরা ঐ সকল দৃশ্যমান বস্তুকে ভগবচ্চিন্তার প্রেরণাস্থলরূপে গ্রহণ না করিয়া পারে না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সর্বাবস্থায় সর্ববিজয়িরূপে বিরাজমান থাকিত। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, হৃদয়োন্মাদক সঙ্গীত, চিত্তের দৃঢ়তা, বিপুল বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় দ্রুত প্রত্যুত্তর, চমকপূর্ণ শ্লেষ, জ্ঞানগর্ভ সংক্ষেপোক্তি ও বাগ্মিতা বিমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরিয়া রাখিত। ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে আগন্তুকের সংখ্যা এমনি ভাবে নিত্য বাড়িয়াই চলিল। স্বামীজী সর্বদা বিনয়ের প্রতিমূর্তি হইলেও, কেহ বিরুদ্ধ ভাব লইয়া পাণ্ডিত্যাদি প্রকাশে অগ্রসর হইলে তিনি সময়বিশেষে এমন মূর্তিও ধারণ করিতেন, যাহাতে মনে হইত, বুঝিবা ইনি যুদ্ধোন্মুখ ও আত্মশ্লাঘী। কিন্তু, প্রায়শঃ এই নিয়মেরও ব্যত্যয় হইত ; এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন পণ্ডিত আসিয়া অযথা তাঁহাকে অপমান করিলেও তিনি বিনয়পূর্বক পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন এবং আপনাকে মূর্খ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। অপর সময়ে আবার তাঁহার চিন্তা ও বাক্যরাশি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্রোতৃবর্গের উপর প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করিত এবং তাঁহাদিগকে অনুরূপ চিন্তা করিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ

দিত না। কিন্তু এই সমস্ত মনোভাবই স্বাভাবিক রীতিতে আসিত, উহার ভিতর সামাজিক কৃত্রিম আদব-কায়দার বা লোক-দেখানোর কোন সংস্পর্শ ছিল না, আত্মম্ভরিতারও প্রয়াস ছিল না। তিনি রূঢ় কথা বলিয়া কাহাকেও কষ্ট দিতেন না, আবার প্রয়োজন স্থলে ন্যায্য সমালোচনা করিতেও ছাড়িতেন না। একবার এক পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সময়ের অভাব স্থলে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ বা সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিলেই বা ক্ষতি কি? অমনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "সেই সব বিরাট পুরুষ, সেই সব প্রাচীন ঋষি—যাঁরা এত বড় ছিলেন যে, তাঁরা পায়ে মাটি না মাড়িয়ে দেশবিদেশ ডিঙ্গিয়ে যেতেন বললেই চলে, যাঁদের কথা মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করতে গেলে আপনার মতো লোক নিজেকে ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না—তাঁদের পর্যন্ত সময় ছিল মশায়, আর আপনার নেই?" সেই একই সভাতে জনৈক পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন হিন্দু যখন বৈদিক ঋষিদের উপদেশাবলীকে নিরর্থক বলিয়া নস্যাৎ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন স্বামীজী যেন উদ্যত বজ্রসদৃশ ভয়ঙ্কর-রূপে গর্জিয়া উঠিলেন, "পূর্ব পুরুষদের আপনি কোন্ সাহসে এভাবে নিন্দা করতে পারেন! অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী! আপনি কি ঋষিদের আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের পরিচয় পেয়েছেন? আর অত দূর না গিয়েও শুধু পাঠ করেও কি দেখেছেন বেদে কি আছে? ঋষিরা ওখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিরোধের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। প্রতিস্পর্ধার সাহস থাকে তো এগিয়ে যান।"

অবিরাম বাদ-বিচার ও আলাপ আলোচনার ক্লান্তি দূরীকরণার্থ তিনি সমুদ্রতীরে সান্ধ্যভ্রমণে নির্গত হইতেন। একদিন ভ্রমণকালে যখন দেখিলেন, মৎস্যজীবীদের উপবাসক্লিষ্ট ও নগ্নদেহ শিশুগণ কটি পর্যন্ত জলে নিমজ্জিত থাকিয়া তাহাদের মাতাকে কার্যে সাহায্য করিতেছে, তখন তাঁহার কপোলদ্বয়ে অশ্রুরেখা দেখা দিল এবং তিনি সখেদে বলিলেন, "হে ভগবান, এসব হতভাগাদের সৃজন করেছ কেন? আমার পক্ষে তো এ দৃশ্য অসহনীয়! হে ভগবান, এ কতদিন চলবে, কত দিন?"

একদিন তাঁহার সম্মানার্থ এক বৈঠকে মাদ্রাজের অনেক বিদ্বান সমবেত হইলে স্বামীজী আপনাকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং এইরূপ সাহসিকতার প্রতিক্রিয়া কতদূর হইতে পারে লক্ষ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই রহিলেন। উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে জন কয়েক জটলা করিয়া প্রশ্ন করিলেন,

"আপনি বলছেন, আপনি ভগবানের সঙ্গে এক, তাহলে তো আপনি সমস্ত নৈতিক ও সামাজিক দায় থেকে মুক্ত। অতঃপর আপনি যদি অন্যায় করেন, তো কিসে আপনাকে বাধা দেবে, সত্যপথ-ভ্রষ্ট হলে কেই বা সংশোধন করবে ?" স্বামীজীর প্রতিপক্ষবিধ্বংসী উত্তর আসিল, "আমার যদি সত্যি বিশ্বাস জন্মে যে আমি ভগবানের সঙ্গে এক, তবে আমি তো স্বভাবতই পাপকে ঘৃণা করব এবং কোন শৃঙ্খলেরই প্রয়োজন হবে না।"

রামনাদের রাজার প্রাসাদে অনুরূপ আর একটি অধিবেশনে "অবাঙমনসোগোচর ব্রহ্মেরও সাক্ষাৎকার সম্ভব", তাঁহার এইরূপ উক্তিকে জনৈক পণ্ডিত হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলে তিনি সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সে অজানাকে জেনেছি।"

ট্রিপ্লিকেনের সাহিত্য-সমিতিতে তিনি অনেকগুলি সভায় আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন ; এই সমিতিই (লিটারেরি সোসাইটি) তাঁহাকে সর্বপ্রথম জনসমাজে পরিচিত করিয়া দেয়। এই সমাজের অনেক যুবক মাদ্রাজের সমাজসংস্কার আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহারা বিপথে চলিয়াছেন, কারণ প্রচলিত সমস্ত রীতিনীতিকে উড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহাদের কার্যধারা। তিনি বিভিন্ন বৈঠকে এই কথাই বারংবার বুঝাইয়া দিতেন যে, বিদেশী আদর্শগুলিকে বিশ্লেষণপূর্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং ধর্মবিরুদ্ধ বহির্দেশীয় সংস্কৃতি যাহাতে গৃহীত না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে। তিনি তাঁহাদিগকে আরও বলিতেন, অতীতে যাহা কিছু মহৎ ও গৌরবময় ছিল, তাহার সাহায্য লইতে হইবে, নতুবা জাতীয় সৌধের ভিত্তি পর্যন্ত টলটলায়মান হইবে। তিনি সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না, বরং ঐ বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন ; কিন্তু সে সংস্কারস্পৃহা বহির্দেশ হইতে আরোপিত না হইয়া অন্তর্দেশ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত। আর উহার গতি হওয়া উচিত ধ্বংসাভিমুখ নহে, পরন্তু ক্রমবিকাশাভিমুখ।

সিঙ্গারবেলু মুদালিয়ার নামক এক নাস্তিক ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টান কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের কার্য করিতেন। খৃষ্টীয় ধর্মের কার্যকারিতার দিকটা তাঁহার সহানুভূতি পাইত ; কিন্তু হিন্দুধর্মকে তিনি নিন্দাই করিতেন। তিনি স্বামীজীর সহিত বিচার করিতেই আসিয়াছিলেন ; কিন্তু অবশেষে স্বামীজীর চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার

অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং নাম দিয়াছিলেন "কিডি"। পরে তিনি "কিডি"-কে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "সিজার বলেছিলেন, 'এলুম, দেখলুম, জয় করলুম!' কিন্তু কিডি এল, দেখল, পরাজিত হল!" কিছুকাল পরে কিডি স্বামীজীর কার্যে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং অনেক পরে স্বামীজীরই অভিলাষানুসারে মাদ্রাজে যখন 'প্রবুদ্ধ-ভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তখন কিডি উহার অবৈতনিক কার্যনির্বাহক হইয়াছিলেন। আরও পরে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হন এবং সাধুরূপেই দেহত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত ভি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার বলেন, তিনি মজা করার জন্য সহাধ্যায়ী জনকয়েক যুবককে লইয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন, স্বামীজী অর্ধনিমীলিত নেত্রে অর্ধসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় হুঁকায় তামাক খাইতেছেন—যেন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আয়ার মহাশয় তখন খৃষ্টান কলেজের ছাত্র এবং খৃষ্টধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান, এমন কি তিনি একসময় খৃষ্টধর্ম গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিলেন। স্বামীজীর নিকট আসিবার পুর্বেই তাঁহারা কয়েকটি প্রশ্ন ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন এবং ঐ গুলির পক্ষে ও বিপক্ষে যাহা কিছু বলা সম্ভব, সমস্ত ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে অকস্মাৎ পরাস্ত না হইতে হয়। স্বামীজীকে তদবস্থ দেখিয়া সকলে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় একজন অপেক্ষাকৃত সাহস দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "মহাশয়, ভগবান কাহাকে বলে?" স্বামীজী যেন কিছুই শুনিতে পান নাই, এমনি ভাবে আপন মনে হুঁকা টানিয়া চলিলেন। তারপর যেন উত্তরচ্ছলে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু, বলতে পার শক্তি (এনার্জি) জিনিসটা কি?" যখন প্রশ্নকর্তা বা তাহার সঙ্গীরা কেহই চেষ্টা করিয়াও সদুত্তর দিতে পারিলেন না, তখন স্বামীজী উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "এ আবার কি রকম কথা? তোমরা যে শক্তি শব্দটা জীবনে অনুক্ষণ ব্যবহার কর, সেই সাধারণ শব্দটার পর্যন্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পার না অথচ আমাকে বলছ ভগবানের সংজ্ঞা বলতে?" তাঁহারা আরও সব প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজী তাঁহাদিগকে নিরুত্তর করিলেন। অবশেষে অপর সকলে চলিয়া গেলেও আয়ার মহাশয় স্বামীজীর কাথাবাতায় মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং স্বামীজী যখন সমুদ্রতীরে সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইলেন, আয়ারও সঙ্গে চলিলেন। হঠাৎ স্বামীজী আয়ারকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, তুমি কুস্তী লড়তে জান ?" আয়ার স্বীকৃতি জানাইলে স্বামীজী কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "এস, একটু লড়া যাক।" স্বামীজীর ব্যায়াম-কৌশল ও পেশীর দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যান্বিত আয়ার অতঃপর স্বামীজীর নাম রাখিয়াছিলেন, "পালোয়ান স্বামী।"

স্বামীজী একদিন লক্ষ্য করিলেন, ভট্টাচার্য মহাশয়ের পাচক মহীশূরের মহারাজের প্রদত্ত তাঁহার রোজ উডের হুঁকাটির দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া আছে। তিনি অমনি পাচককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি এটা চাই ?" থতমত খাইয়া পাচক কোন উত্তরই দিতে পারিল না, হাঁ বলা তো দূরের কথা। স্বামীজীর নিকট হুঁকাটি একটি সখের জিনিস ছিল, খুব আদর করিয়াই তিনি উহা রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু পাচকের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উহা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন। পাচক প্রথমে বিশ্বাসই করিতে পারে নাই যে, ইহাও সম্ভব ; কিন্তু সত্যই যখন উহা হাতে পাইল তখন তাহার সমস্ত চেহারায় কৃতজ্ঞতার ছাপ জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। অপর যাঁহারা ইহা শুনিলেন, তাঁহারাও স্বামীজীর ত্যাগের চাক্ষুষদৃষ্টান্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অথচ স্বামীজীর পক্ষে ইহা ছিল স্বভাবসিদ্ধ। যে কেহ তাঁহার কোন জিনিসের প্রশংসা করিত, অমনি তিনি তাহা তাহাকে দান করিতেন। আমেরিকায় একবার সালেম শহরের শ্রীযুক্ত প্রিন্স উড্‌স্ যখন তাঁহার পরিব্রাজকজীবনের সঙ্গী দণ্ডটির জন্য আগ্রহ জানাইলেন, স্বামীজী তখনই বিনা বাক্যব্যয়ে উহা তাঁহাকে দান করিলেন। দণ্ডটির সঙ্গে তাঁহার একটা বিশেষ ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল বলিয়া তিনি উহা আমেরিকা পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, তবু দ্বিধাশূন্যহৃদয়ে উহা প্রিন্সকে দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যেটার প্রশংসা করলে সেটা তোমারই হয়ে গেল।" তিনি স্বীয় ট্রাঙ্ক ও পরিব্রাজক-জীবনের কম্বলখানিও প্রিন্সের মাতা শ্রীযুক্তা কেইট টেন্নাট্ উড্‌স্‌কে দান করিয়াছিলেন। ঐ সময় (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) তিনি সালেমে তাঁহাদেরই বাড়ীতে থাকিতেন।

মাদ্রাজ-বাসের কোন এককালে স্বামীজীকে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হয়। দিন কয়েক যাবৎ তিনি প্রেতাত্মাদের উৎপাত অনুভব করিতে লাগিলেন ; তাহারা এমন সব খবর তাঁহাকে দিত, যাহাতে তিনি উদ্বিগ্ন হইতেন, অথচ পরে দেখা যাইত ঐসব ভুল। এই ভাবে উৎপীড়িত হইয়া তিনি

যখন ভূতদের উপর খুব চটিয়া গেলেন, তখন তাহারা জানাইল যে, তাহারা বড় কষ্টে আছে, স্বামীজী যেন তাহাদের উদ্ধারসাধন করেন। পরিশেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্বামীজী তাহাদের উদ্ধারের এক উপায় স্থির করিলেন—তিনি সমুদ্র-তীরে গেলেন ও তণ্ডুলাদির অভাবে মুঠো মুঠো বালুকা লইয়া পিণ্ডদানচ্ছলে উহাই দান করিলেন। তদবধি ভৌতিক উৎপাতও থামিয়া গেল।

মাদ্রাজে মন্মথবাবুর বাটীতে থাকা-কালে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার জননী দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মন খুব খারাপ হইয়া গেল। স্বামীজী তখন মঠে বা বাড়ীতে কাহাকেও পত্র লিখিতেন না। মন্মথবাবু তাঁহার বিষাদ দেখিয়া সংবাদের জন্য কলিকাতায় তার করিলেন, আর বলিলেন যে, শহরের কিছু দূরে একজন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস করে; সে জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সব খবর বলিয়া দিতে পারে। মন্মথবাবুর অনুরোধে ও নিজের মনের উদ্বেগবশতঃ স্বামীজী যাইতে রাজী হইলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন মন্মথবাবু, আলাসিঙ্গা ও আরও একজন (সম্ভবতঃ ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বালাজি রাও)। তাঁহারা খানিকটা রেলপথে গিয়া ও পরে পায়ে হাঁটিয়া যথাস্থানে পৌঁছিয়া দেখেন, শ্মশানের পাশে "বিকটাকার, শুঁটকো ভূষ-কালো" একটা লোক বসিয়া আছে। তাহার অনুচরেরা কিড়িং মিড়িং করিয়া পিশাচসিদ্ধের পরিচয় করাইয়া দিল। আলাসিঙ্গা দোভাষীর কাজ করিলেন। পিশাচসিদ্ধ প্রথমে আগন্তুকদিগকে আমলই দিল না। পরে তাঁহারা ফিরিতে উদ্যত হইলে, দাঁড়াইতে বলিল। তারপর একটা পেন্সিল লইয়া খানিকক্ষণ কি সব দাগ কাটিল ও মন একাগ্র করিয়া একেবারে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর প্রথমে স্বামীজীর নাম, গোত্র ও "চৌদ্দপুরুষের খবর" দিয়া বলিল যে, ঠাকুর নিয়ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন; জননীর মঙ্গল সমাচারও দিল এবং বলিল যে, তাঁহাকে ধর্মপ্রচার করিতে শীঘ্রই বহু দূরে যাইতে হইবে। মাদ্রাজে ফিরিয়া তাঁহারা কলিকাতার তারেও মায়ের সুসংবাদ পাইলেন। ('বাণী ও রচনা', ৯।৮৭)।

স্বামীজীর প্রভাব মাদ্রাজে কিভাবে প্রসারিত হইতেছিল, তাহা বুঝাইতে গিয়া শ্রীযুক্ত কে. ব্যাসরাও তখনকার কথা স্মরণপূর্বক লিখিয়াছিলেন, "তিনি একজন সন্ন্যাসী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাস করিয়াছেন, তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, চমৎকার চেহারা, পরিধানে ত্যাগচিহ্ন গেরুয়া বস্ত্র; তিনি

ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলেন, বিরুদ্ধ কথার পাল্টা জবাব দিবার অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন, মুক্তকণ্ঠে সুললিত স্বরে যখন গান ধরেন, যেন মনে হয় বিশ্বাত্মার সঙ্গে তিনি এক হইতে চলিয়াছেন, আর তিনি সারা ধরার পর্যটক! মানুষটি স্বাস্থ্যবান্ ও দীর্ঘাবয়ব, রসিকতায় ভরপুর, আর সিদ্ধাই প্রকাশে যাহারা ব্যগ্র তাহাদের প্রতি তাঁহার হৃদয় ঘৃণাপূর্ণ। সুপক্ক খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি আছে, হুঁকার প্রতি ও তাম্রকূট সেবনে তাঁহার বিশেষ প্রীতি, অথচ এমনি দক্ষতা এবং সারল্যের সহিত তিনি বৈরাগ্যের কথা বলেন যে, কেহ মুগ্ধ এবং শ্রদ্ধাবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। এমন অদ্ভুত বাস্তবতার সম্মুখে আসিয়া বি. এ. এবং এম. এ. পাস ব্যক্তিগণ হতভম্ব হইয়া যাইত। তাঁহার মধ্যে তাহারা এমন একজন মানুষের পরিচয় পাইত, যাঁহার কাছে কেহ অধ্যাত্মক্ষেত্রোচিত মল্লক্রীড়া বা অসিসঞ্চালনের স্পর্ধা লইয়া আসিলে তিনি বেশ আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিতেন। আবার গম্ভীর আলোচনার পর যখন তিনি সাধারণভূমিতে নামিতেন, তখন তাহারা দেখিত, তিনি হাস্যকৌতুকে, ব্যঙ্গবিদ্রূপে এবং কোন কিছুকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেও বেশ পটু। কিন্তু অন্য সব কিছু ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার যে অবিমিশ্র অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম ছিল, তাহাই সকলের চিত্ত জয় করিত। যে যুবক সাংসারিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন এবং বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার একটি মাত্র ভালবাসার বস্তু ছিল—তাঁহার স্বদেশ, এবং একটি মাত্র বিষাদের কারণ ছিল—সেই স্বদেশের পতন। এই বিষয়ে চিন্তামগ্ন হইয়া তিনি এমন সব কথা বলিতেন, যাহাতে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া থাকিতেন। হুগলী নদী হইতে তাম্রপর্ণী নদী পর্যন্ত পর্যটক মানুষটির এই ছিল প্রকৃতি। তিনি মুক্তকণ্ঠে আমাদের যুবকসম্প্রদায়ের নির্বীর্যতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেন এবং উহার নিন্দা করিতেন, তাঁহার বাক্যাবলী বিদ্যুদ্বেগে নিঃসৃত হইত এবং ইস্পাতের ন্যায় পথ কাটিয়া চলিত; তিনি সকলেরই প্রাণে সাড়া জাগাইতেন, অনেকেরই চিত্তে স্বীয় উদ্দীপনা সঞ্চারিত করিতেন এবং ভাগ্যবান্ জন কয়েকের হৃদয়ে অনির্বাণ বিশ্বাসের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন।"

অনেকের দৃষ্টিতে স্বামীজী ছিলেন আবার ভারতীয় দর্শন, আগম ও যোগ-সম্ভূত সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কেবল হিন্দুর অধ্যাত্মানুভূতিই অঙ্গীকৃত হয় নাই, পাশ্চাত্ত্যের দর্শন ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারও তথায় স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল। জনসমাজে পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিমান

জনৈক ব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণান্তে লিখিয়াছিলেন, "স্বামীজীর মনোরাজ্যের প্রসার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইলাম। 'ঋগ্বেদ' হইতে 'রঘুবংশ' পর্যন্ত, বেদান্তের অত্যুচ্চ দার্শনিক চিন্তা হইতে আধুনিক কাণ্ট ও হেগেল পর্যন্ত, প্রাচীন ও আধুনিক সর্বপ্রকার সাহিত্য কলা সঙ্গীত নীতিবাদ এবং প্রাচীন যোগশাস্ত্রের রহস্যবিদ্যা হইতে আধুনিক গবেষণাগারের জটিলতম বিষয়-গুলি পর্যন্ত—সব কিছুই যেন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল। ইহাই আমাকে চমৎকৃত করিয়াছিল—আমাকে তাঁহার দাস করিয়া লইয়াছিল।"

অপর এক শিষ্য লিখিয়াছিলেন, "তাঁহাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসুর নিজের স্তরে নামিয়া আসিয়া তাহারই বোধগম্য ভাষায় স্বীয় উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবরাশিকে প্রকাশ করিতে হইত। অনেক ক্ষেত্রে তিনি পূর্ব হইতেই অনুসন্ধিৎসুর ভাবী প্রশ্নগুলি বুঝিয়া লইতেন এবং এমনভাবে সে সবের উত্তর দিতেন যে আর প্রশ্ন না করিয়াই জিজ্ঞাসুর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত। কেহ যদি জানিতে চাহিত, তিনি কি করিয়া পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারেন, তিনি সস্মিতবদনে উত্তর দিতেন, 'সন্ন্যাসীরা মানুষের চিকিৎসক কিনা, তাই ঔষধপ্রয়োগের আগেই রোগ নির্ণয় করতে পারেন।' কোন কোন সময়ে বহুব্যক্তির চিন্তা যুগপৎ তাঁহার মনে প্রতিভাত হইত—তিনি একই সঙ্গে বহু সমস্যার সমাধান করিয়া জিজ্ঞাসু-দিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। যাঁহাদের প্রতি তিনি কৃপাসুমুখ ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার কোমল ও অদোষদর্শী হইলেও অপরের পক্ষে তাঁহার সান্নিধ্যে থাকা যেন কতকটা বিস্ফোরক দ্রব্যের কাছে থাকার মতোই বোধ হইত। যখনই কাহারও মনে কুচিন্তা উঠিত, উহার ছায়া যেন তাঁহারও চিত্তমুকুরে প্রতিফলিত হইত ; আর তখন তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ে যে অদ্ভুত রকমের মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিত এবং কথাপ্রসঙ্গে যে দুই-চারিটি শব্দ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইত, তাহা হইতেই ঐ ব্যক্তি উহার প্রমাণ পাইত!"

উদ্যোগ ও আয়োজন

মাদ্রাজে স্বামীজী তিন সপ্তাহ রহিলেন; ইহার মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে তিনি কতবারই না বলিয়া ফেলিলেন, তিনি সনাতন ধর্মের প্রচারের জন্য পাশ্চাত্ত্যে যাইতে প্রস্তুত। তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাঁহারা আসিলেন, সকলেই সে ইচ্ছা অবগত হইলেন, এবং তাঁহার গুণগ্রাহী অনুগত ভক্তমণ্ডলী[১] সহজেই সহমত হইলেন যে, এ শুভ সঙ্কল্প সর্বতোভাবে আদরণীয় ও ভবিষ্যতে ইহা বিশেষ মঙ্গলপ্রদ হইবে। তাঁহারা তাঁহার পরিকল্পনাকে কেবল বরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, উহাকে কার্যে পরিণত করার অভিপ্রায়ে উৎসাহভরে অর্থসংগ্রহে যত্নপর হইলেন। চিকাগোর ধর্মমহাসভায় যোগদানের মহতী ইচ্ছা স্বামীজীর মনে দীর্ঘকাল পরিপোষিত হইয়া থাকিলেও, তিনি এ যাবৎ কার্যতঃ কিছুই করেন নাই, হয়তো মহামায়ার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে উৎসাহী ভক্তবৃন্দ প্রায় পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। কিন্তু স্বামীজী সে অর্থ দেখিয়া যেন হঠাৎ দ্বিধায় পড়িলেন—এ অর্থ তো বিদেশ যাত্রার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর; তাঁহার বিদেশগমন যদি বিধাতার অভিপ্রেতই হয়, তবে আয়োজন এমন তুচ্ছ কেন, ভক্তদের প্রযত্ন এরূপ অসাফল্যগ্রস্ত কেন? তিনি ভাবিলেন: "আমি নিজের খেয়ালে চলিতেছি না তো? উৎসাহে গা-ভাসিয়ে দিইনি তো? যেরূপ ভেবেছি এবং যেরূপ পরিকল্পনা করেছি, তার ভেতর কোন সত্য আছে তো?" তিনি প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, তোমার কি ইচ্ছা বল। মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।" সাংসারিক রীতিতে অনভিজ্ঞ সহায়-সম্পদহীন এক সন্ন্যাসী দেশবাসীর অনুৎসাহের মধ্যে কেমন করিয়া একাকী সাগর লঙ্ঘন করিবেন এবং কি করিয়াই বা এমন এক অজ্ঞাত জনসমাজে উপস্থিত হইবেন যাহাদের নিকট তাঁহার বক্তব্য অতি অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব? অতএব দেশবাসীর

১। ইঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমল। ইঁহার জন্ম হয় মহীশূরের চিকমাগালুর-এ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, এবং মৃত্যু হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। বি. এ. পাস করিয়া কিছুদিন আইন পড়ার পর ইনি কুম্ভকোনম্-এর এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে পাচ্চাইপ্পাস হাইস্কুলে (মাদ্রাজ) ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। জনসেবা ও বিদ্যোৎসাহের জন্য ইনি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ('দি হিন্দু', ১১ই জুলাই, ১৯৬৫)।

উৎসাহহীনতা দর্শনে ও জগন্মাতার ইঙ্গিতের অভাবে হতাশহৃদয় স্বামীজী ভক্তদের ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমি মায়ের অভিপ্রায় তাঁরই কাছে জেনে নিতে বদ্ধপরিকর। এ তো অন্ধকারে ঝম্পপ্রদান ছাড়া আর কিছু নয়, অতএব মাকে প্রমাণ করতে হবে যে এ তাঁরই ইচ্ছা; যদি তাঁরই ইচ্ছা হয় তবে অর্থ আপনা থেকেই আবার আসবে। অতএব ঐ টাকা নিয়ে যাও এবং গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।" শিষ্যগণ তাঁহার আদেশ শুনিয়া অবাক হইলেও উহা পালন করিলেন এবং তিনি বোধ করিলেন, যেন স্কন্ধ হইতে একটা ভার নামিয়া গেল।

তাঁহার ঐ সময়ের মনোভাব, ইহারই দিন কয়েক পরে (২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩) হায়দরাবাদ হইতে তাঁহার শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখিত একখানি পত্রে[২] সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে জানা যায়, তিনি আমেরিকায় যাইতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে যাইবার ব্যবস্থা সম্ভব না হওয়ায় তিনি উহা ভগবানেরই বিধান জানিয়া কাহাকেও দোষী করিতে চাহেন না। পত্রাংশ এই—"আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমায় জানাচ্ছি যে, আমি এখন আর রাজপুতানায় ফিরে যেতে পারব না—এখানে (হায়দরাবাদে) এখন থেকেই ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে; জানি না রাজপুতানায় আরও কি ভয়ানক গরম হবে, আর গরম আমি আদপে সহ্য করতে পারি না। সুতরাং এর পর আমাকে বাঙ্গালোরে যেতে হবে, তারপর উতকামণ্ডে গ্রীষ্মটা কাটাতে হবে। গরমে আমার মাথার ঘিটা যেন ফুটতে থাকে।

"তাই আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল। আর এই জন্যই আমি গোড়াতেই মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলাম। সে ক্ষেত্রে আমায় আমেরিকায় পাঠাবার জন্য আর্যাবর্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতাম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথমতঃ এই গরমে আমি ঘুরে বেড়াতে পারব না, তা করতে গেলে মারা যাব। দ্বিতীয়তঃ আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছেই ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্ত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং আমার মতলব ছিল, আমার বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোককে ধরা। কিন্তু মাদ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুন আমার সব আশা-ভরসা চুরমার হয়ে গেছে; এখন আমি

২। পত্রখানির ঠিক তারিখ সম্ভবতঃ ১১ই ফেব্রুয়ারি, কারণ তিনি ১৭ই ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদ ত্যাগ করেন।

অতি দুঃখের সহিত ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলাম—ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক। এ আমারই প্রাক্তন—অপর কারও দোষ নেই। তবে তুমি এক রকম নিশ্চিতই জেনো যে, কয়েক দিনের মধ্যেই দু-এক দিনের জন্য মাদ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে বাঙ্গালোরে যাব, আর সেখান থেকে উতকামণ্ডে গিয়ে দেখব, যদি মহীশূরের মহারাজ আমায় পাঠায়।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৪৩-৪৪)।

কথায় কথায় আমরা হায়দরাবাদে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও মাদ্রাজের বিবরণ শেষ হয় নাই। প্রথমবারে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা বিফল হইলে স্বামীজী পূর্বেরই ন্যায় আচার্যোচিত ধর্মালাপাদিতে মনোনিবেশ করিলেন। অধিকন্তু মনের অন্তরতম প্রদেশে ডুবিয়া গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগজ্জননীর শ্রীচরণে আলোক-লাভ ও পথের সন্ধানের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। ঐ কালে তাঁহার গভীর ধ্যানপরায়ণতাও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্বদেশপ্রেমিক অশেষ প্রতিভাশালী সন্ন্যাসী তখন যেন অসহায় বালকের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া মায়ের আদেশবাণীর অপেক্ষা করিতে থাকিলেন, আর হৃদয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিলেন, মায়ের আহ্বান অবশ্যই আসিবে; এক সুদৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহার মনে বিরাজিত রহিল—মায়ের অভিপ্রায় মায়েরই কাছে না জানিয়া কোন রকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না।

স্বামীজীর মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন মাদ্রাজের ভক্তদের মুখে তাঁহার গুণরাশির সংবাদ পাইয়া হায়দরাবাদের জনগণ তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে পাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইল এবং অল্প সময়ের জন্য হইলেও একবার তথায় যাইবার জন্য সাগ্রহে আমন্ত্রণ করিল। তিনি সহজেই সম্মত হইলেন, কারণ তাঁহার মনে হইল, এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানের নিশ্চয় কোন গূঢ়ার্থ আছে। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় নিজাম-রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইলেন, স্বামীজী ১০ই ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে পৌঁছিয়া তাঁহার অতিথি হইবেন। আগমনের পূর্বদিন হায়দরাবাদ ও সিকান্দরাবাদের হিন্দুগণ এক সভায় সমবেত হইয়া স্বামীজীর অভ্যর্থনার উপযুক্ত আয়োজন করিলেন। অতএব স্বামীজী যখন হায়দরাবাদ রেল স্টেশনে নামিলেন তখন তিনি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, পাঁচশত ভদ্রলোক তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইয়াছেন, আর তাঁহাদের মধ্যে আছেন নিজাম-দরবারের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত ও

ধনী নাগরিক, বণিক, লব্ধকীর্তি ব্যবহারজীবী ও পণ্ডিত। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন, রাজা বাহাদুর শ্রীনিবাস রাও, মহারাজ বাহাদুর রম্ভা রাও, পণ্ডিত রতনলাল, কাপ্তান রঘুনাথ, সামস্থল-উলেমা সৈয়দ আলি বিলগ্রামী, নবাব বাহাদুর ইমাদ নওয়াজ জঙ্গ, নবাব বাহাদুর সিকন্দর নওয়াজ জঙ্গ, মিঃ এইচ. দোরাবজী, মিঃ এফ. এস. মাগুন, রায় হুকুম চাঁদ, শেঠ চতুর্ভুজ, শেঠ মোতিলাল এবং পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়। কালীচরণবাবু স্বামীজীকে কলিকাতায় থাকিতেই চিনিতেন, অতএব তিনিই অগ্রসর হইয়া সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজীকে তখন মাল্য ও পুষ্পে বিভূষিত করা হইল। ঐ দিন তথায় উপস্থিত এক প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা লিখিয়াছিলেন, "স্বামীজী তখন একজন বেশ বলিষ্ঠ যুবক—পরমহংসের বেশে কমণ্ডলুহস্তে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে নামিলেন। তাঁহাকে মধুসূদনবাবুর বাঙ্গলোয় লইয়া যাওয়া হইল এবং অনেক ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তথায় গেলেন। যাঁহারা স্টেশনে যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গলোতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কোন সন্ন্যাসীকে স্বাগত জানাইবার জন্য এরূপ লোকসমাগম আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই—এ ছিল এক জমকালো অভ্যর্থনা।"

১১ই ফেব্রুয়ারি সকালে সিকেন্দরাবাদের একশত জন হিন্দু সমবেতভাবে ফল, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য মহবুব মহাবিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী ১৩ই তারিখে বক্তৃতা দিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর তিনি কালীচরণবাবুর সহিত গাড়ী করিয়া গোলকুণ্ডার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গ দেখিতে গেলেন। বাসস্থানে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, হায়দরাধিপতির শ্যালক নবাব বাহাদুর স্যার খুরশিদ জা, আমির-ই-কবির মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী একজন ভৃত্যকে পত্রসহ তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। ঐ পত্রে অনুরোধ করা হইয়াছে, তিনি যেন পরদিন সকালে রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। যথাকালে কালীচরণবাবুর সহিত তথায় উপস্থিত হইলে নবাব বাহাদুরের এইড-ডি-কং তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। নবাব খুরশিদ জা ধর্মবিষয়ে অতি উদারভাবাপন্ন ছিলেন এবং তিনি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত হিন্দুদের প্রধান তীর্থগুলি সশ্রদ্ধহৃদয়ে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই ঘণ্টা

ব্যাপী আলাপ প্রসঙ্গে স্বামীজী হিন্দু, ইসলাম ও খৃষ্টীয় ধর্মের মর্মকথা সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করিলেন। নবাব বাহাদুর হিন্দুদের সাকারোপাসনার বিরোধী এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে নিরাকারোপাসনারই পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজী এই বিরোধ সমাধানেরও চেষ্টা করিলেন। ভগবদ্ধারণায় ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, এমন একটা স্তর আছে যেখানে মানুষ মানবীয় চিন্তাধারা ও মানবীয় চিন্তাশক্তি অনুসারে ভগবানকে সগুণ ও সাকার বলিয়া ভাবিতে বাধ্য এবং এরূপ ভাবনার একটা সার্থকতাও আছে। তিনি আরও দেখাইয়া দিলেন, হিন্দুধর্ম ব্যতীত অপর সকল ধর্মই একজন ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতার মুখাপেক্ষী, কিন্তু বেদান্তমত ব্যক্তিনিরপেক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং এই ভিত্তিতেই উহা বিশ্বধর্ম হইবার দাবি রাখে। চিন্তারাজ্যের ঊর্ধ্বাত্যূর্ধ্ব স্তরে আরোহণ করিয়া স্বামীজী নবাব বাহাদুরের মনে এই প্রত্যয় জাগাইলেন যে, মানবের ভগবদ্বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কিছু আধ্যাত্মিক বিশ্বাস দেখা যায়, তাহা মানবপ্রকৃতির গভীরতম প্রদেশ হইতে সত্য-সাক্ষাৎকারের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার মতে সকল আদর্শই সত্য এবং বিভিন্ন ধর্ম সেই আদর্শ লাভের বিচিত্র উপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর ঐ পথানুসরণে মানবের আগ্রহবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্নিহিত দেবত্বও অধিকাধিক বিকশিত হইতে থাকে। অতঃপর বেদান্তোক্ত পরব্রহ্মতত্ত্বের কথা উত্থাপন করিয়া তিনি দেখাইলেন, ভগবানের সৃষ্ট জীবকুলের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ অধ্যাত্মভাবে প্রভাবিত মানববুদ্ধির মাধ্যমেই জগতের সর্বপ্রকার উচ্চতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তদবলম্বনেই মানুষ তাহার সসীমতাকে অতিক্রমপূর্বক দেবত্বে আরূঢ় হইয়াছে। অবশেষে তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশে যাইয়া সনাতন সর্বজনীন ধর্মপ্রচারের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। নবাব বাহাদুর তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "স্বামীজী, আমি আপনার এই প্রচেষ্টার জন্য এক হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।" কিন্তু স্বামীজী তখনই ঐ অর্থ গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, তিনি যখন সত্য সত্যই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তখন উহা চাহিয়া লইবেন।

ইহার পর ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি হায়দরাবাদের কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান—মক্কা-মসজিদ, মার-মিনার, ফলক-নামা, বসীর বাগ, নিজামের প্রাসাদাবলী ও অন্য কয়েকটি দর্শনীয় হর্ম্যাদি দেখিয়া লইলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি পূর্বাহ্ণে তিনি পূর্বব্যবস্থানুযায়ী হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী

স্যার আশমান জা, রাজ্যের পেশকার মহারাজ বাহাদুর নরেন্দ্র কৃষ্ণ এবং মহারাজ বাহাদুর শিউ রাজের সহিত দেখা করিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার প্রচারকার্যে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অপরাহ্নে মহবুব মহাবিদ্যালয়ে 'আমার পাশ্চাত্ত্য-গমনের উদ্দেশ্য' বিষয়ে তাঁহার যে বক্তৃতা হইল, তাহাতে পণ্ডিত রতনলাল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোকসহ সহস্রাধিক শ্রোতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর ইংরেজী ভাষায় অধিকার, পাণ্ডিত্য, বাগ্‌-বিন্যাস-মাধুর্য ও ভাষণভঙ্গীতে সকলেই আহ্লাদিত হইলেন।

পরদিন বেগমবাজারের বণিকগণ শ্রীযুক্ত শেঠ মোতিলালের নেতৃত্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। স্থানীয় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি এবং সংস্কৃত ধর্মমণ্ডল সভার কোন কোন সভ্যও দেখা করিতে আসিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি পুনা হইতে তাঁহার নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিল, তাহাতে পুনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গণ্যমান্য নাগরিকগণ তাঁহাকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী জানাইয়া দিলেন, তাঁহার পক্ষে তখনই যাওয়া সম্ভব হইবে না, ভবিষ্যতে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

হায়দরাবাদেই তিনি তখন একজন যোগীর দর্শন পাইয়াছিলেন যিনি অদ্ভুত যৌগিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু সংসারত্যাগপুর্বক যোগাভ্যাসের ফলে বহু যোগবিভূতির অধিকারী হইয়াছিলেন। স্বামীজী বন্ধুগণসমভিব্যাহারে যোগীর সমীপে আসিয়া দেখিলেন, তিনি প্রবল জ্বরে শয্যাগত। সন্ন্যাসীকে সমাগত দেখিয়া শ্রদ্ধাবান যোগী তাঁহাকে নিজ সকাশে ডাকিয়া বসাইলেন এবং সন্ন্যাসীর দেহলক্ষণ-দর্শনে তাঁহাকে উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বুঝিয়া অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণপুর্বক আশীর্বাদ করেন, তাহা হইলেই জ্বর সারিয়া যাইবে। স্বামীজীর নিজের মনোভাব ঐ সময়ে যাহাই হউক না কেন, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখিবার জন্য কুতূহলবশে তিনি যোগীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, আর যোগীও অমনি উঠিয়া বসিলেন। তখন স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "আমাকে আপনার সিদ্ধাই দেখাতে হবে।" যোগী রাজী হইলে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গীরা যোগীর দেহের বস্ত্রাদি উন্মোচিত করিয়া

তাঁহাকে নিজেদেরই একখানি কম্বলে ঢাকিয়া দিলেন। যোগী ঘরের এক কোণে বসিলেন এবং পঁচিশ জোড়া চোখ তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখিল। তিনি বলিলেন, "যে যা চান, কাগজে লিখে ফেলুন।" সে অঞ্চলে তখন ফলে না, এমন সব ফলের নাম তাঁহারা লিখিলেন—আঙ্গুর, কমলা লেবু ইত্যাদি। লেখার পর কাগজগুলি তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি কম্বলের মধ্য হইতে প্রত্যেকের ফরমাশ মতো টাটকা ফল বাহির করিতে লাগিলেন। এত ফল জমিয়া গেল যে, উহা যোগীর দেহের ওজনের দ্বিগুণ হইবে। সেসব তিনি তাঁহাদের খাইতে বলিলেন; কিন্তু আগন্তুকরা ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া তিনি নিজেই খাইতে আরম্ভ করিলেন; তখন অপরেরাও উহা মুখে দিয়া দেখেন, ফলগুলি বেশ সুস্বাদু; সেগুলি আসল ফল। সবশেষে তিনি একরাশি গোলাপ ফুল বাহির করিলেন—সবগুলি ফুলই নিখুঁত ও সদ্যঃশিশিরসিক্ত। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "সবই হাত-সাফাই-এর ব্যাপাব।" কালিফর্নিয়ায় 'মনের শক্তি' বিষয়ক এক বক্তৃতা প্রদানকালে স্বামীজী স্বয়ং এই ঘটনাটি বিবৃত করেন। ('বাণী ও রচনা' ৩।৪০০-২)। ঐ বক্তৃতাকালেই তিনি আর একজন মনঃশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির কথা বলিয়াছিলেন, যিনি অপরের মনের কথা বলিয়া দিতে পারিতেন, মনে মনে কোন প্রশ্ন ভাবিয়া তাঁহার নিকট গেলে প্রশ্ন না শুনিয়াও উত্তর বলিয়া দিতেন। ঐ ব্যক্তির নিকট গেলে তিনি একখণ্ড কাগজে কিছু লিখিয়া উহা ভাঁজ করিয়া স্বামীজীর হাতে দিলেন এবং স্বামীজীকে বলিলেন তিনি যেন মোড়কটির উপর নিজের নাম সহি করিয়া পকেটে রাখিয়া দেন; যথাকালে খুলিতে বলিলে খুলিবেন। উপস্থিত অপর সকলকেই তিনি অনুরূপ কাগজ দিলেন এবং ঐভাবেই রাখিয়া দিতে বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, আপনারা যে-কোন ভাষায় চিন্তা করুন। স্বামীজী সংস্কৃতে চিন্তা করিলেন; ঐ ব্যক্তি সংস্কৃত জানিতেন না। কথা ভাবিবার পর ঐ ব্যক্তি স্বামীজীকে বলিলেন পকেটের কাগজ খুলিয়া দেখুন। স্বামীজী দেখিলেন—তিনি এক্ষণে যে কথা ভাবিলেন, ঐ ব্যক্তি পুর্ব হইতেই উহা জানিয়া লইয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। অপরদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মিলিয়া গেল; বহু অজানা ভাষায় তাঁহারাও ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি পুর্ব হইতেই সব জানিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি স্বামীজী হিন্দু-মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ, বাবা সরাফউদ্দীনের কবর ও স্যার সালারজঙ্গের প্রাসাদ দেখিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি মাদ্রাজে

ফিরিয়া যাইবার জন্য রেল স্টেশনে আসিলে সহস্রাধিক ব্যক্তি সেখানে তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন জানাইলেন। শ্রীযুক্ত কালীচরণবাবু লিখিয়াছেন, "তাঁহার পবিত্রতামণ্ডিত সারল্য, সর্বাবস্থায় আত্মসংযম এবং গভীর অন্তর্মুখভাব হায়দরাবাদ-বাসীদের হৃদয়ে চিরজীবনেব মতো স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।"

মাদ্রাজে প্রত্যাগত স্বামীজীকে তাঁহার ভক্তগণ স্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। এবারে তিনি অধিকতর আত্মবিশ্বাস লইয়া ফিরিয়াছিলেন, কারণ মহবুব মহাবিদ্যালয়ে তিনি স্বীয় বাক্‌শক্তির স্বরূপের ও সাফল্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। ঘরোয়া বৈঠকে যেমন, বিরাট জনসভায়ও তেমনি তিনি এখন শ্রোতাদের মনে স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সিদ্ধহস্ত। সত্যকথা বলিতে কি, ইতিপূর্বে তিনি বেলগাঁওয়ে হরিপদ মিত্র মহাশয়কে বলিয়াই আসিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী বৃহদাকার হইলে বক্তার অন্তঃশক্তিও অধিকতর বিকাশলাভ করে। তবু আপাততঃ তিনি পুনর্বার তাঁহার পুরাতন ধারায় বন্ধুবান্ধব ও ভক্তদের সহিত আলাপ-আলোচনা ও ধর্মপ্রসঙ্গাদিতেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার কথার বিষয় ছিল অনন্ত, আর ভক্ত সমাগমও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

এদিকে দিন যেমন কাটিতে লাগিল, আমেরিকাগমনের চিন্তা-ভাবনা যেন তেমনি বর্ধিত হইতে থাকিল। কখনও বিদেশে অনিশ্চয়তার কথা ভাবিয়া তিনি অতিশয় নিপীড়িত হইতেন, এবং কখনও বা নূতন অভিজ্ঞতালাভ ও তাঁহার কার্যক্ষেত্রের প্রসারের আশায় তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার অন্তর্যামী যেন তাঁহাকে বলিয়া দিতেন, তাঁহার জন্য নবীন পটভূমিকা রচিত হইতেছে, তাঁহার সাফল্য অনিবার্য—বিশ্ববাসী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী, ভারতের শাশ্বত উদারবার্তা অবশ্য শ্রবণ করিবে। তাঁহার আশা ও উৎসাহের স্পর্শ ভক্ত-হৃদয়েও উদ্দীপনা জাগাইল এবং তাঁহারা পুনর্বার অর্থসংগ্রহে যত্নপর হইলেন। যাঁহারা অর্থপ্রদান করিলেন, তাঁহারা যে শুধু তাঁহার দৃশ্যমান গুণরাশিতে মুগ্ধ হইয়াই ঐরূপ করিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও যেন অন্তরে অন্তরে জানিতে পারিলেন, ইনি বিধাতার বরপুত্র, সাফল্য ইঁহার ললাটে দৃঢ়াঙ্কিত। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে যেসব চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই তাঁহারা জানিতেন না, স্বামীজীও তাঁহাদিগকে বলেন নাই। শ্রীযুক্ত ব্যাসরাও লিখিয়াছেন, "জগৎ যখন স্বামীজীকে আবিষ্কার করিল, তাহারই সমকালে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের আট বৎসর পরে তাঁহাকেও আবিষ্কার করিল। শিষ্য

বিবেকানন্দের মাধ্যমেই জগৎ তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনিল। এবং এই অদ্ভুতকর্মা যুবক সন্ন্যাসীর কথাতেই সকলে মানিয়া লইল যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন সবই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি পশ্চাতে আছে বলিয়াই যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আশা পোষণ করা হইয়াছিল, তাহা মোটেই নহে, বরং অজ্ঞাতকুলশীল হইলেও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মাদ্রাজবাসীরা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, তাহারই ফলে বিবেকানন্দকেই কেন্দ্র করিয়া তাহাদের আশা উজ্জীবিত হইয়াছিল।"

মার্চ ও এপ্রিল মাসে অর্থ সংগ্রহের জন্য ভক্তগণ বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে কেহ কেহ মহীশূর, রামনাদ ও হায়দরাবাদেও গেলেন। স্বভাবতই তাঁহারা স্বামীজীর শিষ্য বা অনুরাগী বন্ধুদের গৃহে প্রথম উপস্থিত হইলেন, আর অর্থসংগ্রাহকদের মধ্যে মুখ্যস্থান গ্রহণ করিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল। ইনি স্বামীজীর একান্ত অনুগত ছিলেন এবং উদ্দেশ্যসাধনার্থ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন বলিলেও চলে। ইনি ও ইঁহারই সহচর যুবকমণ্ডলীই অধিকাংশ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আর ইঁহারা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকটই ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, কারণ স্বামীজী তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "মায়ের যদি অভিপ্রায় হয় যে, আমায় যেতে হবে, তবে আমার প্রয়োজনীয় অর্থ গরীবদের কাছ থেকে আসুক; কেননা আমি তো ভারতীয় জনতারই জন্য বিদেশে যাচ্ছি—ভারতীয় জনতা ও দরিদ্রেরই জন্য।" বিদেশযাত্রা-বিষয়ে স্বামীজী কিন্তু তখনও তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন নাই। আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি, তিনি হায়দরাবাদ গমনের পুর্বে জগজ্জননীর অভিপ্রায় আদায় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া যখন শিষ্যদের ঐকান্তিক যত্ন ও কিঞ্চিৎ সাফল্যের পরিচয় পাইলেন, তখন ভাবিলেন, "এদের এই তৎপরতাই হয়তো মায়ের অভিপ্রায়ের প্রথম ইঙ্গিত।" এই প্রকারে তিনি বিদেশযাত্রার প্রয়োজন ও ফল সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও তখনও যেন কি এক কারণে একটা অনিশ্চয়তা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এই মানসিক অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য তিনি স্পষ্টতর ঈশ্বরনির্দেশের অপেক্ষায় রহিলেন, আর জগন্মাতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঐ উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতে থাকিলেন। মানবীয় বিচারে তাঁহার মন উদ্দেশ্যবিষয়ে সন্দেহমুক্ত হইলেও তিনি ভগবদনুমোদনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য লালায়িত রহিলেন। দিন

কয়েক পরে তিনি অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময় স্বপ্নে সে প্রমাণ পাইলেন। তিনি দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে বিস্তৃত মহাসাগরের একূল হইতে সমুদ্রে অবতরণ করিয়া পদব্রজে অপর কুলাভিমুখে চলিয়াছেন এবং তাঁহাকেও অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রাণমন এক অনাবিল শান্তিতে ভরিয়া গেল, আর তখনও যেন তাঁহার কর্ণে বাজিতে লাগিল এক অশরীরী বাণী—"যাও"।

সে অলৌকিক দর্শন তাঁহার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিল, এবং তিনি উহা ভগবন্নির্দেশরূপেই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা দূরীভূত হইল এবং অনির্দিষ্ট নিঃস্বরূপ ভয় হইতেও তিনি মুক্তি পাইলেন। তথাপি পরিব্রাজক-জীবনের আরম্ভকালে তিনি যেমন শ্রীমা সারদা দেবীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সুদূরযাত্রার পুর্বেও তেমনি আশীর্বাদের প্রয়োজন বোধ করিয়া তাঁহাকে ঐজন্য একখানি পত্র লিখিলেন ও অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন স্বামীজীর উদ্দেশ্যের কথা গোপন রাখেন। এই পত্র পাইয়া শ্রীমায়ের মনে সুখদুঃখমিশ্রিত চিন্তারাশির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। স্নেহপাত্র সুপুত্রের সংবাদ তিনি দীর্ঘকাল পান নাই ; অতএব এতদিন পরে প্রাপ্ত পত্রখানি খুবই সুখময় ছিল। কিন্তু নরেন্দ্র যে সুদূরে যাইতে ব্যগ্র! কি হইবে কবে ফিরিবে—কে জানে? এরূপ ক্ষেত্রে মাতৃহৃদয়ে প্রথমেই উত্তর উঠে, "না"। শ্রীমায়ের মনেও প্রথমে ঐরূপ প্রতিক্রিয়াই হইয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া, এই বিদেশযাত্রার মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার আভাস পাইয়া এবং নরেন্দ্রের স্বীয় আগ্রহ দেখিয়া তিনি ব্যক্তিগত ভয়ভাবনা, দুঃখবিষাদ ইত্যাদি ভুলিয়া গিয়া আশীর্বাদপুর্ণ ও মাতৃসুলভ উপদেশসংযুক্ত একখানি সুন্দর লিপি প্রেরণ করিলেন। পত্র পাইয়া স্বামীজী আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন—এখন তাঁহার সঙ্কল্প ও ব্রত সফল হইতে বাধ্য।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে এমন সময় হঠাৎ খেতড়ী-রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। আমরা জানি, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগ পর্যন্ত কিছুদিন স্বামীজী খেতড়ী-রাজপ্রাসাদে ছিলেন। ঐ সময়ে রাজা পুত্রলাভের জন্য স্বামীজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং স্বামীজীও আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এতদিনে রাজার মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হইয়াছে, পুত্রমুখদর্শনে উৎফুল্ল রাজা একটি

উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন এবং ঐ সময় স্বীয় গুরুদেবকে পাইবার জন্য সোৎসাহে জগমোহনকে পাঠাইয়াছেন। মন্মথবাবুর গৃহে জগমোহন লাল যখন স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন স্বামীজী সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এই অকস্মাৎ আগমনের কারণ কি? জগমোহন স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে স্বামীজী বলিলেন, "দেখ জগমোহন, আমি একমাস পরে[৩] ৩১শে মে আমেরিকা যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এসময় কেমন করে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাব?" জগমোহন তবু নিরস্ত না হইয়া বলিলেন, "স্বামীজী, একদিনের জন্য হলেও আপনাকে অবশ্যই খেতড়ীতে আসতে হবে। আপনি না এলে রাজাজী নৈরাশ্যে অবসন্ন হয়ে পড়বেন। আর পাশ্চাত্ত্যে যাবার বন্দোবস্ত নিয়ে আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না; মহারাজ নিজে সব ঠিক করে দেবেন। আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।" অগত্যা স্বামীজী সম্মত হইলেন।

খেতড়ী যাইবার পথে স্বামীজী বাপিঙ্গানা, বোম্বে ও জয়পুরে নামিয়াছিলেন। বোম্বেতে তিনি কোথায় অবস্থান করেন ও কি করেন, ইত্যাদি সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইলেও এইসব বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। তিনি সেখানে কি করিয়াছিলেন, এই বিষয়টি আমরা এই অধ্যায়ের শেষে ধরিব; আপাততঃ অন্যান্য বিষয়ের কথা বলি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের জীবনী আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারা পশ্চিমোত্তর ভারতে তপস্যা ও তীর্থদর্শনান্তে করাচী হইতে জাহাজে চড়িয়া বোম্বেতে আসেন এবং সেখানে স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের মিলন হয়। হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য কালীপদ ঘোষ বা 'দানা কালী'র গৃহে মিলন ঘটিয়া থাকিবে; কারণ কালীপদ তখন কাগজের ব্যবসায়ী জন ডিকিন্সন কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে থাকিতেন। যাহা হউক, দুই-চারি দিন পরেই এই দুই গুরুভ্রাতা ও জগমোহন লালের সহিত স্বামীজী ট্রেনে করিয়া জয়পুর যাত্রা করিলেন। পথে আবু রোডে ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ নামিয়া পড়িলেন—তাঁহাদের গন্তব্যস্থল ছিল আবু। এই ভ্রমণ বিষয়ে খেতড়ী হইতে স্বামীজী জুনাগড়ের দেওয়ান শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাসকে লিখিয়াছিলেন, "অপর যে দুইজন স্বামীজী গতবারে জুনাগড়ে আপনার নিকট গিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাঁরা আমার গুরুভাই।···তাঁদের সঙ্গে তিন বৎসর

৩। ইহা ইংরেজী জীবনীর মত, পরের পাদটীকা দ্রষ্টব্য

পরে দেখা হয় এবং আমরা সকলে আবু পর্যন্ত একসঙ্গে এসে ওখানে ওদের ছেড়ে এসেছি।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৫২)। মুন্সী জগমোহন লালের পরিচয়প্রসঙ্গে তিনি ২২শে মে তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন, "রাজপুতানার জনসাধারণ যে শ্রেণীর লোককে 'তাজিমি সরদার' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে এবং যাহাদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং রাজাকেও আসনত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়, ইনি সেই সরদার-শ্রেণীর লোক। অথচ ইনি এত অনাড়ম্বর এবং এমনভাবে আমার সেবা করেন যে, আমি সময় সময় অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি।" (ঐ, ৩৪৯)।

স্বামীজী জগমোহন লালের সহিত সম্ভবতঃ ১৫ই এপ্রিল বা ঐরূপ কোনও একদিন রেওয়ারী পৌঁছিলেন; রেওয়ারী হইতে খেতড়ী পৌঁছিতে তখনকার দিনে প্রায় এক সপ্তাহ লাগিত। খেতড়ী-রাজ্যের দিনলিপি হইতে প্রকাশ, স্বামীজী ২১শে এপ্রিল খেতড়ী পৌঁছিয়াছিলেন।[৪] সেই দিন হইতে ৯ই মে পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করিয়া তিনি পুনর্বার মুন্সী জগমোহন লালের সহিত ১০ই মে খেতড়ী ত্যাগ করেন। স্বামীজী যখন খেতড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন রাজকুমার জয়সিংহের জন্মোৎসব চলিতেছে। দাঘিতে (তলাব) নৌকা-বিহার, উহার তীরে নৃত্য-গীত, আতশবাজি ইত্যাদি বহু প্রকার আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন হইয়াছে। স্বামীজী এই উৎসবক্ষেত্রে উপনীত হইলে খেতড়ী-রাজ অপর সকলের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানাইলেন, এবং রাজা তাঁহার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নজর হিসাবে পঁচিশ টাকা অর্পণ করিলেন। অতঃপর রাত্রি দশটায় গজারোহণে স্বামীজী, খেতড়ী-রাজ ও অপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রাজবাটীর বহিপ্রান্তে অবস্থিত উদ্যানে আসিলেন ও সেখানে অবতরণ করিলেন। ইহার পর স্বামীজী রাজার সহিত 'ছবিনিবাসে' বসিয়া রাত্রি এগারটা পর্যন্ত গল্পগুজব করিলেন। অতঃপর একত্র আহারান্তে তাঁহারা রাত্রি বারোটায় নিজ নিজ শয়ন-কক্ষে চলিয়া গেলেন। এইভাবে আলাপ ও উৎসবাদিতে কয়েকদিন অতীত হইল। ৯ই মে রাজকুমারকে আশীর্বাদ করিবার জন্য স্বামীজীকে 'দেওড়ী' বা মহিলাদের বাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইল; তিনিও প্রাণ খুলিয়া তাহাকে আশী-

৪। এই তারিখগুলিকে ঠিক ধরিলে মুন্সী জগমোহন লাল মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছিলেন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে, অর্থাৎ স্বামীজীর বিদেশ-যাত্রার প্রায় দুই মাস পূর্বে। *Swami Vivekananda*—B. S. Sarma p. 92.

বাদ করিলেন[৫]। পরদিন ১০ই মে স্বামীজী পালকিতে চড়িয়া খেতড়ী ত্যাগ করিলেন। মুন্সীজী বোম্বে পর্যন্ত যাইবেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। রাজা অজিত সিংহও তাঁহার সহিত জয়পুর পর্যন্ত গেলেন। স্বামীজী এতদিন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন; খেতড়ী আসার পূর্বে তিনি সচ্চিদানন্দ নামটি ব্যবহার করিতেছিলেন। খেতড়ী হইতে বিদায়ের পূর্বে রাজা তাঁহার বিদায়-সম্ভাষণের জন্য দরবার আহ্বান করিলেন এবং সেখানে তাঁহাকে অতঃপর বিবেকানন্দ নামে আত্মপরিচয় দিতে এবং ঐ নূতন নাম পরিবর্তিত না করিতে অনুরোধ করিলেন। এই নামেই তিনি ইহার পর জগদ্বরেণ্য হইয়াছিলেন, আমরাও এখন হইতে এই নামই ব্যবহার করিব।

জয়পুরের একটি ঘটনা বিশেষ মর্মস্পর্শী; উহাতে যেন স্বামীজীর একটা নূতন দিকে চক্ষু খুলিয়া গেল। এক সন্ধ্যায় এক নর্তকী গান গাহিয়া রাজার চিত্তবিনোদন করিতেছিল। সঙ্গীতের আরম্ভকালে স্বামীজী আপনার তাঁবুতে ছিলেন; রাজা তাঁহাকে সঙ্গীতাসরে আসিবার জন্য খবর পাঠাইলেন। স্বামীজী কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐরূপ আসরে উপস্থিত থাকা অনুচিত। গায়িকা ইহা শুনিয়া খুবই মর্মাহত হইল, এবং স্বামীজীর কথার প্রত্যুত্তরচ্ছলেই যেন গান ধরিল—

হমারে প্রভু অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো, অব মোহি পার করো ॥
ইক লোহা পুজামেঁ রাখত, ইক ঘর বধিক পরো,
পারস গুণ অবগুণ নহিঁ চিতবৈ কঞ্চন করত খরো ॥
এক নদিয়া ইক নার কহাবত, মৈলো হি নীর ভরো,
জব দোউ মিলি এক বরন ভয়ে সুরসরি নাম পরো ॥
যহ মায়া ভ্রম জাল নিবারো, সুরদাস সগরো,
অবকী বের মোহি পার উতারো নহিঁ প্রন জাত টরো ॥

—*Swami Vivekananda A Forgotten Chapter, page 61*

৫। জীবনীকারদের মতে—প্রথম দিনই সমাগত সকলের সম্মুখে 'সভামধ্যে' নবজাত কুমারকে আনা হইল; "তিনি তাহার মস্তকে হস্তরক্ষা করিয়া কল্যাণবাক্য উচ্চারণ করিলে চতুর্দিকে আনন্দের কলরোল উত্থিত হইল।" শেষ দিনের (৯ই মের) ঘটনার জন্য আমরা বেণী শঙ্করজীর নিকট ঋণী।

সঙ্গীতটি স্বামীজীর হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল ; সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বাইজী যেন তাঁহাকে এক অবহেলিত সত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছিল—জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", সর্ববস্তুর পশ্চাতে এক অভিন্ন ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত, এমন কি ঘৃণীতা নারীতেও তিনিই বিদ্যমান। অতএব স্বামীজী আসরে আসিয়া সকলের মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি পরে বলিয়াছিলেন, "গানটি শুনে আমার মনে হলো, এই কি আমার সন্ন্যাস ? আমি সন্ন্যাসী, অথচ আমার ও এই নারীর মধ্যে আমার ভেদজ্ঞান রয়ে গেছে ; সে ঘটনাতে আমার চোখ খুলে গেল। সর্ববস্তু সেই একই সত্তার অভি-ব্যক্তি জেনে আমার আর কাউকে নিন্দা করার জো ছিল না।"[৬]

জয়পুরে অতি বিষাদগ্রস্ত-হৃদয়ে অজিতসিংহ স্বামীজীকে বিদায় দিলেন। তারপর মুন্সীজীর সহিত স্বামীজী আবু রোডে উপস্থিত হইয়া পুর্বপরিচিত এক রেল কর্মচারীর বাসায় রাত্রিযাপন করিলেন। এখানে আবু পাহাড় হইতে আগত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটিলে সকলে সানন্দে অনেকক্ষণ বার্তালাপ ও ভাববিনিময়ে কাটাইলেন। গরুর গাড়ীতে আসিতে গুরুভ্রাতৃদ্বয়ের গায়ে ব্যথা হইয়াছে শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "গাড়োয়ানকে দুটো পয়সা দিলেই গাড়ীতে খড় বিছিয়ে দিত, কোন কষ্ট হত না।" সর্ববিষয়ে তাঁহার ভূয়োদর্শন ও বিবেচনাশক্তি এমনি প্রবল ছিল !

স্বামীজীর সহিত ঐ কালে বার্তালাপ সম্বন্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি) পরে বলিয়াছিলেন, "সে সময় স্বামীজীর গোটা কয়েক মন্তব্য আমার স্পষ্ট মনে আছে—

৬। এই ঘটনার স্থান-কাল-বৃত্তান্তাদি বিষয়ে মতভেদ আছে। আমরা ইংরেজী জীবনীর অনুসরণ করিয়াছি। বাঙ্গলা জীবনীর মতে ঘটনার স্থান খেতড়ী ; তবে পাদটীকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই ঘটনাটি সম্ভবতঃ খেতড়ী রাজের জয়পুর বাটীতে সংঘটিত হয়।" (১৯৯ পৃঃ, ৩য় সংস্করণ)। এই গ্রন্থের মতে স্বামীজী অন্যত্র ধ্যানমগ্ন ছিলেন ; খেতড়ী-রাজের আহ্বানে প্রমোদ-উদ্যানে আসেন ; সেখানে নর্তকীর সঙ্গীতের আয়োজন ছিল। স্বামীজী আসিলে রাজার আদেশে সঙ্গীত আরম্ভ হইবে, এমন সময় স্বামীজী আসর ত্যাগ করিতে উদ্যত হন ; কেননা সন্ন্যাসীর পক্ষে বামা-কণ্ঠের সঙ্গীত-শ্রবণ অবাঞ্ছনীয়। রাজা তখন অনুরোধ করেন, "একটি গান শুনিয়া যান। সে গান শুনিলে সাধারণের মনেই অতি উচ্চ ভাবের উদয় হয়।" অগত্যা স্বামীজী বসিলেন ; অতঃপর ঐ গান হইল। গান শুনিয়া স্বামীজী বাইজীকে বলিলেন, "মা, আমি অপরাধ করিয়াছি : আপনাকে ঘৃণা করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।" বেণী শঙ্কর শর্মা ও বাঙ্গলা গ্রন্থকারের মতে ইহা খেতড়ীর প্রথম রাত্রের ঘটনা।

ঠিক শব্দগুলি ও স্বর এবং যে বিষাদ নিয়ে সে শব্দগুলি উচ্চারিত হয়েছিল, তা এখনও আমার কানে বাজছে। তিনি বলেছিলেন, 'হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না।' অতঃপর মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া নিয়ে এবং ভাবাতিশয্যে কম্পিতকলেবরে তিনি নিজের হাত বুকের উপর রেখে আরও বললেন, 'কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে!' তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আর বলতেই পারছিলেন না—চোখের জল পড়তে লাগল।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামী তুরীয়ানন্দও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি অনেকক্ষণ অশ্রুসিক্তনয়নে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "স্বামীজী যখন ঐ কথাগুলি বলছিলেন, তখন আমার মনে কি খেলছিল বলতে পার? আমি ভাবছিলাম: 'বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেননি, আর এমনি কথা বলেননি?'...আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে—তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরি করা হচ্ছিল।"

স্বামীজীর বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী আর যে একটি ঘটনার কথা স্বামী তুরীয়ানন্দ শুনাইয়াছিলেন, তাহাও এখানে বলিয়া রাখিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেদিন স্বামীজী কলিকাতার শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি স্বামীজীকে দেখতে এসে দেখি, তিনি এত গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বারাণ্ডায় পায়চারি করছেন যে, আমার আগমন টেরই পেলেন না। পাছে তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ে এই ভয়ে আমি চুপ করে রইলাম। একটু পরে স্বামীজী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মীরাবাই এর একটি বিখ্যাত গান গুন গুন করে গাইতে লাগলেন। পরে নিজের হাত দুখানিতে মুখ লুকিয়ে রেলিংএ ভর দিয়ে বিষাদভরে গাইলেন, 'দরদ না জানে কই!' তাঁর দুঃখময় সুর ও নৈরাশ্য যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল ও সবই বিষাদে ভরে উঠছিল। 'ঘায়ল কী খত ঘায়ল জানে, আওর না জানে কই'—এই বিষাদময় গানে যেন সমস্ত আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হচ্ছিল। তাঁর স্বর আমার হৃদয়ে যেন তীরের মতো বিঁধছিল এবং আমারও চোখে জল এসেছিল। স্বামীজীর দুঃখের কারণ বুঝতে না পেরে আমি বড়ই বিব্রত বোধ করছিলাম। একটু পরেই বুঝতে

পারলাম—জগতের দুঃখিত নিপীড়িতদের দুঃখের প্রতি এক অপার সহানুভূতিতেই তাঁর এই ব্যথা!"

আবু রোড স্টেশনে পুনর্বার গাড়ীতে উঠিবার সময় একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল। স্বামীজীর সহিত গাড়ীতে বসিয়া স্বামীজীর ভক্ত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় এক শ্বেতাঙ্গ টিকেট-পরীক্ষক আসিয়া ভদ্রলোককে নামিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক নিজেও রেলকর্মচারী ছিলেন, তাই উহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, প্রত্যুত সাহেবের সহিত বচসায় প্রবৃত্ত হইলেন। অগত্যা স্বামীজী উহা থামাইতে সচেষ্ট হইলে সাহেব আরও চটিয়া গিয়া রূঢ় ভাষায় বলিলেন, "তুম কাহে বাত করতে হো?" সামান্য সন্ন্যাসী ভাবিয়া এক ধমকে থামাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সাহেব হিন্দীর সাহায্য লইয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজী যখন ইংরেজীতে গর্জিয়া উঠিলেন, "তুম তুম করছ কাকে? উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় জান না? 'আপ' বলতে পার না?" তখন টিকেট-পরীক্ষক সাহেব বেগতিক দেখিয়া বলিলেন, "অন্যায় হয়েছে, আমি ও (হিন্দী) ভাষাটা ভাল জানি না; আমি শুধু ও লোকটাকে (ফেলোকে)—"। স্বামীজীর আর সহ্য হইল না। কথা শেষ করিতে না দিয়াই তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এই বললে হিন্দী ভাষা জান না; এখন দেখছি, তুমি তোমার নিজের ভাষাও জান না। 'লোকটা' কি? 'ভদ্রলোক' বলতে পার না? তোমার নাম ও নম্বর দাও; আমি উপরওয়ালাদের জানাব।" ততক্ষণে চারিদিকে ভিড় জমিয়া গিয়াছে, এবং সাহেবও পলাইতে পারিলে বাঁচেন। স্বামীজী তবু বলিতেছেন, "এই শেষ বলছি, হয় তোমার নম্বর দাও, নতুবা লোকে দেখুক, তোমার মতো কাপুরুষ দুনিয়ায় নাই।" সাহেবের তখন অত মান-অপমান ভাবিবার অবসর নাই; তিনি ঘাড় হেঁট করিয়া সরিয়া পড়িলেন। শ্বেতাঙ্গ চলিয়া গেলে স্বামীজী জগমোহনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি চাই দেখছ? এই আত্মসম্মানজ্ঞান। আমরা কে, কি দরের লোক না বুঝে ব্যবহার করাতেই লোকে আমাদের ঘাড়ে চড়তে চায়। অন্যের নিকট নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখা চাই। তা না হলেই তারা আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমান করে—এতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শিক্ষা ও সভ্যতায় হিন্দুরা জগতের কোন জাতির চেয়ে হীন নয়; কিন্তু তারা নিজেদের হীন মনে করে বলেই

একটা সামান্য বিদেশীও আমাদের লাথি ঝাঁটা মারে—আর আমরা চুপ করে তা হজম করি।"

আবু রোড হইতে স্বামীজী ও মুন্সী জগমোহন লাল বোম্বে পৌঁছিলেন। স্টেশনে আলাসিঙ্গা উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছিলেন। খেতড়ী-রাজও মুন্সীজীকে বলিয়া দিয়াছিলেন, স্বামীজীর জন্য যেন সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তিনি যেন রাজগুরুর সম্মানেই ভ্রমণ করিতে পারেন। অতএব স্বামীজীর আপত্তি সত্ত্বেও মুন্সীজী রেশমের পোশাক করাইয়া দিলেন—আলখাল্লা ও পাগড়ী। সঙ্গে কিছু অর্থও দিলেন এবং পেনিনসুলার এ্যাণ্ড ওরিয়েণ্ট কোম্পানির একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকেট সহ তাঁহাকে ঐ কোম্পানীর "পেনিন্সুলার" নামক জাহাজে তুলিয়া-দিলেন। সেদিন ৩১শে মে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ। স্বামীজী তখন আশা ও ভয়পুর্ণ হৃদয়ে জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া বন্ধুদের নিকট বিদায় লইতেছেন—আশা এই যে, এতদিন পরে তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল, তিনি সত্যই ভারতের বাণী প্রচার করিয়া স্বদেশ ও বিদেশের মঙ্গল সাধন করিবেন; আর ভয় এই যে, অজ্ঞাত দেশে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে তাঁহাকে না জানি কতই বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। দীর্ঘকালের জন্য এত জন বন্ধুবান্ধবকে ছাড়িয়া যাইতে দুঃখও কম হয় নাই। বন্ধুগণের হৃদয়ও তখন সুখদুঃখে দোলায়মান। তাঁহাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে আজ তাঁহাদের স্বামীজী সত্যই দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে বিদেশে চলিলেন। রেশমের আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিহিত স্বামীজীকে তখন যেন একজন রাজা বা মহারাজ বলিয়াই মনে হইতেছিল—এমন নির্ভীকহৃদয় বীর অবশ্যই জগজ্জয়ী হইবেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন, স্বামীজীর বাহিরের পরিবেশ যাহাই হউক না কেন, তিনি চিরসন্ন্যাসী, চিরবৈরাগী; পাশ্চাত্ত্যের ঐশ্বর্যাদির মধ্যেও তাঁহার মুখে ও জীবনে ভারতের অধ্যাত্মবার্তাই ধ্বনিত ও বিঘোষিত হইবে। তথাপি ঠিক বিদায়মুহূর্তে সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল—দীর্ঘকাল যে আর তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে না! ভক্তগণ পরিশেষে সমুদ্রতটে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক বিদায়সম্ভাষণ জানাইলেন; স্বামীজীও রেলিংএর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণ তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জাহাজ ক্রমে দূর সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল, বন্ধুরা ক্রমেই দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে লাগিলেন—পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে পার্শ্বে রহিলেন একমাত্র

ব্যারিস্টার ছবিল দাস, যাঁহার গৃহে স্বামীজী পূর্বে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছবিল দাস চলিয়াছেন নিজ কর্মব্যপদেশে ; রাস্তায় নামিয়া পড়িবেন।

স্বামীজীর বিদেশগমনের প্রাক্কালীন প্রায় চারিমাসের ঘটনাবলী আমরা ইংরেজী ও বাঙ্গলা জীবনীদ্বয় ও স্বামীজীর পত্রাবলী ইত্যাদি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করিলাম। খেতড়ীর ঘটনাবলীর জন্য শ্রীযুক্ত বেণীশঙ্কর শর্মার প্রণীত ইংরেজী গ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দ—এ্যা ফরগটেন চ্যাপ্টার' এর সাহায্যও লইলাম। উক্ত গ্রন্থে শর্মাজী একদিকে যেমন অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি স্থানবিশেষে ঐ তথ্যগুলির মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে গিয়া কিছু ভ্রান্তিরও সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে বলা আবশ্যক যে, শর্মাজীর এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইলেও ভ্রমগুলি সংশোধন করা কর্তব্য মনে করি। শর্মাজীর প্রধান বক্তব্য এই যে, খেতড়ী-রাজ স্বামীজীর বিদেশগমনের সমস্ত ব্যয়ভার একাই বহন করিয়াছিলেন। অপর কেহ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও তাহা নগণ্য। তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, খেতড়ী-রাজ স্বামীজীর মাতা প্রভৃতিকে নিয়মিত সাহায্য পাঠাইতেন। দ্বিতীয় কথাটি প্রসঙ্গাগত হইলেও স্বামীজীর জীবনে প্রণিধানযোগ্য ; কারণ জননীর ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া স্বামীজী নিশ্চিন্তমনে বিদেশের কার্যে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য খেতড়ী-রাজ বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইহা ক্ষুদ্র ঘটনা নহে; স্বামীজীর জীবনীকার ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু আমরা বর্তমানে প্রধানতঃ বিদেশযাত্রার ব্যবস্থাদির কথা লিখিতেছি ; ক্রমে আনুষঙ্গিকভাবে আমাদিগকেও স্বামীজীর পরিবারের জীবিকানির্বাহের কথায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। আপাততঃ আমাদের বিবেচ্য এই—স্বামীজীর ব্যয়ভার কে বহন করিয়াছিল ?

স্বামী শিবানন্দ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ হইতে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র বাবাজীর সংবাদ তাঁহার নিকট হইতে কিছুই পাই নাই, তবে মাদ্রাজে তাঁহার অনেকগুলি বন্ধু, যাঁহারা কলেজের প্রফেসর, হাইকোর্টের উকিল, ডাক্তার এবং যাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ—কেহ কেহ কায়স্থও আছেন—তাঁহারা চাঁদা করিয়া প্রায় চারি সহস্র টাকা একত্র করিয়া তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠান। তাঁহাদের কাছে বিবেকানন্দ-প্রেরিত কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি।··· মাদ্রাজের ভদ্রলোকগুলি তাঁহাকে এতদূর ভক্তি করেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ

কেহ স্ব স্ব বিষয়ের কিঞ্চিদংশ বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, যদি তিনি সেখান হইতে চাহিয়া পাঠান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইঁহারা পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমেরিকার লোক তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার সমস্ত খরচ তাহারাই দিতেছে।" ইহার পরও যাঁহাদের মনে সন্দেহ থাকিবে, তাঁহাদিগকে জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখিত স্বামীজীর একখানি পত্র পড়িতে বলি ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৫০-৫২)। উহার আবশ্যকাংশ উদ্ধৃত করিলাম —"আপনার হয়তো স্মরণ আছে যে, আগে থেকেই আমার চিকাগো যাবার অভিলাষ ছিল; এমন সময় মাদ্রাজের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং মহীশূর ও রামনাদের মহারাজের সাহায্যে আমাকে পাঠাবার সব রকম আয়োজন করে ফেললো। আপনার আরও স্মরণ থাকতে পারে যে, খেতড়ীর রাজা ও আমার মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম বিদ্যমান। তাই কথাচ্ছলে তাঁকে লিখেছিলাম যে, আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। এখন খেতড়ীর রাজা মনে করলেন যে, যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবই। আরও বিশেষ কারণ এই যে, ভগবান তাঁকে সিংহাসনের একটি উত্তরাধিকারী দিয়েছেন এবং সেজন্য এখানে (খেতড়ীতে) খুব আমোদ-আহ্লাদ চলেছে। অধিকন্তু আমার আসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্য তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে অতদূর মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।" পত্রখানি খেতড়ী হইতে লিখিত। এই পত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, খেতড়ী-রাজের দানের কোন উল্লেখ নাই, যদিও তিনি যথাকালে স্বামীজীরই পত্র হইতে তাঁহার বিদেশ-গমনের সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। পত্রে দাতা হিসাবে মহীশূর ও রামনাদের অধিপতিদ্বয়ের এবং মাদ্রাজবাসী ভক্তদের উল্লেখ আছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, খেতড়ী পৌঁছিবার পূর্বে মাদ্রাজবাসীরা স্বামীজীকে "পাঠাবার সব রকম আয়োজন করে ফেললো।" তাহারা খেতড়ীরাজের টাকার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে নাই। এই তত্ত্বেরই অনুরূপ কথা পাই স্বামীজীর আর একখানি পত্রে, উহা তিনি খেতড়ী হইতে ২৭শে এপ্রিল মাদ্রাজের ভক্ত ডাঃ নাঞ্জুণ্ড রাওকে লিখিয়াছিলেন। পত্রে আছে: "মাদ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার জো নাই, কারণ আমি পূর্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলিবেন, (খেতড়ীর) রাজা অথবা আমার গুরুভাইগণ আমার সঙ্কল্পে বাধা দিবেন, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজাজীর তো আমার প্রতি

অগাধ ভালবাসা।" এখানেও স্বামীজী বলিতেছেন, খেতড়ী পৌঁছিবার পূর্বেই "বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত" করিয়া আসিয়াছেন। খেতড়ী-রাজের দানের উল্লেখ এই পত্রেও নাই। মাদ্রাজবাসী মন্মথবাবু সমস্ত খবর জানিলেও খেতড়ী-রাজের দানের সংবাদ জানিতেন না; কারণ খেতড়ী-রাজ দান করিয়াছেন এই কথা জানা থাকিলে বাধা-দানের প্রশ্নই উঠিত না। স্বামীজী ও দানের কথা না বলিয়া শুধু প্রেমের কথা বলিলেন। অর্থাৎ খেতড়ী পৌঁছাইবার পরেও খেতড়ী-রাজ তাঁহার পাথেয় বাবদ কোন অর্থ দেন নাই। স্বামীজী বোম্বেতে থামিয়াছিলেন টিকেট কিনিয়া বার্থ রিজার্ভ করিতে; আর ঐ অর্থ আসিয়াছিল আলাসিঙ্গাদেরই চাঁদার টাকা হইতে। তখনকার দিনে রিজার্ভ না করিয়া অকস্মাৎ পি. এ্যাণ্ড ও. কোম্পানীর জাহাজে বার্থ পাওয়া সহজ ছিল না। তাই বার্থ রিজার্ভ করিয়া তবে তিনি খেতড়ী গিয়াছিলেন। আর এক যুক্তি এই—আমরা দেখিয়াছি আলাসিঙ্গারা চারি-সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করেন। স্বামীজী ২০শে আগস্ট, ১৮৯৩ তারিখে আমেরিকা হইতে আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট এবং ৯ পাউণ্ড নগদ দিয়াছিলে।" এই ১৭৯ পাউণ্ড প্রায় ২৬৮৫৲ টাকার সমান হয়। বাকী দেড় হাজারের মতো টাকা তাহা হইলে টিকেট ও অন্যান্য ব্যাপারে খরচ হইয়াছিল। তবে যে আমরা পূর্বে লিখিয়া আসিলাম, জগমোহন লাল স্বামীজীর হস্তে একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকেট দিয়াছিলেন? ইহা কি সম্পূর্ণ খেতড়ী-রাজের দান? আমরা বেলুড় মঠের প্রাচীন সাধুদের মুখে দীর্ঘকাল পূর্বে শুনিয়াছি, আলাসিঙ্গা অর্থাভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনিয়াছিলেন; রাজগুরুর সম্মানার্থ জগমোহন তাহা প্রথম শ্রেণীতে পরিবর্তিত করেন। ইহাই ঠিক সামঞ্জস্য বলিয়া মনে হয়। অধিক টাকা খেতড়ী-রাজ দিয়া থাকিবেন।

শর্মাজী এই যুক্তিপরম্পরা ধরিতে না পারিয়া অন্যরূপ অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম যুক্তি এই: মাদ্রাজবাসীরা তেমন কিছু অর্থ তুলিতে পারেন নাই বলিয়া স্বামীজী জগমোহন লালকে বলিয়াছিলেন, তিনি আফগানিস্তানের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া আমেরিকা যাইবেন এবং ঐ সংবাদ জগমোহন খেতড়ী-রাজকে জানাইলে তিনি অর্থ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এখন কথা এই—খেতড়ী-রাজ দেশীয় রাজন্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও জয়পুরের অধীন সামন্ত-রাজ মাত্র ছিলেন, এবং আয়ের দিক হইতে একজন ধনী জমিদার মাত্র

ব্যতীত অধিক কিছু ছিলেন না। শর্মাজীও লিখিয়াছেন, "তাঁহার অতি সামান্য আয়" (ঐ, ৬৮ পৃঃ)। আর স্বামীজীর হাঁটিয়া যাওয়ার কথা? শর্মাজীর হিসাবে জগমোহন ৩রা এপ্রিল বরাবর মাদ্রাজে উপস্থিত হন। আমরা ধরিয়া লইলাম, ঐ দিন পর্যন্ত আমেরিকা যাইবার মতো যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। অতএব স্বামীজী বিশেষ চিন্তাকুল। এমন সময় যদি কেহ ফাঁকা প্রশ্ন করে, "স্বামীজী যাবেন কেমন করে?" তবে স্বামীজীর মতো বীর পুরুষের একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর এই, "তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে, ঝোপঝাড় ভেঙ্গে হেঁটে যাব।" তাহার মানে ইহা নহে যে, কোন কালেই টাকা উঠে নাই। শর্মাজীর কিন্তু অনুমান—টাকা উঠে নাই। অথচ তখনও জগমোহন খেতড়ী-রাজের টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কোন প্রতিজ্ঞাসূচক লিপি পান নাই; মৌখিক কথা তো পূর্বে মোটেই হয় নাই; তবু জগমোহন ছিলেন রাজ্যের দেওয়ান; অতএব নিজ দায়িত্বে টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে স্বামীজীকে খেতড়ী যাইতে রাজী করাইয়াছিলেন। এমন নিছক কল্পনার মূল্য কি?

শর্মাজীর আর একটি যুক্তি এই: ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর স্বামীজী একপত্রে খেতড়ী-রাজকে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহার জীবনের একটি "ভয়ানক উদ্বেগ" অপসারিত করিয়াছিলেন। শর্মাজীর মতে এই উদ্বেগ ছিল আমেরিকা যাইবার অর্থাভাবের জন্য; খেতড়ী-রাজ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া ঐ উদ্বেগ অপসারিত করেন। কিন্তু বস্তুতঃ এই উদ্বেগ আমেরিকাগমনের অর্থাভাবের জন্য নহে; সে উদ্বেগ "ভয়ানক" ছিল না, কিন্তু তাঁহার মাতার অন্নাভাবের চিন্তা সত্যই ভয়াবহ ছিল, আর খেতড়ী-রাজ সেই উদ্বেগই অপসারিত করিয়াছিলেন। স্বামীজী দ্বিতীয়বার খেতড়ী ত্যাগের প্রাক্‌কালে রাজা অজিৎ-সিংহ স্থির করেন, স্বামীজীর পরিবারকে মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য দিবেন (ঐ, ১৬০ পৃঃ)। তিনি অতঃপর উহা নিয়মিত পাঠাইতেন, এমন কি, রাজার অকালে দেহত্যাগের পরও উহা পাঠানো হইত। শর্মাজীর গ্রন্থে (১৭১-১৭৫ পৃঃ) স্বামীজীর যে পত্রদ্বয় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, স্বামীজী নিজের মায়ের কথার প্রসঙ্গেই "ভয়ানক উদ্বেগের" উল্লেখ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, আমরা জীবনী লিখিতে বসিয়াছি। ইহা সমালোচনা-গ্রন্থ নহে; অতএব অলমতিবিস্তারেণ। শর্মাজী যে-সকল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারি, রাজা অজিতসিংহ জগমোহনের মাদ্রাজের পত্র

হইতে যখন সংবাদ পাইলেন, অর্থাভাবে স্বামীজীর বিদেশ-গমনে বাধা পড়িতেছে, তখন সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়াই হউক, তিনি প্রয়োজনীয় তিন সহস্র মুদ্রা দিবেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, টাকা অন্যভাবে সংগৃহীত হইয়া গিয়াছিল। অতএব আমাদের বিশ্বাস, স্বামীজী যখন খেতড়ীতে উপস্থিত হইয়া যথাকালে রাজার সঙ্কল্প অবগত হইলেন, তখন তিনিই রাজাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিলেন, এবং তাঁহার জননীর জন্য অর্থসাহায্যের পরামর্শ দিলেন; রাজাও তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। দ্বিতীয় আর একটি বিষয় জানা যায় যে, উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত পত্রগুলি নির্ভুল হইলে—এবং নির্ভুল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ স্বামীজীর নূতন নাম—"বিবেকানন্দ"—তাঁহার চিকাগো বিজয়ের পুর্বেই অবগত ছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জানিতেন অন্ততঃ ১৩ই জুন, ১৮৯৩ খৃঃ (১৬২ পৃঃ), এবং স্বামী শিবানন্দ জানিতেন অন্ততঃ ২০শে জুলাই, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে (১৬৪ পৃঃ)। এই গ্রন্থ হইতে এবং অন্যান্য ঘটনা হইতে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, স্বামীজী যদিও প্রায় দুই বৎসর আত্মগোপন করিয়া চলিতেছিলেন, আমেরিকায় যাইবার কিঞ্চিৎপুর্বে তিনি স্বীয় সঙ্কল্প গোপন রাখিবার খুব বেশী প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মাদ্রাজের বন্ধুরা তো ইহা জানিতেনই; শ্রীমা ও স্বীয় গুরুভ্রাতাদের মধ্যে অন্ততঃ ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ ইহা জানিতেন; তবে বরাহনগরের অনেকেই হয়তো তাঁহার নূতন নাম জানিতেন না—স্বামী অভেদানন্দ এইরূপ না-জানার কথাই লিখিয়াছেন ('আমার জীবনকথা', ২১১ পৃঃ)। বোম্বের পরিচিত মহলেও স্বামীজীর উদ্দেশ্য অজ্ঞাত ছিল না—যদিও প্রথমাবস্থায় বিবেকানন্দ নামটি অবিদিত ছিল। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন, "আমেরিকা-যাত্রার অব্যবহিত পুর্বে তিনি (স্বামীজী) যখন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি কর্নেল অলকট-এর নিকট আমেরিকার জন্য পরিচয়পত্র চাহিতে গিয়াছিলেন, কর্নেল অল্‌কট তখন তাঁহাকে তাঁহার সচ্চিদানন্দ নামেই জানিয়াছিলেন" (৮ পৃঃ)। আমাদের মতে স্বামীজী "বিবেকানন্দ"—নামটি চিরজীবনের মতো স্বীকার করেন দ্বিতীয়বার খেতড়ী-ত্যাগের প্রাক্‌কালে; শর্মাজীর মতে তিনি উহা স্বীকার করেন খেতড়ী-রাজের সহিত প্রথমবারে মিলনকালে। ঐরূপ হইলে কিন্তু রোমাঁ রোলাঁর বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য পাওয়া কঠিন। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে, রোমাঁ রোলাঁ আরও লিখিয়াছেন, "কর্নেল

অল্‌কট স্বীয় বন্ধুগণের নিকট স্বামীজীকে পরিচিত করিয়া তো দেনই নাই, বরং তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন (ঐ)।

আর দুই-চারিটি কথা বলিয়াই আমরা স্বামীজীর বিদেশ-যাত্রার উদ্যোগপর্ব শেষ করিব। স্বামীজীর জনৈক শিষ্য স্বামীজীর বিদেশগমনের জন্য হার্দিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "পরিব্রাজকরূপে তিনি পর পর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সার কথা এবং রামানন্দ ও দয়ানন্দের ভাব-রাশির মর্ম অবগত হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চলদাস ও তুলসীদাসের গ্রন্থ একান্তমনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের মহাপুরুষবৃন্দ ও দক্ষিণদেশের আলোয়ার ও নায়নারদিগের সম্বন্ধে তিনি সুবিদিত ছিলেন। পরমহংস পরি-ব্রাজক হইতে আরম্ভ করিয়া লালগুরুর শিষ্য ভঙ্গী মেথর পর্যন্ত সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে তিনি পরিচিত তো ছিলেনই, তাহাদের সম্প্রদায়গত ইতিবৃত্তাদিও জানিতেন। তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে মোগল-প্রাধান্য ভারতেতি-হাসে একটা সাময়িক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভিন্ন কিছুই নয়। চিন্তার উদারতা ও সমন্বয়-সাধনের সাহসের দৃষ্টিতে আকবর ছিলেন হিন্দু। তাজ কি তাঁহার চিন্তায় মর্মর-প্রস্তরে রূপায়িত 'শকুন্তলা'-কাব্যছাড়া আর কিছু ছিল? 'তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ে মীরাবাই ও তানসেনের গানের মধ্যে মধ্যে গুরুনানকের সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যাইত। চিতোর, রাণাপ্রতাপ, শিব ও উমা, রাধা ও কৃষ্ণ, সীতা ও রাম এবং বুদ্ধের আখ্যায়িকা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজ ও দিল্লীর ইতিহাসও তাঁহার মুখে স্বতঃইব যেন আসিয়া পড়িত। তিনি যখন বক্তৃতামঞ্চে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন, তখন প্রতিটি প্রাচীন মহিমময় কীর্তিকাহিনী যেন অত্যাশ্চর্য-রূপে সজীব হইয়া উঠিত। তাঁহার সমগ্র হৃদয় এবং আত্মা যেন ছিল ভারতীয় মহাকাব্যের চিরউজ্জ্বল দীপশিখা, ভারতের নামশ্রবণেই যেন উহা রহস্যময় অধ্যাত্মশক্তিতে উছলিয়া পড়িত।' (ভগিনী নিবেদিতার লিখিত প্রবন্ধাংশ—'হিন্দু', ২৩।৭।১৯০২)। যাহা কিছু মৌলিক, অবিচ্ছেদ্য ও অবর্জনীয়—সবই তাঁহার আয়ত্তে ছিল ; জীবনের গোপন উৎসের সন্ধান তিনি জানিতেন ; তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত ছিল এমন এক বহ্নি, যাহা মৌলিক তত্ত্বসমূহের অনুভূতির ও অধ্যাত্মজ্ঞানলাভের ফলে তথায় আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিল। অপরেরা যেখানে বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহ মাত্র দেখিতেন, তাঁহার বিরাট মন সেখানেও সমন্বয়-সূত্র আবিষ্কার করিত। তাঁহার বুদ্ধি প্রতিবস্তুর মর্মস্থলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

ঘটনাবলীকে স্বীয় প্রকৃত পরম্পরাক্রমে সাজাইয়া দিত। তাঁহার মনটি ছিল সর্বাধিক সার্বভৌম অথচ পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী সংস্কৃতিসম্পন্ন। যিনি সর্বতোভাবে—বৈদিক, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব, এমন কি ইসলামের দিক হইতেও, ধর্মমহাসভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে উদ্যত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কোন্ প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল ? যিনি স্বীয় জীবনে সত্য সত্যই একটি ধর্মমহাসভাস্বরূপ ছিলেন, সেই মহামানবের শিষ্য এই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কে এই কর্তব্যসম্পাদনের যোগ্যতর পাত্র ছিলেন?" ('ব্রহ্মবাদিন্', ১৩৷৫৬৫-৬৬)।

পরিশেষে ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। "হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহা তাঁহার নিজস্ব, তবে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুণ্ণ হইত। গীতার কৃষ্ণের ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শঙ্করাচার্যের ন্যায় ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আচার্যের ন্যায় তাঁহার বাক্যসমূহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতিদ্বারাই সমৃদ্ধ। যে রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশকরূপে, ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী বিরাজমান।…দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোদ্যানে থাকিয়া যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বীয় ভাব প্রচার করিতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ—তদানীন্তন নরেন—তাঁহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্ত্র-সমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক খুঁজিতেছিল। এইখানে তিনি সেই তত্ত্বই পাইয়াছিলেন, যাহা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বর্ণিত।…গুরু রামকৃষ্ণের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবনরহস্যের কুঞ্চিকালাভ করিয়াছিলেন।…ইহার পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু, পণ্ডিত, সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল—এবং ভারতমাতা যেরূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছিলেন, তাহা দেখিতে হইয়াছিল।…সুতরাং শাস্ত্র গুরু এবং মাতৃভূমি—এই তিনটি সুর, এইগুলিই মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে বিবেকানন্দের রচনাবলীর মহান সঙ্গীত; এই রত্নগুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পৃথিবীর সকলের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক করুণার এক সর্বরোগহর মহৌষধি।" ('বাণী ও রচনার" ভূমিকা)।

সমুদ্রে যাত্রা

বোম্বে ছাড়িয়া জাহাজ দক্ষিণাভিমুখে কলম্বোর দিকে চলিল। যাত্রার শেষ হইবে অজ্ঞাত আমেরিকার অপরিচিত জনসমাজমধ্যে। যতক্ষণ ভারতের পুণ্য-ভূমি অক্ষিসমক্ষে অবস্থিত রহিল ততক্ষণ তিনি সেদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন, আর যাহারা ভালবাসিয়া বিদায়কালে এতদূর আসিয়াছে ও যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, কিংবা যাহারা আসিতে না পারিলেও তাঁহার সাফল্যের জন্য ভগবানের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছে, যাহারা চিরকাল তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে, তাহাদের সকলের কথা এককালে তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, প্রাণ ভরিয়া তিনি তাহাদের মঙ্গলকামনাদি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, হৃদয় বিষাদবেদনায় বিহ্বল হইল। তিনি ভাবিলেন ঠাকুরের কথা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, গুরুভ্রাতাদের কথা, আর ভাবিলেন তাঁহার প্রিয় ভারতের কথা—ঐতিহ্যময়, অধ্যাত্মসম্পদে পরিপূর্ণ, ঋষিদের পদসঞ্চারে পবিত্রীকৃত, ধর্মপ্রসূ জন্মভূমির কথা। এই সমস্ত ছাড়িয়া যাইতে যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ততক্ষণে তিনি দেখিলেন চারিদিকে শুধু সমুদ্রের নীল জলরাশি, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন-মনে বলিয়া ফেলিলেন, "সত্যি তাহলে ত্যাগভূমি ছেড়ে ভোগভূমিতে চললাম!" কিন্তু সেখানেও তো তাঁহার গমন ভোগের জন্য নহে—সেখানে রহিয়াছে তাঁহার জন্য কঠোর কর্তব্যসম্পাদন, ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ জীবনসংগ্রাম, দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বসঙ্কুল বিরামহীন প্রচারব্রত, ভয়াবহ অনিশ্চয়তা, এবং প্রাণপাতী পরিশ্রম! সে কঠোর তপস্যায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে, আয়ু দ্রুত ক্ষয় হইবে, বিশ্রামের অবকাশ ঘটিবে না। জীবনে তিনি আর নয়টি মাত্র বৎসর পাইবেন—তাহাও আবার দুঃখময় ও কর্তব্যপরম্পরায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেসব চিন্তায় বিবেকানন্দ কাল কাটাইতে পারেন না। বীর সন্ন্যাসী সাহসভরে, আশাপূর্ণ-হৃদয়ে ঠাকুর ও মায়ের শরণ লইলেন—তিনি তো চিরজীবন তাঁহাদেরই আশ্রিত সন্তান, তাঁহারা কি সন্তানের মঙ্গলবিধান করিবেন না? বৈদিকজ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার যাঁহার হৃদয়ে সে বিবেকানন্দের ভয় বা ভাবনা কোথায়? জাহাজ সীমাহীন সাগরজলে ভাসিল, স্বামীজীও দেশকালাতীত অনন্তের ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

ক্রমে সমুদ্রযাত্রার ধারা ও রীতিনীতিতে তিনি অভ্যস্ত হইয়া গেলেন। প্রথম প্রথম তিনি নিজের জিনিসপত্র লইয়া খুবই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দণ্ড কমণ্ডলুধারী কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসীর পক্ষে ট্রাঙ্ক, পোর্টম্যাণ্টো, বিছানাপত্র সামলানো এক দুরূহ সমস্যারূপেই দেখা দিয়াছিল। ক্রমে সব অভ্যাস হইয়া গেল এবং দুই-চারি দিনের মধ্যে সহযাত্রীদের সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া লইলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ ছিলেন জার্মান। গৈরিকপরিহিত, উজ্জ্বলবদন, আয়তলোচন, নির্ভীকগতি, প্রতিভামণ্ডিত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই যুবক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার সম্ভ্রান্তব্যক্তিসুলভ চলনভঙ্গী সারল্য ও মধুর ভদ্র-ব্যবহার তাঁহাদের চিত্ত জয় করিল। কাপ্তেন সাহেব মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত গল্পগুজব করিতেন এবং সাগ্রহে জাহাজের ইঞ্জিন ও অন্যান্য অংশ দেখাইতেন। যাত্রীদের প্রায় সকলেই ছিলেন বিদেশী, আর স্বামীজী ছিলেন তাঁহাদের আদব-কায়দায় অনভ্যস্ত, কিন্তু এই সকল দূরত্বও ক্রমে অপসৃত হইল। খাদ্যও তাঁহার নিকট প্রথমে অদ্ভুত ঠেকিত, সে বাধাও দূর হইল। অনভ্যস্ত খাদ্য, অপরিচিত জনসান্নিধ্য, অদ্ভুত পরিবেশ ইত্যাদি সর্বাবস্থার সহিতই তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইলেন। আর উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসসহ অর্ণবপোতের অবিরাম উত্থানপতন ও দোলখাওয়া, প্রবলগতি বায়ুপ্রবাহ, আকাশে বিভিন্ন বর্ণ ও আকারের মেঘসঞ্চরণ ইত্যাদির মধ্যে তাঁহার কল্পনাপ্রবণ কবিহৃদয় একটা অনুপম সৌন্দর্যের সন্ধান পাইল। সমুদ্রের বিশুদ্ধ হাওয়া তাঁহার দেহমনে একটা উল্লাস আনিয়া দিল। মোটের উপর এই অভিনব পরিস্থিতিমধ্যেও তিনি বেশ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর এই সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে স্বরচিত যে প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা ১০ই জুলাই ইয়োকোহামা হইতে লিখিত। উক্তপত্রে কলম্বো পর্যন্ত যে বিবৃতি আছে, তাহা এই : "আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্বদা খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল, আমি তা করিনি, সেজন্য আমায় ক্ষমা করবে। এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। বিশেষতঃ আমার তো কখন নানা জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে ঘোরা অভ্যাস ছিল না। এখন এইসব যা সঙ্গে নিতে হয়েছে তার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি খরচ হচ্ছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম ঝঞ্ঝাট। বোম্বাই ছেড়ে এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছিলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে ছিল। এই সুযোগে আমি নেমে শহর দেখতে গেলাম।

গাড়ী করে কলম্বোর রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। সেখানকার কেবল বুদ্ধ-ভগবানের মন্দিরটির কথা আমার স্মরণ আছে, তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ পরিনির্বাণ-মূর্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে। মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁরা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না বলে আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। ওখান থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যদেশে অবস্থিত কাণ্ডি শহর সিংহলী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার সেখানে যাবার সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ —কি পুরুষ, কি স্ত্রী—সকলেই মৎস্য-মাংসভোজী, কেবল পুরোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলবাসীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মাদ্রাজবাসীদেরই মতো। তাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, তবে উচ্চারণ শুনে মনে হয়, উহা তোমাদের তামিলের অনুরূপ।"

কলম্বো ছাড়িয়া জাহাজ বঙ্গোপসাগর অতিক্রমপূর্বক মালয়ের অন্তর্গত পিনাংএ আসিয়া থামিল। পিনাং সমুদ্রমধ্যবর্তী এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডমাত্র। নগরটি ক্ষুদ্র হইলেও সুনির্মিত এবং সুবিন্যস্ত আধুনিক অপর নগরগুলিরই ন্যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মালয়বাসিগণ অধিকাংশ মুসলমান, স্থানে স্থানে বহু চীনদেশীয় লোকও আছে, এবং কালক্রমে অনেক ভারতীয় উহাকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীনকালে মালয়বাসীদের কেহ কেহ জলদস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সওদাগরী জাহাজের ভীতি উৎপাদন করিত, কিন্তু আধুনিক স্তরবিন্যস্ত-কামানশোভিত রণতরীর ভয়ে তাহারা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে বাধ্য হইয়াছে।

পিনাংএর পর সিঙ্গাপুর। পথে সুমাত্রাদ্বীপের পর্বতমালা দৃষ্টিগোচর হয়, এবং জাহাজের কাপ্তেন ঐগুলির স্থানে স্থানে বোম্বেটিয়াদের আড্ডা ছিল বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশে স্বামীজীকে দেখাইয়া দিলেন। সিঙ্গাপুর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ হইলেও জাহাজ চলাচলের পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত থাকায় বেশ একটি সুন্দর ও বৃহৎ বন্দরে পরিণত হইয়াছে। উহা তখন স্ট্রেটস্ সেটলমেণ্ট-এর রাজধানী ছিল। সিঙ্গাপুরে একটি সুন্দর বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। উহাতে তাল-জাতীয় বহু প্রকারের বৃক্ষ সংগৃহীত রহিয়াছে। পান্থপাদপ নামক তালজাতীয় গাছ সিঙ্গাপুরে প্রচুর জন্মায়, এবং রুটি-ফলের গাছ যেখানে সেখানে। এখানে ম্যাঙ্গোষ্টিন অপর্যাপ্ত জন্মায়। স্থানটি বিষুবরেখার নিকটবর্তী হইলেও অধিবাসীরা তেমন কালো নহে। সিঙ্গাপুরে একটি যাদুঘরও আছে। তবে বন্দর-জীবনে যেমন

সাধারণতঃ হইয়া থাকে এখানেও তেমনি পানদোষ ও চরিত্রদোষ খুবই বেশী। জাহাজ বন্দরে কিছুক্ষণ থাকার অবসরে স্বামীজী নামিয়া বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া লইলেন।

জাহাজ অতঃপর ইংরেজ উপনিবেশ হংকং-দ্বীপে থামিল। হংকং খাঁটি চীনেরই অন্তর্গত। অবশ্য সিঙ্গাপুরেই স্বামীজী চীন-সভ্যতার পরিচয় পাইয়াছিলেন, কারণ সিঙ্গাপুরে চীনদের সংখ্যা খুবই বেশী। চীনদেশের কথা ভারতবাসীরা শৈশব হইতেই শুনিয়া থাকে, বিশেষতঃ কলিকাতার চীনাবাজার অঞ্চলে তো বহু চীনার সহিতই দেখা হয়। অতএব চীনাদের সম্বন্ধে—তাহাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, খাদ্য, বাসস্থান, তাঁহারা নিজেদের দেশে ঠিক কিভাবে থাকে ইত্যাদি বিষয়ে স্বামীজীর যথেষ্ট ঔৎসুক্য ছিল। চীন শব্দটির সঙ্গেই জড়িত ছিল যেন কত কল্পনা, কত জাদু। চীন দেশটা দেখিতে হইবে। হংকংএ উপস্থিত হইয়া স্বামীজী আগ্রহভরে সমস্ত লক্ষ্য করিলেন। ইয়োকোহামার পূর্বোদ্ধৃত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"হংকং তো খাঁটি চীন; যেই জাহাজ কিনারায় নোঙ্গর করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা এসে ডাঙ্গায় নিয়ে যাবার জন্য তোমায় ঘিরে ফেলবে। এই নৌকাগুলো একটু নূতন রকমের—প্রত্যেকটিতে দুটো করে হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকাতেই বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির স্ত্রীই হালে বসে থাকে, একটি হাল দুহাত দিয়ে ও অপর হাল এক পা দিয়ে চালায়। আর দেখা যায় যে, শতকরা নব্বই জনের পিঠে একটি কচি ছেলে এরূপভাবে একটি থলির মতো জিনিস দিয়ে বাঁধা থাকে, যাতে সে হাত-পা অনায়াসে খেলাতে পারে। চীনে-খোকা কেমন মায়ের পিঠে সম্পূর্ণ শান্তভাবে ঝুলে আছে, আর ওদিকে মা—কখন তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নৌকা চালাচ্ছে, কখন ভারি ভারি বোঝা ঠেলছে, অথবা অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে এক নৌকা থেকে অপর নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছে—এ এক বড় মজার দৃশ্য। আর এত নৌকা ও স্টীমলঞ্চ ভিড় করে ক্রমাগত আসছে যাচ্ছে যে, প্রতিমুহূর্তে চীনে-খোকার টিকি-সমেত ছোট মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, খোকার কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্মজীবনের কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মতো ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু-একখানা চালের পিঠে দিচ্ছে, সে ততক্ষণ তার গঠনতন্ত্র জেনেই সন্তুষ্ট। চীনে খোকা একটি রীতিমত দার্শনিক। যখন

ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে স্থিরভাবে কাজ করতে যায়। সে বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়তার দর্শন শিখেছে। চীন ও ভারতবাসী যে 'মমি'তে পরিণতপ্রায় এক প্রাণহীন সভ্যতার স্তরে আটকে পড়েছে, অতি দারিদ্র্যই তার অন্যতম কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তার প্রাত্যহিক অভাব এতই ভয়ানক যে, তাকে আর কিছু ভাববার অবসর দেয় না।

"হংকং অতি সুন্দর শহর—পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্মিত ; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক বাস করে ; ইহা শহর অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। পাহাড়ের উপরে প্রায় খাড়াভাবে ট্রাম-লাইন গিয়েছে, তারের দড়ির সংযোগে এবং বাষ্পীয় বলে ট্রামগুলি উপরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

"আমরা হংকংএ তিন দিন ছিলাম। সেখান থেকে ক্যাণ্টন দেখতে গিয়েছিলাম, হংকং থেকে একটি নদী ধরে আশী মাইল উজিয়ে ক্যাণ্টনে যেতে হয়। নদীটি এত চওড়া যে বড় বড় জাহাজ পর্যন্ত যেতে পারে। অনেকগুলো চীনে জাহাজ হংকং ও ক্যাণ্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বিকেলে একখানি জাহাজে চড়ে পরদিন প্রাতে ক্যাণ্টনে পৌছলাম। প্রাণের স্ফূর্তি ও কর্মব্যস্ততা মিলে এখানে কি হই-চই! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলেছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়, হাজার হাজার নৌকা রয়েছে গৃহের মতো বাসোপযোগী। তাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলো দোতলা তেতলা বাড়ীর মতো, চারিদিকে বারান্দা রয়েছে, মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে ; কিন্তু সব জলে ভাসছে!

"আমরা যেখানে নামলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গভর্নমেণ্ট বৈদেশিকদের বাস করবার জন্য দিয়েছেন, এবং চতুর্দিকে নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল জুড়ে এই বৃহৎ শহর অবস্থিত—এখানে অগণিত মানুষ বাস করছে, জীবনসংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলে ফেলে চলেছে—প্রাণপণে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার চেষ্টা করছে। মহা কলরব, মহা ব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসীসংখ্যা যতই হোক, এখানকার কর্মপ্রবণতা যতই হোক, এর মতো ময়লা শহর আমি দেখিনি। তবে ভারতবর্ষের কোন শহরকে যে হিসাবে আবর্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসেবে বলছি না, চীনেরা তো এতটুকু ময়লা পর্যন্ত বৃথা নষ্ট হতে দেয় না ; চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয় তার কথাই বলছি। তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখন স্নান করবে না।

"প্রত্যেক বাড়ীখানি একখানি দোকান—লোকেরা উপরতলায় বাস করে। রাস্তাগুলো এত সরু যে, চলতে গেলেই দুধারের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চলতে না চলতে মাংসের দোকান দেখতে পাবে। এমন দোকানও আছে যেখানে কুকুর-বেরালের মাংস বিক্রয় হয়, অবশ্য খুব গরীবরাই কুকুর-বেরাল খায়।

"আর্যাবর্তনিবাসিনী হিন্দু-মহিলাদের যেমন পর্দা আছে, তাদের যেমন কেউ কখন দেখতে পায় না, চীনের মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সামনে বেরোয়। এদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটি স্ত্রীলোকের পা তোমাদের ছোট খোকার পায়ের চেয়ে ছোট; তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঠিক বলা যায় না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ থপ করে চলেছে।"

স্বামীজী চীনবাসীদের দারিদ্র্য, জীবনযাত্রাপ্রণালী, শ্রমপরায়ণতা, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাঁহাদের ধর্মের সহিতও পরিচিত হইতে উৎসুক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "আমি কতকগুলি চীনে-মন্দির দেখতে গেলাম। ক্যাণ্টনে যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি আছে, প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট এবং সর্বপ্রথম পাঁচশতজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্তি; তাঁর নীচেই সম্রাট বসেছেন; আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্তি—সব মূর্তিগুলিই কাঠে সুন্দররূপে ক্ষোদিত।" তিনি বৌদ্ধ ভাস্কর্য উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিলেন; এবং লক্ষ্য করিলেন, ভারতীয় মন্দিরের সহিত ইঁহাদের মন্দিরের সাদৃশ্য আছে। অবশ্য বৈষম্যও যথেষ্ট ছিল এবং ঐ বৈষম্যেরই মধ্যে চীনবাসীদের মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ইহার পর তাঁহার ঔৎসুক্য জাগিল, শুধু বৌদ্ধ মন্দির নহে, খাঁটি চীনা-মন্দির দেখিতে হইবে। কিন্তু সেসব মন্দির এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ। তাহা হইলে কি করা যায়? তিনি দ্বিভাষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সেখানে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কৌতূহল আরও বর্ধিত হইল—চীনা-মন্দির অবশ্য দেখিতে হইবে! তিনি দ্বিভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর, কোন বিদেশী ওখানে গিয়ে পড়ল, তাহলে কি হবে?" সে উত্তরে বলিল, "তাহলে মন্দিরবাসীরা তার উপর অত্যাচার করবে।" স্বামীজী মনে মনে ভাবিলেন, মঠবাসী সাধুরা যদি জানিতে পারে যে, তিনি

হিন্দু সন্ন্যাসী তবে তাহারা তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিবে না। তিনি দ্বিভাষী ও সহযাত্রী জার্মানদের ঐরূপ একটি মঠে যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, এবং সহাস্যে বলিলেন, "এসোই না, দেখি তারা আমাদের মেরে ফেলে কিনা।" কিন্তু তাঁহারা মঠের দিকে অধিক অগ্রসর হইতে না হইতেই দ্বিভাষী চীৎকার করিয়া উঠিল, "পালান মশায়রা, পালান! ঐ দেখুন তারা তেড়ে আসছে, আর তারা চটে গেছে বেজায়।" দেখা গেল দুই-তিনজন লোক যষ্টিহস্তে দ্রুত সেদিকে আসিতেছে। তাহাদের চণ্ডমূর্তি দেখিয়া স্বামীজী ও দ্বিভাষী ব্যতীত সকলেই পলাইলেন। যখন দ্বিভাষীও পলাইতে উদ্যত হইল, তখন স্বামীজী তাহার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাপু হে, চীনারা নিজেদের ভাষায় ভারতীয় যোগীকে কি বলে, তা না শিখিয়ে দিয়ে পালানো চলবে না।" দ্বিভাষীর নিকট শব্দটি লিখিয়া লইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীনাদের বলিতে লাগিলেন, তিনি ভারতীয় যোগী। উহাতে যাদুমন্ত্রের ন্যায় ফল ফলিল। ক্রুদ্ধ লোকগুলি সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার পদপ্রান্তে অবনত হইল এবং অতঃপর গাত্রোত্থান করিয়া করজোড়ে অতি বিনীতভাবে কতকগুলি কথা উচ্চারণ করিল যাহার একটি শব্দ স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন—"কবচ"। তিনি অনুমান করিলেন, ইহা হিন্দু কবচ শব্দই হইবে। কিন্তু নিঃসন্দেহ হইবার জন্য দূরে অবস্থিত দ্বিভাষীকে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগুলি কি চায়? দ্বিভাষী প্রাণভয়ে দূরে পলাইয়া এই সব ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল; কারণ জীবনে সে এরূপ দৃশ্য দেখে নাই। সে উত্তরে বলিল, "মশায় এরা ভূতপ্রেত থেকে এবং অপবিত্র প্রভাব থেকে বাঁচবার জন্য রক্ষাকবচ চাইছে, এরা আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছে।" স্বামীজী কি করিবেন অকস্মাৎ ভাবিয়া পাইলেন না; কেননা জাদু-বিদ্যায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। অতঃপর একটা বুদ্ধি ঠাওরাইলেন। পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়া উহা টুকরা টুকরা করিলেন এবং প্রত্যেক খণ্ডে বেদের পবিত্রতম শব্দ "ওম্" সংস্কৃত অক্ষরে লিখিয়া তাহাদের হস্তে দিলেন। তাহারা ঐগুলি গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে মস্তকে ঠেকাইল এবং তাঁহাকে মঠাভ্যন্তরে লইয়া গেল। মঠের অতি নিভৃত অংশে তাহারা তাঁহাকে কিছু প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক দেখাইল। উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি যখন ক্যাণ্টনের ঐ বিরাট মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন মন্দিরস্থ বুদ্ধশিষ্যদের প্রতিমূর্তির

আকৃতি বাঙ্গালীদেরই সদৃশ দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং পূর্বে অধীত চীনদেশের ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, এককালে বঙ্গদেশের সহিত চীনের ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান ছিল, এককালে নিশ্চয়ই বঙ্গদেশ হইতে বহু ভিক্ষু তথায় আসিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রও সঙ্গে আনিয়াছিলেন; এইরূপে ভারতীয় চিন্তা চীনদেশের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ইহার পরবর্তী বিবরণ স্বামীজীর পূর্বোদ্ধৃত পত্রে এইরূপ পাওয়া যায়, "ক্যান্টন হতে আমি হংকঙে ফিরলাম। সেখান থেকে জাপানে গেলাম। নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জাহাজ লাগলো। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ থেকে নেমে শহরের মধ্যে গাড়ী করে বেড়ালাম। চীনের সহিত কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাদের অন্যতম। এদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলো প্রায় সবই চওড়া সিধে ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো। খাঁচার মতো এদের ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলো, প্রায় প্রতি শহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত চিড়গাছে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলো, বেঁটে, সুন্দরকায়, অদ্ভুত বেশধারী জাপ, তাদের প্রত্যেক চালচলন, অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব—সবই ছবির মতো। জাপান সৌন্দর্যভূমি। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পেছনে এক একখানি বাগান আছে—তা জাপানী ফ্যাশনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মতৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, ছোটছোট কৃত্রিম জলপ্রণালী এবং পাথরের সাঁকো দিয়ে ভালরূপে সাজানো।

"নাগাসাকি থেকে কোবি গেলাম। কোবি গিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিলাম। স্থলপথে ইয়োকোহামায় এলাম—জাপানের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ দেখবার জন্য। আমি জাপানের মধ্যপ্রদেশে তিনটি বড় বড় শহর দেখেছি। ওসাকা—এখানে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটো—প্রাচীন রাজধানী; টোকিও—বর্তমান রাজধানী; টোকিও কলকাতার প্রায় দ্বিগুণ হবে। লোকসংখ্যাও প্রায় কলকাতায় দ্বিগুণ। ছাড়পত্র ছাড়া বিদেশীকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করতে দেয় না।

"দেখে বোধ হয়—জাপানীরা বর্তমান কালে কি প্রয়োজন, তা বুঝেছে; তারা সম্পূর্ণ জাগরিত হয়েছে। ওদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। ওদের যে কামান আছে, তা ওদেরই একজন কর্মচারী

আবিষ্কার করেছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। আমি একজন জাপানী স্থপতিনির্মিত প্রায় এক মাইল লম্বা একটা সুড়ঙ্গ দেখেছি। এদের দেশলাই-এর কারখানা একটা দেখবার জিনিস। এদের যে-কোন জিনিসের অভাব, তাই নিজের দেশে করবার চেষ্টা করছে। জাপানীদের একটি স্টীমার লাইনের জাহাজ চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করে; আর এরা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাবে, মতলব করছে।"

এশিয়ারই একটি দেশ নবীন জাপানের শিল্পায়োজন স্বামীজীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এমন শোভাময় দেশ, এমন সুরুচিসম্পন্ন নরনারী—সুন্দর তাহাদের সবটুকু—ঘরবাড়ী, রাস্তা, উদ্যান, চাল-চলন, ভাবভঙ্গী। আর তাহারই মধ্যে এই বিশাল কর্মোদ্যম। নবীন জগতের ধারা সম্বন্ধে তাহারা অতিমাত্র জাগরূক এবং সেই ধারায় চলিয়া স্বদেশের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর। স্বামীজীও স্বদেশের আর্থিক উন্নতির চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কে জানে ভগবদ্বিধানেই তিনি ইউরোপের পথে আমেরিকায় না গিয়া জাপানের পথে গিয়াছিলেন কিনা। ইউরোপ হইতে শিক্ষালাভ অপেক্ষা জাপানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া ভারতের পক্ষে সহজ—ইহা স্বামীজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ জাপানীরাও এশিয়া-বাসী, এবং কিছুদিন পুর্বেও তাহারা আর্থিক সভ্যতা ও উন্নতির মাপকাঠিতে ভারতের তুল্য অথবা তদপেক্ষাও নিম্নতর স্তরে ছিল। জাপানে যাহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা ভারতে কেন হইবে না? জাপানের মন্দিরও তিনি দেখিয়াছিলেন। পুরোহিতকুল সাধারণতঃ রক্ষণশীল ও পরিবর্তনবিরোধী কিন্তু স্বামীজী জাপানের মন্দিরগুলি দেখিয়া এবং পুরোহিতদের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলেন, "এরা বেশ বুদ্ধিমান। বর্তমানকালে সর্বত্রই যে একটা উন্নতির জন্য প্রবল চেষ্টা দেখা যায়, তা পুরোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে।" তারপর মনে মনে জাপান ও চীনের সহিত ভারতের আরও তুলনা করিয়া স্বামীজী স্পষ্টই লিখিলেন, "জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদিত হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতিবৎসর চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখনও সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ। আর তোমরা কি করছ? সারা জীবন

কেবল বাজে বকছ। এস এদের দেখে যাও তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ। পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ। শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়, সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ত্রিশ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশেপাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ; 'বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও' করে উচ্চ চীৎকার তুলছে। বলি সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?"

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ অগ্নিবর্ষী বাক্যে স্বামীজী স্বদেশের আশা-ভরসার স্থল শিক্ষিত যুবকদের একখানি নিখুঁত ছবি আঁকিলেন। কিন্তু শুধু নেতির দিক দেখাইয়া সকলকে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত করিতে স্বামীজী অবতীর্ণ হন নাই। তাই তিনি পুনঃ উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিলেন, "এস, মানুষ হও! প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শতশত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত হতে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।"

স্বামীজী দেখাইলেন সভ্যতায় পশ্চাদ্বর্তী জাপান স্বীয় উদ্যমে কেমন করিয়া বড় হইল। তিনি ভারতকে শুনাইলেন মন উদার করিবার, দৃষ্টি প্রসারিত করিবার কথা; মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করিয়া মৌলিক চিন্তার আশ্রয় লইতে হইবে, আর হৃদয় পূর্ণ করিতে হইবে উচ্চ আকাঙ্ক্ষায়। ইহাই তো উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। পথের নির্দেশ দিয়া স্বামীজী নেতার আসন হইতে দেশের যুবকদের ডাকিয়া বলিলেন, "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে প্রেরণ করেছেন, আর মাদ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?...ধীর, নিস্তব্ধ, অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্বদা মনে রাখবে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৫৩-৫৯)।

মনে রাখিতে হইবে পত্রখানি মাদ্রাজের ভক্তদিগকে লিখিত, তাই মাদ্রাজের যুবকদের অবস্থাদিই ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অখণ্ড ভারতের প্রতি স্বামীজীর প্রথম সুবিন্যস্ত, সুচিন্তিত স্পষ্ট উক্তি বা নির্দেশ। অনেকের ধারণা আমেরিকায় অবস্থানকালে পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাই সাধুচিত পারলৌকিক চিন্তাস্থলে তিনি ইহলৌকিক চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। স্বামীজীর মনে ভারতের উন্নতির যে চিত্র উদিত হইত, তাহা কখনও ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মবিরোধী ছিল কিনা, সে বিষয়ে বিবেচনার সময় আমরা অতঃপর যথেষ্ট পাইব। এখানে আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, প্রাচ্য ভূভাগ পরিত্যাগের পূর্বেই স্বামীজীর মনে ভারতের সামূহিক উন্নতির একটা পরিপূর্ণ পরিকল্পনা রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার বিচ্ছিন্ন আভাস আমরা তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনালোচনাকালে যথেষ্ট পাইয়াছি; বর্তমান পত্রে তাহারই সুসংবদ্ধ

পরিচয় পাই। ইহার পরে তিনি ভারতের উন্নতিকল্পে যাহা কিছু বলিয়াছেন, মনে হয় যেন তাহার সবটাই এখানে সূত্রাকারে রহিয়াছে—শিক্ষাপ্রচার, দারিদ্র্য-বিদূরণ, সামাজিক অত্যাচারনিরোধ, ত্যাগী যুবকদের দ্বারা এই কার্যসম্পাদন ইত্যাদি অনেক কথাই পত্রে আছে। অবশ্য নারীসমাজের উন্নতি, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, বাল্যবিবাহনিরোধ ইত্যাদি কোন কোন বিষয় এখানে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক দেখিবেন, স্বামীজী মৌলিক যে কথাগুলি সূত্রাকারে বলিয়াছেন, তাহার বিস্তার করিতে গেলে এইগুলি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

ইয়োকোহামা হইতে লিখিত চিঠিখানির তারিখ ১০ই জুলাই। জাহাজ ঠিক কবে ইয়োকোহামা ছাড়িয়াছিল, এবং প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিতে কতদিন লাগিয়াছিল জানা নাই ; তবে স্বামীজীর ২০শে আগস্টের পত্র হইতে পথের কিঞ্চিৎ সংবাদ পাওয়া যায়, "জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে পৌছিলাম।[১] প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোনরূপে বঙ্কুবরে পৌছিয়া তথা হইতে কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌছিলাম। তথায় আন্দাজ বারো দিন রহিলাম।" ('বাণী ও রচনা', ৬।৩৬০)। ভারতীয় বন্ধুগণ স্বামীজীকে রেশমনির্মিত ভারতীয় পোশাকে সজ্জিত করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালেও যে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ, এমন কি কানাডা ও যুক্ত-রাষ্ট্রও এত ঠাণ্ডা যে, উষ্ণবস্ত্র আবশ্যক হয়, ইহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অতএব শুধু জাহাজেই নহে, জাহাজ হইতে নামিয়াও তাঁহাকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল।

প্রাচীন ভূখণ্ড ত্যাগ করিয়া যেদিন স্বামীজী নূতন ভূখণ্ডের পশ্চিম কূলে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে অবস্থিত বঙ্কুবর বন্দরে অবতরণ করিলেন, সেই বিশেষ দিনটি আমরা অবগত নহি। সম্প্রতি শ্রীযুক্তা মেরী লুইস বার্ক তাঁহার গবেষণাপূর্ণ অমূল্যগ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন্ আমেরিকা ; নিউ ডিস্‌কবারিজ'[২] এর মুখবন্ধে

১। বাঙ্গলা জীবনীর মতে (৮০২ পৃঃ) বোম্বের জামসেদজী নসরওনজী টাটা জাপান হইতে চিকাগোর পথে স্বামীজীর সহযাত্রী ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটে।

২। অতঃপর আমাদিগকে এই গ্রন্থখানির অনেক সাহায্য লইতে হইবে, আমরা শুধু 'নিউ ডিস্‌কবারিজ' বলিয়া ইহার উল্লেখ করিব।

লিখিয়াছেন "সম্প্রতি আবিষ্কৃত কিছু তথ্যের ভিত্তিতে আমি বলিতে পারি, তিনি ২৫শে জুলাই, ১৮৯৩ খৃঃ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বঙ্কুবরে অবতরণ করেন।" বঙ্কুবর উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের অন্তর্গত। বঙ্কুবর হইতে কানাডা প্যাসিফিক রেলপথে তিনি বিখ্যাত রকি পর্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া চলিলেন—পথ অতীব মনোরম। বহু নদ-নদী, বনানী, নগর, মহানগর অতিক্রম করিয়া ট্রেন ছুটিল এবং উইনিপেগ হইয়া খুব সম্ভবতঃ ৩০শে জুলাই, ১৮৯৩ খৃঃ, সন্ধ্যায় তিনি চিকাগো নগরে উপস্থিত হইলেন।

নির্দেশিকা